মেঘ জীবনের তৃষ্ণা

মেঘ জীবনের তৃষ্ণা

মেঘ জীবনের তৃষ্ণা

মেঘ জীবনের তৃষ্ণা

মেঘ জীবনের তৃষ্ণা

অনিল ঘড়াই
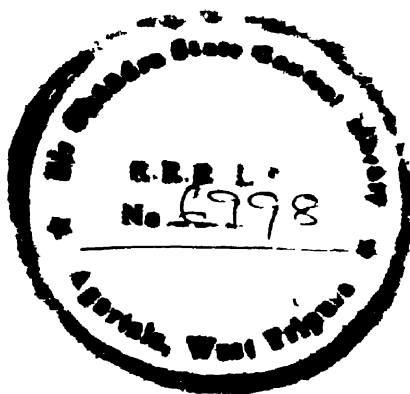
গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ কলেজ স্ট্রিট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

MEGH JIBONER TRISHNA

A Bengali Novel

By

Anil Gharai

First Published
January, 1960

ISBN 81-7332-108-X

Price : Rs.70/- Only

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ১৯৬০

দাম : ৭০ টাকা

গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে এস. বি. নায়ক কর্তৃক
প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যাণ্ড প্রসেস, ১১৪এন ডাঃ এস. সি.
ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত

মাননীয় শ্রীশ্যামাপ্রসাদ নাথ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই

কাক
পরীযান
আগুন
জ্ঞানবৃক্ষের ফল
কটাশ
জলচুরুণী
তিন ভুবনের গল্প
জার্মানের মা
ভারতবর্ষ
গর্ভ দাও
অনিল ঘড়াইয়ের গল্প
কামকুঠিয়া
নুনবাড়ি
বনবাসী
বোবাযুদ্ধ
প্লাবন
মুকুলের গন্ধ
বক্ররেখা
তরঙ্গলতা
কাননে কুসুমকলি
লালি-দুলি (কিশোর গল্পগ্রন্থ)

মেঘ জীবনের তৃষ্ণা

টিমটিমে ডিবরি জ্বলছিল শ্বাসকষ্টের রোগীর মত। চার দেওয়ালের মাঝাখানে তবু পচা পাঁক অন্ধকার। ভোরের আদুরী আলো সুড়সুড়ি দেয় গায়ে। ঘরের পিছনে পুকুরের জলে শিকড় ছুঁইয়ে, বুকে কিল মেরে হাবাগোবার মত দাঁড়িয়ে আছে বাঁশঝাড়। কাকের কর্কশ চিৎকার তবু গাছগাছালির মৌনতা ভাঙাতে পারে না। হৈমবুড়ির মশারীটা বড় আজব, পুরনো শাড়ি কেটে বানিয়ে দিয়েছে সুভদ্রা। এই হিম ঝরেপড়া ভোরে বাতাসকে প্রেমিক ভেবে জড়িয়ে ধরেছে শীত। হৈমবুড়ির বুকের কাছে তেল-চিটে ময়লা একটা কাঁথা। চিমটি কাটলে নখের ডগায় জড়িয়ে যাবে সেগুলো। তা যাক। তবু বুড়ি চেষ্টা করে ঘুমোতে। কাঁচা-পাকা চুলের গোড়ায় খেলা করে ডুমো উকুন। রাতভর ঘুমোবার চেষ্টা করেও হার মানতে হয় তাকে। খাটা গতর বিছানা পেলে ধানকাটা মাঠের মত জুড়োয়। চোখ দুটো অবাধ্য তার, কথা শোনে না। দু-চোখের পাতা বয়স বাড়লে এক হয় না সহজে। সামান্য শব্দে ঘুম চটকে যায় হাওয়া লাগা কচি কলাপাতার ঢঙে। ভোরের দিকে কিছুতেই এক হতে চায় না চোখের পাতা, দু-চোখ একেবারে হাটখোলা। শীত হাওয়ার সপাং সপাং চাবুক নেই ঘরে, তবু কাঁথাটাকে দু-হাত দিয়ে বুকের কাছে টেনে আনে হৈমবুড়ি। বয়স বাড়লে কথা শোনে না চোখ, নিদ্রাহীন রোগ ছোবল মারে মানুষকে।

পবন তার নাতি। শীর্ণ রোগাটে শরীর নিয়ে শুয়েছিল ব্রজবুড়ার পাশে। বুড়োটা আঁকশিলতা হয়ে ছুঁয়ে আছে পবনের শরীর। অসাড় ঘুমে কাদা দু-জনেই।

দাওয়ার দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল হৈমবুড়ি। হিংসে হল মনে মনে। শান্তিতে যে ঘুমোতে পারে তার মত সুখী মানুষ কে আছে এই ভুবনে?

চোখ রগড়ে পাশ ফিরে শুলো হৈমবুড়ি। এত ভোরে বিছানা ছাড়লে রাগারাগি করে সুভদ্রা। ঠোঁট ফুলিয়ে শুধোবে, মা, তোমার কি রাতভর চোখের পাতা এক হয় না?

বৌমার প্রশ্ন শুনে হৈমবুড়ি ফ্যালফ্যাল করে তাকাবে, কপালে ফুটে উঠবে হিজিবিজি রেখা, চোখের নীচে ভুসো কালি আঁধার, ঘুমোলে কি চলে বৌমা! সহদেব সেই যে গেল তার আর ঘরে ফেরার মন নেই। তোমার শ্বশুরও তো বুড়া হয়েছে, সে আর কত কাল সংসারের জোয়াল টানবে?

সুভদ্রার জানা নেই উত্তর। সহদেবের উপর যথার্থ অভিমানে তার পাতলা ঠোঁট নড়বে কচি বাঁশ পাতার মত। ভাষাশূণ্য চোখ, পুরো শরীর অসাড়, পাথর।

কাল রাতে ভিজে ভাত আর আলুমাখা দিয়ে খেতে খেতে সহসা ব্রজবুড়া শুধিয়েছিল, বউরে, কতদিন এ ঘরে আঁশজল হয় নি বলতো? কবে যে মাংস খেয়েছি মনেই পড়ে না!

বুড়োর বড়ো ভাল-মন্দ খাওয়ার বাতিক। আঁশজলের জন্য খেতে বসে ভুলভুলিয়ে তাকায় সে। কামাই না হলে হাটে গেলে কেউ পোছে না। হাট ঝাঁটানোর কাজটা কেড়ে নিয়েছে হরিয়া। ধর্মাবাবু সাপোর্ট করল তাকে। সেই থেকে বুড়োর 'তলা' তোলা বারণ। মাছ খেতে গেলে নগদ পয়সার প্রয়োজন। কোথা থেকে আসবে পয়সা? এ সংসারে সবাই হা-করে তাকিয়ে থাকে ব্রজবুড়ার মুখের দিকে। সে মুখে সুখ নেই, ছায়া নেই—আছে শুধু সর্বগ্রাসী অভাব।

হৈমবুড়ি মানুষের মন বোঝে।

বুড়ার মন পেতে সে সাঁঝবেলায় কুঁড়াজালি পেতে এসেছে পুকুরে। ভোর-ভোর না গেলে কুঁচো চিংড়ি কুঁড়া-গোবর খেয়ে পালাবে। তখন অসার হবে কুঁড়াজালি পেতে রাখা।

বুড়ির বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করে না। ভোরবেলায় মনে পড়ে সহদেবের মুখখানা। ক'খানা বাঁশি নিয়ে সে যাত্রাদলে চলে গেল। কবে ফিরবে এমন কোন মাথার দিব্যি দিয়ে যায়নি। শুধু সুভদ্রা নয়—হৈমবুড়িও ভাবে তার কথা। ছেলেটা বুঝি অগস্তযাত্রায় গিয়েছে, ফেরার কোন নাম-গন্ধ নেই! অমন বুকে পাথরচাপা ছেলে কি করে হয়? হৈমবুড়ি ভাবল।

তার কপাল মন্দ।

না হলে দু-দুটো ছেলে কলা দেখিয়ে ঠিকরে যায় উড়ুল মাছের মত। কপালের লিখন যাবে কোথায়! দীর্ঘশ্বাস ঠাণ্ডা বিছানায় ভাঁজ ভাঙা জলের মত গড়ায়।

নকুল আর সহদেব থেকেও নেই সংসারে। একটা বাঁশিওলা, অন্যজন ঝাড়ুর কাজ করে মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে। মাস গেলে সে মাইনে পায়, একটা টাকাও ছুঁড়ে দেয় না ঘরের দিকে। ঘর তার কাছে পর। নিজের বৌ-বাচ্চা নিয়ে সে সুখে আছে। শুধু বুড়ির কপাল ফোঁপরা। সুভদ্রার ফাটা কপাল। বিয়ের পর থেকে সংসারের ঘানি টানতে টানতে হাঁপিয়ে উঠেছে সে।

বুড়ি তাকে সান্ত্বনা দেয়, মনে দুঃখ পুষে রেখোনি বউমা। সংসারে সবাই সব সুখ পায় না। কেউ কেউ অসুখ নিয়ে ছেইরে হয়ে যায়—

হাড়িসাইয়ে গায়ে গা লাগিয়ে বেঁচে থাকার জন্য চালাঘর। ছেলে-বুড়ো মিলিয়ে শ'য়ের উপর মানুষ। ব্রজবুড়া তাদের মধ্যে মাতব্বর, সাক্ষীবট। মাজা পড়েছে, ছানি পড়া চোখ, অশক্ত শরীর তবু খাটতে চায় সংসারের জন্য। একটু বেশি পরিশ্রম করলেই বুকটা হয়ে যায় কামারশালার হাঁপর। ট্যাঁড়াকাঠি খেলা মুখটায় ফাটা মাটির গাম্ভীর্য। এ পাড়ায় ব্রজবুড়ার কদরই আলাদা। পেটে ভাত না থাকলেও তার সম্মান আছে এখানে। দায়ে অদায়ে মানুষ সুপরামর্শ পেতে তার কাছেই ছুটে আসে। পুরনো গাছ, পুরনো চালের কদরই আলাদা। দশ-পাঁচটা গ্রামের লোক জানে ব্রজবুড়ার নাম। শুধু নাম ভাঙিয়ে পেট চলে না। তাই ব্রজবুড়া এখনও পেটের ধান্দায় গাঁ-ঘোরে। তার নিজের জমি-জিরেত কিছু নেই। শুধু আছে কাঠা পাঁচেক বাস্তুভিটে। বাস্তুভিটেয় চাষ হয় না, শুধু আগাছার জঙ্গল। তাই শেষ কবে মাংস খেয়েছিল ব্রজবুড়া তা এখন আর মনে করতে পারে না। ছাঁচি পেঁয়াজ ফাঁকা মাড়িতে মাংসের স্বাদ এনে দিতে অক্ষম।

তরলা বাঁশঝাড়ের পাতা চিরে আলো এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে দাওয়ায়। সুভদ্রার মাটির হাঁড়িতে গোবরগোলা জল। হাতের ময়লা শাঁখায় করুণ-বিষণ্ন আর্তি। ঐ ধারাবাহিক দুঃখবাহী মুখের দিকে সে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না। সুভদ্রা ছড়া ছিটান শেষ করে ঝুড়ি তুলে দেয় হাঁসের। মোট চারটে হাঁস প্যাঁক-প্যাঁক ডাকতে ডাকতে হাই তুলে পালক ঝেড়ে নেমে যাচ্ছে পুকুরঘাটে। সুভদ্রাও ঘাটে নেমে ধুয়ে নেয় হাতের গোবরজল। চোখে-মুখে জল দিয়ে পাড়ের উপর উঠে দাঁড়ায়। মুখ-চোখ মোছে আঁচলে।

ঘরে ফিরে এসে সুভদ্রা দেখে তখনও জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে পবন। একমাথা ঝাঁকড়া চুল কার্তিকের মত। পবন যে তার গর্ব, কলিজার শব্দ একথা হাড়িপাড়ার সবাই জানে।

সুভদ্রা ডাকব-ডাকব করেও ব্রজবুড়া বা পবনের ঘুম ভাঙায় না। মনে তার সর্বদা ভয়। ঘুম থেকে উঠে ব্রজবুড়া বলবে—লাল চা করে দিতে! তখন কোথায় পাবে চা-পাতা, চিনি? ঘরে চা-পাতা নেই, গুড়ও নেই। চিনি তো বিরাট স্বপ্ন!

কতদিন হল ঘরে টাকা পাঠায়নি সহদেব। অভাবে ছ্যারাবেরা সংসার। মেনিকে তার বড় মামা বৈকুণ্ঠ এসে নিয়ে গিয়েছে। মেয়েটা ক্ষিদে সহ্য করতে পারে না, শুধু শুকনো মুখ নিয়ে পোষা বেড়ালের মত ঘুরঘুর করে। বৈকুণ্ঠর অবস্থা ভাল। মেনি সেখানে খেয়ে-পরে বাঁচবে।

ভোরের মিহি আলো নয়, সকালের রোদ এসে বিঁচুটি ডলে দেয় সুভদ্রার চোখে। অসহ্য লাগতেই সে কেমন বিপদে পড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল, পবন রে, উঠ, উঠ। হা-দেখ, বেলা কত হলো....

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলেও পবনের দু-চোখে ঘুমের পরাগ ভরা। চোখ রগড়ে নিয়ে সে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল। কোনমতে ঢোক গিলে বলল, মা, তোমার কি ঘুম হয় না রাতে?

সহজ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে গলা কেঁপে উঠল সুভদ্রার। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে সে বলল, যা পবন, ছাগল দুটো বেঁধে আয় পুকুরপাড়ে। ওরা খুব দুরন্ত, ছাড়া পেলে লোকের ফসলে মুখ লাগায়।

ছাগলের লালায় যে বিষ আছে—সেই বিষ কেন মানুষের ঠোঁটে থাকে না! যদি থাকত তাহলে সুভদ্রাকে কাঁদতে হোত না একলা, গোপনে। সে নিশ্চয়ই জিতে যেত অতসী বোষ্টমীর সাথে তর্ক করে। স্বামীর হক ছেড়ে দিতে হোত না তাকে। মুখচোরা মানুষ কিল খেয়েও ঠোঁটের হাসি জিইয়ে রাখে। নিজের বুক উজাড় করে সে অন্যের বুক ভরে দেয়। এ কেমন মানুষের ধর্ম—পবনের মাথায় কিছু ঢোকে না। সুভদ্রা তাকে তাড়া লাগায়, যা পবন, দাঁত মেজে এসে চাট্টিখানি কিছু খেয়ে নে। আজ তোর দাদুর সাথে তুই-ও যে গাঁ-ঘুরতে যাবি।

এমন কথায় আশ্চর্য হয় না পবন, বরং স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়। কাল হাটখোলায় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল ব্রজবুড়া। টেলারিং দোকানের বসন্ত জানা তার মাথায় জল দেয়। সুস্থ হতেই বলেছিল, নাতিটারে তো সঙ্গে নিতে পার? পবনা তো বড় হয়েছে—ওরও তো কাজ শেখার দরকার।

ব্রজবুড়ার শুকনো শরীরের দিকে তাকিয়ে পবনের রোজ মনে হয় যেন শ্মশানের পোড়া কাঠ শুয়ে আছে বিছানায়। ঘাট-পারের কড়ি কেনা সারা। ডাক আসলেই চলে যাবে হাওয়ায়। নিমেষে বুক কেঁপে উঠল পবনের; ঠেলা মেরে বলল, দাদু, ও দাদু। গাঁ-ঘুরতে যাবা না? বেলা যে চড়ে গেল, উঠো-উঠো।

অনবরত ঠেলা মারলে ব্রজবুড়া এক সময় উঠে বসে বিছানায়। কপালে জোড় হাত ছুঁইয়ে বিড়বিড়িয়ে সে থেমে যায় এক সময়। তারপর পবনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তাই তো রে, বেলা তো ঢের হল!

ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায় পুরো পাড়ায়। কাঁচা কঞ্চি ভেঙে দাঁতন করে পবন। হাঁস সাঁতার দিচ্ছে জলে। পাটখোলা শাড়ির চেয়েও স্থির জল এখন হাসিতে উদ্বেল। ছাড়া গোরু নাদতে-নাদতে চলে যাচ্ছে মাঠের দিকে। ধানমাঠ ফাঁকা। গোরুগুলো দিনভর চরবে সেখানে। ছাগলছানা দৌড়-ঝাঁপ খেলে ভাঙা কাঁথ দেওয়ালে। চারটে শুয়োর ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ করে অতি ব্যস্ততায় ঢুকে যাচ্ছে বাঁশঝাড়ে। ওরা সেখানে নোংরা খায়।

সারা শরীর ঘিনিঘিনিয়ে উঠল পবনের। সে সব সইতে পারে কিন্তু শুয়োর দেখলেই চিড়বিড়িয়ে ওঠে তার গা। বাঁশঝাড় থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনে চকিতে। এত সুন্দর সকালটাতে গোচনা ছিটিয়ে দেবার তিক্ত জ্বালা অনুভব করে সে। ধীরে ধীরে নেমে যায় পুকুরঘাটে। কুলকুচি করে, মুখ ধোয়।

ঘর থেকে ব্যস্ত ডাক ভেসে আসে সুভদ্রার, কই রে পবন। আয় বাছা, তাড়াতাড়ি আয়। বেলা যে চড়ে যাচ্ছে—

ব্রজবুড়া তানুভাত নিয়ে বসেছে, জামবাটিতে ছোট নৌকোর মত ভাসে ছাঁচি-পেঁয়াজ। মনে ক্ষোভ, জ্বালা। সুভদ্রা তাকে লাল-চা বানিয়ে দিতে পারেনি। এই অক্ষমতাকে ভাল নজরে দেখছে না ব্রজবুড়া। তানুভাত খেতে তাই অনীহা।

পবন তার দাদুর পাশে বসেছে কলাইকরা থালায় ভেজা ভাত নিয়ে। শুকনো মাছ খড় ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে সুভদ্রা। ভারী বাতাসে শুটকি পোড়ার গন্ধ। এই গন্ধটা ভারি ভাল লাগে ব্রজবুড়ার। লোভের লালায় ভিজে যায় বয়স্ক ঠোঁট, জিভটা ঠোঁট ভিজিয়ে দেয় ঘন ঘন। বুড়ো লোভ সামলাতে

না পেরে বলে, বৌমা, আমাকে টুকে রাইতা দাও। কাঁচা মরিচ দিয়ে শুকা পোড়া খেলে আমি এখনও দু-থালি ভাত খেয়ে নেব। —ব্রজবুড়ার কথায় তারুণ্যের ঝিলিক। হৈমবুড়ির ভাঙাচোরা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বাঁধ ভাঙা আলোয়। বয়সকালে ব্রজবুড়ার দু-থাল ভাত লাগত গা ধুয়ে আসার পরে। এখন শরীরের রস টানছে গভীরে। অভাবের ক্ষত বুজিয়ে দিচ্ছে পেটের গর্ত। দুটো ভাত চাইতেই সংকোচবোধ হয় বুড়োটার। হিমেল আমেজে গর্তে ঢোকা সাপের মত কুঁতকুতে চোখ মেলে ব্রজবুড়া তাকিয়ে আছে সুভদ্রার দিকে। সুভদ্রা এই ভীত চাহনির অর্থ বোঝে।

—আর দুটো ভাত দিই বাবা?

—না থাক। একা সব খেয়ে নিলে তোমরা খাবা কী? জল ঢালা ভাতের শেষ বিন্দুতে চুমুক দিয়ে ব্রজবুড়া বিতৃষ্ণায় উঠে গেল পুকুরঘাটে। মন মতো কুঁচো চিংড়ি পড়েছে কুঁড়াজালিতে। পুরনো তেঁতুল দিয়ে টক রাঁধলে হাতের তালু চেটে খাওয়া যাবে। অভাব শুধু ভাতের। চামড়ার মহাজন আওলাদ মোড়ল পাড়ায় এলে দশ-বিশটাকা অগ্রিম নিত বুড়াটা। আওলাদ মোড়ল অগ্রিম দিতে কার্পণ্য করে না।

তরলা বাঁশঝাড়ের ডগায় চিল্লে যাচ্ছে অগুণতি কাক। এত সুন্দর সকালে কাকের ডাক বিষ ঢেলে দিল ব্রজবুড়ার কানে। চরম আক্রোশে একটা গ্যাংটা তুলে নেয় ব্রজবুড়া। ছুঁড়ে মারে বাঁশঝাড়ের টিকলি লক্ষ্য করে। লক্ষ্যভ্রষ্ট গ্যাংটা ব্যর্থতার ঢেউ তুলে হারিয়ে যায় পুকুরের জলে। কালো ডানা কাঁপিয়ে উড়তে থাকে ভীতু কাক। চারদিকে অশুভ কা-কা শব্দ। হৈমবুড়ি বিরক্ত হয়ে নেমে আসল উঠোনে, মুড়ো ঝাঁটা হাতে তুলে দিয়ে উর্দ্ধমুখে তাকাল, মর মর, গুখেগোর দল সব মর। আমার টিপায় তোদের কেন ছায়া পড়ে রে-এ-এ-এ। দূর হ, দূর হ-অ-অ। গাল দিতে দিতে এক সময় তার বুকের কাপড় সরে যায়, শুকনো বেগুন বুক দুটো ডানে-বাঁয়ে দুলতে থাকে। ভয়াল-ভীষণ নিষ্ঠুরতায় তার হনুহাড় জাগান চোয়াল দুটো নড়তে থাকে ক্রমশ। পাট ফেঁসো চুলগুলো আছাড় খেয়ে পড়েছে মুখের উপর, চোখ থেকে ঠিকরে বেরয় আগুন। হা-করে আকাশের দিকে তাকিয়ে সে গাল পাড়ে মনের জ্বালা জুড়োতে। গাল দিতে দিতে এক সময় স্তব্ধ হয়ে যায় হৈমবুড়ির দু-চোখ। পুরো শরীর গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার আনন্দে থিরথিরিয়ে কেঁপে ওঠে, উঠোনে দাঁড়িয়ে উল্লসিত গলায় সে ডেকে ওঠে, হা দেখ পবন, আকাশপানে দেখ। হা দেখ, কত্তো! একটা-দুটা-তিনটা! কত্তো!

—কী গো দিদি? পবনও আকাশের দিকে মুখ ঘোরায়, কুঁড়াজালির চিংড়িমাছগুলোর মত তার বুকের ভেতরটা ছটফট করে উত্তেজনায়। সে দেখতে পায় আকাশ জুড়ে কালো কালো ফুটকি, অজস্র সুখের বিন্দু। হৈমবুড়ি পবনের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল, কি রে, দেখতে পেলি?

পবন শুধু ঘাড় নাড়ে।

হৈমবুড়ি বাঁধভাঙা আবেগকে দমন করতে পারে না, অস্থির ঠোঁট নড়ে ওঠে ক্রমাগত, যা, তোর দাদুকে ডেকে আন। ওর তো চোখ নেই। চোখ থাকলে ঠিক দেখতে পেত ফুটকিগুলো!

অপরাজিতা নীলাকাশ ছেয়েছিল চলমান কালো কালো সুখচিহ্নের সমারোহে। ব্রজবুড়া চোখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে চাইল সাংকেতিক বিন্দুগুলো। কিন্তু পারল না। বয়স খুঁবলান চোখে সুখের চিহ্নগুলোকে ঝাপসা দেখল সে। তবু সে তাকিয়ে থাকল টান টান করে ঘাড়-গলা। এক সময় টনটনিয়ে উঠল কাঁধের চারপাশ, ভেঙে পড়া গলায় বলল, কিছু দেখতে পাচ্ছি না রে নকুলের মা। আমার চোখ দুটা থেকে আগুনটুকু নিভে গিয়েছে! হৈমবুড়ি বিষণ্ন চোখে তাকাল। পবন কী মনে করে এগিয়ে এল ব্রজবুড়ার পাশে। সাহস জুগিয়ে বলল, হা দেখো দাদু, কত্তো শকুন! একটা-দুটা-তিনটা। দাদু গো, শকুনগুলা সব ভাগাড় ঘিরে উড়ছে। আজ মনে হয় মা ভাগাড়চণ্ডী দয়া করেছে।

পবনের কথা শুনে আবেগজ্বরে কাঁপতে থাকল ব্রজবুড়া, তার চোখের কোণে পেটের গর্ত ভরানোর উথলে ওঠা নদী।

দুই

পাকা দাড়ির মত মাঠময় ফুটে আছে ধানের নাড়া। চিকনি শাক খুঁটতে এসে গ্রামের বউ-ঝিউড়িরা ব্রজবুড়াকে দেখছিল আশ্চর্যভরা চোখ মেলে। গেল সনে এই মাঠেই ছেলেধরা সন্দেহে পাশের গাঁয়ের একজন কাকমারা মার খেয়েছিল বেধড়ক। সেদিনও ভাগাড় খুঁজতে যাচ্ছিল ব্রজবুড়া। তার হস্তক্ষেপে কাকমারার জীবন বাঁচে।

ফাঁকা মাঠের বাতাস ছলাকলায় ওস্তাদ। ব্রজবুড়ার পিছনে পবন হাঁটছিল স্ফূর্তিতে। চিকনি শাকভরা মাঠে এখন বঠ-ঝিউড়িদের আনাগোনা। ওরা পালি ভরে খুঁটে নিয়ে যায় শাক। খামালু আর চিকনি শাকের সুয়াদই আলাদা। মেনি ঘরে থাকলে তার সময় কাটত মাঠে। সে কারোর বাধা নিষেধ শুনত না। বেতপালি হাতে মাঠে সে যেতই যেত। চিকনি শাক তুলতে যাওয়া মেয়েদের বিচিত্র নেশা। খোলা পিঠে রোদ লাগিয়ে ওরা ঘর-সংসারের কথা আলোচনা করে, পরনিন্দা পরচর্চায় মশগুল হয়ে ওঠে কখনওবা।

পবন পাকা সড়ক পেরিয়ে ব্রজবুড়ার পিছন পিছন নেমে এল ধানমাঠে। ঢ্যাঙ্গা আলের উপর থেকে শরীরের ছায়া ঠিকরে পড়েছে জমিনে। ব্রজবুড়ার পরনে খাটো ধুতি, ফলে মালইচাকি উদোম। হাতে ধরা পাকা বাঁশের লাঠি। লাঠির ডগায় বাঁধা ছোটমাপের পোঁটলা। পোঁটলায় ভরা চাকু-ক্ষুর-শেকড় বাকড়-শিলপাথর। লাল গামছা কোমরে বাঁধা অষ্টপ্রহর। ভাগাড় যেন যুদ্ধক্ষেত্র তাই সাজ-পোষাক সম্পূর্ণ আলাদা। কাক শকুন আর ভাগাড়খেগো কুকুরগুলোর সাথে চাম দখলের লড়াই। এই অসম লড়াইয়ে কে জেতে—আগাম কেউ জানে না। তবু ভাগাড়ে যাওয়ার সময় ব্রজবুড়ার মেজাজটাই আকাশছোঁয়া। আলের উপর উঠে এসে সে পবনের সাথেও কথা বলে না। নিজেকে নিজের ভেতরে গুছিয়ে রাখে সর্বদা। চোখ সর্তক, পা ফেলে মেপে মেপে। এসময় ধৈর্য হারালে চলবে না। পিছন ফিরে তাকান মানা। তবু মাঝে মাঝে শ্লথ হয়ে যায় ব্রজবুড়ার চলার গতি। বয়স্ক গতর জু ি ত চায় যখন তখন। দামাল হাওয়ায় আছাড় পাছাড় খায় মাথার চুল। খালি গায়ে মেঠো বাতাস দাঁৎ বসিয়ে চলে যায়। পবন দাদুর পিছন ছাড়ে না। সে মন করলে ব্রজবুড়াকে পিছনে ফেলে আগে চলে যেতে পারে, কিন্তু তা করে না। কারোর ছায়াকে মাড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। অনেকক্ষণ পরে ব্রজবুড়া বলল, হ্যাঁ রে পবন, দেখ তো শকুনগুলো উড়ছে কিনা!

দাদুর কথায় পবন আবার ঘাড় ঘুরিয়ে আকাশমুখো তাকাল। কালো কালো ফুটকিগুলো উড়ছিল আকাশ জুড়ে, ওদের দৃষ্টি ভাগাড়ের উপর নিবদ্ধ।

ব্রজবুড়া জোরে জোরে পা চালিয়ে পেরিয়ে এল তিন-চারখানা জমি। আলপথ নয়, গোরুর গাড়ির নিক্ ফেলা পথে হাঁটু অব্দি ধুলো উড়িয়ে হাঁটছিল ব্রজবুড়া। ব্যস্ততার শেষ নেই। কাক-শকুনে চাম ক্ষামি করে দিলে চামড়ার মহাজন কিনবে না। আধা দামে মাল বেচে সুখ নেই। মেহনতের ধন নেয্য মূল্যে বিকোন উচিত। চিন্তিত মুখ তুলে কিছুটা গিয়েই থমকে দাঁড়াল বুড়ো, পবনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, বড্ড দেরী হয়ে গেল রে। চাম ক্ষামি হলে মনটাও যে ক্ষামি হয়ে যায়। পবন কোন কথা না বলে দাদুর মুখের দিকে তাকাল। ব্রজবুড়া বলল, গলা শুকিয়ে গেছে, দু-ঢোক জল পেলে ভাল হোত।

বললেই সে খুক খুক করে কাশল, মা ভাগাড়চণ্ডীর দয়া হলে চাম বেচার টাকায় আমি আধামণ চাল কিনে নেব। খেতে বসে হাঁড়ির দিকে তাকাতে আমার ভাল লাগে না।

পবন কিছু বলতে গিয়েও পারল না, অনতিক্রম্য দুঃখবোধ কাহিল করে তুলল তাকে। সুভদ্রার শাড়ি ছিঁড়েছে মাসের উপর। ভেজা শাড়ি সে গায়েই শুকোয়। তার দিকে তাকালে মন ভেঙে যায় পবনের। তখন তার মনে হয় গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও বাঁচতে। কিন্তু ব্রজবুড়া তাকে স্নেহের আঁকশিলতায় বেঁধেছে। পালিয়ে গিয়ে কি সে সুখ পাবে? হৈমবুড়ি চোখ ভাসিয়ে কাঁদবে। সুভদ্রা নাওয়া-খাওয়া ভুলে শীতলাবুড়ির থানে কপাল ঠুকবে তার মঙ্গল কামনায়। পবনের তাই গাঁ ছেড়ে কোথাও যাওয়া হয় না। মাটির মায়ায় পড়ে থাকতে হয় মাটি আঁকড়ে। শিকড় ছড়ানো চারাগাছের মত তার দশা। অন্য মাটিতে বাঁচবে কী ভাবে?

মাঠ পেরিয়ে বুড়ো বটতলার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। পথের ধুলোয় শরীর ভরা। রোদে কালচে দেখায় পবনের মুখ। ব্রজবুড়া ঘাড়ের কাছের ঘাম মোছে গামছায়। দূর থেকে নজরে পড়ে দশাসই গোরুটাকে। ঠ্যাং উল্টে শুয়ে আছে চোখের কোণে গাদাখানিক পিচুটি নিয়ে। বুড়ো বটের পা ছুঁয়ে আদ্যিকালের ভাগাড় পুকুর। কাকচক্ষু টলটলে জল। শাপলা পাতায় রোদ পড়ে পিছলে যায় দ্রুত। কুঁড়ি শাপলার মুখগুলো বিষহীন সাপের মত। হাওয়ায় ভাঁজ ভেঙে যায় জলের। চার আঙুল উঁচু ঢেউখেলানো টিনের মত অসংখ্য ঢেউ। ওরা যাকে ভাগাড় পুকুর বলে, গ্রামের লোকের কাছে তা মাঠপুকুর। এই মাঠপুকুরে মাছের বাড়বাড়ন্ত ভাল। খরানীর সময় এই পুকুরে হামলে পড়ে পুরো পাড়া। তখন টানাজালে ধরা পড়ে পাকা রুই, কাতলা। মাছের ভাগ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ প্রায়ই লেগে থাকে। বাবুভাইদের নজর নেই মাঠপুকুরের উপর। ভাগাড় চুয়ান জল বর্ষায় এই পুকুরে জমে। তাছাড়া চামড়া ছাড়িয়ে ব্রজবুড়া রক্তহাত ধোয় এই পুকুরে। ভাগাড়খেগো কুকুরগুলো এই পুকুরে পেট ডুবিয়ে আরাম খোঁজে। মাঠপুকুর তাই গরীব নিম্নবর্গের পুকুর।

ব্রজবুড়া শুকনো গলা ভেজানের জন্য অতি সন্তর্পণে নেমে গেল পুকুরের জলে। ক্ষুদে ক্ষুদে শ্যাওলা সরিয়ে জল খেল পেট পুরে। পোঁটলা বাঁধা লাঠিটা পড়ে থাকল বটগাছের গোড়ায়। পবন বটগাছের শেকড়ে পেছন ঠেকিয়ে বসল। বুড়া জল থেকে উঠে আসলেই সে জলে নামবে। তারও গলা ভেজানোর দরকার। এতটা পথ হেঁটে এসে হাঁপু লেগেছে তার বুকে। মুখে-চোখে জল না দিলে ভাগাড়ের রোদ সইবে কেমন করে! হাঁটু জলে নেমে শ্যাওলা সরিয়ে মুখ ধুয়ে এল পবন। পুরনো বটতলায় দাঁড়ালে দিনের বেলাতেও তার গা ছমছম করে। একা সে কোনদিন এখানে আসার সাহস পায় না। ব্রজবুড়া তাকে জোর করে ঠেলে পাঠালে, হৈমবুড়ি বাধা দেয়। বলে, তোমার কি মাথা খারাপ যে ছেলেটারে একা-একা ঠেলে দিচ্ছো ভাগাড়ে? কু' জায়গায় কু' বাতাস ঘোরাফেরা করে। পবনার কিছু হলে তুমি কি তাকে বাঁচাবে?

ব্রজবুড়ার মুখ শুকিয়ে সুপুরি, পবনের কিছু হলে সে নিজেও কি শান্তি পাবে বেঁচে থেকে! সহদেব ঘর ছাড়ার পর পবনই হয়েছে তার হাতের লাঠি। তাকে ছাড়া ভাগাড়ে আসতে, এমন কী গাঁ-ঘুরতেও ভয় করে ব্রজবুড়ার। অশক্ত শরীর একটু রোদ খেলেই টলমল করে সদ্য হাঁটতেশেখা শিশুর মতন। ক'দিন থেকে মাথা, ঘাড়, গর্দান টনটন করে ব্যথায়। শুলে আর বিছানা ছাড়তে মন করে না। চিন্তায় কালো হয়ে থাকে মুখ। বাঁ-হাতটা আপসেই উঠে আসে গালে। এই এত বয়সে কোন মানুষটা ভাগাড়ে আসে? মরা পেট কথা শোনে না। নিশির ডাকের মত টেনে আনে।

বুড়ো বটের ছায়ায় বসে শিলপাথরে চাকু ধার দেয় ব্রজবুড়া। কানে গোঁজা পোড়া বিড়ির অংশ। খালি গায়ের হাড়গুলো বটের শেকড়ের মত জাগান। বসন্ত-ছুঁবলান মুখটায় মটরদানার মত ছোট ছোট

দাগ। ঘাম জমে চকচক করছে চামড়া। কপালের ভাঁজগুলো থেকে থেকে নড়ে উঠছে [illegible] মত। পবন হা-করে তাকিয়ে থাকে ব্রজবুড়ার মুখের দিকে। চোখের পাতা নড়ে না এমন সমাধিস্থ মুখ।

চাকু-ক্ষুর শান দিয়ে ব্রজবুড়া উঠে দাঁড়ায় গা ঝাড়া দিয়ে। পটাপট ফুটে ওঠে মাজার হাড়। লাল গামছায় মুখের ঘাম মুছে সে পবনকে বলে, আর দেরী করা ঠিক হবে না। চল, পবন এবার আমরা এগোই।

মাঠপুকুরের চারধারে আম-জাম আর চারা দেবদারুগাছের ঠাস ভিড়। শ্যাকুল আর বুনো কাঁটা নটের ঝোপ তাদের ছায়ায় অবহেলিত আত্মীয়র মত বাস করছে। রাক্ষুসী রোদ তার লম্বা জিভ দিয়ে চেটে নিচ্ছে পাতার সবুজ শ্যামলিমা। শ্যাকুল খেতে এই মাঠপুকুরের ধারে পবন কতদিন দল বেঁধে এসেছে তার কোন হিসেব-নিকেশ নেই।

মাঠ পালান হাওয়া এসে আটকে গেছে বটের পুরু পাতায়, চতুর্দিক জুড়ে নূপুর বাজানোর ঝমঝম শব্দ। শুকনো পাতা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে মাটি নিচ্ছে অবলীলায়। পবন ভেজা গামছা চাপিয়ে নিয়েছে মাথায়। ব্রজবুড়ার ডান হাত আঁকড়ে ধরেছে লাঠি। ক'পা হেঁটে এসে মুখ দিয়ে অদ্ভুত 'চুকচুক' শব্দ বের করল ব্রজবুড়া, ভাগাড় দখল করা গোরুটার দিকে তাকিয়ে আপন খেয়ালে বলে উঠল, কেন মরলি রে মা ভগবতী, তোর তো মরার সময় হয় নি! আহা রে, কার সব্বোনাশ হলো রে!

ব্রজবুড়ার বিড়বিড়ানী থামে না। খড়ি ফোটা উদোম দাপনা চুলকে সে বলে, অসময়ে সব ঝরে গেল রে, কী দিনকাল পড়ল!

পবন চুপ করে শোনে। ভাগাড়ের মাটিতে পা ছুঁয়ালে বুড়োর কথা বলার স্পৃহা বেড়ে যায় শত গুণ। মরা গোরুর সাথে সে দীর্ঘ সময় কথা বলে বিড়বিড়িয়ে। আফশোষ, হা-হুতোশে ভরে ওঠে ভাগাড় প্রাঙ্গণ। পবন ধৈর্য হারিয়ে বলল, দাদু গো। রোদ চড়ছে। খপ খপ কর; না হলে ঘর ফিরতে বেলা চড়ে যাবে।

আচ্ছন্নতা কাটিয়ে ব্রজবুড়া তাকাল ফাঁকা মাঠের দিকে, তারপর লাঠিটা পবনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, যা, তফাৎ-এ গিয়ে দাঁড়া। ভাগাড়খেগো কুকুরগুলোকে আমার খুব ভয় করে। ওরা সুযোগ পেলেই ঘেউ ঘেউ করে ছুটে আসে। লাঠি ছাড়া ওরা কাউকে ডরায় না।

ছাল ছাড়ানোর কাজে ভাগাড়খেগো কুকুরগুলো হল চরম প্রতিপক্ষ। পবন লাঠি হাতে পাহারাদারের ঢঙে দাঁড়ায়। তফাৎ-এ দাঁড়িয়ে কুকুরগুলো জুলজুল চোখে দেখছে তাকে। তাদের চোখে-মুখে আপোষের কোন চিহ্ন নেই। যেন সুযোগ পেলেই তেড়ে আসবে জ্যান্ত খেতে।

দাপনায় চ্যাটাং চ্যাটাং বাড়ি মেরে ব্রজবুড়া পবনের দিকে সাহসী চোখে তাকাল, ডরবি নে, ডরলেই মরবি। ছাল ছাড়ানর কাজে সাহস আর তাগদই হল আসল কথা। আমি জানি—এ দুটা জিনিস তোর আছে। তুই তোর বাপ-জ্যাঠার মত ডরপুঁক নোস।

নকুল-সহদেব ঘৃণাভরে কেউ ভাগাড়মুখো হল না। জাতব্যবসায় অরুচি ওদের। ব্রজবুড়া এই অবহেলা মন থেকে মানতে পারেনি। দোষ যে ওদের নয়, এটা বুঝতে চায় না ব্রজবুড়া। জাতব্যবসায় আজকাল আর পেট ভরে না। ভাগাড় যা দেয় তাতে ঘুণধরা সংসারের ফোঁকর ভরে না। সহদেব তাই আড়বাঁশি শিখে যাত্রাদলে নাম লেখাল, নকুল জমি বেচার টাকায় ঘুষ দিয়ে সদর হাসপাতালের ঝাড়ুদার। পবন স্কুলের মুখ দেখলেও বড় ইস্কুলে যাওয়া তার সৌভাগ্য হল না।

পবনেরও ইচ্ছে ছিল বড় ইস্কুলের শেষ ধাপটা পেরোবে কিন্তু সহদেব তাকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করল সরাসরি। ব্রজবুড়া সায় দিল তার কথায়, পড়ে আর লাভ নেই রে দাদু। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে জাতকাজটা শিখে নে। কোথাও কিছু না পেলে তখন এই জাতব্যবসাই তোকে দু-মুঠো ভাত দেবে।

শুধু প্রতিবাদ করেছিল সুভদ্রা, কিন্তু তার ক্ষীণ প্রতিবাদ ধোপে টেকেনি, হাওয়ার মুখে শিমুল তুলোর মত উড়ে গেল। সেদিন থেকেই পবনের চেনা হয়ে গিয়েছে ভাগাড়ের পথ। ব্রজবুড়া উদোম দাপনায় চাটি মেরে উবু হয়ে তুলে নেয় ভাগাড়ের মাটি, তারপর মন্ত্র পড়ে উড়িয়ে দেয় শূন্যে; বিড়বিড়িয়ে বলে, মা ভাগাড়চণ্ডী, মুখ রেখো মা। যে কাজে এসেছি, সে কাজ যেন শেষ করে যেতে পারি মা। আমায় শাক্তি দাও মা, আমি যেন পাকড়া গাইয়ের ছাল ছাড়িয়ে ঘরে নিয়ে যেতে পারি।

দু-জন মানুষের উপস্থিতিতে ভাগাড় থেকে উড়ে যায় কাক-শকুন। কুকুরগুলোর দাপাদাপি তবু কমে না। ওদের নজর পাকড়া গাইয়ের শরীরে। পবন লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে আগোলদারের ঢঙে। ব্রজবুড়া ধার চাকুর সুচলো মুখটা গিঁথে দেয় গোরুর মুখের কাছে, তারপর গায়ের জোরে টেনে আনার চেষ্টা করে লেজ পর্যন্ত। ফিনকি দেওয়া রক্ত নয়, চাপ চাপ কালো রক্তে ভরে যায় ব্রজবুড়ার হাত। লেজের কাছ অব্দি চাকু টেনে আনতে গিয়ে ঘাম ফুটে বেরয় ব্রজবুড়ার সর্বাঙ্গে। পবনের গা গুলিয়ে ওঠে এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে। ঠোঁট কামড়ে লাঠিটাকে আরো শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে সে। কাক-শকুনের উল্লাস বাড়ে ক্রমশ। কুকুরগুলো কামড়া-কামড়ি করে নিজেদের মধ্যে। চামড়া ছাড়ানোর কাজে বিঘ্ন ঘটে ব্রজবুড়ার; বিরক্তিতে সে বলে, শ্যালোরা মরেও না। মরলে আমার চিন্তা দূর হোত।

কথার ফাঁকে ফাঁকে হাত চলে ব্রজবুড়ার। অতি তৎপরতায় চামড়া ছাড়িয়ে গামছায় পুঁটুলি বাঁধে সে। তারপর মাঠপুকুরের পাড় থেকে ভেজা এঁটেলমাটি তুলে নিয়ে হাতে ঘষে। জলে হাত ধুয়ে ফিরে এসে সে পবনকে বলল, চ।

ফাঁকা মাঠের উপর দ্রুতপায়ে উঠে এসে পবন দেখল, লাল মাংস টিপিটার উপর হামলে পড়েছে কাক-শকুন। কুকুরগুলো ছেঁড়াছেঁড়ি করছে মাংস, তখন কোন বিরোধ নেই ওদের। অথচ হাড়িসাইয়ের হরিয়া কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে পথ আঁকড়ে দাঁড়াল ব্রজবুড়ার। তার চেহারায় ক্রোধ-আক্রোশ। পোড়া ভেঁটুল চোখ করে সে বলল, খুড়া, চামটা নামিয়ে রাখো, এ চাম আমার।

—তোর চাম? ব্রজবুড়ার শীতল চোখ থেকে উপছে পড়ে বিস্ময়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ আমার চাম। ভালো চাও তো নামিয়ে রাখো নাহলে ফাটাফাটি হয়ে যাবে কিন্তু!

—তার মানে? অসহায় চোখে চেয়ে থাকল ব্রজবুড়া, চাম-পুঁটলি শক্ত করে ধরে সে বলল, তফাৎ যা। তুই আমার সম্মুখ থেকে তফাৎ যা। না হলে—

তার কথা শেষ হল না, হরিয়া আকাশ থেকে খসে পড়ে বজ্রের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল ব্রজবুড়ার উপর। চোখের নিমেষে হাত ধরে ঠেলে ফেলে দিল ব্রজবুড়াকে, তারপর বুকের উপর চেপে বসে বলল, এ চাম আমার, এর দখল আমি কাউকেই দেব না।

পবন ঘটনার আকস্মিকতায় দরদরিয়ে ঘামছিল; তার হাতের মুঠি, পায়ের পেশি, এমন কী বুকের ভেতরটাও পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে উঠল। হরিয়া যখন চাম-পুঁটলিটা নিয়ে পালাতে যাবে তখন সে গলার রগ ফুলিয়ে চিৎকার করে উঠল, খবরদার, চাম নিয়ে পালিও না, তাহলে আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়ব না।

ফাঁকা মাঠে হাওয়ার উল্লাস আর দাপাদাপি। পবনের অগ্নি-উদ্দীপক চোখ হিংস্র পশুর মত জ্বলছিল, হরিয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বলল, আমাদের অত কষ্টের চাম সহজে তোমাকে ছেড়ে দেব না। ভাল চাও তো চাম ফিরিয়ে দাও। নাহলে হাড়িসাইয়ে গিয়ে জনে জনে আমি তোমার জোর জুলুমের কথা বলব।

—যা বলগে যা। হরিয়া মুখ বিকৃত করে বলল, আমি তোর কথায় ছেপ ফেলি। হাড়িসাইয়ের কাউকে আমি ডরাই না। নিজের কামাই খাই, লোককে ডরব কোন দুঃখে?

হাতের মুঠি ঘেমে উঠছিল পবনের, তার দুবলা শরীরটা কাঁপছিল থরথরিয়ে। হরিয়ার কথা-বার্তায় অহঙ্কারের মিশেল, চিবিয়ে চিবিয়ে বিকৃত কণ্ঠে সে বলল, চাম আমি দেব না; যা পারিস কর গে যা।

—চাম দেবা না?

—না, দেব না। দু' হাত দিয়ে সজোরে ঠেলা মেরে পবনকে সরিয়ে দিতে চাইল হরিয়া।

পবন তবু সরল না।

হরিয়া বিকৃত গলায় বলল, ধর্মাবাবুর টাকা কোথায়? তার টাকা শোধ না করলে এ চাম তোরা পাবি না।

—ধর্মাবাবুর ধার ধর্মাবাবুই বুঝবে, তাতে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?

—মাথা থাকলেই ব্যথা হয়, এ তো সোজা কথা। হরিয়া কপালে ভাঁজ ফেলে শয়তানের ঢঙে হাসল, বাবু আমাকে ভাগাড়ে পাঠিয়েছে। বাবু মানুষ, তাই চাম ছুঁতে পারবে না। তাই বাবুর হয়ে আমি এসেছি।

—কাক হয়ে তুমি কাকের মাংস খাবা?

—ক্ষিদে লাগলে পুরো দুনিয়া আমি খেয়ে ফেলব।

—তোর এত ক্ষিদে? ব্রজবুড়ার কথা শুনে হরিয়ার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে আগুন, সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় ব্রজবুড়ার উপর।

বিপদ বুঝে লাঠি বাগিয়ে দাঁড়ায় পবন। হামাগুড়ি দেওয়া শেয়ালের মত ব্রজবুড়ার দিকে এগিয়ে যায় হরিয়া। তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। সে যেন অপ্রতিরোধ্য ঝড়। পবন আরও শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে লাঠি। ব্রজবুড়া কাকুতি-মিনতি করে বলে, হরিয়ারে, দে আমার চামটা ঘুরোন দে। ঐ চামের উপর আমার পুরো সংসার তাকিয়ে আছে।

—বললাম তো দেব না। যা পারো করো গে যাও। আমার কাছে নাকে কেঁদে কী হবে? যা বলার ধর্মাবাবুর পা ধরে বল গে যাও। হরিয়ার কথাগুলো যেন বিষমাখা তীর, ব্রজবুড়ার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে চলে যায়। ব্রজবুড়া তবু কাকুতি-মিনতি করে বলে, দে বাবা, চামটা দে। কত কষ্ট করে চামটা আমি ছাড়ালাম—

—চাম নেবা? এই নাও—। বিকট হেসে হরিয়া চাম-পুঁটুলিটা ছুঁড়ে দেয় ভাগাড়খেগো কুকুরগুলোর দিকে। চোখের পলকে হামলে পড়ে কুকুর। চামড়ার প্রিয় গন্ধে তারা ভোজবাড়ি খাওয়ার আনন্দে মেতে ওঠে।

নিঃস্ব চোখে সব দেখতে থাকে ব্রজবুড়া। চোখের জলে তার তোপড়ান গাল ভিজে যায়। এ দৃশ্য সহ্য হয় না পবনের। সে লাঠি বাগিয়ে তাক করে মারে হরিয়ার মাথায়। ঠোঙা ফাটানোর মত শব্দ হয় একটা। তারপর শুকনো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে হরিয়া। রক্ত মেশে ধানের মাঠে। টুটিছেঁড়া মোরগের মত ছটফট করে সে। পবন কালবিলম্ব না করে ছুটে যায় চামড়ার দখল নিতে।

ব্রজবুড়া সংজ্ঞাহীন হরিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এ কী করলি রে পবনা? একটা চামের জন্য হরিয়াকে তুই—কথা শেষ হল না ব্রজবুড়ার, তার আগেই ভয়ে বুজে এল গলা। দম ধরে দাঁড়িয়ে ছিল পবন, ফুঁস করে শ্বাস ছেড়ে সে বলল, ওকে আমি মেরেই ফেলব। যে তোমার বুকের উপর চড়ে বসে চাম ছিনিয়ে নেয় তাকে কি আমি ফুল দিয়ে পূজো করব? তার মাথা আমি লাঠির ঘায়ে ফাটিয়ে দেব। তাতে আমার যা হয় হোক।

ব্রজবুড়া ফ্যাকাসে গলায় বলল, তুই পালিয়ে যা পবন। হরিয়ার কিছু হলে গাঁয়ে পুলিশ আসবে। তুই ধরা পড়ে যাবি।

পবন ফাঁকা মাঠের দিকে তাকাল, ভয় এসে খামচে ধরল তার হৃৎপিণ্ড। আড়ষ্ট, অস্ফুট স্বরে বলল, কোথায় পালাব দাদু?

—যে দিকে দু-চোখ যায় চলে যা। ব্যস্ত হয়ে উঠল ব্রজবুড়া, এখানে তোর থাকা আর ঠিক হবে না। ঐ দেখ, হরিয়া কেমন করছে। ও মানে হয় আর বাঁচবে না। তুই পালা দাদু, পালা...

তীরের মতন ব্রজবুড়ার সম্মুখ থেকে ছিটকে গেল পবন। কিছুদূর গিয়ে সে আবার ব্রজবুড়ার দিকে সর্বস্ব হারানোর চোখে তাকাল; তার চোখে আত্মীয় বিচ্ছেদের অশ্রু। শুকনো মুখটা ভিজে যাচ্ছিল ঘাম আর চোখের জলে। এ কী করল সে! হরিয়াকে সে তো মেরে ফেলতে চায়নি, শুধু আঘাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু এ কী হল? ভয়ে গুমরে উঠল বুক, ঢল নামল হিমস্রোতের। সে দেখল, আকাশ বেড়া দিয়েছে তার যাওয়ার পথ। কোথায় পালাবে সে, কোথায়? ফাঁকা মাঠে সে যেন শুনতে পেল পুলিশের ভারী বুটের আওয়াজ। জিপ গাড়ির হর্ন।

আর দেরী নয়! —পবন ভাবল।

সামনে খোলা আকাশ। বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ। পথ, হাওয়া। পবন হাওয়ার বেগে দৌড়াতে শুরু করল নিজের ছায়াকে পিছনে ফেলে।

তিন

হাঁপ ধরা বুক; দু-চোখের কোণে আতঙ্কের ছায়া, মাঠের ধুলো পা জড়িয়ে উঠে এসেছিল পবনের হাঁটু অব্দি। রুদ্ধশ্বাসে পরপর কয়েকটা আল টপকে এসে পবন একবার পিছন ঘুরে তাকাল। বুকের ধড়কানী তখনও কমেনি। চোখের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে প্রখর রৌদ্র তাপের বহ্নি। বাতাসে চুলার আঁচের হল্‌কা। গা জ্বলে, ঘামে চ্যাট চ্যাট করে পুরো শরীর। জিভ শুকিয়ে টাগরায় ঠেকে ঘনঘন। একটা ব্যাঙ গেলা সাপের মতন কিংবা জাত সাপের মুখ থেকে ছিটকে আসা ব্যাঙের মত হাঁপাতে থাকে পবন। মাথার ওপর রাক্ষুসী রোদ তাকে যেন গিলে খাবার জন্য ব্যস্ত। হাঁপ ধরা বুকে পবন ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকায়, ভয় কঠিন হাতুড়ির ঘা মারছিল কলিজায়। ব্রজবুড়ার আতঙ্কিত কথাগুলো তখনও কানের পর্দায় কাঁপছিল পবনের। রাগের মাথায় এ কী করল সে! লাঠির আঘাতটা এত জোর আর অব্যর্থ হবে—সে ভাবতে পারেনি। আসলে পুঞ্জীভূত রাগ আর নিরন্তর অপমানকে সে দমিয়ে রাখতে পারেনি। মাথায় রক্ত চড়ে গেলে সহজে তা স্বাভাবিক হয় না।

ফাঁকা মাঠে দু-একটা ছড়ানো ছিটানো বাবলা আর ঝাঁকড়া মাথার খেজুরগাছ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না পবনের। ব্রজবুড়াকেও দেখা যায় না অতদূর থেকে। উন্মুক্ত চরাচর, রৌদ্রদগ্ধ মাঠ সব কেমন ঝাপসা ঠেকে তার চোখে। এতবড় পৃথিবীতে সে এখন একা, নিঃসঙ্গ, অসহায়—এই বোধ তাকে পীড়িত করে; অস্থির ব্যাকুলতায় ভয়ের সুস্পষ্ট ছাপ তার মুখমণ্ডলে পচা পাঁক লেপার মতন লেপে দেয় কেউ। পবন কিছুতেই আগের মত সহজ হতে পারে না। তার পা-দুটো ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে, ভয় এসে খামচে ধরে বুক, কোমল মনে নখ চালিয়ে দেয় আতঙ্কগ্রস্ত ভবিষ্যৎ।

হরিয়াকে সে মেরে ফেলতে চায়নি, চেয়েছিল আহত করে এত কষ্টের চামড়াটাকে উদ্ধার করতে। অথচ, কোথা থেকে কি সব হয়ে গেল। এখন সে পালাবে কোথায়? যাওয়ার মত, দাঁড়াবার মত জায়গা কোথায়? কে আশ্রয় দেবে একজন খুনিকে? থানা-পুলিশ-কোর্ট কাছারী এসবের ঝামেলা বরদাস্ত করবে কে? যত ভাবছিল, ভয়ে ধূসর হয়ে উঠছিল তার চোখ-মুখ। এভাবে ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে সময় ব্যয় করা তার পক্ষে আরও বিপজ্জনক। ছুটতে গিয়ে বিড়ালের তাড়া খাওয়া ইঁদুরছানার মত পুরো শরীর

কেঁপে উঠল ইচ্ছের বিরুদ্ধে। পায়ে-পায়ে জড়িয়ে গেল পা। ধানের নাড়ায় হুমড়ে পড়ল সে। আবার ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করল সে। ঝড়ের বেগে সে পেরিয়ে এল আরও কতকগুলো মাঠ। আর মাত্র ক'পা এগুলেই পাকা সড়ক। দীঘা-পানিপারুল বাস রাস্তা। চোখের কোণে জ্বলজ্বল করে উঠল নিরাপত্তার হাতছানি। বাস ধরে সে দীঘার দিকে পালিয়ে যাবে, সমুদ্রপাড়ে ভ্রমণপিপাসু মানুষের মাঝে হারিয়ে যাবে। কিন্তু বাসভাড়া? পবনের টগবগে রক্ত থিতিয়ে আসে পয়সার চিন্তায়। ঠোঁট কামড়ে সে আকাশ-পাতাল ভাবে কিন্তু আশার আলো ফুঃ দিয়ে নিভিয়ে দেয় কেউ। একরাশ হতাশা এসে আবার গ্রাস করে তাকে। আর তখনই তার চোখের সামনে দিয়ে ইন্দ্রের রথের গতিতে দীঘা-মেদিনীপুরের লাক্সারী ধরনের বাসটা পথের ধুলো উড়িয়ে, আশে পাশের গাছগাছালিকে কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যায়। গালে হাত দিয়ে বোকা দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে থাকে পবন। তার শূন্য চোখে রাজ্যের ধুলো-বালি ঢুকে গিয়ে পলাশফুলের চেয়েও রাঙা হয়ে ওঠে। মার কথা মনে পড়ে, বাবার কথাও। ছোট বোন মেনির কথা মনে পড়তেই সহজাত আবেগজোয়ার তাকে নুইয়ে দিয়ে, দুঃখবোধকে জাগ্রত করে আবার নিরুদ্দেশ হয়। একলা পবন তাড়া খাওয়া পশুর ঢঙে হাঁপায়। পাকা সড়কের একপাশে দাঁড়িয়ে পবন আবছা, জলছবি গ্রামখানার দিকে তাকায়। চোখের তারায় অস্থির এক কাঁপুনী শুরু হয় তখন। এই কাঁপুনী যেন তার জন্মগত, একে সে কিছুতেই হটিয়ে দিতে পারছে না। অক্ষমতায় নুয়ে আসে মাথা। সে আর কোনমতে মাথা তুলতে পারছে না। এমন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না আদৌ, অথচ কী করে সেই মর্মান্তিক, হৃদয়বিদারক ঘটনাটাই ঘটিয়ে ফেলল সে।

একপাল গোরু ঘাস খেতে খেতে আপন খেয়ালে চলে যায় সড়ক ডিঙ্গিয়ে। মাঠবাবুই পাখিগুলো কিচির মিচির ডাকতে ডাকতে ঝরা ধান কুড়িয়ে খাওয়ার লোভে উড়ে যায় বিস্তৃত ধান মাঠে। পবন হাপুস নয়নে চেয়ে থাকে। সে যদি পাখির মত হতে পারতো। একটা তরল দীর্ঘশ্বাস নেমে আসে বুক ছুঁয়ে, ধীর পদক্ষেপে সে হেঁটে আসে কৃষ্ণচূড়া গাছটার কাছে। পাকা সড়ক এখন ফাঁকা। দু-ধারে রোদের কিলবিলান হেলে সাপ নাচছে। পবন শুকনো ঢোক গিলে মলিন-শুষ্ক ঠোঁটটা কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে। গোরুর গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ শব্দ ভেসে এল তার কানে। গোরুর গাড়িটা যত এগিয়ে আসছিল ততই ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিল সে। গোরুর গাড়িতে চেপে অসময় কে যায়? সহসা যদি ধরে ফেলে তাকে? চোরের মন সর্বদা চৌকিদারের খেয়াল রাখে, পাছে ধরা পড়ে এই ভয়ে তটস্থ। কাল বিলম্ব না করে কৃষ্ণচূড়া গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো পবন, গোরুর গাড়িটা নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলে সে আবার ব্যাঙের ছাতার মত ফুটে উঠবে। যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। কিন্তু বিধি বাম! কৃষ্ণচূড়া গাছের পিছনে পবনকে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আওলাদ মোড়লের মাডগার্ড খোলা সাইকেলটা থেমে গেল ব্রেক দাবিয়ে। পবন কলকল করে ঘামছিল, রক্তহীন হয়ে উঠছিল তার মুখমণ্ডল। আওলাদ মোড়লের চোখের দিকে না তাকিয়ে অস্ফুটে বলল, চাচা। সাইকেল ঠেলতে-ঠেলতে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল আওলাদ মোড়ল, আর তখনি চামড়া পচা দুর্গন্ধটা ব্যতিব্যস্ত করে তুলল পবনকে।

আওলাদ মোড়ল পাশের বস্তিটায় থাকে, তার কাঁচা চামড়ার কারবার। এগরা থেকে পানিপারুল— আওলাদ মোড়লের কারবারের এলাকা। চামড়ার খোঁজ-খবর পেলেই সাইকেল হাঁকিয়ে সে চলে আসে তৎক্ষণাৎ। কাঁচা চামড়ায় কাঁচা পয়সা। এখন তার রমরমা ব্যবসা। কলকাতার মহাজন এসে সরাসরি তার কাছ থেকে চামড়া কিনে নিয়ে যায়।

সাইকেলের ক্যারিয়ারে বস্তায় জড়ানো সাত-আটটা চামড়া। টুপটুপিয়ে ঝরে পড়ছিল নুন মাখানো জল। বাতাস মারার সঙ্গে-সঙ্গেই তীব্র ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ। এই গন্ধটা পবনের অতি চেনা। এই দুর্গন্ধই তার জীবনে সৌভাগ্যসূচক সুগন্ধ। ব্রজবুড়া গোরু-ছাগলের ছাল ছাড়িয়ে পুকুরপাড়ে টান-টান করে শুকোতে দেয়। কাক-কুকুরে চামড়া যাতে ক্ষামি না করে সেজন্য লাঠি হাতে পাহারায় থাকে পবন।

কখনও মেনিও তার সঙ্গে যোগ দেয়। মেনি কাক তাড়াতে ওস্তাদ, শুধু কুকুরকে সে যমের মত ভয় পায়। আওলাদ মোড়ল ফি-হপ্তায় দু-তিনবার এসে খোঁজ নিয়ে যায় ব্রজবুড়ার কাছ থেকে। তামুক খায় হুঁকোয়, গল্প-গুজব করে। চামড়ার মাপ-জোক, গুণাগুণ বিচার করে দরদাম ঠিক হয়। ব্রজবুড়া তুষের চাদর ভাঁজ করার যত্ন নিয়ে চামড়া ভাঁজ করে আওলাদ মোড়লের সাইকেলের পিছনে তুলে দেয়। তার ধুতির খুঁটে তখন নগদ কড়কড়ে টাকা। সেই টাকায় পুরো হপ্তার ধার মেটায় ব্রজবুড়া, আনাজ-পাতি, তেল-নুন, তামাক কেনে। তাই আওলাদ মোড়লকে দেখলে পবনের মনে হয় ঐ মাঝ-বয়েসী লোকটা যেন টাকার গাছ, সুখের খনি! তার আগমনে পুরো হাড়িসাই যেন ঝিমুনি কাটিয়ে জেগে ওঠে, ছেলে-বুড়ো, ঝি-ঝিউড়ি সবার মুখে ফুটে ওঠে খুশীর ঝিলিক।

এই অসময়ে আওলাদ মোড়লকে দেখে মোটেও খুশী হয় না পবন, তবু কৃত্রিম হেসে সে শুধোয়, কোথায় গেছিলে গো চাচা? তা, খবর সব ভাল তো। আওলাদ মোড়ল কাঁচা-পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে হাসল, পবন এমন স্বস্তিপূর্ণ হাসির অর্থ বোঝে। চামের জোগান আশাপ্রদ হলে আওলাদ মোড়ল এমন হাসিই হেসে থাকে। ব্যবসা যে ভাল হয়েছে পবন তা দু চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল। চামড়ার ভারে দেবে আছে সাইকেলের টায়ার। একটা বিড়ি ধরিয়ে সাইকেলটা গাছের গোড়ার ঠেস দিয়ে আওলাদ মোড়ল অবাক গলায় শুধোল, কী ব্যাপার, খরাবেলায় কী করছিস এখানে, ঘর যাবি না?

পবনের অস্থির চোখ, অশান্ত হৃদ্‌পিণ্ড কেঁপে গেল প্রশ্ন শুনে। মাথার ওপর দাউদাউ সূর্যের দিকে তাকিয়ে জ্বালা করে উঠল তার চোখ, সহসা সে কোনো উত্তর খুঁজে পেল না।

আওলাদ মোড়ল সেই একই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, ঘর যাবি নে?

পবন 'হ্যাঁ' সূচক ঘাড় নাড়তেই আওলাদ মোড়ল সোৎসাহে বলল, চল, আমিও যাব।

—বুড়া কি ঘরে আছে? তোর বাপের খপর কী? সে কি এখনও যাত্রা করে বেড়াচ্চে? পবন আনমনে শুকনো ঠোঁটটা আঙুল দিয়ে নাড়ছিল, অন্যমনস্কতার ঘোর কাটিয়ে বলল, দাদু তাগান কাটতে গিয়েছিল, ঘর ফিরেছে কিনা জানি না। আমি সেই সকালবেলায় বেরিয়েছি। ভাগাড়গুলান দেখে ঘর ফিরব। বাবা ঘরে নেই। কবে আসবে কোনো চিঠি দেয়নি।

বিড়িটার সুতোর কাছাকাছি আগুন, হাতে ছ্যাঁকা লাগতেই ওটা ফেলে দিয়ে আওলাদ মোড়ল বলল, তোর বাপের আর কোনোদিন আক্কেল-জ্ঞান হবেনি। সংসারে যখন মন নাই তখন কে বলেছিল বে-থা করতে? এখন ছেলেপুলের জন্ম দিয়ে বাবু ফকিরের মতন ঘুরছে। সহদেব আর কোনোদিন শুধরবে না। যার মন একবার বাইরের দিকে ঝোঁকে—সে কোনোদিন ঘরের দিকে ফিরতে পারে না। চরে খাওয়া দামড়াকে রশায় বাঁধলে—সে ঠিক রশা ছিঁড়ে পালায়। কী আর করবি? সব তোদের মন্দ ভাগ্য।

একজন হাড় কিপটে চামড়া ব্যবসায়ীর মুখে পিতৃনিন্দা শুনতে ভাল লাগছিল না পবনের। আওলাদ মেড়লের স্বভাব কিছুটা ছিনে জোঁকের মতন, তার সংস্রব ভাল লাগছিল না পবনের। অথচ মানুষটাকে সে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিল না।

সময় যত অতিবাহিত হচ্ছিল ততই ধরা পড়ে যাবার ভয়টা খুঁবলে খাচ্ছিল পবনকে, উদ্বেগ-অস্থিরতা জোয়ার আসা নোনাখালের মত উথলে উঠছিল বুকের ভেতর।

সে এড়িয়ে যাবার জন্য যুক্তি খাড়া করল, তুমি আগে-আগে সাইকেলে চেপে চলে যাও চাচা, আমি তোমার পিছে পিছে যাচ্ছি। এত রোদে তুমি কেন আমার জন্য কষ্ট করবে?

পবনের কথা মনঃপূত হল আওলাদ মোড়লের, গাছে হেলান দেওয়া সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে সে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। পবনকে উদ্দেশ্য করে বলল, তা গেলে কিছু কাজ হবে তো—নাকি খালি হাতে ফিরে আসতে [illegible] কী খপর ওদিককার? বুড়া কি আমার জন্য মাল রেখেছে?

[illegible]ের পর প্রশ্ন ভাল [illegible]ছিল না পবনের, বিরক্তিতে ভ্রূযুগল বেঁকে উঠল তার, অসহিষ্ণু হয়ে [illegible]ল, দাদুর শরীরটা তর্তো [illegible] ভাল নাই। তবু সকালে ভাগাড়পানে গিয়েছে। ভাগ্য ভাল হলে কিছু হলেও হতে পারে। তবে [illegible]র ঘরে না হলেও শশধরকাকা আর হরিয়াকাকার ঘরে মাল আছে।

—তুই কী করে জানলি? সন্দেহঘন দৃষ্টিতে শুধোল আওলাদ মোড়ল।

—আমি শুনেছি। ওরা দুবেলা তোমার পথ চেয়ে বসে থাকে। সবার ঘরে এখন অভাব। তুমি গেলে ওরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

পবনের কথায় খুশী হল আওলাদ মোড়ল, সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা শক্ত করে ধরে বলল, বুড়াকে দেড়শ টাকা কর্জ দিয়েছি তার কী হবে?

পবনের ফাঁপরে পড়া চোখ-মুখ, দাদুর হাতে টাকা নাই। বাবা আসলে তোমার টাকা শোধ দিয়ে দেবে।

—এ কথা তো সেই কবে থেকে শুনছি। সহসা কাঠিন্য প্রকাশ পেল আওলাদ মোড়লের কণ্ঠস্বরে, পিক ফেলে বলল—টাকা আমার চাই। ব্যবসার টাকা আটকে গেলে খুব ভোগান্তি হয়। অথচ বুড়ার কোনো গা নাই। তা, কবে আসবে তোর বাপ?

—আমি জানি না! অসহায়ত্ব ঝরে পড়ল পবনের গলা থেকে, বাবা যে কবে আসবে তা কে জানে। মা তার কথা ভেবে ভেবে কাঠি হয়ে গেল! জান চাচা, মা রোজই বাবার পথ চেয়ে থাকে। বাবার চিন্তায় অনেকদিন আমি মার মুখে হাসি দেখিনি। দাদুও খুব ভাবে। বলে, ও ছেলে আর মানুষ হবে না।

—ঠিকই বলে তোর দাদু। বোঝমান লোক, যা বোঝার সে বুঝে নিয়েছে। পবন হা-করে আওলাদ মোড়লের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, গলার ভেতর কত কথা ঘোঁট পাকায়, তার একটাও যথার্থ শব্দ হয়ে বাইরে আসে না। এক ধরনের বিপন্নতা আচ্ছন্ন করে তাকে, মরা মাছের মত ফ্যাকাসে চোখ মেলে আওলাদ মোড়লের বুক পকেটের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। ছোট একটা খাতার ভেতর ভাঁজ করা দশ-পাঁচ টাকার নোট। কত রকমরে হিজিবিজি কাগজপত্র, যত্ন কর কাটা একটা উড্ পেন্সিল। এই উড্ পেন্সিল দিয়ে নোটবুকে হিসাব, দাদন, কর্জ লিখে রাখে আওলাদ মোড়ল। তাই ছোট হয়ে আসা উড্ পেন্সিলটা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। জলের তলায় রায়খয়রা মাছের চকচকে শরীর দেখে পবনের যেমন আনন্দ হয়, খুশীতে ঝিলিক দিয়ে ওঠে চোখ—ঠিক তেমনই আনন্দময় অনুভূতি তার শঙ্কিত সত্তাকে নাড়া দেয় নোটবুকের বাইরে বেরিয়ে থাকা টাকাগুলোকে দেখে। একটা পাঁচ টাকার নোট সে যদি পেত তাহলে পানিপারুল অব্দি হেঁটে গিয়ে দীঘা যাওয়ার বাস ধরত সে। সেখান থেকে চতুর কোন সামুদ্রিক মাছের মত সাঁতার দিয়ে চলে যেত সকলের নাগালের বাইরে একেবারে সমুদ্রে। টাকাগুলো শুধু জ্বল জ্বল করে চোখের তারায়, পবনের ঠোঁট নড়ে ওঠে কিন্তু সে মুখ ফুটিয়ে চাইতে পারে না। আওলাদ মোড়ল তার হাবভাব দেখে শুধোয়, কিছু বলবি?

—না। ছোট্ট জবাব দেয় পবন।

—তাহলে অমন করে কি দেখছিস?

—তোমার মেলা টাকা তাই না চাচা? এত টাকা তুমি কোথা থেকে পাও? এত টাকা দিয়ে তুমি কী কর?

বোকা-বোকা প্রশ্ন শুনে আওলাদ মোড়ল গর্বের হাসি হাসল, টাকা কামাই করতে বেরেন খাটাতে হয়। এ সংসারে যার টাকা নেই, তার কিছু নাই। টাকা না থাকলে সখ-আহ্লাদ কিছুই মেটে না।

পবন যত শুনছিল ততই ঘাবড়ে যাওয়া মুখ করে দেখছিল আওলাদ মোড়লকে। মাঝে মাঝে হাওয়া এসে ধান ঝাড়ার মত আছড়ে-পাছড়ে দিচ্ছিল তার কোঁকড়ানো চুলগুলো। মুখময় বুজকুড়ি কাটছিল ঘাম। আওলাদ মোড়ল চলে যাবার পরও হাবা-বোবা দৃষ্টি মেলে সে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল ধূ-ধূ, শূন্য পথের দিকে। ভয়টা তখনও তার মন থেকে মোছেনি, পাকাপাকিভাবে দখল নিয়েছে মনের।

দূর থেকে সোরগোলের শব্দ ভেসে এল বাতাসে, যদিও বাতাসে আগুন—সেই আগুন পবনের মনটাকে উস্কিয়ে দিয়ে বলল, পালা পবন, পালা। এই মাঠ, হাওয়া, বনবাবুই, ঢ্যাঙ্গা আল, পরিত্যক্ত

ভাগাড়—সবাই তোর শত্রু।। হরিয়াকে তুই খুন করেছিস—তুই একটা খুনী। খুনীর আশ্রয় জেল-হাজত-ফাঁসী-মৃত্যু। তুই পালা, পবন। এখানে তুই বাঁচতে পারবি না। এরা কেউ তোকে বাঁচতে দেবে না। সবাই তোকে ধরার জন্য ফাঁসজাল পেতেছে। তোর কি ক্ষমতা আছে ফাঁস ছিঁড়ে পালানোর? নেই। তাহলে কেন বোকার মত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘামছিস, পুড়ছিস? এসবের নিঃশ্বাসের বাইরে তুই চলে যা। আওলাদ মোড়ল হাড়িসাইয়ে গিয়ে খবর দেবে যে তোর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। তখন? তখন কী করবি? তাই এখন থেকে সাবধান হ। সাবধান না হলে ডুববি, মরবি। এ সমাজে তোর আর ফিরে আসার মুখ নেই। গ্রাম সমাজ তোকে ক্ষমার চোখে দেখবে না। ওদের চোখ ঘোলাটে, সন্দেহে ভর্তি। তুই এসবের দৃষ্টির বাইরে চলে যা। চলে যা বলছি—

খানাখন্দ পেরিয়ে, আল টপকে, গোরুর গাড়ির নিক্ ফেলা পথে ধুলো উড়িয়ে, প্রখর সূর্যদহনকে অগ্রাহ্য করে হাওয়ার বিরুদ্ধে ছুটতে থাকে পবন। টুপটুপান ঘামে তার সর্ব শরীর ভিজে যায়, সে কাঁদছে না ঘামছে—কিছুই বোঝা যায় না। শুধু বোঝা যায়, সে একটা গণ্ডি পেরিয়ে গন্তব্য ছুঁতে চাইছে। কিন্তু গন্তব্যহীন মানুষের গন্তব্য খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। অথচ প্রকৃতির আশ্চর্য নিয়মে, সর্বশক্তিমানের অশেষ করুণায় গন্তব্য খুঁজে পায় পবন। অতসী বোষ্টমীর ঘরের পাশে এসে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। রেণু পুজোর ফুল তুলছিল বাগানে। সে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলল, কে, কে ওখানে? পবন কোন জবাব দিতে পারল না, তার ছটফটে উদ্বিগ্ন চোখের তারায় রেণুর সদ্যস্নাত মুখ, ডুরে শাড়ির বাহারি উজ্জ্বলতা, সঘন জোড়া ভুর শিল্পিত ধনুক। পায়ে পায়ে কচাগাছের বেড়ার কাছে এগিয়ে এল রেণু, মুখে সলাজ হাসিজোড়া চোখে আশ্চর্যতার প্রলেপ। অস্ফুটে মিষ্টি করে শুধোল, তুমি? কখন এলে গো পবনদা? পবন আশ্চর্যভরা দৃষ্টি মেলে তাকাল, বুকের গভীরে হিমস্রোতের ঢল, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসাতে বুকের ভেতরে কাঠব্যাঙের ডাক। গলার ভেতরটা শুকিয়ে এসেছিল—সহসা কোন বাক্যালাপ করা তার পক্ষে সম্ভব হল না। অতসী বোষ্টমীর একমাত্র মেয়ে রেণুকে সে চিনতে পারেনি এমন নয়—যদিও বালিকা রেণু এখন কিশোরী পর্যায়ে উন্নীত। বেড়ার ধারে সরে এসে রেণু গভীর অর্থবহ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে, সে-ও পবনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। আজ কত দিন পর দেখা হল ওদের—একথা সঠিক ভাবে কেউ-ই মনে করতে পারে না। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে অতসী বোষ্টমীর মাটির ঘরে কতদিন যে পবন আসেনি একথা মনে করে সে নিজেকে আর ব্যতিব্যস্ত করতে চায় না। সে এখানে আসতে পছন্দ করে না। সহদেব জোর করে না পাঠালে মাঠের মাঝখানের এই ঘরটা তার কাছে জীবনভর অপরিচিত, অজ্ঞাত থেকে যেত। আর সে যদি না আসত তাহলে রেণুর সাথে আলাপ হতো না। তখন অনেক ছোট্ট ছিল রেণু, আধো আধো কথা বলত, ফি-কথায় ঠোঁট ভরিয়ে হাসত আর দুষ্টুমী করে চিমটি কেটে পালাতো। পবন একদিন চুল টেনে দিয়েছিলে, ব্যথায় কুঁকড়ে গিয়ে অশ্রুসজল চোখে মায়ের কাছে নালিশ করেছিল রেণু। মেয়ের চোখ মুছিয়ে দিয়ে অতসী বোষ্টমী পবনকে বুঝিয়ে বলেছিল, মেয়েদের চুলে হাত দিতে নেই বাবা। তাহলে পুরুষ জাতির ভয়ানক ক্ষতি হয়। কথাটা আজও মনে আছে পবনের, কেননা কিশোরী রেণুর বুনোলতার মত পিঠের ওপর লতিয়ে বেড়ান চুলগুলোর দিকে তাকিয়ে সে কি করে ভুলে থাকবে চুল টেনে দেবার সেই মজার ঘটনাটা। মেয়েদের অর্দ্ধেক রূপ খোলতাই হয় সুললিত কেশ বিন্যাসে—পবনের ভয়জর্জরিত চোখে এই সত্য এখন রহস্যাবৃত। তবু সে ভয় ভুলে তাকিয়ে আছে নয়নলোভন রেণুর মুখের দিকে, এক ধরনের আড়ষ্টতা ছুঁয়ে আছে তার পুরো শরীর। সহজ হতে গিয়ে নিজের স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে ফেলছে পবন।

রাংচিতে আর কচাগাছের বেড়ার ধারে ঘনিষ্ঠভাবে সরে এসে রেণু বলল, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এসো।

—মাসী কোথায়? অনেকক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে শুধোল পবন, তখনও তার চোখের পাতা সুষনি শাকের মত কাঁপছে।

—মা ঘরে নেই। গাঁয়ের ভেতর গিয়েছে। হাসি মুখে উত্তর দিল রেণু, তারপর টগরফুলের সরু ডালটা এক লাফে ধরে নিয়ে পটাপট কটা ফুল পেড়ে নিয়ে বলল, মা আজ আর আসবে না। গাঁ থেকে সিধা চলে যাবে গুরুজীর আখড়ায়। সেখানে 'গান' আছে। দশ জায়গার বাউল ফকির আসছে। রাতভর গান হবে।

—তুমি গেলে না?

রেণু সেই আগের মত মুখ ভরিয়ে হাসল, মা আমাকে নিয়ে যায় না। আখড়ায় যাওয়া আমার বারণ। মা ওসব পছন্দ করে না।

—কেন?

—আমি তার কী জানি! মা আসলে মাকেই শুধিও।

—তোমার যেতে ইচ্ছে করে না?

প্রশ্ন শুনে রেণু বিবর্ণ চোখে তাকাল, ফুল তোলা থামিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সে পবনের দিকে তাকাল, তারপর খুবই নিস্তেজ স্বরে বলল, আগে খুব যেতে ইচ্ছে করতো। এখন আর করে না। ওখানে যারা আসে তাদের হালচাল, কথাবার্তা আমার একদম পছন্দ হয় না। তাছাড়া ওদের ঘোরান-প্যাঁচান গানগুলোও আমার মনে ধরে না। যারা সহজ ভাষায়, সহজ গলায় কথা বলতে পারে না—তাদের আমার কোনদিনও ভাল লাগে না। রেণুর ডাগর চোখে পুঞ্জীভূত বিতৃষ্ণা। এই পরিবেশে তার যে দমবন্ধ হয়ে উঠেছে, তা স্পষ্ট অনুমান করা যায় কথা-বার্তায়।

পবনের তাড়া ছিল, বেলা বাড়ার সংকেতে সে তড়িঘড়ি করে বলল, আমি যাই রেণু, পরে আসব'খন। আমার অনেক কাজ, দেরি হয়ে গেল!

—কী এমন রাজকাজ ফেলে এসেছ? রেণু শ্লেষের সঙ্গে শুধোল। পবন বলল, কাজের কি গোনা গুনতি আছে? তুমি তো সব জান, তোমাকে আর নতুন করে কী বলব?

—ঘরে আসবে না?

—না। পাথর গলায় জবাব দিল পবন।

টগরগাছের দুবলা-পাতলা ডালটা ছেড়ে দিয়ে রাংচিতার বেড়ার উপর শরীরের ভার ছুঁইয়ে উদগ্রীব হয়ে তাকাল রেণু, এখনও রাগ কমেনি বুঝি! ছেলেরা যে অমন খুঁতখুঁতে হয় আমার জানা ছিল না। কত দিনের কথা, ভুলে গেলেই ভাল করতে। আমি সব মন থেকে মুছে ফেলেছি।

পবন তবু সহজ হতে পারল না, নিদারুণ অপমানবোধটা লাউডগা সাপের মত পেঁচিয়ে ধরেছে তার সর্বশরীর। রেণু বলেছিল, তোমরা ছোট জাত, তোমাদের ঘরে আমি যাব না। মা জানতে পারলে মুখ করবে।—একথা শোনার পরে পবন আর রেণুর মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে পারেনি; তার আহত, অপমানিত ক্ষুদ্র দৃষ্টি সিজান পুঁইডাঁটার মত লতলতে হয়ে মিশে গিয়েছিল মাটির দিকে। সেদিন থেকে সে আর রেণুর কথা ভাবতে সাহস করে না। রেণু মুখের উপর যা বলার নয় বলে দেয়। কেউ কষ্ট পেলেও তার কোন কিছু যায় আসে না। অতসী বোষ্টমী দূর-দূরান্তের গাঁয়ে গিয়ে খঞ্জনী বাজিয়ে ভিখ মেঙ্গে আনে—অথচ ধারেকাছের হাড়িসাইয়ে সে কোনদিন ভিক্ষা করতে যায় না। কেন যায় না—সেই কারণটা স্পষ্ট করে মুখের উপর বলে দিয়েছে রেণু। বলে ভালই করেছে। পবন দুঃখ পেলেও তা সামলে নিয়েছে ধীরে ধীরে। তার এখন আর কোনো কষ্ট নেই।

যে অপমান, আঘাত রক্তের ভেতর ঢুকে যায় তাকে সহজে মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। রেণুর সাথে তার বয়সের ফারাক মাত্র দু বছরের, অথচ সে কথা বলে বড়দের মতন। এই বুড়োমীও সহ্য

হয় না পবনের। রেণু যখন ধান-মাঠ পেরিয়ে চোরপালিয়ার ইস্কুল মাঠে খেলতে যেত তখন মেনিও রেণুর পিছন পিছন দৌড়াত; কখনও গোল্লাছুট, গাদী কিংবা হুস্ খেলত। ইস্কুলের কত কাছে হাড়িসাই, রেণু কোনদিন ভুল করেও সেখানে যেত না। পবন কিংবা মেনি জোরাজুরি করলে বলত, আমি যাব না, মা বকবে। তোমাদের ঘরে কাঁচা চামড়া, শুকুমাছ, ঢাক-ঢোল সব আছে। মা আমাকে ওগুলো ছুঁতে বারণ করেছে।

অতসী বোষ্টামী ভিখ মাঙ্গতে হাড়িসাইয়ে যায় না—এটা পবন জ্ঞান পড়ার পর থেকেই জানতো। আর এও জানতো, অতসী বোষ্টমীর এই ভড়ং লোক দেখানো—নাহলে সে কেন সহদেবের সাথে গলায় গলায় মিশতো, কেন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত না তাকে। অথচ যারা হরিনাম গাইতে গাঁয়ে আসতো, তারা খোল সারতে আসতো ব্রজবুড়ার কাছে। পিপাসায় জল চেয়ে খেত, এমন কি অল্প একটু মুখ মুছে নিয়ে হুঁকোও ব্যবহার করতো কেউ কেউ। অতসী বোষ্টমী কি তাদের চেয়েও উচ্চবর্ণের? এসব জটিল তত্ত্ব পবনের মাথায় ঢোকে না, তাই সে নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকলো রেণুর মুখের দিকে তাকিয়ে।

ব্যথিত রেণু নিজের ভুল বুঝে আর্দ্রস্বরে বলল, তখন আমি যেমন বুঝতাম তেমন বলেছি। সে সব আমার মনের কথা নয়। মা এখন বলেছে—সব মানুষ সমান। মানুষকে ঘৃণা করতে নেই, ভালবাসতে হয়। মা যা বলে—আমি তাই করি। আমি তো ইস্কুলে যাই না, পড়াশুনা করি না। মা'ই আমার গুরু। সে যা শেখায়, আমি তাই শিখি। এরপরে আমাকে ভুল বোঝা তোমার অন্যায়।

—আমি কাউকে ভুল বুঝি না। থমথমে গলায় কথাগুলো বলল পবন, কেউ দুঃখ দিলে আমার খুব বুকে বাজে। আমি কারোর অন্যায় সহ্য করতে পারি না। কেউ ভাল মুখে কথা বললে আমি তার জন্য জীবনও দিয়ে দেব।

—তাই নাকি? পবনের আবেগতাড়িত কথাগুলোয় ভ্রু'র ধনুক বেঁকিয়ে হেসে উঠল রেণু, বোঝাই ফুলের সাজিটা যত্নে বুকের কাছে এনে সে আধো-স্বরে বলল, ইস্, কতো বেলা হল বল তো! এখনও পুজো সারা হয়নি। মা জানতে পারলে কি ভাববে বল তো?

শুকনো ঢোক গিলে পবন বলল, তুমি পুজো কর, আমি যাই। বড় দেরি হয়ে গেল! তবে যাওয়ার আগে তোমাদের পুকুরের জল পেট ভরে খাব, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। গলা শুকিয়ে খড়খড় করছে কণ্ঠনালীটা। কি, জল খাব তো নাকি পুকুরের জল আমি ছুঁয়ে দিলে নষ্ট হয়ে যাবে?

এত বড় আঘাত সহ্য হল না রেণুর, সে করুণ গলায় বলল, কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা। দেখে ভীষণ খুশি হয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে তুমি এমনভাবে দুঃখ দেবে ভাবিনি। শাড়ির খুঁটে চোখ মুছে নিল রেণু, তুমি কি প্রতিশোধ নিতে এসেছ? যদি মনের ক্ষোভ না মিটে থাকে তাহলে আমাকে তুমি গলা টিপে মেরে রেখে চলে যাও। ঘরে মা নেই, কেউ টেরও পাবে না। মরে যাওয়া অনেক সহজ কিন্তু কথা হজম করা অত সহজ নয়। রেণুর ফোঁপানি এখনও থামেনি, অনবরত হাতের ঘর্ষণে রক্তাভ হয়ে উঠেছে তার চোখের কোণ। সুন্দর ঠোঁট দুটো নড়ছিল অদ্ভুত অপারগতায়। কাঁদলে যাদের সুন্দর দেখায় তাদের দলে রেণু। এই কান্না কিছুতেই ভাল লাগছিল না পবনের, বিবর্ণ চোখে সে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল রেণুর দিকে। কতদিন আগের ঘটনা এখনও কেন বিস্মৃত হতে পারেনি সে—এই বোধ তাকে বড় পীড়া দেয়। যে মানসিক দৃঢ়তায় সে এতক্ষণ তর্ক করছিল তা যেন নিমেষে তরল দ্রব্যের মত গলে গলে পড়ে নিজের সম্মুখে। রেণুকে সে কাঁদাতে চায়নি, অথচ সামান্য কথায় রেণু চোখের জলে গোলাপী গাল ভাসিয়ে অবুঝ কান্না কাঁদছে। পবন তাকে চুপ করার কথাও বলতে পারে না। সম্পর্কটা দূরের তাই সান্ত্বনার কথায় কেমন বেখাপ্পা ঠেকবে পরবর্তী দৃশ্যাবলী। উদভ্রান্তের মত সে কেন এখানে ছুটে এল? তবে কি মনের অবচেতনে সে এখানে উপস্থিত হয়েছে আশ্রয়ের জন্য? অতসী বোষ্টমীর চালাঘরে সে আশ্রয় নেবে—একথা স্বপ্নেও ভাবেনি। তবু কী করে এখানে ছুটে এল সে?

আর কেনই বা জড়িয়ে গেল এমন অভিমান-সম্পৃক্ত ঘটনায়? এ সবের কোনো উত্তর পবনের জানা নেই।

রেণু ফিরে যাচ্ছিল ঘরের দিকে, পবন আপোসী স্বরে ডাকল, শোন। আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে। আমাকে এক গেলাস জল দেবে না?

নিজের কানকে বিশাস করতে পারছিল না রেণু, তৃষ্ণার্ত আবেদন কানে যেতেই অবিশ্বাস্য চোখে সে পিছন ফিরে তাকাল। ঠোঁটের কোণে চাপা একটা হাসি। সারা মুখে ছড়িয়ে রয়েছে সেই সংযত হাসির রেণু। হাসলে পাথরও সুন্দর হয়ে ওঠে। আর রেণুর তো টিকাল নাক, পাখি ওড়া চোখ, লাবণ্যময়ী কিশোরী!

পবন বলল, আমার হাতে সময় কম। জল খেয়েই আমি চলে যাব। তুমি যাও, তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল এনে দাও। সেই কখন থেকে তেষ্টা পেয়েছে।

—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সারাদিন তুমি কিছু খাওনি?

রেণুর প্রশ্নে অবাক হল না পবন, কেননা মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া পৃথিবীর সব চাইতে কঠিন কাজ।

রেণু সহজ হয়ে বলল, ঘরে আস, তারপর জল দেব। বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে থাকলে গেলাস তোমার হাতে পৌঁছাবে কী করে?

উঁচু বেড়া। রেণু দীর্ঘাঙ্গী নয় যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে দেবে। অগত্যা পবনই আগড় সরিয়ে ঢুকে এল ভেতরে। সে এল কিন্তু সংকোচ তখনও তার কাটেনি, সদ্য প্রসব হওয়া ছাগলছানার গায়ের লালার মত সেই সংকোচ জড়িয়ে থাকল তার শরীরে। এমন কী চোখের দৃষ্টিতেও সংকোচের ডাল-পালা।

ছোট্ট বাগানটাতে ট্যাঁড়সগাছের পাশাপাশি ফুলচারা। একটা কুদ্রুগাছ লতিয়ে গিয়েছে বেড়ায়—সাদা ফুলগুলো চড়া রোদে মনমরা। বাগানের মাঝখান দিয়ে রেণুর কাঁচা সিঁথির মত সরু একফালি পথ। পথের বাঁ দিকে করলাগাছের ছোট্ট একটা মাচা, বেশ কয়েকটা জালি ফুল নিয়ে গাছটা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাড়ছে। পবন জলের দিকে চাতক নয়নে তাকিয়েছিল, টলটলে জলের পুকুর দেখে তৃষ্ণা তীব্র আকার ধারণ করেছে।

—আসো। বলেই রেণু ব্যস্ত পায়ে উঠোন পেরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। পবন কলাগাছের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ, নতুন কোথাও আসলে অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে তার অনেক সময় লাগে। কিছু সময় পরে রেণু ফিরে এল জলের গ্লাস হাতে। কাচের গ্লাসে কলের জল নতু' একটা মাত্রা পেয়েছে, মেয়েরা লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পরলে যেমন দেখায়—তেমন দেখাচ্ছে কাচগ্লাস...। পবন হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা ধরে নিয়ে চুমুক দেবার আগেই রেণু বাধা দিয়ে বলল, শুধু জল খেও না। আগে দুটো বাতাসা চিবোও, তারপর জল খেও।

রেণুর আন্তরিকতাকে ছোট করে দেখল না পবন, বাতাসা দুটো হাতে নিয়ে কী যেন ভাবল সে, তারপর অন্যমনস্কতা কাটিয়ে একটা বাতাসা মুখে পুরে চিবাতে-চিবাতে বলল, আমি এখানে আসতে চাইনি অথচ কী করে যেন এসে গেলাম। এসে ভালই হল। কমসে কম এক গেলাস জল তো খেতে পেলাম। শুধু জল নয়—বাতাসাও খেতে পেলাম। অনেকক্ষণ পরে পবনের ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠল, সে যে কিছুটা সহজ হতে পেরেছে এই নম্র-মার্জিত হাসিই তার চিহ্ন।

ভাল লাগল রেণুর। পবন ঢকঢক করে জল খেয়ে গেলাসটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, আমি এবার যাই। পরে আবার একদিন আসবো। আর শোন, আমার জন্য তোমাকে একটা মিথ্যে কথা বলতে হবে। মাসীমাকে আমার আসার কথা বলো না যেন।

—বললে কী হয়? রেণুর সহজ প্রশ্নে পবন বিচলিত বোধ করল, ভেজা ঠোঁটটা মুছে নিয়ে জড়তাপূর্ণ গলায় বলল, বলো না, না বললেই ভাল হয়।

—কেন? রেণু কৌতূহলী চোখে তাকালো।

পবন বলল, আমি তো এখানে আসি না সেইজন্য। তাছাড়া মাসীমা আমার এখানে আসা পছন্দ করে না।

—কে বলল? এটা তোমার ভুল ধারণা। তোমরা আস না বলে মা কত দুঃখ করে। আগে মেনি আসতো। সে-ও এখন আসে না।

—তুমিও তো যাও না। পবনের কণ্ঠস্বর উগ্র হয়ে উঠল কিছুটা।

রেণু স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করতে চাইল, যাব কী করে! মা ঘরে থাকে না। মাঠের মাঝখানে ঘর, ফাঁকা রেখে গেলে চুরি হয়ে যাবে। এখানে যা চোরের উৎপাত! নিজের যুক্তিটা নিজের কানে কেমন বেখাপ্পা ঠেকলো রেণুর তবু সে দমবার পাত্রী নয়, একমুখ হেসে বলল, মা বলে—আমি নাকি বড় হয়েছি, আমার এখন বাইরে যেতে নেই! আগে স্কুলমাঠে খেলতে যেতাম, কতদিন হলো সেখানেও যাই না। মা খুব রাগারাগি করে। রেণুর উজ্জ্বল মুখটা নিমেষে রংজ্বলা শাড়ির চেয়েও মলিন হয়ে এল, ধীর অথচ দীপ্ত স্বরে সে বলল, বাইরে যেতে আমারও মন করে না। একা থেকে থেকে কথা বলার ইচ্ছেটা আমার মরে গেছে।

—একা থাকা খুব কষ্টের। পবন বলল, একা থাকলে আমার বুকের উপর পাথর চেপে বসে। ভাত হজমায় না।

রেণু সারসের মত মুখ তুলে বলল, একা থাকলেও আমার কোনো কষ্ট হয় না। মা গাঁ ঘুরতে চলে গেলে আমি রাঁধা-বাড়ার কাজ সারি। বাগানে জল দিই, ফুল তুলি। সময় কোথা দিয়ে চলে যায় বুঝতেই পারি না।

কলাগাছের বেগো ভেঙ্গে পড়ার শব্দ হল। ঘেরা পুকুরটায় ঘাই দিয়ে ওঠে মাছ। পবন আধ-বোজা চোখে পুকুরের দিকে তাকাল, জলের ঈষৎ সবুজ রঙ মুগ্ধ করল তাকে। সচরাচর জলের এমন বিচিত্র রঙ চোখে পড়ে না। মাঠের মাঝখানে পুকুর, চতুর্দিক থেকে ক্রোধী সূর্যের উত্তাপ এসে অষ্টপ্রহর মেতে থাকে জলক্রীড়ায়। শ্যাওলামুক্ত জলে কাকচক্ষুর স্বচ্ছতা নেই ঠিকই কিন্তু তুঁতে রঙের মহিমান্বিত আভা পরিলক্ষিত হয় সূর্য কিরণে।

হাড়িসাই থেকে রেণুদের এই চালাঘর অনায়াস দূরত্বের মধ্যে হলেও পবনের আসা হয়ে ওঠে না এখানে। অথচ সহদেব ঘরে এলে এবেলা ওবেলায় আসা চাই। তার আসা যাওয়া সন্দেহজনক, গ্রামের মানুষ ভাল চোখে দেখে না। অতসী বোষ্টমীর চরিত্র পুকুরের জলের মত স্বচ্ছ নয়, সমাজ বহির্ভূত জীবনযাপন তার চরিত্রকে রহস্যাবৃত করেছে। গ্রাম থেকে এতদূরে ঘর বাঁধার অর্থ কি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার অদম্য প্রয়াস? পবন এই জটিলতার অর্থ বোঝে না। অতসী বোষ্টমী গ্রামের বাইরে থেকেও গ্রামের সাথে নাড়ির যোগসূত্র বজায় রেখেছে। আশে পাশের দশ-গাঁ থেকে ভিক্ষে না আনলে তার হাঁড়ি চড়বে না। তবু কেন সে গ্রামের বাইরে? এ প্রশ্ন পবনকে আনমনা করে দেয়।

যদিও মাটির ঘর তবুও এই ছোট্ট ঘরে ছড়ানো ছিটানো সৌন্দর্যের কমতি নেই। ছোট্ট একফালি উঠোন, তাতে সর্ষে পড়লেও খুঁটে নেওয়া যায়। কাঁথ দেওয়ালে গোবর ছঁচ। দেওয়ালের মাটি কেটে সুন্দর কুলুঙ্গী। কুলুঙ্গীর চারধারে এবং গোবর লেপা দেওয়ালে খড়ি মাটি আর আতপচাল গুঁড়ার আলপনা। ফুল-লতা-পাতা-পাখি আর পালকি আঁকা। চিরাচরিত লক্ষ্মীর পদচিহ্ন। নিকোন দেওয়ালে খড়িমাটির চিত্রকল্প জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। ঘরের সামনে তুঁতে গোলা জল, স্বল্প পরিসরের একটা পুকুর। এই পুকুরের ঘাটে বসে প্রত্যহ নিম দাঁতন করে রেণু। অতসী বোষ্টমী গায়ে এক ফেরতা গেরুয়া শাড়ি জড়িয়ে প্রত্যহ স্নানপর্ব সেরে নেয় সূর্য ওঠার আগে। তারপর পূজা-পাঠ, সাধন-ভজন, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম। সব শেষে ভিক্ষার ঝুলিটা কাঁধে গলিয়ে নিয়ে খঞ্জনীতে শব্দ ঝংকার তুলে গলা মিলিয়ে

গ্রামের পথে মিলিয়ে যাওয়া। ঘরে একলা থাকে রেণু তবু তার কোনো বিরক্তি নেই। একলা থাকতে ভালবাসে সে, কিংবা একলা থেকে থেকে প্রতিনিয়ত এক অন্ধকূপের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে সে।

পবন উশখুসিয়ে বলল, আমি এবার যাই রেণু, পরে আবার আসব। বেলা কত হল বলতো?

রেণু বেলার কিছু বোঝে না তবু সূর্যের দিকে তাকাল। রোদের রঙ তার চোখে মুখে ঠিকরে পড়ল। ঘর্মাক্ত মুখটায় রুইমাছের আঁশের মসৃণতা। টানা টানা চোখ দুটোয় অদ্ভুত মায়া ছড়ান। বুকের অতল থেকে নিঃশ্বাস তুলে এনে সে মন কেমন করা চোখে তাকাল, অনুচ্চ কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল তার অন্তর নিঃসৃত দাবী, অনেক বেলা হল—দুটো খানি খেয়ে গেলে খুব কি ক্ষতি হতো? কতদিন তুমি এঘরে খাওনি। আমার সামনে বসে তুমি যদি ডাল-ভাত দিয়ে তৃপ্তি করে দুটো ভাত খেতে তাহলে আমার চেয়ে কেউ সুখী হতো না। কি খাবে? যদি হ্যাঁ কর তাহলে হাত-পা ধুয়ে আস পুকুরে। আমি তোমার জন্য ভাত বেড়ে দিই। হার্দিক আবেদন। অগ্রাহ্য করতে গিয়ে কেঁপে ওঠে পবনের নিঃসঙ্গ হৃদয়। তাছাড়া ক্ষিদেও লেগেছিল প্রচণ্ড। সকালের তানুভাত দীর্ঘ সময়ে জল হয়ে মিশে গিয়েছে রক্তে। মুখে ক্ষিধে কিন্তু মনে লাজ। পবন কুণ্ঠিত চোখে তাকাল, মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ এই ভেবে নিয়ে ভরাট মুখে তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল রেণু। পবনের কাছে খাওয়াটা বড় কথা নয়—তার কাছে এই মুহূর্তে আত্মগোপন করাটাই আসল কথা। মাঠের মধ্যে হরিয়ার রক্তাক্ত দেহটা এতক্ষণে কেউ না কেউ হাড়িসাইয়ে নিয়ে গিয়েছে। এই নৃশংস ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিশ্চয়ই ঘোঁট পাকাচ্ছে পাড়ার মানুষ। দূরে থেকে পবন যেন সব দেখতে পায় একের পর এক। যত তার কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়—ততই ভয়ে ছোট হয়ে আসে মুখ।

মাঠের মাঝখানে ঘর, এখানে পাড়ার কেউ চট করে তার খোঁজে আসবে না। এ গ্রামের অনেকেই এই মাটির ঘরটাকে ভয় পায়। যদি কলঙ্ককালি গায়ে লেপে যায়—তাহলে ভদ্র সমাজে মুখ দেখানো দায় হবে। মানুষ গোপনে রতিসুখ পেতে চায় কিন্তু প্রকাশ্যে গোবর ডিঙ্গাতে ভয় পায়।

হাত-পা ধুতে গিয়ে পুকুরে এক ডুব দিয়ে এসেছে পবন। গা মোছার জন্য গামছা বাড়িয়ে দিয়েছে রেণু। পরার জন্য দিয়েছে অতসী বোষ্টমীর একটা গেরুয়া শাড়ি। চুল আঁচড়ে পবন খেতে বসেছে বাবু হয়ে, তার খাওয়ার আগ্রহ দেখে ভয়ানক খুশী রেণু। সহাস্যে বলল, আর দুটো ভাত দিই? টমাটো পোড়াটা কাঁচলঙ্কা দিয়ে মেখে নাও, সুয়াদ পাবে। অত তাড়াহুড়ো করে খাচ্ছ কেন, আস্তে আস্তে খাও।

পবন লজ্জায় খাওয়া থামিয়ে রেণুর দিকে তাকাল, ঢোক গিলে বলল, তুমি খাবে না?

শাড়ির আঁচলটা গলার কাছ দিয়ে ঘুরিয়ে এনে পাকা গিন্নির মত পাতের গোড়ায় বসেছে রেণু, আদুরে কোনো পোষা অনুগত বেড়ালের মত তার চোখ-মুখ। বাম পার্শ্বের গালে হাতের তেলোটা শুইয়ে রেখে বলল, আমার হাতে কেউ কোনদিন ভাত খায়নি। তুমিই প্রথম মানুষ যে কিনা আমার হাতে ভাত খেলে। রেণু তার খুশীটা ছড়িয়ে দিতে চাইছিল পবনের মধ্যে।

কিন্তু পবনের উদ্‌গ্রীব চোখ রেণুর শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে কে যেন তার সমস্ত রক্ত শুষে নিল জোর করে। ঘেমে উঠছিল সে। তার ডান হাত কিছুতেই ভাতের থালা স্পর্শ করতে পারল না। কানচল ছানিয়ে ভেসে এল ঘামের ধারা, উৎকণ্ঠার প্রতিভূ হয়ে ঘামের ফোঁটাগুলো ঝরে পড়ল টুপটুপ করে। ঘটনার আকস্মিকতায় রেণু বিহ্বল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পবন।

ধানমাঠ থেকে ভেসে আসছিল মানুষের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, অগ্নি উৎক্ষিপ্ত বাতসে সেই ভয়াল ভীষণ কণ্ঠস্বর ফণা তোলা বিষাক্ত সাপের মত ছোবল মারলো পবনের কর্ণকুহরে। এঁটো হাতে তড়িৎ গতিতে

সে চেপে ধরল রেণুর হাত, চুড়ি ভেঙ্গে যাওয়ার শব্দ হল পুট করে, আঁতকে উঠে রেণু বিরক্তির সঙ্গে বলল, কী হল, অমন করছ কেন? না খেয়ে উঠে পড়লে যে—

পবন ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে মাঠের দিকে তাকাল। ধূলি ওড়া মাঠে রোদের কিলবিলান আঁচ। চারা বাবলাগাছগুলো রোদের মধ্যে ধুঁকছিল। দিকচক্রবালের তালগাছগুলো পাহারাদারের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। পবন রেণুর হাতটা ঝাঁকিয়ে দিলে বলল, আমার বড় বিপদ। তোমার ভাত আর আমার তৃপ্তি করে খাওয়া হল না! আমি জানতাম—ওরা আমাকে ঠিক খুঁজে বের করবে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবে—আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তুমি খেয়ে নাও রেণু! এখানে থাকা আমার আর ঠিক হবে না। আমি যাই—

পবনের হাতের মুঠি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রেণু ধাঁধায় পড়া চোখে তাকাল, কিন্তু কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই পবন তাকে বলল, আমি এখানে থাকলে ওরা তোমাদেরও দুষবে। শুধু শুধু আমার জন্য কেন লোকের কাছে খারাপ হতে যাবে। তুমি ঘরে যাও—আমি ঠিক গা বাঁচিয়ে ওদের নজরের বাইরে চলে যাবো।

—কোথায় যাবে তুমি? ফাঁকা মাঠ। দিনের বেলায় ওরা তোমাকে দেখে ফেলবে।

—ঢ্যাঙ্গা আলের ধারে ধারে হামা দিয়ে আমি ঠিক চলে যাব। তুমি চিন্তা করো না। যদি ধরা না পড়ি—তাহলে আবার একদিন আসব। আর যদি ধরা পড়ে যাই—তাহলে আর দেখা হবে না! আমি হরিয়াকাকাকে খুন করেছি। খুনের দায়ে আমার ফাঁসী হবে।

চার

তুমি খুন করেছ, কেন? হরিয়াকাকা তোমার কী করেছিল? রাগে, ক্ষোভে স্তব্ধ হয়ে এল রেণুর সত্তা, সে কেমন কাতর গলায় বলল, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। যে একটা ব্যাঙ মারতে ভয় পায়—সে মানুষ খুন করবে কী করে? তুমি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলছো—

—মিথ্যা হলে আমি হয়তো বেঁচে যেতাম। কিন্তু যা বলেছি—তা সত্যি। সে দাদুর কাছ থেকে অন্যায়ভাবে চামড়াটা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল, আমি আর দাদু মিলে তাকে কত বুঝিয়েছি, সে মোটে বুঝতে চায়নি। উপরন্তু সে দাদুর বুকের উপর চড়ে বসেছিল। দাদুকে মারধোর করলো। আমার সহ্য হল না। আমি ভাগাড়ের কুকুর খেদান লাঠিটা দিয়ে তার মাথায় মেরেছি। মার খেয়েই মাটি নিয়েছিল হরিয়া কাকা। কত রক্ত! রক্ত মাখামাখি হয়ে ধানমাঠে ছটফট করছিলো সে। দেখে-শুনে দাদু বলল, পালা পবনা, পালা। ভয়ে আমি পালিয়ে এলাম। সেই থেকে মাঠে মাঠে ঘুরছি। হরিয়াকাকা বেঁচে আছে কিনা জানি না। তবে আঘাতটা খুব জোরে লেগেছে। বিশ্বাস কর রেণু, আমি ঠিক অত জোরে মারতে চাইনি। আমি তাকে ঘায়েল করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে যে মরে যাবে, আমি একথা এখনও ভাবতে পারি না।

সব শুনে থম মেরে গেল রেণু, চোখের দৃষ্টি ছোট হয়ে এল বিপদের গন্ধ পেয়ে। পবন বেপরোয়া হলে বলল, আমি তাকে না মারলে সে আরও দিন দিন বেড়ে যেত। তুমি জান না—কী বাড় সে বেড়েছিল। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করতো না। সে ছিল ধর্মাবাবুর এক নাম্বারের দালাল। দু-পাঁচটা টাকা পেলেই সে মানুষ খুন করতে পিছপা হোত না। সে আমাদের খুব জ্বালাতন করছিল। যদি এ যাত্রায় সে বেঁচে যায় তাহলে বুঝে-শুনে পা ফেলবে, আমাদের মত গরীব মানুষদের সহজে আর ঘাঁটাতে সাহস পাবে না। রেণু অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বলল, এখন তোমার কোনমতেই ঘরের বাইরে যাওয়া ঠিক

হবে না। বাইরে বেরলে ওরা তোমাকে যে করেই হোক ধরে ফেলবে। ধর্মাবাবুর লোকেরা এতক্ষণে মাঠে এসে গিয়েছে। তাদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ হবে না।

—তুমি কী বলতে চাও?

পবনের আতঙ্কগ্রস্ত চোখের দিকে তাকিয়ে রেণু অভয় দিয়ে বলল, তুমি ঘরের মধ্যে থাক—এখানে কেউ আসবে না। ভাতগুলো খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম কর, আমি বিছানা পেতে দিচ্ছি। ভয় নেই, আমি থাকতে তুমি কিছুতেই ধরা পড়বে না। আমি জানি—ওরা কেউ আমাদের এখানে আসবে না। গাঁয়ে আমাদের যা বদনাম—তাতে এখানে আসলে সবার জাত যাবে।

পবন আশ্বস্ত হল না রেণুর কথায়; সে কেমন বিব্রত স্বরে বলল, ওদের বিশ্বাস নেই, আসলেও আসতে পারে। তখন?

রেণু কিছু সময় ভাবল, আসলেও কোন ভয় নেই। ওদের দূর থেকে দেখেই ঘরে শেকল তুলে তালা আটকে দেব আমি। তারপর হাটের দিকে চলে যাব। ওরা জানবে আমি হাট করতে যাচ্ছি। ওদের মনে কোন সন্দেহ হবে না।

—যদি তা না হয়! পবনের মুখ শুকিয়ে এল। শুকনো পাতাগুলোর চেয়েও সাদা হয়ে আছে তার মুখ। বুকের ভেতর অস্থিরতার বান ডেকেছে, সেই জলস্রোতে যেন ভেসে যাচ্ছিল পবন। রেণুর কথাগুলো সামান্য খড়কুটোর মত তাই ভরসা পেয়ে বলল, ঠিক আছে তোমার কথাই থাকবে। আমি ঘরের মধ্যে থাকবো। কিন্তু রাত হলেই পালাবো। তখন তুমি আমাকে আর বাধা দিও না।

রেণু আহত হল এ কথায়, বেদনাবোধকে কাঁটা গেলার মত হজম করে নিয়ে সে বলল, আগে রাত আসতে দাও, তারপর।

ক্রুধিত মানুষের কোলাহলের শব্দে মুখরিত বাতাস। পবনকে ঘরের ভেতর ঠেলে দিয়ে ঘরের বাইরে এল রেণু। যে ভয় সে পবনের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, বাইরে আসতেই তা দিনের আলোয় ঘাম হয়ে ফুটে উঠল সারা মুখে। তার চোখের তারা সঙ্কুচিত হল মাঠপুকুরের কাছে একদল মানুষকে ছোটাছুটি করতে দেখে। তাদের হাতে লাঠি, টাঙ্গি, এমন কী কোঁচ! রোদের মধ্যে পাগলের মত ছোটাছুটি করছিল ওরা। ওদের এই সন্দেহজনক ঘোরাফেরায় রীতিমতো ভয় পেল রেণু। সে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে টানটান চোখে কী যেন দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু আলোর মধ্যেও তার চোখে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে এল চাপচাপ অন্ধকার। উঁচু ঢিপিতে দাঁড়িয়ে সে দেখল খালি গা, খালি পায়ের তেল চুকচুকে একটা কালো মানুষ তাদের ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে; তার হাতে তরলা বাঁশের লাঠি, খাটো ধুতি দাপনার উপর উঠান। লোকটা কিছুটা হেঁটে আসার পর পায়ের ব্রেক কষিয়ে দাঁড়াল। রেণু দেখল—কালো লোকটা ধর্মাবাবুর চাকর বৈকুণ্ঠ। সে এক লাফে ঢিপি থেকে নেমে পড়ে পড়িমড়ি করে ছুটে গেল ঘরে। চাপা গলায় পবনকে সতর্ক করে দিয়ে সে আবার উঠোনে নেমে এল ঝড়ের বেগে। দড়ি থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে সোজা চলে গেল পুকুরঘাটে। খেজুরগাছের গুড়ি কেটে ধাপে-ধাপে ঘাট বানান। একদম শেষ ধাপে বসে শাড়িটা হাঁটুর উপর তুলে নগ্ন, পুরুষ্টো পা দুটো ডুবিয়ে দিল জলে। স্বচ্ছ জলে পা দোলাচ্ছিল রেণু। পুরুষ্টো পায়ের গোছ পাকা রুইমাছের মত ঘাই দিচ্ছিল জলে। তখনই আগড় সরিয়ে বাগানের ভেতর ঢুকে এল বৈকুণ্ঠ। তার ঘাম জ্যাবজেবে গা। ঘ্যাটা পড়া কাঁধের কাছে পাট করা গামছা। গামছায় মুখ মুছে সে রেণুর দিকে তাকিয়ে সহজাত লজ্জায় কেন্নো হয়ে গেল মুহূর্তে। কোন কিছু প্রশ্ন না করেই যেমন ঢুকেছিল তেমনই বেরিয়ে এল বাইরে। কচার বেড়ার উল্টো পিঠে দাঁড়িয়ে সে গোপনে দেখতে থাকল সদ্য যৌবন ছুঁইছুঁই রেণুর স্নানের দৃশ্য। যে কাজে সে এসেছিল—তা বেমালুম ভুলে গিয়ে—চেয়েই থাকল ঘাটের দিকে। অসহ্য লাগতেই গামছার জল নিংড়ে চুল মুছে বেড়ার কাছে এগিয়ে গেল রেণু। খুবই কাঠোর হয়ে শুধোল, কী ব্যাপার, তুমি ওখানে চোরের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছ? দাঁড়াও, মা আসুক—আমি সব বলব।

—কী বলবে? বৈকুণ্ঠর গলার স্বর কেঁপে উঠল।

—যা বলব তা তুমি তোমার বাবুর মুখেই শুনতে পাবে। অসভ্য, ইতর কোথাকার। আমি চান করছিলাম—তুমি কেন লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখছিলে? রাগে উত্তেজনায় কথা জড়িয়ে গেল রেণুর। বৈকুণ্ঠর ধরা পড়ে যাওয়া পাপী চোখ দুটোয় তখন চাকরি হারানোর ভয়, কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে অনুনয় ফুটিয়ে বলল, মা জননী, আমার অপরাধ লিয়োনি। আমি এখানে সখ করে আসিনি, ঠেলায় পড়ে এসেছি। ধর্মাবাবু আমাকে জোর করে পাঠাল। বলল—যা দেখে আয়, হারামজাদা পবনাটা ওদিকপানে গিয়েছে কি না! বাবুর কথা তো ঠেলতে পারি না তাই ঠেলায় পড়ে ল্যালার জল খাওয়া। তা এসে দেখি তুমি নাইছো। তাই ফিরে যাচ্ছিলাম।

—তাহলে বেড়ার ধারে কেন দাঁড়িয়ে ছিলে? রেণুর প্রশ্নবাণে নাজেহাল বৈকুণ্ঠ বিব্রতবোধ করছিল, এমন অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে মুক্তি চাইছিল সে। রেণু তাকে বকাঝকা করে বলল, মা ঘরে নেই। গাঁয়ে গিয়েছে। ঘরে আমি একা। তুমি তো নিজের চোখে দেখলে সব। যাও, এবার বাবুদের বলো গে যাও। তারা হয়তো তোমার পথ চেয়ে আছে।

—তা ঠিক। তুমি ঠিকই বলেছো মা জননী। আমি যাই। অপরাধ নিওনি। তুমি আমার মেয়ের মত গো।

বৈকুণ্ঠ চলে যাবার পরও আগড় ধরে চিন্তিত মুখে দূরের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল রেণু। তার ভেজা শরীরে রৌদ্র পড়ে চড়চড় করছিল গাত্রত্বক, শরীরে চেপে বসে থাকা ভেজা শাড়িটা ঈষৎ শুকিয়ে গিয়ে গাছের পুরনো ছালের মত আলগা হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। ফাঁকা মাঠের বাতাস দুরন্ত বালকের মত এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করে; কখনও থেমে থাকতে জানে না, প্রতিনিয়তই শোঁ-শোঁ শব্দে মাতোয়ারা করে তোলে দশ দিগন্ত। রেণু হাওয়ার শিসকে অগ্রাহ্য করেও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল, তার প্রলম্বিত উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি তখনও অস্থিরতার মোড়কে ঢাকা পড়ে অদ্ভুত ভয়-বিহ্বলতার ছায়া ফেলেছে। পবনের জন্য প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক রকমের দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তার। পবনের আতঙ্কিত, ঘনঘোর বিপদের কথা ভেবে খুবই অস্থির হয়ে পড়ছিল সে। ধর্মাবাবু মানুষটিকে রেণু অল্পবিস্তর চেনে। আগে যাতায়াত ছিল এখানে। কিন্তু পাত্তা না পেয়ে সে এ রাস্তা ছেড়েছে। আর সেদিন থেকে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে রেণু নিজেও।

বিকেলের আলোয় ধানমাঠ ছেড়ে গাঁয়ে ফিরে গেল ধর্মাবাবুর লোকজনরা। তারা দৃষ্টির বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত আগড় ধরে ঠায় দাঁড়িয়েছিল রেণু। চোখের মণিতে মানুষগুলো একটা ফুটকিতে পরিণত হতেই আশ্বস্ত ভঙ্গিতে ঘরে ফিরে এল রেণু, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে দুশ্চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেলতে চাইল মন থেকে। খুব সহজ আর স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল সে। তারপর, ভেজানো কবাট খুলে ঢুকে গেল অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের ভেতর। পবন জাঁক দেওয়া কলার মত ঘেমে গিয়েছিল গরমে, তার চেহারায় অস্বাভাবিকত্ব পরিস্ফুট হল। সে-ও পূর্ণ একটা শ্বাস নিয়ে রেণুর দিকে পরাজিত চোখে তাকাল। রেণু তাকে আশ্বস্ত করে মৃদু কণ্ঠে বলল, ভয় নেই। ফাঁড়া কেটে গিয়েছে। চল, বাইরে গিয়ে বসি।

তাৎক্ষণিক উদ্বেগ কাটিয়ে উঠতে কিছুটা সময় নিল পবন, এভাবে ভীত-বিহ্বল মেঠো ইঁদুরের মত আত্মগোপন করে থাকা মন থেকে মেনে নিতে পারে না সে।

রেণু অপ্রত্যাশিত চিন্তার বোঝা হালকা করে পবনের কাছে সহজ থেকে সহজতর হওয়ার চেষ্টা করল। বিকেলের স্বর্ণপ্রভা আলোকরশ্মি মায়ের আদরের মত ছড়িয়ে পড়েছে উঠোনে। ধানমাঠ থেকে উঠে আসছে শীতলতম হাওয়া। ধানমাঠ যেন তার নগ্ন দেহতনু এলিয়ে দিয়ে নীলাম্বর আকাশের সঙ্গে সখ্যতায় মেতে উঠছে দিনান্তের শেষ আলোয়। মাঠ থেকে ফিরে যাচ্ছে গোরুর পাল, তাদের অলস ক্ষুরে ধুলোমাটির অসহায় ঘূর্ণাবর্ত।

পবনের ভেতরটা তখনও ঝড়ের মুখে ছোট একটা পানসীর মত দুলছিল। কিছুতেই সে সুস্থির হতে পারছিল না। রেণু এই অক্ষমতার গুরুত্ব বুঝতে অক্ষম। সে পবনের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থেকে কিছু বলার তাগিদ অনুভব করল। অজস্র কথার জোয়ারে নড়ে উঠল তার ওষ্ঠযুগল, সে প্রশ্নাকীর্ণ মুখে পবনকে জিজ্ঞেস করল, এভাবে কতদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে? তার চেয়ে তুমি এখানে থেকে যাও। আমি তোমার ঘরে গিয়ে সব বলে আসব যাতে ওরা কিছু চিন্তা না করে।

চুপ করে থাকল পবন, কথাগুলোয় তার কোনো প্রতিক্রিয়া হল না। রেণু হালকা চালে বলল, সেই থেকে কী ভাবছ? ভাবলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। মাকে আসতে দাও। মা আসলে সবকিছু সহজ হয়ে যাবে। মাকে আমি তোমার জন্য ধর্মাবাবুর কাছে পাঠাব। মার কথা ধর্মাবাবু অগ্রাহ্য করতে পারবে না। আমি জানি, ধর্মাবাবু মায়ের কথা ঠিক রাখবে। তুমি ভেবো না সব ঠিক হয়ে যাবে। রেণু অত্যন্ত ধীরে ধীরে কথাগুলো শেষ করে পবনের দিকে তাকাল কিন্তু তার কথা পবনের মনে কোনো রকম রেখাপাত করেনি এটা বুঝতে পেরে পরবর্তী কিছু বলার সাহসই পেল না সে।

পবন অনুনয়ের স্বরে বলল, তুমি আমার জন্য যা করলে তা আমি কোনোদিনও ভুলব না। তুমি যদি আর একটু কষ্ট কর তাহলে চিন্তা থেকে আমি কিছুটা ছাড় পাই।

—কী করতে হবে বলো?

—তুমি একবার পাড়ায় গেলে ভাল হয়। হরিয়াকাকা বেঁচে আছে না মরে গেছে—শুধু এই খোঁজ নিয়ে চলে আসবে!

রেণু ক্ষয়ে যাওয়া বিকেলের দিকে তাকাল, তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে আশ্বাস দিয়ে বলব, যাব। কিন্তু তোমাকেও কথা দিতে হবে—আমি না আসা পর্যন্ত তুমি কোথাও যাবে না।

—কোথায় যাব আর, যাওয়ার জায়গা বা কোথায়?—পবনের উচ্চারণে অবর্ণনীয় আক্ষেপ। রেণু এই মানসিক রোগের ওষুধ জানে না। মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকে। পবন ঝোঁকের মাথায় অযাচিত রক্তপাত ঘটিয়ে ভাল করেনি—এই চিন্তা সর্বদা তাকে পীড়িত করে তুলছে।

রেণু চলে যাবার পর পবন আবার মাটির ঘরে একা হয়ে গেল। রেণু ফিরে আসা না পর্যন্ত সে সুস্থির হয়ে কোথাও বসতে পারল না। বারবার করে তার মনে ঝলসে উঠল হরিয়ার রক্তস্নাত মুখগুল, কাতর আর্তনাদ, যন্ত্রণালব্ধ শব্দাবলী।

রেণু ফিরে আসতেই বুকের বোঝা হাল্কা করে তাকাল পবন, কিন্তু কথা ·শার অদম্য স্পৃহাটা থিতিয়ে গেল ঠোঁটের উপর। রেণুই মুখ খুলল প্রথমে, সে রহস্য বাক্সের ঢাকনা খোলার মত চোখ মেলে তাকাল, তোমার ভয় পাবার কিছু নেই, হরিয়াকাকা বেঁচে আছে—সে মরেনি। অমন মানুষ সহজে মরে না। ওদের কৈ মাছের পরাণ।

—তুমি ঠিক শুনেছ? অতিরিক্ত আগ্রহে রেণুর দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ল পবন।

অনেকক্ষণ পরে মুখ ভরিয়ে স্বস্তির হাসি হাসল রেণু, সত্যি নয় তো কী মিথ্যে! তোমার দাদুকে দেখলাম গালে হাত দিয়ে বসে আছে দাওয়ায়।

আমি তার সঙ্গে কথা বলিনি, তাহলে সন্দেহ করতো লোকে। ফেরার পথে শুনলাম—ধর্মাবাবু নাকি তাকে হাটের মাঝে অপমান করেছে। গায়েও হাত তুলেছে। লোকজন গিয়ে ছাড়িয়ে না দিলে বিপদ ঘটে যেত। কেননা ধর্মাবাবু মানুষটা তো ভাল নয়— স যার পিছনে লাগে তাকে একেবারে শেষ করে ছাড়ে। রেণু একনাগাড়ে কথা বলে শ্বাস টেনে নেয় বড় করে, তারপর নিচু স্বরে বলে, হরিয়াকাকাকে পাড়ার লোকে এগরা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। লাঠির আঘাতটা বেশ জোরই লেগেছিল। শুনলাম—সাতটা সেলাই পড়েছে মাথায়। ভয়ের কিছু নেই, সে ভালই আছে।

সব শুনেও পবন চিন্তামুক্ত হতে পারে না, ব্রজবুড়ার জন্য মনটা ব্যথায় ছটফটিয়ে ওঠে। আজকের এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য মূলত সেই দায়ী, একথা সে মন থেকে মুছতে পারে না। ঐ বুড়ো মানুষটা তার কথা ভেবে আজ সারা রাত দু' চোখের পাতা এক করবে না। এ সবের পরেও পবন নিশ্চিন্তে থাকবে কিভাবে? তার গা-হাত-পা নিশপিশিয়ে ওঠে রাগে-উত্তেজনায়। ধর্মবাবুর মুখটা মনে করে অদম্য উত্তেজনাকে বহু কষ্টে চেপে রাখার চেষ্টা করে সে।

রাত বেড়ে যায়, ফ্যাকাসে চাঁদ মাঠের চতুষ্পার্শ্বে জ্যোৎস্না ছড়ায়। সজনেফুল জ্যোৎস্নায় খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে দাওয়ায় এসে বসে ওরা। সামনের বাগান থেকে কী একটা ফুলের মিষ্টি বাসনা উঠে আসছিল হাওয়ায়। টগরগাছের পাতা কাঁপছিল মৃদুমন্দ হাওয়ায়, জ্যোৎস্নাআলোয় তেল চকচকে পাতায় রেণুর মুখের লাবণ্য রসদ।

খাওয়া-দাওয়ার পরে পবন বলেছিল 'চলে যাবে', কিন্তু রেণুই তাকে যেতে দিল না, মন কেমন করা গলায় সে বলেছিল, চলে যেতে চাও বাধা দেব না কিন্তু আমাকে একা ফেলে যেতে তোমার কষ্ট হবে না? আজকের রাতটা থেকে যাও। আজ আমরা গল্প করব মনের সুখে।

সুখ কোথায়? সুখ তো খাঁচা ভেঙে উড়ে যাওয়া চতুর পাখি! পবনের উড়োনচণ্ডী মন স্থিতু হয়েছে ঠিকই কিন্তু শান্তি পুকুরের অথৈ জলে হারিয়ে যাওয়া কাঁচের গুলি। তবু রেণুর আব্দার মাখানো অনুরোধকে সে হটিয়ে দিতে পারে না, আবেগতাড়িত কণ্ঠে বলে, থাকব। আজ আর যাব না। আজ চলে গেলে আমিও কি শান্তি পাব! এত বড় রাতে কোথায় ঘুরব? বিপদ-আপদের তো শেষ নেই।

পবনের এই পরিবর্তন আনন্দ দেয় রেণুকে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সে বলল, জ্যোৎস্না রাতে আমার খুব বাবার কথা মনে পড়ে। মায়ের মুখে গল্প শুনেছি, আমার যেদিন জন্ম হয় সেদিন সন্ধেবেলায় তোমাদের ঐ হাটতলার চারা অশোথগাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরল বাবা। সেদিন থেকে মা আমাকে দেখতে পারে না। বলে, রাক্ষুসী তুই তোর বাবাকে খেলি! আমাকে কেন এত জ্বালাস! তুই কি আমাকেও খাবি? বলো তো এসব গা জ্বালানো কথা শুনে কার আর ঘর আঁকড়ে পড়ে থাকতে মন করে! মাঝে মাঝে আমার মনে হয়—এই ঘর-দোর ছেড়ে আমি কোথাও পালিয়ে যাই। কিন্তু ঐ মায়ের কথা ভেবেই আমি আর যেতে পারি না। এই ছন্নছাড়া সংসার আঁকড়েই পড়ে থাকি।

রেণুর বাবা ভরত বোষ্টম ছিল এ অঞ্চলের নাম করা বাউল গাইয়ে। তার হাতে থাকত একতারা আর ডুগডুগি, গলায় সুধা ঝরা সুর। একতারাটা কথা কইত, ডুগডুগিটা হাসতে পারত দমতক। আসলে ঐ দুটি বাদ্যযন্ত্র বড় বাধ্য ছিল ভরত বোষ্টমের। ভেক নেওয়ার পর থেকে একতারা আর ডুগডুগি ছাড়া হয়নি কোনদিন। রেণু তার বাবাকে দেখেনি, কিন্তু এ গাঁয়ের যারা তার বাবাকে দেখেছে প্রত্যেকেই ভরত বোষ্টমের প্রশংসা করত প্রাণ ঢেলে। এমন কী ব্রজবুড়াও বলে, অমন মানুষ হয় না। ও তো মানুষ ছিল না—ছিল সাক্ষাৎ ভগবান। অবিকল ভগবানের মত দেখতে। লম্বা-লম্বা চুল মাথায় ঝুঁটি বাঁধা, পরনে ঢিলেঢালা বাউলী পোষাক। মুখ ভর্তি দাড়ি, টানা টানা চোখ। কাঁধের কাছে কার্তিক ঠাকুরের মত লুটিয়ে থাকত লাউ আঁকসি পেচান কৃষ্ণ ভ্রমর চুল। প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি লম্বা ছিল মানুষটা, গায়ের রঙ দুধেআলতা।

ভরত বোষ্টমের মৃত্যু প্রসঙ্গে জোর গুজব আছে গ্রামে। কেউ বলে—সে গলায় ফাঁস নিয়েছে তার রূপসী বউটার জন্য। মাগীটার জাত-মান কিছু নাই নাহলে হাড়িসাইয়ের সহদেবের সাথে ঢলায়!

কথাটার সত্য-মিথ্যা এখনও যাচাই করে উঠতে পারেনি পবন। তবে বাবাকে তার দুর্ভেদ্য ঠেকে যেহেতু তারা কেউ কারোর কাছে সহজ নয়।

রেণুর উদাস দৃষ্টিতে স্মৃতি রোমন্থনের জোয়ার, পবন মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে—সামনে দিগন্ত প্রসারিত জ্যোৎস্না ধোওয়া মাঠ, জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব। মাঠ পালান হাওয়ায় কলাপাতায় কাঁপুনি শুরু

হয়, ঠিক একইরকম কাঁপুনি যেন অনুরণিত হয় রেণুর বুকের ভেতর। হাই তুলে সে বলে, বাবাকে আমার আর চোখে দেখা হ'ল না। মার মুখে তার গান শুনে আমি নিজেই পাগল হয়েছি। বাবা একটা গান গাইত—শুনবে? অনুমতি ছাড়াই রেণু গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠে—

কৃষ্ণপ্রেমের রেলগাড়ি চড়বি কে রে আয়
সদর ইস্টিশান গোলকধাম
টিকিট দিচ্ছে নদীয়ায়।...

....

প্রফুল্ল মন তাই বলছে ডেকে
মাধব এবার উঠরে জেগে
ঘণ্টা পড়ল, ডাউন হ'ল
ভিড়ে টিকিট কাটা হবে দায়।

গান থামার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মুছে নিয়ে হালকা হাসল রেণু। আধো স্বরে বলল, এই গানটা যত গাই ততই নতুন লাগে আমার কাছে। তবে মা আমার চেয়েও এই গানটা আরও দরদ দিয়ে গাইতে পারে। তুমি কি কোনদিন মায়ের গলায় 'কৃষ্ণ প্রেমের রেল গাড়ি' গানটা শুনেছ?

'না' সূচক ঘাড় নাড়ল পবন।

রেণু বলল, দুদিন থেকে যাও। মা আসলে গাইতে বলব। তখন আমার কথাটা মিলিয়ে নিও সত্যি কিনা!

ঘরে ডিবরি জ্বলছে টিমটিম করে, সেই ঝিমুনি আলোয় রাতের পোকারা আগুনের নিঠুর খেলায় মেতেছে। তক্তাপোষের নিচে জোনাকি উড়ছিল আলোর ফুটি ফুটি আলপনা এঁকে। কে কোথায় শোবে—এই নিয়ে রেণুর বড় চিন্তা। সে বলল, তুমি খাটে শোও, আমি নিচে বিছানা পেতে নিচ্ছি।

—তা হয় না। তুমি খাটে শোও। আমার জন্য নিচে বিছানা পেতে দাও। ঘরে আমি দাদুর সাথে দাওয়ায় ঘুমাই। খাটে শোওয়ার আমার অভ্যেস নেই।

পবনের কথায় রেণু ফাঁপরে পড়া চক্ষু মেলে তাকাল, তা হয় না। তুমি হলে অতিথি, নারায়ণ। তোমাকে মাটিতে শুইয়ে আমি রাণীর মত খাটে শুতে পারি না। মা জানলে ভীষণ বকবে আমাকে। রেণুর কণ্ঠস্বর নরম হয়ে এল নিমেষে, নিদ্রাতুর গলায় সে বলল, রাত বাড়ছে। শোওয়ার আগে তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। বলেই সে খাটের নিচে ঢুকে গেল মাথা নিচু করে। টানতে টানতে বের করে আনল কাঠের একটা বাক্স। ডালা খুলে বের করল যত্নে রাখা ডুগডুগি আর একতারা। তারপর ধরা গলায় বলল, বাবার কোনো ফটো নেই ঘরে কিন্তু একতারা আর ডুগডুগি রয়ে গেছে! মা এগুলো অন্য আর একজন বোষ্টমকে দিয়ে দিতে চেয়েছিল, আমি দিই নি। এ দুটো জিনিস ছাড়া বাবার কোনো চিহ্ন নেই ঘরে।

ছোট ঘরে হাত মাপের একটা জানলা, সেটা খুলে দিলে এক সাথে হাওয়া আর জ্যোৎস্না ঢুকে পড়ে হুড়মুড়িয়ে। রেণুর জোরাজুরিতে খাটে শুয়েছে পবন। রেণু মাটিতে বিছানা পেতে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে। একতারা আর ডুগডুগি তার বিছানার উপর শোয়ানো।

শুতে যাওয়ার আগে রেণু বলল, আমার ঘুম খুব গাঢ়। সকালে ঘুম ভাঙলে ডেকে দিও আমাকে। মা যদি এসে দেখে আমি ঘুমিয়ে আছি বেলা অব্দি, তাহলে খুব মুখ করবে।

মাসীমার কি কাল আসার কথা?

—কেন বল তো? পাল্টা শুধোল রেণু।

—না এমনি! পাশ ফিরে শুলো পবন। কিন্তু সারা রাত তার দু-চোখের পাতা এক হল না। সারা দিনের ঘটনাগুলো মনে পড়ছিল একের পর এক। দাদুকে ধর্মাবাবু হাটখোলায় চড় মেরেছে একথা শোনার পরে পবনের চোখ থেকে ঘুম উধাও!

ভোরের দিকে একটু শীত শীত লাগতেই পবন বিছানা ছেড় উঠে পড়ল নিঃশব্দে। রেণু তখন ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করে কার সঙ্গে কথা বলছে। তার দু'হাত ঘুমের ঘোরে আঁকড়ে ধরেছে একতারা। যেন সে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। এমন দৃশ্যে পবনের চোখটা জ্বালা জ্বালা করে ওঠে ভোরবেলায়। ঘুমন্ত রেণুর দিকে এক পলক তাকিয়ে পবন বিড়বিড়িয়ে বলল, আমি যাই রেণু। তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। আমার ভুল আমাকে এখন কষ্ট দিচ্ছে।

রেণুকে একবার ছুঁয়ে দিতে মন চায় পবনের কিন্তু যদি ঘুম ভেঙে পথ আগলে দাঁড়ায় তাহলে তার আর যাওয়া হবে না—এই ভয়ে হাতটা শামুকের মতন গুটিয়ে আনে বুকের কাছে। তারপর নিঃশব্দে কপাট সরিয়ে বাইরে আসে সে।

ভোর হতে তখন অনেক বাকি। ফিকে আঁধারে পবন লম্বা-লম্বা পা ফেলে পেরিয়ে এল ধানমাঠ। পাকা সড়কে উঠে সে আর একবার রেণুদের ঘরটার দিকে তাকাল। এতদূর থেকে ঘরের অবস্থান বোঝা যায়, সুস্পষ্ট অস্তিত্বের হদিস পাওয়া যায় না। আনমনে বিষণ্ণ হেসে উঠল সে। রেণুর শুয়ে থাকার ভঙ্গিটা বড় মনোরম, অবিকল মেনির মত।

পাকা সড়ক শুয়ে আছে দু' মুখো সাপের মত। তার এক দিকে এগরা, অন্য দিকে দীঘা। পবন ভাবল, কোন্ দিকে যাওয়া যায়, জল না স্থল? শেষে নোনা জলই ডাকল, আয় পবন, আয়। আমি তোকে লুকিয়ে রাখব, কেউ তোর হদিস পাবে না।

জলের টান, মায়ের টান। পবন জল ভালবাসে বলেই দীঘার দিকে পা বাড়াল।

সকালবেলায় বালি ভিজে থাকে অনবরত শিশির সোহাগে; সমুদ্রের নোনা জলে ফাগুনের আবীর গুলে দেয় টুকি দেওয়া প্রভাতী অরুণ। এ সময় সারণি জাল টেনে ডাঙায় ফেরে পাড়ের মানুষ। রূপালী বরণ মাছ চড়বড়িয়ে ওঠে জালের গায়ে ঘষা খেয়ে, যে মাছের তেজ বেশি তারা জাল সমেত জলের উর্দ্ধে উঠে এক পাক নেচেই আবার জলের ভেতর মুখ লুকায় অনিবার্য ব্যর্থতায়। কাগজামাছ দেখতে অনেকটা পাতলা সিন কাগজের মত, জালের ভেতর জড়িয়ে গিয়ে মরার মত পড়ে থাকে। বুকডুলি মাছের চওড়া বুকও শুকিয়ে থাকে ভয়ে। ভেজা জাল পাড়ের বালি ছুঁলে শুধু বুকডুলি মাছ নয়—তেল তাপড়া, টাঁউরী এমন কি রূপাপাটিয়া মাছও মরমর শরীর নিয়ে পড়ে থাকে।

মাত্র পনের দিনেই সমুদ্র ধার পবনের কাছে পরিচিত মেলার মত মনে হয়। রোজ ভোর হওয়ার আগেই সে তালসারির গাঁ থেকে চলে আসে নিকটবর্তী সমুদ্রে। ভোরের জলো হাওয়া তাকে আদর করে এলোপাথাড়ী। ঝাউবন বন্ধুর মত কাছে ডাকে। এই রৌদ্রদগ্ধ দিনে ঝাউবনের মত পরম উপকারী বন্ধু বুঝি আর কেউ নেই! নারাণ সাউয়ের মাছখটীতে মাছবাছার কাজ পেয়েছে সে। এর মধ্যে জেলে নৌকোয় সমুদ্রে গিয়েছে দু-বার। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, ভাবতে গেলে গায়ের লোম চেগে ওঠে উত্তেজনাময় আনন্দে।

নারাণ সাউ মানুষ হিসাবে মন্দ নয় তবে বড় বেশি কথা বলার ধাঁৎ। কাজে ফাঁকি দেওয়া মোটেও পছন্দ করে না সে। পাঁচ মেশালি মাছ জাত অনুযায়ী আলাদা করে বেছে দিলে পেটের ভাতের যোগাড় হয়ে যায় পবনের। কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে কদাচিৎ তার বাড়ির কথা মনে পড়ে। নাহলে সে হাত-পা ঝাড়া, পিছুটানহীন কর্মঠ যুবক।

নারাণ সাউ তাকে বকাঝকা করে কম। প্রায় বলে, মন দিয়ে কাজ কর পবনা, আমি তোকে জেলে নৌকোর মাঝি বানিয়ে ছেড়ে দেব। নোনা জলকে ভালবাসলে—এই সমুদ্র তোকে কোনদিন ফেরাবে না।

এখন শুটকিমাছের সিজিন। মাছখঠীতে মানুষের কাজের কোনো অভাব নেই। সমুদ্রধার মেলার মতন জমজমাট। নারাণ সাউয়ের পিছন পিছন তালগাছটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে পবন। একটু আগে চা-বিস্কুট খেয়েছে ঝুপড়ির চা-দোকানটায়। যার হাত থেকে চায়ের গ্লাস ধরে নিল—সে একজন সমুদ্রকন্যা—চোখ দুটো তার টানা টানা—গলার স্বরে শান্ত সমুদ্রের মিষ্টি ঝংকার। ভ্রূ বেঁকিয়ে নারাণ সাউকে বলল, কী সাউয়ের পো, এটা বুঝি তোমার নতুন শিকার! যাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলা সেই পবন তখন চায়ের গেলাসটা ধরে আনমনে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নিস্তরঙ্গ ঢেউয়ের কামুক আস্ফালন দেখছে। চা-দোকানী স্থূলকায় মহিলটির নাম কোটিমণি। তার সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর, হাতে মোটা শাঁখা, চিকন পলা, লোহার কতবি। শুধু মুখ নয়—দেহলতায় দোল দিয়ে কথা বলে কোটিমণি। পবন ঐ ভেঁটুলের মত গোটা গোটা চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভয় পায় কেননা কোটিমণির কথাবার্তায় এমন একটা বুনো গন্ধ আছে যা অত্যন্ত অপ্রিয় এবং চাঁচাছোলা। নারাণ সাউ চা শেষ করে চারমিনার ধরিয়ে বলল, ছেলেটাকে সমুদ্রধারে কুড়িয়ে পেয়েছি। বলল, ওর কেউ নেই। দুটোখানি পেটের ভাতের যোগাড় হলেই চলে যাবে। তাই সাথে করে এনে মাছখটীতে ঢুকিয়ে দিলাম। আমারও কাজের লোকের অভাব ছিল।

কোটিমণির পুরু ঠোঁটে গড়িয়ে পড়ল হাসি, সেই ঢেউ লাগা হাসিতে লাগাম কষে বলল, ভালই করেছো সাউয়ের পো। অমন লহরামাছের মত নরম মুখ দেখে শুধু তুমি কেন সবারই দয়া হবে। তা, তুমি তো যখন তখন ছেলে-মেয়ে কুড়িয়ে পাও। এবার পেলে আমায় একটা দিও। আমি পোষানী নেব গো! তোমার দাদা তো একটা চিলামগর—দশ বছরে তার শুধু ভুড়ি বাড়ল, সংসারে মাথা বাড়ল না!

সকালবেলায় ঠাট্টা-ইয়ার্কি নারাণ সাউয়ের কাছে হরিনামের মত প্রিয় বিষয়। ওদিকে সারণি জাল এসে ঠেকেছে ভেজা বালিতে, সে খেয়াল তার নেই। ভাগ্যিস পবন দেখেছিল—নাহলে গালি শুনত রাত জাগা মাঝিমাল্লাদের মুখে।

রোদ ওঠেনি। আকাশ মেঘলা বলেই থমথম করছে সমুদ্রধার। দূরের তালগাছগুলো রাত জাগা মানুষের মত ঘুম-ঘুম চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। আড়াআড়ি পোঁতা বাঁশের খুঁটিতে পেল্লাই দাঁড়িপাল্লা টাঙানো। তাতে ওজন হচ্ছে ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ। পবন একটা টেপামাছের ঢাউস পেটে নখ চালিয়ে চুপসে দিতেই নারাণ সাউ ধমকে উঠল তাকে, কি-রে, বাবুদের ছেলেগুলোর মত খেলতে বসলি বালি নিয়ে তাহলে কাজ করবি কখন! যা, ঝুড়িগুলো সব টেনে টেনে পাড়ের কাছে নিয়ে যা। ওখানে ট্রাকটা দাঁড়িয়ে আছে। খপখপ না নিয়ে গেলে মাছখটীর মুনিষগুলো সব হাত গুটিয়ে বসে থাকবে।

দু'ঝুড়ি রেখে এসে ঠিক তিন ঝুড়ি পৌঁছানোর সময় তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল মাছ বেপারী বাঁকার। সাইকেলটা কোনমতে স্ট্যাণ্ড করে একরকম ছোটার মত হেঁটে এল বাঁকা, পবনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে সে হৈ-চৈ করে বলল, আরে, পবনা না? কী কপাল আমার! তোর দেখা পেলাম! ওদিকে তোর ঘরের লোক কেঁদে কেটে হয়রান। তারা ধরে নিয়েছে—তুই আর বেঁচে নেই।

পবন গুটিয়ে যাওয়া শামুক। কেরিপাখির মতন ছোট হয়ে এসেছে তার মুখ। বাঁকাকে সকালবেলায় দেখে সেও যেন জাঁদরেল বাঘের মুখে পড়েছে। কথা আটকে গেল তার। মাছের ঝুড়িটা পায়ের কাছে নামিয়ে সে চুপসে যাওয়া সমুদ্রফেণার মত মুখ করে বলল, ঘরের সব ভাল তো? দাদু কেমন আছে বাঁকাদা? মা, বোন, পাড়া-পড়শী সব কেমন আছে গো।

অনেকদিন পরে গ্রামের একজনকে দেখে বাস্তবিক খুব আনন্দ পেল পবন, কথা বলতে বলতে কখন যে তার দু' চোখ লবণাক্ত জলে ভরে উঠেছে তা সে টের পায়নি; টের পেল নারাণ সাউয়ের হাঁক-ডাকে, কী রে ছোকরা, পীরিতের কথা বুঝি তোর আর ফুরাবে না। আয়, আয়। খপ্ খপ্ আয়, মাছ কি তোর বাপ বয়ে নিয়ে যাবে ঘাড়ে করে?

বাঁকা তাজ্জব, পবনের গর্বিত চোখ বালির মধ্যে ঢুকে গিয়ে কুঁচো কাঁকড়ার মত লুকিয়ে পড়তে চাইছে মান-সম্মান বাঁচাতে।

বাঁকা মাছ কিনল নারাণ সাউয়ের মাছখটী থেকে। ইশারায় সে পবনকে ডেকে নিয়ে গেল চা-দোকানে। বলল, ঘর চ, পবনা। নোনা জলে বিষ আছে, সে বিষ তোর সহ্য হবে না।

—কোন্ মুখ নিয়ে ঘর যাবো বলো? বাঁকার সামনে ভেঙ্গে পড়ল পবন। হাত ধরে ঝাউবনের কাছে টেনে নিয়ে গেল বাঁকা. পবনের ঝিমনো মনকে চাঙ্গা করার জন্য বলল, তোর কোনো ভয় নাই; কেউ তোকে কিছু বলবে না। হরিয়াকাকা ভাল হয়ে ঘর এসেছে—সে এখন আগের মত খাটা-খাটনী করতে পারে। তোর উপর রাগ থাকলেও তার কিছু করার ক্ষ্যামতা হবে না। দেশের দশ জন্ আছে—তারা তোকে সামলাবে।

তবু সাহস হচ্ছিল না পবনের, ধর্মাবাবুর মুখটা বারবার করে মনে পড়ছিল তার। কিন্তু ভয় পেয়ে সে আর কতদিন গর্তে ঢোকা সাপের মত শীতঘুম দেবে? বাড়ির বড় ছেলে সে। তার কর্তব্যের ডাল-পালা অনেকদূর অব্দি বিস্তৃত। সমুদ্রধারে তার পেটের ভাতের অভাব হবে না ঠিকই কিন্তু এখানে তার কোন শান্তি নেই।

বাঁকা বারবার করে একই কথা বলতেই পবন এক সময় রাজী হল। বাঁকার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, ঠিক আছে বাঁকাদা, আমি তোমার সাথে যাব। কিন্তু দিনের বেলায় হাটের উপর দিয়ে যাওয়ার আমার সাহস নেই, হাট সেরে আমরা সাঁঝের বেলায় ঘর ফিরব। তার আগে খটীবাবুকে সব বলা দরকার। অসময়ে সে আমাকে জায়গা দিয়েছিল, তার অনুমতি ভিন্ন আমি এক পাও নড়ব না।

নারাণ সাউ অন্য ধরনের মানুষ, শোনা মাত্রই ছাড়পত্র দিয়ে দিল সে। হাসতে হাসতে বলল, তোকে দেখে প্রথমেই আমার সন্দেহ জেগেছিল, অমন কচি মুখ কোনোদিন সাতঘাটের জল খেতে পারে না। যাক, ভালই হ'ল। ঘরের ছেলে এবার ঘরে ফিরে যা। তবে যদি কোনোদিন দরকার পড়ে আমার কাছে চলে আসিস। তোর জন্য আমার মাছখটী সব সময় খোলা থাকবে।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার সময় নারাণ সাউ বুকে জড়িয়ে ধরল পবনকে; আশীর্বাদ করে বলল, কলিযুগে সরল মানুষের দেখা পাওয়া ভার। সবাই হল গভীর জলের মাছ। তুই এখনও চুনো পুঁটিই থেকে গেলি। তোর ভাল হবে পবন। তুই এখন যা। এদিকে আসলে আমার এখানে আসিস।

শুধু লবণাক্ত পরিমণ্ডলে নয়, যে কোন পরিবেশেই বিদায় দৃশ্য হৃদয় বিদারক। কিন্তু অনন্যোপায় পবনের এছাড়া কিছু করারই ছিল না। মাছখটী ছেড়ে বাঁকার সাইকেলটা যখন ভিন গাঁয়ের ভেতর ঢুকে গেল তখনও পবন মুখ তুলতে পারেনি অনতিক্রম্য লজ্জায়।

বিড়ি ধরিয়ে খোঁচা মারল বাঁকা, তুই কি মেয়েমানুষ যে লাজ করিছস। মুখ তুলে হাঁট। তুই কোনো খারাপ কাজ করিস নি যে চোরের মতন হাঁটবি। মাছ কটা বেচে দিয়েই আমি ঘর যাব। বাঁকা টেরা চোখে তাকাল, পবনের তবু কোন পরিবর্তন নেই। তার মেঘের মত মুখ। চিন্তাক্লিষ্ট শোচনীয় হাবভাব। পবন যেন তার স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে ফেলেছে এ ক'দিনে। বাঁকা হাড়িসাইয়ের লোক তবু তার কাছেও পবনের খোঁড়ার পাহাড় ডিঙানো সংকোচ। বাঁকা চালাক চতুর যুবক। সাতঘাটের জল খেয়ে, দশটা হাট নেড়ে চেড়ে তার কথা-বার্তায় আলাদা একটা আকর্ষণ। পবনের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে জোর গলায় সে বলল, আমি সব শুনেছি, তুই যা করেছিস ভালই করেছিস। তোর জায়গায় আমি থাকলে, আমি হরিয়াকাকারে খুন করতাম। হারামীটা কী ভাবে নিজেকে? নবাব-বাহাদুর? শালার পেছনে নেই ছাল, কথায় ধানী লঙ্কার ঝাল। যেমন কুকুর তেমন মুগুর না হলে এযুগে চলবে না। আমরা যা পারিনি, তুই তা করে দেখিয়েছিস। তোর মেডেল পাওয়া উচিত।

নির্বোধ পবন খুশি হল বাঁকার কথায়, নীরবতা ভেঙে বলল, সে দাদুর বুকের উপর চড়ে বসেছিল। আর একটু হলে দাদুকে খতম করে দিত।

বাঁকার মাছ ভর্তি ঝুড়িটা সাইকেলের ক্যারিয়ারে রশা দিয়ে বাঁধা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুঁচো বরফ গলে জল ঝরে অনবরত৷ নোনামাছের পচন ক্ষমতা দ্রুত৷ দাম কম বলেই বিক্রি হয় আরও দ্রুত। এক ঝুড়ি মাছ সাবাড় হতে দুপুর গড়িয়ে ছায়া পড়ে পৃথিবীতে। বাঁকার পয়সায় সস্তার হোটেলে মাছ ভাত খায় পবন। রোদ ঝিমোতেই বাঁকা বলে, আর দেরী করা উচিত হবে না। ঘরে চাল-ডাল-তেল-নুন কিছু নাই। আমি ঘর ফিরলে হাঁড়ি চড়বে। তোর বৌদি কচি ছেলেটার মুখে কী যে দেবে কে জানে।

সাইকেলের পিছনে বসল পবন, বাঁকা অভ্যস্ত কায়দায় প্যাডেল ঘুরাচ্ছে বন্‌বন্‌।

পানিপারুল আসতেই সূর্য ডুবে যায়, অস্বচ্ছ দিবালোকে লত্তেমাছের মতন পরাজিত ক্লেদ-গ্লানিতে মাথা নুয়ে আসে পবনের। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চোরপালিয়ার বাজার ছাড়িয়ে তারা ছুঁয়ে দেবে আসল গন্তব্য।

চোরপালিয়া বাজারের আলো নজরে পড়তেই লাফ দিয়ে সাইকেলের পিছন থেকে নেমে পড়ল পবন। কাতর হয়ে বাঁকাকে বলল, তুমি যাও দাদা, আমি আর যাব না। গাঁয়ে যেতে আমার মন নাই। সেখানে কী মুখ নিয়ে যাব। আমি গেলে দাদুর আরও অশান্তি বাড়বে।

একগুঁয়ে বাকা প্রথমে সমব্যথীর চোখে তাকাল, তারপর ঝাঁঝাল স্বরে বলল, আদিখ্যেতা রাখ। যা বলছি তাই কর। তুই কি করোর বউ নিয়ে পালিয়েছিস যে পেলিয়ে পেলিয়ে বেড়াবি। মরদ তুই, মরদের মতন আমার সাথে চল। দেখি কে তোর কী করতে পারে।

—তা হয় না গো! তুমি যাও।

—তুই তাহলে যাবি নে?

—যাব। কিন্তু বাজারের পথ দিয়ে নয়। আমি বাঁশতলার ঘুরপথ দিয়ে যাব।

—যা ভাল বুঝিস কর। বাঁকা আর মানিয়ে নিতে পারছিল না। পবন যে বরাবরের বেয়াড়া একথা তার চেয়ে কে আর ভাল জানে। যেমন বাপ তার ছেলে তো তেমনই হবে। আমড়াগাছে কখনও আম হয় না। বাঁকা গজগজ করতে করতে সাইকেলটা কিছুদূর ঠেলে নিয়ে গিয়ে তারপর পিছন ফিরে চিৎকার করে বলল, আমি আগে আগে যাচ্ছি। তুই আয়। পাড়ায় গিয়ে দেখা হবে।

বাঁকা চলে যেতেই শূন্য চোখে ভয়ের বুদ্‌বুদ্‌গুলো ফেটে গেল সহসা, পবন ভ[illegible]য়ের মতন দাঁড়িয়ে থাকল ফাঁকা পথে। পিচ রাস্তার দু দিকেই ধান জমিন। তোলা ধানে জল দিচ্ছে শ্যালো মেসিন। খুব ভাল করে নজর ফেললে দু-একজন মানুষ দেখা যায়। বাঁ পাশের ক্ষেতগুলো ডিঙিয়ে গেলেই ভাগাড়! বুকটা ছ্যাং করে উঠল পবনের! একরাশ কালি এসে বিছিয়ে গেল মুখে। দূরে কোথাও ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল কুকুর। বাতাস সেই পিলে চমকান, মর্মভেদী ডাককে পৌঁছে দিল এক মাঠ থেকে আরেক মাঠে। অলস পদক্ষেপে পবন হেঁটে এল কৃষ্ণচূড়া গাছটার কাছাকাছি। পচা চামড়ার দুর্গন্ধ পেল সে। মনে পড়ল—আওলাদ মোড়লের কথা। নিজের ঘরে ফিরতে গিয়ে পবন পায়ে পায়ে জড়িয়ে ফেলছে পা। অপরাধীর মত মুখ করে তবু সে পাকা রাস্তা ছেড়ে নেমে গেল ঘুরপথে। বাঁশ বাগানের পথটায় মানুষজন এই সন্ধেবেলায় কম চলে। তাছাড়া, ঘুরঘুট্টি আঁধার। গায়ে গা ঠেকে গেলেও কারোর কিছু করার নেই।

হাড়িসাইয়ের চালাঘরগুলো ভরে ছিল অন্ধকারে। তেলের অভাবে কয়েকটা চালাঘরে বাতি জ্বলেনি। দিনের আলো ফুরোতেই খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে গিয়েছে ওরা।

তরলা বাঁশের ঝাড়টা পেরিয়ে পবন তাদের পুকুরপাড়ে গিয়ে দাঁড়াল। কাঠ ব্যাঙ ডাকছিল কটকট করে, বাতাসে বাঁশে-বাঁশে ঠোকঠুকি লেগে ভৌতিক সব আওয়াজ।

জল নড়ছিল ঘাটের। অন্ধকার এড়াতে হৈমবুড়ির মাথার উপর নারকেল তেলের কৌটোয় বানান ডিবরিটা। খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে হাঁটতে গিয়েও ধরা পাড়ে গেল পবন। ঢেলায় হোঁচট খেয়ে হুমড়ে পড়েছে সে। শব্দটা বিকট। মাটির ঢেলাটা পাড় থেকে গড়িয়ে পড়েছে জলে। ঝপাৎ! তারপর ঢেউ এবং ভয়ের চিৎকার, কে—কে? সুভদ্রার গলা কেঁপে উঠলো সন্ধ্যার বাতাসে। পবন ভেবেছিল দৌড়ে পালিয়ে যাবে কিন্তু লাভ কী তাতে? পালিয়ে যাবার জন্য ফিরে আসেনি এখানে। আর পালিয়ে যাবেটা কোথায়? ঠোটে ঠোট চেপে গাছের মত দাঁড়িয়ে থাকল পবন।

পুকুরের জলে ঢেউটা তখনও মেলায় নি। সুভদ্রার ভয়ার্ত চোখ আগের অবস্থায় ফেরেনি। ঘাট থেকেই সে চাপা গলায় বলল, দেখো তো মা, কে ঢিল ফেলল পুকুরে? কলার কাঁদিটা বিকেলে কেটে রাখলেই ভাল হোত। চোরের যা উৎপাত!

হৈমবুড়ির মাথার উপরে ডিবরি, দু পা আসতেই ধরা পড়ে গেল পবন। চোরের মত মুখ করে সে বলল, দিদি গো, আমি।

—তুই কেডা রে? হৈমবুড়ির মাথা থেকে পাকা ফলের মত খসে পড়ল ডিবরি, আনন্দে আত্মহারা হৈমবুড়ি চিৎকার করে ডাকল, বউ মা, বউ মা। হা দেখ, কে এসেছে?

—কে মা? ঘাট থেকে ধড়ফড়িয়ে উঠে এল সুভদ্রা। নিজের চোখকে যেন বিশ্বেস হয় না তার। ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠতেই গলা বুজে এল অভিমানে। ঠোট নড়ল ঘনঘন। চোখের পাতা ভিজে জড়িয়ে গেল চোখের জলে। নিঃশব্দে ডুকরে উঠে সে বলল, এসেছিস ভাল করেচিস বাপ। তোর দাদুর বড় শরীর খারাপ। মরা ছাগলের মান্‌সো খেয়ে সেই যে ছ্যারানী শুরু হল—আর ভাল হল না। দিনরাত খালি তোর চিন্তায় পাগল। চল বাপ, ঘরে চল। সে মানুষটা তোকে দেখলে জ্ঞান ফিরে পাবে আবার।

এ কয়দিনে ব্রজবুড়ার যা চেহারা হয়েছে তা অবর্ণনীয়। চোয়াল বসা মুখ, গলার কণ্ঠীহাড় জাগান। গালের চামড়া কুঁকড়ে গিয়ে ফাটা জমিন। চোখ ঢুকেছে গর্তে, হাড়গুলো জেগে উঠেছে—হারমোনিয়ামের রীডের মত। ল্যাংল্যাংয়ে পা-হাত। পবন গিয়ে ব্রজবুড়ার খড়খড়ে পায়ের ধুলো নিতেই, 'কে, কে' বলে দু' হাতে ভর দিয়ে জীর্ণ বিছানায় উঠে বসল সে। তারপর, নিভু দৃষ্টিতে পবনের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে অভিমানী গলায় বলল, তুই ফিরে এসেছিস, দাদু? আয়, আয়—আমার বুকে আয়! তুই না আসা পর্যন্ত আমার যে দু-চোখে ঘুম ছিল না। সবাই আমাকে দুষছিল। এখন আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

শীতল অশ্রু নয়, তরল কান্না গড়িয়ে পড়ল ব্রজবুড়ার চোখ ছুঁয়ে। পবনের হাত ধরে বলল, আর তোকে আমি যেতে দিব নাই। বুকের এই হাড় কটা দিয়ে তোরে আমি আটকে রাখব, দাদু। আমি তোর ছিমুতে এবার আরাম করে মরব।

—দেখ দেখি কথার ছিরি! হৈমবুড়ির ধমক খেয়ে ব্রজবুড়া আপন মনে হাসে, অনবরত চোখের ধারায় তার তোপড়ান গালটা পলিমাটির মতন উর্বরা হয়ে উঠছিল ক্রমশ।

মেনি ফেরেনি। ফেরেনি যাত্রা-পাগল সহদেবও।

সুভদ্রা পবনের হাতে মুড়ির বাটিটা দিয়ে বলল, খা বাপ, আমি পাতার জ্বালে ভাত চড়াই। আজ নোনামাছ এনেছি হাট থিকে—টক রেঁধে দিব।

মাছের টক পবনের অতি প্রিয় খাদ্য।

মুড়ির বাটিতে সে যখন জল ঢেলেছে, তখনই বাতাস বয়ে আনল উন্মাদ মানুষের সোরগোল। হৈমবুড়ি উৎকর্ণ হয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল।

ব্রজবুড়া বলল, কী হল রে, নকুলের মা?

—কিছু বুঝতে পারছিনে! দাঁড়াও, ভাল করে শুনতে দাও।

—তুই কালা, শুনবি কী করে?

হৈমবুড়ি কালা, তবু শুনল কথাগুলো। শুনেই আঁতকে উঠে বলল, হা দেখো, ধর্মাবাবু লোকজন নিয়ে আসছে পবনকে ধরতে। কী হবে গো...। ও পবনা,...পবনা রে-এ-এ। তুই পালা দাদু, তুই পালা। ওরা তোকে হাড়িসাইয়ে আর থাকতি দিবেনি। তুই যে জাতসাপের লেজে পা দিয়েছিস, ...কেনে দিলি দাদু রে-এ-এ!

জনা পঁচিশেক মারমুখী মানুষ ছুঁড়ে দেওয়া বর্শার গতিতে ছুটে আসছিল হাড়িসাইয়ে। পবন মুড়ির বাটিটা সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল গা ঝাড়া দিয়ে। সুভদ্রা তার হাত ধরে টানল, যা বাপ, ঘরের পিছু দিয়ে তুই ফের পালিয়ে যা। নাহলে ওরা তোকে আজ শেষ করে ফেলবে।

মায়ের হাতটা ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে দিল পবন, ফুঁসে উঠে বলল, যাব না। পালিয়ে গিয়ে কোন্ মানুষটা বাঁচে? ওদের আসতে দাও মা। মরতে আমি ভয় পাই না।

হৈমবুড়ি দাওয়া থেকে নেমে এসেছে উঠোনে। তার পাশে পবন।

দূরে মশাল জ্বালা আলো। সেই আলোয় পবন দেখল বাঁকা চারমিনার ফুঁকছে ধর্মাবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে। ধর্মাবাবু কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বলতেই মশাল হাতে পবনদের ঘরের দিকে ছুটে এল বাঁকা।

ঘেন্নায় বেঁকে-চুরে উঠল পবনের ঠোঁট। বাঁকা ছুটে এসে খপ করে চেপে ধরল পবনের হাতটা। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, পালাবার চেষ্টা করবিনে। তাহলে জানে মরবি।

—বেইমান! হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে রাগে-ক্ষোভে জ্বলে উঠল পবন, মুখ ভর্তি থুতু সে বাঁকার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, ছিঃ-ছিঃ, কাক হয়ে তুমি কাকের মান্‌সো খাচ্ছো! আর ক'দিন পরে নিজের ছেলেটাকেও খেয়ে নেবে। বাঁকাদা, তোমার এত ক্ষিদে?

পাঁচ

কথাটা সহ্য হল না বাঁকার, পবনের হাতটা মুচড়ে দিয়ে সক্রোধে [illegible] হারামজাদা, তুই ঘুঘু দেখেছিস, ফাঁদ দেখিসনি, আজ তোকে ফাঁদে লটকে মারব। রাড়ুয়ার ছেলের [illegible] তেজ আজ নিংড়াব। ভেবেছিস কী তোরা? ভেবেছিস হরিয়াকাকার বুঝি কেউ নেই!

ধস্তাধবস্তিতে ক্লান্ত পবন এক সময় হাল ছেড়ে দেওয়া চোখে তাকাল। ব্রজবুড়া কুঁই কুঁই স্বরে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করিছল ধর্মাবাবুকে। ধর্মাবাবু রাগে তিন হাত পিছিয়ে গিয়ে বলল, আগুন খেলে অঙ্গার উগ্‌লাতে হয়। এখন আমার পায়ের গোড়ায় কেঁদে-কেটে লাভ কি? তোমাদের কান্না আমি ঢের শুনেছি, আর শুনব না।

—বাবু, নাতিটারে ছেড়ে দাও, তার কোনো দোষ নাই গো। যত দোষ সব আমার। যা শাস্তি দেবার আমাকে দাও, মাথা পেতে নিব। ব্রজবুড়ার ব্যাকুল আকুতি-মিনতি কথার তোড়ে ভেসে গেল। পবনকে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে বেড়ার ধারে ফেলে দিয়েছে বাঁকা। একটা শুকনো ডালের মত অসহায়ভাবে পড়ে আছে পবন, তার রুগ্ন-ক্লান্ত দেহখানা পাকান দড়ির [illegible]ত মোড়া মারছে রাগে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে রাগের বিচিত্র ধ্বনি। ধর্মাবাবু হুঙ্কার দিয়ে বলল, ওঠা শালাকে। নিয়ে চল হাটখোলায়। বজ্জাতটাকে বটগাছে ঝুলিয়ে মারব।

এই ভয়ঙ্কর কথা হৈমবুড়ির কানে যেতেই আঁতকে ওঠে সে, ভয়ার্ত কান্না ঠেলে ওঠে তার বুক থেকে, ও গো, তোমাদের দুটো পায়ে ধরি গো...পবনটারে ছাড়ি দাও। সে এক গেলাস জলও খায়নি,

তাকে কেনে তোমরা ধরে নিয়ে যাচ্ছ গো। বলি, এদেশে কি বেচার নাই গো। এট্টা ছেলের উপর পুরা গাঁ হামলে পড়েছে, এ কেমন ধারা বেচার গো।

হৈমবুড়ি শিকারী মেছো চিলের গতিতে ছুটে গিয়ে শীর্ণ দু-হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল পবনকে। তাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল বাঁকা, সরে যাও। নাহলে তোমারও অবস্থা পবনার মত হবে।

—বাঁকারে, তুই কি মানুষ না পশু? চোখ থেকে আগুন ঝরে পড়ল হৈমবুড়ির। বাঁকা তাচ্ছিল্যে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ধর্মাবাবুর অপমান, পুরা গাঁয়ের অপমান। ধর্মাবাবু না থাকলে পুরা হাড়িসাই পচা ভাদোরে না খেয়ে শুকিয়ে মরত। বাবু ছিল বলে দাদন দিয়ে আমাদের বাঁচিয়েছে। যার নুন খেয়েছি তার হয়ে লাঠি ধরতে আমি পিছপা হব না।

—বাবু দাদন দেয়, ঠিক কথা। কিন্তু তার চড়া সুদ তো আমরা মিটায় দিই। ব্রজবুড়ার কণ্ঠনালী ধুকো বকের মত নড়ে উঠল।

—তোমরা হলে গিয়ে বেইমান, নাহলে বাবুর বিরুদ্ধে কথা বল কি করে? যে তোমাদের সময়ে-অসময়ে দেখে, দায়-অদায়ে পাশে দাঁড়ায়, তার বিরুদ্ধে কি করে তোমরা কু-গাও বুঝিনে! বাঁকার কথাগুলো গমগম করে হাড়িসাইয়ের ঘোলাটে বাতাসে। কপালে হাত দিয়ে গোবর লেপা উঠোনে বসে পড়ে ব্রজবুড়া। বাঁকার স্পর্ধিত কথাগুলো তালগোল পাকায় তার মনের ভেতর। ধর্মাবাবুর কীর্তি হাড়িসাইয়ের কে না জানে! জন-মজুরের দরকার হলে বাবুর লোক এসে হাড়িসাইয়ের লোকগুলোকে ধরে নিয়ে যায়। ন্যূনতম যা মজুরী দেয়, তাই হাত পেতে নিতে হয় বিনা প্রতিবাদে। পচা বর্ষায় যখন চাষ কাজ সারা—তখন তোলা ধান দাদন দেয় বাবু। তিন বস্তা ধান দাদন দিলে পাঁচ বস্তা ফেরৎ—না দিলে আর রক্ষে নেই। সব কিছুতেই বাবুর যে প্রচ্ছন্ন স্বার্থ জড়িয়ে তা কি বাঁকারা বুঝতে পারে না?

টপটপ করে ঘাম ঝরে পড়ে ব্রজবুড়ার কপাল থেকে। পবনকে খাড়া করে তুলে ধরেছে ষণ্ডামার্কা দু'জন। একজন মশাল ধরিয়ে ধর্মাবাবুকে শুধোয়, বাবু, এবার আসল কাজটা করে আসি। তার হিংস্র চোখ ব্রজবুড়ার খড়ের ঘরটার দিকে। ধর্মাবাবুর নির্দেশ পেলেই সে আগুন ধরিয়ে দেবে চালাঘরে। হাওয়া বইছিল শন্‌শন। সুভদ্রা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল খুঁটিবাঁশটা জড়িয়ে ধরে। হৈমবুড়ি ক্ষোভের সাথে বলল, কাঁদিস নে বউ, ওদের তুই শাপ দে। তোর শ্বশুর ঢিপায় ডাকাত পড়েছে।

কথাগুলো গায়ে মাখল না ধর্মাবাবু, কঠিন ঠোঁটে পশাবিক হাসির ঢেউ খেলিয়ে বলল, মশাল নিভিয়ে ফেল কার্তিক। সামনে ভোট। এখন আগুন ধরানো মানে নিজের ভাগ্যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া। আবেগে এসব কাজ হয় না। কাঁটা তুলতে হয় কাঁটা দিয়ে, তবে রয়ে-সয়ে।

কার্তিক নামের লোকটি মুড়ি মিয়ানোর মত মিইয়ে গিয়ে ধর্মাবাবুর চোখের দিকে ভেজা বেড়ালের চোখে তাকাল। কাল বিলম্ব না করে পুরো দলটা বেরিয়ে এল উঠোন থেকে। ওরা চলে যাবার পর গলা ফাড়িয়ে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল সুভদ্রা, হৈমবুড়ি কান্নার সুরে সুর মিলিয়ে উচ্চকণ্ঠে গাল দিল, গু খেগোর বেটারা, মর..তোরা সব মর। মুখে রক্ত উঠে মর।

হাড়িসাইয়ের শেষ ঘরটা যুগলবুড়ার। ওটা ঘর না হুমড়ে পড়া চালাঘর দূর থেকে তা বোঝা মুশকিল। তিন কুলে কেউ নেই যুগলবুড়ার, তবু হৈ-চৈ-এর শব্দ শুনে সে বাইরে এসে শুধোল, কী হয়েছে গো বাবুরা?

যুগলবুড়ার হাতে-পায়ে দীর্ঘদিনের কুষ্ঠ, ঘা মুখগুলো তার চেহারাটাকে হাড়িসাইয়ের লোকগুলোর থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এ পাড়ায় তাকে কেউ দেখার নেই, সে একা; ভিক্ষাবৃত্তিকে আঁকড়ে ধরে নিজে পেট পালছে কোনমতে। সন্ধেবেলায় তার ঘরে কোনোদিন আলো জ্বলে না, কেরোসিন কেনার

সামর্থ নেই বলেই—অন্ধকার তার বড় প্রিয়। সেই যুগলবুড়া যখন লাঠি ঠুকে তে-বেঁকা শরীরটা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, তখন তার ভূতের চেয়েও বীভৎস চেহারাটা দেখে ভয়ে থমকে দাঁড়াল দলটা।

ধর্মাবাবু আর বাঁকা সবার আগে। যুগলবুড়া তার পাগলের মত আঠায়ুক্ত চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে বলল, পেন্নাম হই বাবু। তা কী মনে করে গরীব-গুবরোদের পাড়ায়?

—পথ ছাড় যুগল, আমাদের যেতে দে। আমি দানসত্র খুলে বসিনি যে সব সময় হাত পাতবি।

ধর্মাবাবুর কথা শুনে ছাতা ধরা দাঁত দেখিয়ে খ্যা-খ্যা করে হেসে উঠল যুগলবুড়া। গলা কাঁপিয়ে বলল, আমি ভিখ চাইনে গো বাবু। আমি শুধু জানতে চাই—ব্রজর নাতিটা কী করেছে, কেনে তারে তোমরা গোরুচোরের মত ধরে নিয়ে যাচ্ছো?

—সে কৈফিয়ৎ কী তোকে দেব? —সহসা ধর্মবাবুর চোখে ঝরে পড়ল আগুনের ফুলকি, পথ ছাড় বলছি। আমাদের যেতে দে। হাটখোলায় বিচার ডেকেছি, সেখানে বিচার হবে পবনের।

—এইটুকু ছেলের বেচার, হাসালে বাবু! কলিকালে আর কত কী যে দেখব! যুগলবুড়া তার হাড়-সর্বস্ব বুকের ঘাম মুছে কেমন আশ্চর্যভরা চোখে তাকাল।

বাঁকা অধৈর্য হয়ে বলল, তুমি কী বলতে চাও, খোলসা করে বল তো! যুগলবুড়া তার বেঁকে কুঁকড়ে যাওয়া আঙ্গুলগুলো যথাসম্ভব টান টান করে ধমকে উঠল বাঁকাকে, তুই কে রে? তুই তো সেদিনের ছেলে! তোর নাক টিপলে এখনও ফোঁটা ফোঁটা দুধ বেরবে। আমি কেনে তোর কাছে জবাবদিহি করব? যা বলার বাবুকেই বলি। বাবু জ্ঞানমান, নেশ্চয়ই আমার কথা বুঝবে।

—তোর কথা শোনার আমার সময় নেই। ধর্মাবাবুর ঠোঁট শক্ত হয়ে উঠল, কপালে ভাঁজ ফেলে কটকটে চোখে তাকিয়ে থাকল যুগলবুড়ার দিকে। রাগে তার নিঃশ্বাস পড়ছে ঘনঘন। এসব উপেক্ষা করে লাঠি ঠুকে যুগলবুড়া মুখোমুখি দাঁড়াল ধর্মাবাবুর, তার কালো কুচকুচে শরীরটা ঘামে চকচক করছিল মশালের আলোয়। পবনকে পিঠমোড়া করে বেঁধেছে কার্তিক এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। মশালের আলোয় পবনের দুর্দশাগ্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে যুগলবুড়ার কপালের ভাঁজগুলো আরও গাঢ় হয়, সে লাঠিতে দেহের ভারটা সঁপে দিয়ে বলে, ধিক বাবু তুমাকে। অমনভাবে মানুষকে কেউ গোরু-ছাগলের মত বেঁধে নিয়ে যায়? কেনে, কী করেছে কী পবনা? সে কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছে?

—দিয়েছে তো! সে হরিয়ার মাথায় লাঠি ধরেছে: যে হাতে সে লাঠি ধরেছে—তার সেই হাত দুটো আমি ভেঙে দেব।

—তুমি তার হাত ভাঙার কে? রাগে থরথর করে কাঁপছে যুগলবুড়া, সব ঘা মুখগুলোয় যেন সমস্ত রক্ত এসে জড়ো হয়, চোখ-মুখ ঘোলাটে করে সে শুধোয়, বলি দেশে কী আইন-আদালত নেই? পবনা যদি দোষ করে থাকে—তাহলে তার বিচার করবে গাঁয়ের দশজনে। তোমার লেঠেলরা পবনার বিচার করার কে? হাড়িসাইয়ের মামলা হাড়িসাইয়ের মুরুব্বিরা মিটিয়ে নেবে। তুমি ওকে ছেড়ে দাও বাবু। আমি বেঁচে থাকতে এমনটা হতে দিবনি।

—কী করবি তুই?

—করার তো অনেক কিছুই ছিল কিন্তু গায়ে আমার অসুক ফুটেছে। বয়সও হয়েছে। নাহলে একাই আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়ে দিতাম। এখন হাড়িসাইয়ে যারা থাকে—তারা তো এক-একটা ভেড়া। নাহলে খাল কেটে কেউ কুমীর ঢোকায়...। গর্দভগুলার জ্ঞান যে কবে হবে—তা আমি জানি না।

অন্ধকারে ঝিঁঝির ডাক বয়ে আনছিল মাঠপালান হাওয়া। হাওয়ায় কেঁপে যাচ্ছিল কেরোসিন তেলে ভেজান নেকড়ার আগুন। নেকড়া পোড়ার দুর্গন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল হাওয়ার তীব্রতায়। এমন প্রতিরোধ ধর্মাবাবুর কাছে অপ্রত্যাশিত। যে মানুষটা ঘা সর্বস্ব শরীর নিয়ে ঠিকমত হাঁটতে পারে না, হঠাৎ-ই তার কাছ থেকে এমন প্রতিবাদ আছড়ে পড়বে—এটা স্বপ্নেও ভাবেনি ধর্মাবাবু। ভ্যাবাচেখা

খেয়ে সে যে কী করবে হঠাৎ-ই বুঝে উঠতে পারে না। তার চোখ দুটো দপদপ করে রাগে; হাতের তেলো, শরীরের সবখানে জড়িয়ে যায় ঘাম। যুগলবুড়াকে সে যে কী উত্তর দেবে তা আর মাথার ভেতর কিছুতেই আসে না।

যুগলবুড়া মালকোঁচা দিয়ে খাটো ধুতিটা পরে নিয়ে বাঁকাকে বলল, তোর শরম লাগে নি রে হতভাগা! তোর বাপ প্রফুল্লকে এই ধর্মাবাবুর বাপ মিছিমিছি চোর সাজিয়ে জামগাছে ঝুলিয়ে মেরেছিল। হাড়িসাইয়ের সবাই জানত প্রফুল্ল নির্দোষ। কিন্তু জানলে কী হবে, সেদিন বাবুদের তাগদের কাছে আমরা পেরে উঠিনি। প্রফুল্ল মার খেয়ে সাতদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি। যখন ভাল হলো—তখন তার আর খাটার ক্ষমতা নেই। বাবুদের লেঠেল তার জন্মের মত পেট মারল। আমি দেখেছি বাপ—সে আমাদের চোখের ছিমুতে না খেতে পেয়ে মরেছে। যারা তোর বাপকে মেরেছে—আজ তুই তাদের হয়ে লাঠি ধরেছিস—তোর কি ডুবে মরতে জল জোটে না বাপ। তোর গায়ে কী রক্ত না পুঁজ—আমি ঠিক বুঝি না রে! আগে ভাবতাম—কুঠ্ বুঝি আমার একার হয়েছে, এখন দেখছি—কুঠ্ আমার একার গায়ে ফোটেনি, কুঠ্ তোদেরও ধরেছে। কুঠ্ পুরা হাড়িসাইয়ে। এসব দেখার আগে আমার যদি চোখের আলো নিভে যেত—তাহলে বড় সুখ হোত রে! তাহলে তোদের মত কুলাঙ্গারদের মুখ আমাকে আর দেখতে হোত না।

বাঁকা গরগর করছিল রাগে, যুগলবুড়ার কথাগুলো তার মন থেকে কচুপাতার জলের মত পিছলে গেল। সে গলা চড়িয়ে বলল, চুপ যাও। বেশি বললে তুমার গলায় আমি বাঁশ চেপে ধরব। আমার সামনে বাবুরে তুমি মুখ করো—তোমার সাহস তো কম নয়। জান, বাবু না থাকলে এ হাড়িসাইয়ের একটা প্রাণীও বাঁচত না।

—জানি রে বাপ, জানি। বাতাসে আমার চুল পাকেনি। এই বাবুই আমাকে হাড়িসাই থেকে খেদিয়ে দিয়েছিল গায়ে কুঠ্ ফোটার পর। দুলুবাবু না থাকলে—এই বাবুই আমার দু'কাঠা ভিটে বাড়িও হাতিয়ে নিত। এই বাবুই আমাকে পথের ভিকিরি করত। বাবুর দানের কথা আমি কী করে ভুলব! আমি তো তোর মতন গায়ে শুয়ারের পুরু চামড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াই না! গায়ে আমার কুঠ্ ফুটেছে ঠিকই কিন্তু এখনও মানুষের চামড়াটুকু হারায়নি। তুই যে এই কঁচা বয়সে সব খুইয়ে বসলি বাপরে, তোর জন্য আমার কষ্ট হয়।

—তোমার অমন কথায় আমি থুতু ফেলি।— বাঁকার চোখ নিরেট পাথর হয়ে উঠল নিমেষে, সে ছুটে গিয়ে পাকমোড়া দিয়ে লাঠিটা কেড়ে নিল যুগলবুড়ার। তারপর লজ্জা ঘেন্নার মাথা খেয়ে তার বুকের উপর চড়ে বসে বলল, সেই তখন থেকে তোমার বড় লম্বা-চওড়া কথা শুনছি। আর নয়। এবার তোমাকে শেষ করেই আমি হাটখোলায় যাব। শালা বুড়া, বুড়াভাম, আইন দেখাচ্ছে। দাঁড়া দেখাচ্ছি তোর আইন।

বাঁকা হয়ত যুগলবুড়াকে মেরেই ফেলত যদি না যমুনা এসে ঠেকাত তাকে। যমুনাই যুগলবুড়ার হাত ধরে বেড়ার ধারে টেনে নিয়ে গেল। বলল, খুড়া গো, ঐ পশুটার সাথে তুমি কেনে লড়তে গিয়েছ? সে আর মানুষ নেই! বাবুর পয়সায় তাড়ি গিলে সে একটা অমানুষ হয়ে গিয়েছে। নাহলে সে ঠিক তোমাকে চিনতে পারত।

মানুষের পায়ের শব্দ হারিয়ে যেতে বেশি সময় লাগে না। বাঁকা যুগলবুড়ার লাঠিটা ছুঁড়ে দিয়েছিল দূরে। যমুনা লাঠিটা কুড়িয়ে এনে যুগলবুড়ার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, ঘর চল খুড়া। পথে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলে কী হবে? এ দেশে বেচার নাই গো। বেচার থাকলে বিনা মেঘে চড়কা পড়ে মরত।

অন্ধকারে যুগলবুড়োর ঘোলাটে চোখ থেকে অনবরত জল ঝরছিল, ধস্তাধস্তিতে ঘা মুখ থেকে রক্ত চুঁইয়ে জড়িয়ে গিয়েছে আঙুলের খাঁজে খাঁজে। তবু নিজের জন্য তার কোন কষ্ট নেই, তার যত

কষ্ট পবনকে ঘিরে। ছেলেটা সময়ে-অসময়ে তার খোঁজ নিয়ে যায়, জ্বর-জ্বালা হলে ওষুধ এনে দেয় ডাক্তারের কাছ থেকে। মোহৎসব বা ভোজবাড়ির খবর পেলে পবন নিজে এসেই ডেকে নিয়ে যায় বুড়োটাকে। তার বিপদের সময় হাত-পা গুটিয়ে বসে কী করে ঠুঁটো জগন্নাথের মত সে থাকবে! শত চেষ্টা করেও পবনকে সে উদ্ধার করতে পারল না। বৃদ্ধ জটায়ুর মত যুগলবুড়ার অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে চোখে-মুখে। এই দুঃসময়ে যমুনা যদি না আসত তাহলে বাঁকা তার প্রাণবায়ু বের করে ছাড়ত। ধর্মাবাবুর মনের ইচ্ছেও সেই রকম ছিল।

হাতে-পায়ের ধুলো ঝেড়ে লাঠিটা আঁকড়ে ধরে যুগলবুড়া যমুনার দিকে ব্যথা ভরা চোখে তাকাল, তখনও তার ভেতরে অস্থির কাঁপুনিটা পুরোপুরি মেলায়নি। যমুনা সমব্যথীর স্বরে বলল, খুড়া গো, যা হয়েছে তা ভুলে যাও। তুমি রুগী মানুষ। সবাই তোমাকে ঘেন্না করে, কথা বলে না। তবু তুমি যা হাড়িসাইয়ের জন্য করলে, এমনটা কেউ করে না।

—কী আর করেছি মা, আমার ক্ষমতাইবা কতটুকু? ওরা চলে গেল, কেউ আমার কথা শুনল না। এখন পবনটার যে কী হবে—তাই আমি ভাবছি।

—তুমি ভেব না খুড়া। তাকে দেখবার জন্য ভগমান আছে। সে ঠিক পবনারে বাঁচাবে।

—আমি ঠিক ভরসা পাইনে। যুগলবুড়ার বয়স্ক কপালের রেখাগুলো ঘামজলে স্পষ্ট হয়ে উঠল আরও, বিষণ্ণ গলায় সে বলল, এ গাঁয়ে দুলুবাবু ছাড়া আমি আর কাউকে মানুষ বলে ভাবি নে। তুই একবার কষ্ট করে যা মা, খবরটা তার কানে তুলে আয়। যদি পারে তো সেই-ই পবনাকে বাঁচাবে। আমি জানি ধর্মাবাবু দুলুবাবুকে যমের মত ভয় করে। সে তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না।

দেরী করে না যমুনা। ঘরে তার কাঁচা খোকা শুয়ে। ফাড়ান বাঁশের দরজাটায় শেকল তুলে হাওয়ার গতিতে সে পেরিয়ে আসে হাড়িসাই। হাটখোলার পথ ধরে নয়, সে যায় সিধা পথে। আঁধার রাত তবু টিপটিপ করে জোনাক জ্বলে। রাতপোকার ডাকে অস্থির জগত। হাড়িসাইয়ের ঘরে ঘরে জোনাক পোকার মত ক্ষীণ আলো। কিছুটা আসার পর যমুনার সাথে দেখা হয় সুভদ্রার। চোখাচোখি হয়, কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে পারে না। যমুনা আন্দাজে সুধায়, কে, কাকি নাকি?

গলার স্বরটা চিনতে পেবে কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে সুভদ্রা, যমুনারে, আমরা তো তোদের কোনো ক্ষতি করিনি—তবু কেন বাঁকা পবনারে ধরে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে যমুনা বলল, কেঁদো না কাকি। আমি তার জন্য পায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছি। এই আঁধারে তুমি কোথায় যাচ্ছো?

সুভদ্রা আঁচলের খুঁটে চোখটা মুছে নিয়ে বলল, দুলুবাবুর ঘর। এ সময়ে সে ছাড়া আর কেউ বাঁচানোর নেই রে!

ধর্মাবাবুর দলবল হাটখোলার বটতলায় পবনকে নিয়ে মজা লুটবার খেলায় মেতেছিল যা অমানবিক, পৈশাচিক। পুরো গাঁ খবরটা জেনেছে তবু সাহস করে এগিয়ে এসে ধর্মাবাবুর মুখের উপর কেউ কথা বলেনি। পবন মনে মনে প্রস্তুত চরম লাঞ্ছনা আর গঞ্জনাকে হজম করার জন্য। আসার সময় ব্রজবুড়ার করুণ আর্তি মাখান চাহুনি পবনের চোখে-মুখে বিষাদের সীমারেখা টেনে দিয়েছে—যা সে শত চেষ্টা করেও অতিক্রম করতে পারছে না। এই বয়সে এত ধকল সইবার ক্ষমতা বুড়োটার কোথায়? বাঁকার চড়-থাপ্পড়ে তার পুরো মুখটা লাল, সেই রক্তাভ মুখের উপর ফুটে উঠেছিল ছোপ-ছোপ অপমানের কালি। এই কালি সহজে যে মুছবার নয়।

পবনের হাতের দড়ি খুলে দিয়েছে কার্তিক। বাঁকা এখন আর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে না। যুগলবুড়ার বুকের উপর চড়ে বসে সে যে খুব একটা বাহাদুরির কাজ করেনি—তা তার চোখ মুখ দেখলে বোঝা

যায়। যুগলবুড়ার কথাগুলো সেই সময় উপেক্ষা করে গেলেও সেই মারাত্মক কথাগুলো তার বুকে এখনও গেঁথে আছে। পুরনো ঘা সহজে শুকায় না। যুগলবুড়া তার ঘা ভর্তি হাত দিয়ে খুঁচিয়ে দিয়েছে বাঁকার কলজে। বাঁকার মনের ভেতর আত্মদহন আর অনুশোচনার আগুন। সে আর পবনের দিকে তাকাতে পারছে না আগের মত, নিজেকে অপরাধী ভাবছে আজকের এই নক্কারজনক ঘটনার জন্য। পবন গাঁয়ে ফিরতে চায়নি, বাঁকাই তাকে জোর করে টেনে আনল। কাজটা সে কী ঠিক করেছে? এই প্রশ্ন বারংবার ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল বাঁকাকে।

ধর্মাবাবু যখন আদেশ করল পবনকে দড়ি বেঁধে বটগাছের ডালে ঝুলিয়ে দিতে, তখন বাঁকা মিনমিনে স্বরে আপত্তি করেছিল কথাটার। ধর্মাবাবু সতর্ক চোখ তুলে তাকিয়েছিল, বাঁকার এই নরমপন্থী মনোভাব পছন্দ হয়নি তার।

বাঁকা যুক্তি খাড়া করেছিল, বাবু, লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়ে যায় তাহলে। তাছাড়া, পবনা দিনভর খায়নি। দম আটকে মবে গেলে আমরা সবাই ফাঁসব।

কথাটা নেহাৎ মন্দ বলেনি বাঁকা, ধর্মাবাবু বাঁকার সতর্কিত কথা শুনে পবনের দিকে তাকিয়েছিল। ভয়ে ছোট হয়ে এসেছিল চোখ। বুদ্ধিমান মানুষ বিতর্কিত পথে হাঁটে না। ধর্মাবাবু তার মোটা গোঁফে তা দিয়ে বলেছিল, কেউটে সাপের ছায়ের যে বিষ কম হবে এমন ভাবা বোকামি। যার দাঁত আছে, তার বিষ আছে। যার বিষ আছে; তার বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া উচিত, নাহলে আবার সুযোগ পেলে ছোবলাবে।

কার্তিক কী বুঝে এগিয়ে এল সমানে, হাত কচলে বলল, বাবু, ওরে মারধোর না করে দশ হাত নাকখৎ দিলে চরম সাজা হবে। নাকের চামড়া ছড়ে রি-রি করলে তখন বাছাধন টের পাবে কত ধানে কত চাল।

যুক্তিটা মনে ধরে যায় ধর্মাবাবুর। গলা ফাড়িয়ে সে বলে, হারামীর বাচ্চা, দাঁড়িয়ে কেন? যা, নাকখৎ দে। শুধুমুধু আমি তোকে ছাড়ব না, বড় বাড় বেড়েছে তোদের। রস নিংড়ে ছেড়ে দেব।

পবন নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকল। ধর্মাবাবু চারমিনার ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, যা। কথা বুঝি কানে ঢোকেনি! দেরী করলে তোকে আমি লেংটো করে ছাড়ব। দেখি কোন্ বাপ তোকে বাঁচায়।

পবন অসহায় চোখে চারপাশে তাকাল। হ্যারিকেন লাইটের আলোয় বটতলায় জ্যোৎস্না রাতের আমেজ। সবাই নড়ে চড়ে উঠেছে পবনের শাস্তি দেখার জন্য। বাঁকা এগিয়ে এল সামনে, দুই পুকুরের শোলের ভূমিকায় সে এখন। কেমন আপোসী স্বরে বলল, যা না পবন, বাবু যা বলে তা কর। দশ হাত নাকখৎ দেওয়া দশ মিনিটেরও কাজ নয়। তুই যা অপরাধ করেছিস—তোর গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিলেও বাবুর রাগ পড়ত না। স্রেফ ভাগ্যের জোরে আজ তুই বেঁচে গেলি। বাবুর দয়ার শরীল। গোঁয়ার-তুমি করে তার মাথায় আর রক্ত চড়িয়ে দিস না।

বাঁকার কথাগুলো কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটে হয়ে জ্বলে ওঠে পবনের মনের ভেতর। হাতের মুঠি পাকিয়ে সে সভার দিকে তাকায়। সহদেবের কথা মনে পড়ে। তার দৃঢ় বিশ্বাস—বাবা থাকলে এমনটা তার হোত না। বাবা নিশ্চয়ই এই বিপদের দিনে তার পাশে এসে দাঁড়াত।

বাঁকা আবার ফড়ে গলায় বলল, কী রে, যা। বাবু যা বলে তা মেনে নে। জলে বাস করে কুমীরের সাথে লড়াই কি ভাল দেখায়? তুই আমার পাড়ার ছেলে। বাবুকে আমি অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজি করেছি। দোহাই তোকে—বাবুকে আর বিগড়ে দিস না—তাতে ফল আরও খারাপ হবে।

—হতে দাও খারাপ। জান থাকতে নাকখৎ আমি দেব না।

—দিবি না তাহলে? গম্‌গমিয়ে উঠল ধর্মাবাবুর গলার স্বর।

পবন মরিয়া হয়ে বলল, না দেব না।

কথা শেষ হল না, তার আগেই ধর্মাবাবুর পুরুষ্টো হাতের থাপ্পড়ে ডানে-বাঁয়ে হেলে গেল পবনের মাথা। চোখে আঁধার দেখতেই গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল সে। ধর্মাবাবু থাপ্পড় মেরেও খুশী নয়; কার্তিককে বলল, বাঁধ শালাকে। বেঁধে গাছের উপর ঝুলিয়ে দে। কত ডাকাত আমি শায়েস্তা করে ছাড়লাম—এ হারামজাদা তো সেদিনের ছেলে।

মনের মত একটা কাজ পেয়ে কার্তিক এগিয়ে আসছিল উৎসাহে, কিন্তু দুলুবাবু ভিড় ঠেলে চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় এগিয়ে আসতেই তার আত্মারাম ভয়ে শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেল। ধর্মাবাবু তর্জনী উঁচিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলল, থামলি কেন, যা! হিসাব টাটকা-টাটকা মিটিয়ে নে। আমি কারো চোখ রাঙানীকে পাত্তা দিই না। কার্তিকের পা কাঁপছিল ভয়ে, সে নিরীহ গলায় বলল, দুলুবাবু যে নিষেধ করছে!

—দুলুবাবু কে? আমি তোকে যা বলছি—তাই শোন।

ধর্মাবাবুর কথা পানসে হয়ে গেল সভার মাঝে। বেগতিক দেখে অন্ধকারে সটকে পড়েছে বাঁকা। ইজ্জোত মাটিতে মেশার আগে ধর্মাবাবু ফুঁসে উঠে বলল, তুমি কে আমার কাজে বাধা দেবার? সব ব্যাপারে তুমি নাক গলাও কেন? যেমন এসেছ, তেমন চলে যাও। নাহলে এর ফল কিন্তু ভাল হবে না। আমি সব সইতে পারি কিন্তু কারোর খবরদারি সহ্য করতে পারি না।

দুলুবাবু প্রতিক্রিয়াহীন চোখে তাকালেন, শান্ত অথচ ভাবগম্ভীর গলায় বললেন, একটা পাগলের সাথে কথা বলার আমি কোন আগ্রহবোধ করি না। ধর্ম, তুই ক্ষমতার লোভে পাগল হয়েছিস, তোর এই অধঃপতন আমাকে খুব কষ্ট দেয়। গ্রামের মাথা হওয়া মুখের কথা নয়, যার নিজের মাথার ঠিক নেই—সে অন্যের ব্যাপারে নাক গলালে তার নিজের নাকটাই কাটা যায়। আমি তোকে সাবধান করতে এসেছি। এখন থেকে সাবধান না হলে তুই মরবি। তোর অপরাধ তোকে একদিন পাগল করে দেবে।

—আমাকে জ্ঞান দেবার তুমি কে? তোমার জ্ঞান তোমার ঝোলায় ভরে রাখ।

—সে আমি রাখছি। কিন্তু পবনকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। তোর ক্ষমতা থাকলে বাধা দে। দুলুবাবুর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা, ওঠ পবন। চল। দেখি, কে তোর গায়ে হাত তোলে। যে তোর গায়ে হাত তুলবে—আমি তার হাত দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে দেব।

কার্তিক অসহায় চোখে ধর্মাবাবুর দিকে তাকাল। ধর্মাবাবু গলগল করে ঘামছে, চোখের পাতা না পড়ার নীরবতা। হ্যারিকেন লাইটের জ্যোতি কমে পুরো বটতলা ভরে উঠছে অন্ধকারে।

দুলুবাবু সময় ব্যয় না করে বীরের মত এগিয়ে গেলেন, পবনের হাত ধরে বললেন, চ। এই ভেড়ার দলে তোকে মানায় না পবন। আমি তোর সব কথা শুনেছি। তোকে মালা পরিয়ে পুরো গ্রাম ঘোরানো উচিত। বুড়োরা যা পারেনি তুই তা করেছিস। ধর্মর অহঙ্কারে তুই লাঠি মেরেছিস। এবার মূর্খটা শুধরাবে নিশ্চয়ই নিজেকে।

জনা পঁচিশেক লোক হাপুস নয়নে চেয়ে থাকল দুলুবাবুর দিকে, তাদের মরা দৃষ্টিতে কোন প্রতিবাদের ভাষা নেই। দুলুবাবু এলেন, জয় করলেন—এমন উদ্ধত ভঙ্গিতে পবনকে নিয়ে চলে গেলেন, ধর্মাবাবু সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। ওরা দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার পর ধর্মাবাবু গজগজিয়ে বললেন, আমি ওদের ছাড়ব না কার্তিক। আমি ভাতে বিষ দেব না, বিষ দিতে হলে আমি মুখেই দেব। বাঘের মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে নিয়ে জংগলে বুক ফুলিয়ে ঘুরবে—এমন জানোয়ার এ অঞ্চলে নেই। আমি এর বদলা নেবই নেব।

বিচার সভা ভেঙে গেল। হাটখোলা ফাঁকা। রাত বাড়ছিল। খিদেয় নাড়ি-ভুঁড়ি চটকাচ্ছিল পবনের। কিছুটা হেঁটে আসার পর দুলুবাবু বললেন, চল পবন, তোকে দুটো মিষ্টি খাওয়াই। সারাদিন তোর নিশ্চয়ই কিছু খাওয়া হয়নি।

পবনের উত্তর দেওয়ার কোন ক্ষমতা ছিল না, দুলুবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভিজে উঠছিল তার চোখের পাতা। যদিও তার অভিজ্ঞতা কম, বয়সে নবীন তবু তার মানুষ চিনতে ভুল হয়নি। দুলুবাবুকে এ গ্রামের

সবাই মান্য করে তার নিরপেক্ষ উদার সহনশীল পরোপকারী মনোভাবের জন্য। হাড়িসাইয়ের অনেকেই তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। বন্যার সময় দুলুবাবু ঘরে ঘরে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়েছেন, নিজস্ব উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন। তার কাছে উচ্চ-নীচ, আপন পর নেই।

দুলুবাবুর নির্দেশে দুটো জিলিপিই দিয়েছে ময়রা দোকানী। পবন শালপাতার ঠোঙাটা ধরে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ময়রা দোকানীর দিকে। এই মানুষটিকে পবন আসা-যাওয়ার পথে প্রায়ই দেখে, তার ছোট্ট কাচের আলমারীতে মিহিদানা, মোচড়ামিঠাই সব সাজান থাকে—যা পবনকে লোভী করে তোলে অনেক সময়। মেনি প্রায় বলে—দাদারে, আমাদের যদি অমনধারা এট্টা মেঠাই দোকান থাকত—তাহলে যখন মন হোত তখনই মেঠাই খেতে পারতাম। পবন মেনিকে নিরুৎসাহ করেনি। সে বলেছে আর একটু বড় হই, তারপর চাকরি করলে তোরে আমি পেট ভরে মেঠাই খাওয়াব। মেনির দু-চোখে আশার বীজ বপন করে পবন সেদিনের মত নিষ্কৃতি পেলেও মনের দিক থেকে সে যেন বাঁধা পড়ে আছে অমন প্রতিশ্রুতির জন্য। সে জানে—লেখা-পড়া না শিখলে কোন দিন চাকরি পাওয়া যায় না। তার জ্যাঠা চাকরি করে—এটা তাদের সংসারে রীতিমতন গর্বের কথা। নকুলকে নিয়ে ব্রজবুড়ার গর্বের শেষ নেই অথচ একটা পোষ্ট কার্ড লিখেও এখন আর খোঁজ-খবর নেবার সময় পায় না নকুল।

শালপাতার ঠোঙা ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল পবন। আজ সে যে মিষ্টি ভর্তি শালপাতা ধরে দাঁড়িয়ে আছে—একদিন বাবুদের ফেলে দেওয়া এঁটো শালপাতা মেনি চেটে-পুটে খাচ্ছিল ময়রার দোকানের পিছনে দাঁড়িয়ে। পবন নিজের চোখে দেখছে—মেনি কত তৃপ্তি সহকারে তার ছোট্ট লাল জিভ দিয়ে চেটে খাচ্ছিল রসলাগা এঁটো শালপাতাটা। এমন সুখের দৃশ্য পবনের কেন যে পছন্দ হয়নি—তা সে নিজেও জানে না। ছুটে গিয়ে শালপাতাটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল দূরে। তাবপর মেনি-র অবোধ নিরীহ গালে একটা থাপ্পড় সজোরে কষিয়ে দিয়ে বলেছিল, লোভা, লোভা কোথাকার! দাঁড়া বাবা আসুক—আমি সব বলব।

পবন যে বাবার কাছে কী অভিযোগ করবে সেদিন মেনির তা বোঝার ক্ষমতা ছিল না, সে মার খেয়ে ভ্যা-ভ্যা করে কেঁদে উঠে কেমন অবিশ্বাসী চোখে পবনকে দেখছিল। বাবুদের ফেলে দেওয়া রসলাগা এঁটো শালপাতা হাড়িসাইয়ের ছেলে-মেয়েরা কুড়িয়ে খায় এ ঘটনা মেনি অনেকবার দেখেছে। সবাই খায়, সে খেলে কেন দোষের হবে—মেনি তার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারছিল না কিছুতে।

কড়কড়ে জিলিপিতে কামড় দিয়ে পবন চোখের জলকে কোনমতে আটকে রাখতে পারল না। যে হাত দিয়ে মেনিকে সে চড় মেরেছিল সেদিন—সেই হাত দিয়ে জিলিপি খেতে গিয়ে সে টেব পেল তার হাত দুটো বেজায় কাঁপছে। হাতের কাঁপুনিটা ছড়িয়ে পড়ছে ঠোঁটে। পবন কিছুতেই খেতে পারছিল না।

দুলুবাবু অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে সব দেখলেন। অত্যন্ত আপনজনের মত বললেন, খেয়ে নে পবন। খেয়ে-দেয়ে তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। তোর মা আমাদের ঘরে বসে আছে। সে তোকে নিয়ে যাবে।

মা কেন দুলুবাবুদের ঘরে গিয়েছে—এ প্রশ্নের উত্তর পবন তার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে খুঁজে পেল না। তবে কি মা তার বিপদের কথা ভেবে দুলুবাবুর ঘরে ছুটে গিয়েছিল? মা কি জানত দুলুবাবুই একমাত্র মানুষ—যে তাকে এই বিপদের দিনে বাঁচাতে পারে। মার দূরদর্শিতার কথা ভেবে ক' মুহূর্ত পবনের মুখে কোন কথা সরল না। সে চটপট মিষ্টি আর জিলিপি দুটো খেয়ে নিয়ে দুলুবাবুর পিছন পিছন হাঁটতে থাকল।

হাটখোলা ছাড়িয়ে পিচ রাস্তার পাশেই দুলুবাবুদের বিশাল মাটির দোতলা ঘর। ঘরের সামনে উঁচু বেড়া, বেড়ার ভেতর বাগান, পুকুর, তুলসী মঞ্চ। টিনের ছাউনি দেওয়া ঘর এ গ্রামে কটা আছে হাতে

গোনা যায়। দুলুবাবুর বাবা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। আজীবন পরহিতে তার যৌবন-বার্ধক্য কেটেছে। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন সচল, কর্মক্ষম। ছেলেকে তিনি সৎগুণ ছাড়া আর বিশেষ কিছু দিয়ে যেতে পারেন নি।

পিচ রাস্তার একপাশ ধরে হাঁটছিল পবন, অপরিষ্কার চাঁদের আলো এসে পৃথিবীর আলো ছুঁয়েছে। সামনে অনন্ত বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ। এই মাঠ পেরিয়ে ভাগাড়ে যেতে হয় পবনকে।

যাওয়া আসার পথে টিনের বিশাল ঘরটাকে পবন কেন এ গ্রামের অনেকেই সম্ভ্রমের চোখে দেখে। এতবার দেখেছে তবু কোনদিন সাহস করে আগড় সরিয়ে উঠোনে পা দেবার সাহস হয়নি পবনের। মোহৎসব বা পুজা-পার্বনের কথা আলদা। তখন পুরো হাড়িসাই দুলুবাবুর উঠোনে এসে জড়ো হয়। দুলুবাবু কাউকে প্রসাদ না খাইয়ে ফেরান না, তার মত হল—দরিদ্র সেবাই প্রকৃত ভগবানের সেবা।

এই দীর্ঘদেহী মানুষটাকে পবন যেমন ভক্তি করে ভয়ও কম করে না। তার কণ্ঠস্বরে বলিষ্ঠতা থাকলেও স্নেহ-মায়া-মমতার কোন অভাব নেই। হাঁটতে-হাঁটতে থমকে দাঁড়ালেন দুলুবাবু। পবনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, হরিয়ার গায়ে হাত তুলে তুই ভাল কাজ করিসনি।

পবনের বুকের ভেতরটা ধকাস করে উঠল, ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে সে কিছুই উত্তর করতে পারল না। দুলুবাবু কথার জের টেনে বললেন, আমি সব শুনেছি। তুই লাঠি না ধরলে হরিয়া হয়ত সেদিন ব্রজবুড়াকে মেরে ফেলত। কথাগুলো বলেই চুপ করে গেলেন দুলুবাবু। পবন তার বুদ্ধিদীপ্ত গম্ভীর চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না। তার কেমন ভয় করছিল, কথা বলার সামান্য ক্ষমতাটুকু সে হারিয়ে ফেলছিল।

পথ ছোট হয়ে আসছিল কথায়-কথায়। দুলুবাবু আগড় খুলে বললেন, পড়াশুনা না করে তুই ভুল করেছিস। তোদের পড়াশুনো করার জন্য সরকার থেকে অনেকরকম সাহায্য দেওয়া হয়। আমি সহদেবকে সব বলেছিলাম। সে আমার কথাটা রাখল না।

—এত অভাব থাকলে পড়াশুনা হয় না বাবু। পবনের কাঁপা কাঁপা কথায় চমকে উঠলেন দুলুবাবু, তার চোখে-মুখে রাজ্যের অসহায়ত্ব প্রকাশ পেল তখন। পিছন ফিরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, অভাব আছে এবং থাকবে। অভাবের হাত থেকে আমি তোদের বাঁচাতে পারব না। কিন্তু অশিক্ষা কুশিক্ষার হাত থেকে একটু চেষ্টা করলে মানুষকে বাঁচান যায়। তবে চেষ্টা থাকার দরকার। চেষ্টা না থাকলে কোন কাজই সম্পূর্ণ হয় না।

—পেটে ক্ষিদে থাকলে সব চেষ্টাই একদিন মাটি হয়ে যায়। পবন জড়তা কাটিয়ে বলল কথাগুলো।

দুলুবাবু চটলেন না; স্মিত হাসলেন, ঠিকই বলেছিস। তবে, এই সর্বগ্রাসী অভাবের বিরুদ্ধে একা একা আমি কী করব? আমার সামর্থই বা কতটুকু। তোরা সবাই মিলে এগিয়ে এলে আমি তোদের পাশে থাকব। তবে ধর্মর মত লোকও তো কম নেই গ্রামে। ওরা খুব ক্ষতিকারক। ওরা লোভের টোপ দিয়ে কার্তিক, বাঁকার মত মানুষকে নিজের কব্জায় নিয়ে আসে। যদি ওদের মধ্যে শিক্ষার আলোটুকু থাকত তাহলে সহজে ওরা ধর্মর ফাঁদে পা দিত না। ভাই হয়ে ভায়ের মাথায় লাঠি ধরত না।

প্রায় বিঘা খানিকের উপর দুলুবাবুদের মাটির দোতলা ঘরটা। উঠোনের শেষ প্রান্তে গাদা দেওয়া খড়। খড়ের গাদা দেখে প্রাচুর্যের অনুমান করা যায় সহজে। আম-জাম-কাঁঠাল গাছে ঘেরা বাড়ির চারপাশ। দুয়োরাণীর মত ঘরটি বাগানের মাঝখানে। লম্বা দীঘির মত পুকুর থেকে উঠে আসছিল ঠাণ্ডা হাওয়া। এই শীতল হাওয়া পবনকে কিছুটা স্বস্তি দেয়। বড় করে শ্বাস টেনে পবন শ্লথ গতিতে হাঁটছিল দুলুবাবুকে অনুসরণ করে। গাছের ছায়ায় রাতের অন্ধকার জাঁকিয়ে বসেছে পথে। চেনা পথ বলেই দুলুবাবুর হাঁটতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না, কিন্তু কাঁপা হেঁটে পেতে রাখা থান ইটে হোঁচট খেল পবন।

অতর্কিতে যন্ত্রণার শব্দটা বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। দুলুবাবু অপ্রস্তুত গলায় বললেন, কীরে হোঁচট খেলি বুঝি? সাবধানে আয়।

পবন কিছু বলার আগেই চোখ তুলে দেখল হ্যারিকেন হাতে এগিয়ে আসছে রেণুর বয়সী একটা মেয়ে। অস্পষ্ট আলোয় দূর থেকে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে পবনের প্রথমে রেণুর কথা মনে পড়ল। মানুষের চেহারায় এত সাযুজ্য কী করে থাকে? চট করে সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই মালা অভিমানী কণ্ঠে বলল, অন্ধকারে আসছ, আমাকে ডাকলেই পারতে। আমি তো বারান্দায় বসে পড়ছিলাম।

দুলুবাবু মালার দিকে স্নেহভরা চোখে তাকালেন; তারপর বললেন, দেখত, পবনের পায়ে কী হল। যা জোরে হোঁচট খেয়েছে—নখটা মনে হল উঠে গিয়েছে।

মাটিতে হ্যারিকেন নামিয়ে উবু হয়ে বসল মালা, বৈকালিক প্রসাধনের হাল্কা ঝাঁজ চকিতে নাকে এসে পবনকে কিছুটা উন্মনা করে দিল। হলুদ আলোয় খুব কাছ থেকে মালাকে দেখল পবন, কিন্তু চোখের জড়তা তার কাটল না। মালা অনুচ্চ স্বরে বলল, কৈ দেখি, কোথায় লেগেছে।

পবন পা-টাকে নিজের কাছে টেনে এনে যাথসম্ভব জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল। দুলুবাবু পবনের সংকোচের কারণ বুঝতে পেরে বললেন, লজ্জা করিস না পবন। মালা আমার মেয়ে। ও ভাল ডাক্তারী করতে জানে। আমার কিছু হলে মালাই আমাকে ওষুধ দেয়। সব হোমিওপ্যাথি ওষুধের নাম ওর মুখস্থ।

লজ্জা এসে ছুঁয়ে দিল মালাকে, হাসতে গিয়েও মেয়েলী গাম্ভীর্যবোধ তার স্বতঃস্ফূর্ত হাসিতে সীমারেখা টেনে দিল জড়তার। পবন দেখল, মালার ঈষৎ গোলাপী রঙের শরীরে কৈশোর উত্তীর্ণ বয়সের প্রখর লাবণ্য। তার কমলাকোয়া ঠোঁটে হাসির কোন কমতি নেই; সে হাসলে চোখ দুটো দীর্ঘ, সু-অঙ্কিত ভ্রূর তালে তালে নেচে ওঠে। যে মুখে হাসির চাষ-আবাদ—সেই মুখ কখনও কঠোর হতে পারে না। মেয়েদের শরীরে এমন একটা বাড়তি চটক থাকে যা তারাবাজির আলোর মত, যা বিপরীতধর্মী যে কোন চোখকে ক' মুহূর্তের জন্য হতবাক বা ঝলসে দিতে পারে।

হ্যারিকেনটা সরিয়ে এনে মালা থেঁতলে যাওয়া পবনের বুড়ো আঙুলটা যত্নশীল চোখে দেখল। তারপর আন্তরিকতার সঙ্গে বলল, নখটায় লেগেছে। বাবা, তুমি ওকে একটু ব্যথা কমার ওষুধ দিয়ে দিও। আমি একটা ক্রীম লাগিয়ে দিচ্ছি। ভাল হয়ে যাবে।

চিকিৎসাপর্ব শেষ হতেই এক বাটি ঝাল-মুড়ি এনে দিল মালা। দুলুবাবুর স্ত্রীর নাম মুক্তা। মালা যেন তারই জলছবি। ভদ্রমহিলা খুব কথা বলতে ভালবাসেন। তার মুখশ্রীতে দেবীসুলভ সৌন্দর্য লুকিয়ে রয়েছে—যা চাপা হলেও বুঝে নিতে কোন অসুবিধা হয় না পবনের। কপালে সিঁদুরের টিপ, হাতে দামী শাঁখা, পরণে যদিও সাধারণ একটা শাড়ি তবু মুক্তা-মুক্তোর মত ঝক্‌ঝকে। পবন কোনদিন মুক্তো দেখেনি, মুক্তা শব্দটা তার কাছে পরিচিত। তবে সে জানে ঝিনুকের বুকে মুক্তো লুকানো থাকে। মালা কাঁসার গ্লাসে জল দিতেই দুলুবাবু বললেন, খেয়ে নে পবন। রাত হচ্ছে। আবার এতটা পথ তোদের যেতে হবে।

রাতের আকাশে গুটি গুটি তারার পাশে ধূসর বরণের চাঁদ উঠেছে, তার মুখ দুঃখী মানুষের চিন্তাক্লিষ্ট মলিন মুখের মত। লম্বা বারান্দার মাঝখানে বসে পবন মুড়ি চিবাচ্ছিল একমনে। সুভদ্রা মুক্তার সাথে কথোপকথনে ব্যস্ত। পবনের নিবিষ্ট চোখ দুই মায়ের ফরাক খুঁজছিল গোপনে। আকাশ আর জমিনের ফারাক সহজেই নজরে পড়ে তার। সুভদ্রার শাড়িটার রঙ জ্বলে পুরানো, পচা খড়ের মত বিবর্ণ। মুক্তা পরেছে তাঁতের একটা সাধারণ শাড়ি, তবু সেই সাধারণ শাড়িতে তাকে অশথের কচি পাতার চেয়েও সতেজ দেখাচ্ছে। দুই নারীর এই বাহ্যিক বৈষম্য পবনের চোখ সওয়া। মালা এবং রেণু—দুজনেই প্রায় সমবয়সী, তবু মালা রেণুর থেকে অনেক এগিয়ে। মালা কেয়াফুল হলে, রেণু পুটুস ফুল। যে আর্থিক স্বচ্ছলতা মালার আছে, রেণুর তা নেই। তবু, দু-জনের মধ্যে অদ্ভুত মিল কথাবার্তা, চাল-চলন আর আন্তরিকতায়।

দুলুবাবু কাঁসার বাটিটা নামিয়ে রেখে বড় কাচের গেলাসের জল নিঃশেষ করলেন তারপর মুখ মুছে পবনকে বললেন, তোদের অভাবের কথা আমি শুনেছি। ঘরে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে কিছু হবে না। কাজ করে খেতে হবে। সুভদ্রা দুলুবাবুর এই কথায় উৎসাহিত হল। দীর্ঘ ঘোমটায় ঢাকা তার মুখটা দুলবাবু দেখতে পেলেন না ঠিকই কিন্তু ঘোমটার আড়াল থেকে সুভদ্রা নিচু গলায় বলল, বাবু, গাঁয়ে-ঘরে কোন কাজ নেই। আপনি ওর একটা গতি করে দিন। ছেলের চিন্তায় আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি। সুভদ্রার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং দুশ্চিন্তা দুলুবাবুকে স্পর্শ করে। মায়ের মন তিনি বোঝেন। কিন্তু গ্রামসমাজে চাকরি কোথায় পাওয়া যাবে? পবনের যোগ্যতাই বা কী আছে? যাদের যোগ্যতা নেই, আর্থিক সংস্থান নেই তারা কি পড়ে পড়ে এইভাবে মার খাবে? দুলুবাবু গভীর চিন্তা থেকে ফিরে এলেন। সুভদ্রা জড়োসড়ো হয়ে উত্তরের অপেক্ষায় বসে আছে। দুলুবাবু বললেন, কাউকে চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তবে আমি কিছু ব্যবসার পথ বলে দিতে পারি। পবন যদি খাটতে পারে তাহলে দু-মুঠো ভাতের অভাব হবে না। কথাগুলো বলেই কিছু সময়ের জন্য থামলেন দুলুবাবু, তারপর পবনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কাছেই সমুদ্র। তুই মাছের ব্যবসা কর। নোনা মাছের ব্যবসা করে অনেকেই তো সংসার পালছে।

একথা শুনে অবাক হল না পবন, কেননা মাছ ব্যবসার কথা মনে মনে ভেবেছিল সে। আর্থিক অসঙ্গতির জন্য সে ব্যবসায় নামতে পারেনি। সে ভেবেছিল—আওলাদ মোড়লের কাছ থেকে কিছু টাকা কর্জ নিয়ে মাছ ব্যবসায় নামবে। কিন্তু আওলাদ মোড়ল বিশ্বাস করে টাকা দেয়নি। তাছাড়া শুধু টাকার যোগাড় হলেই মাছ ব্যবসা হবে না। সমুদ্র থেকে মাছ বয়ে আনার জন্য তার একটা সাইকেল দরকার। এই দুর্মূল্যের বাজারে একটা নতুন সাইকেল কেনার সঙ্গতি ব্রজবুড়ার নেই।

পবন অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, বাবু, ব্যবসা করতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ব্যবসার জন্য যে টাকার দরকার তা আমার কাছে নেই।

দুলুবাবু পবনের দিকে উদ্ধারকর্তার চোখে তাকালেন, আমি তোকে ব্যবসা করার জন্য টাকা দেব। সে টাকা তুই কিছু কিছু করে শোধ দিবি।

—শুধু টাকা হলে হবে না। আমার একটা সাইকেলও দরকার।

—সাইকেলও আমি দেব। আমার একটা পুরনো সাইকেল আছে, সেটাকে সারিয়ে নিলেই হবে। যতদিন নতুন সাইকেল কিনতে না পারিস—ততদিন আমারটা দিয়ে কাজ চালা।

এর পরে পবনের আর কিছু বলার থাকে না; দুলুবাবু বলেন, তুই কাল সকালে আয়। আমি কাল ঘরেই থাকব।

অন্ধকার পথ ধরে ঘরে ফিরছিল পবন আর সুভদ্রা। সারা পথ কেউ কোন কথা বলে না। পাকা সড়ক পেরিয়ে হাড়িসাইতে ঢোকার মুখে পবন বলল, মা, তুমি ঘর যাও। আমি যুগলদাদুর ঘর হয়ে যাচ্ছি।

সুভদ্রা ভয়ার্ত গলায় বলল, বেশি দেরী করবি নে। তুই না ফেরা পর্যন্ত তোর দাদু ঘুমাবে না।

ঘুমিয়ে পড়ছিল পুরো হাড়িসাই, শুধু জেগেছিল যুগলবুড়া। এই অসহ্য গরমে তার ঘাগুলো থেকে রস কাটে, কানি ভিজে যায় রক্তপুঁজে। চ্যাটচেটে ঘাগুলো তাকে ঘুমোতে দেয় না কিছুতে। বাঁকা ঠেলা মেরে ফেলে দিয়েছিল তাকে, বুড়ো হাড় সেই ধকল সহ্য করতে পারেনি। আচমকা পড়ে গিয়ে মাজার কাছে বড্ড লেগেছে। পবনের ডাকে যুগলবুড়া বিছানায় একটু কাৎ হয়ে বলল, আয়, আমি এখনও ঘুমোইনি।

পবন বিছানায় গিয়ে বসতেই যুগলবুড়া বলল, টুকে তফাৎ-এ বস। রোগটা ভাল নয়।

কথা শুনল না পবন; বলল—এই রোগদেহ নিয়ে তুমি যা করলে সুস্থ মানুষরা তা ভাবতেও পারে না। দাদু গো, তুমি পুরা হাড়িসাইয়ের মান বাঁচালে! নিরুত্তাপ হাসি হেসে যুগলবুড়া বলল, মানুষের

ধর্ম হল আপদে-বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ান। আমি কিছু করিনি, আমি শুধু বাধা দিয়েছি। যা করার সব করেছে বাঁকার বৌ। সে যদি দুলুবাবুরে খপর না দিত তাহলে পশুগুলো তোকে অত সহজে ছাড়ত না। ...বাঁকা ঘরে ফিরে তার বৌটাকে মনের সুখে মারল। অভাগীর বিটি মার খেয়ে খুব কাঁদছিল। এই তো কিছুক্ষণ আগে কান্না থেমেছে তার।

পবন ফিরে এল মন খারাপ করে। তার পায়ের শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল হৈমবুড়ি। পবনের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে তার চোখ বেয়ে নেমে এল গলিত অগ্নিধারা। এই চোখের ধারা মুছিয়ে দেবার সাহস পবনের নেই। হৈমবুড়ি কাঁদতে কাঁদতে তার শীর্ণ দু-হাত বাড়িয়ে এক সময় বুকে টেনে নিল পবনকে। উষ্ণ জলের স্পর্শে পবন টের পেল—কান্নার মত ছোঁয়াচে রোগ পৃথিবীতে আর কিছু নেই। রাতের প্রগাঢ় অন্ধকারে বিন্দু বিন্দু চোখের জল বেলিফুল প্রস্ফুটিত তারার মত ঝরে পড়ে। মানুষের চোখ সম্পূর্ণ একটা আকাশ। আকাশের ছায়ায় মানুষের বেঁচে-বর্তে থাকা। মেঘমুক্ত আকাশের মত অনেকদিন পরে নিজেকে ঝরঝরে মনে হল পবনের। হৈমবুড়িকে জড়িয়ে ধরে তার মনে হল, সে যেন দু-হাত বাড়িয়ে অবলীলায় ছুঁয়ে দিয়েছে আকাশের মুগ্ধতা।

ছয়

সাইকেলটা ভাঙা-চোরা।

লাটু মিস্ত্রির দোকানে সাইকেলটা মেরামত করতে দিলেন দুলুবাবু। পবন ঠায় দাঁড়িয়ে সেখানে। দুলুবাবু কাছে ডেকে বললেন, তুই থাক। আমি একটু পাড়া থেকে ঘুরে আসি। বিষহরি কাকার দোরে একবার যেতে হবে। জমি নিয়ে ভজাদের সাথে ওদের পুরনো বিবাদ। আজ মিটমাট হবার কথা। সিগারেটের ছাই ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন দুলুবাবু। যাওয়ার সময় লাটু মিস্ত্রিকে সতর্ক করে বললেন, আমি চললাম। আমি থাকছি না বলে কাজে ফাঁকি দিবি নে। বিকেলে এসে তোর হিসেব পত্তর সব মিটিয়ে দেব। তারপর স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে পবনের দিকে তাকালেন, সাইকেলটা সারানো হয়ে গেলে তুই একবার আমাদের ঘরে যাবি। মালার কাছে টাকা রেখে এসেছি। তুই গেলেই মালা তোকে টাকাগুলো দিয়ে দেবে। আমি যাই, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

দুলুবাবু তড়িঘড়ি করে চলে যাবার পর আবার একা হয়ে গেল পবন। লাটু মিস্ত্রি সাইকেলের চেনে তেল লাগিয়ে বলল, পুরনো সাইকেল হলে কী হবে, ঠিক মত রাখতে পারলে মেরে-কেটে দশ বছর তো চলবেই। আগেকার দিনের সাইকেল, এখন আর এমন জিনিস দুনিয়া ঘুরে এলেও পাবি নে। তোর ভাগ্যটা ভালরে পবন, দুলুবাবু সহজে কাউকে কিছু দেয় না। অথচ তোর বেলায় উনি দেখলাম—খুব সদয়। যাক, ভালই হলো। এবার মন দিয়ে মাছ ব্যবসাটা কর দেখি। ব্যবসার মত জিনিস আর হয় না।

পবন ঘাড় নেড়ে সায় দিতেই লাটু মিস্ত্রি তোড়ের বেগে বলল, গাঁয়ে এখন আর কোন সুখ নেই। আমার এই সাইকেল দোকানটা টিমটিমিয়ে চলছে। গাঁয়ের কেউ নতুন সাইকেল কিনলে এগরা-কাঁথি থেকে কিনে আনে। ওরা আমার কাছে কিনতে ভরসা পায় না। অথচ কোম্পানীর মাল, যেখান থেকেই কিনুক না কেন—একই দাম। এই কথাটাই আমি ওদের বোঝাতে পারি না।

পবন বোকা চোখে তাকিয়ে; লাটু মিস্ত্রি বলল, যা, সাইকেলটা যা করে দিলাম ছ'মাস আর হাত দিতে হবে না। তারপর, সে হিসাব কষে বলল, দুলুবাবুকে বলিস—সব মিলিয়ে পঞ্চান্ন টাকা হয়ছে। আমি সন্ধে বেলায় বাবুর সাথে দেখা করব।

চোরপালিয়া হাটের মাঝখান দিয়ে পায়ের চড়া পড়া পথ, সধবার সিঁথির মত সুন্দর সেই পথ। বটতলা ছাড়িয়ে কিছুটা হেঁটে এলেই চকচকে বাসরাস্তা পানিপারুল হয়ে দীঘা ছুঁয়েছে। সাইকেলটা স্পর্শ করতেই পবনের মনে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ আছড়ে পড়ল। দুলুবাবুর দয়ায় সে এক নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে—যা তার মনোবলকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করবে। অভাবের সংসারে মেহনতের মূল্য অনেক। পবন জানে—পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই, একমাত্র কাঠোর পরিশ্রমই পারে—তাদের হেলে পড়া সংসারটাকে ঠেকা দিতে।

হাঁটতে হাঁটতে পবন যখন বাসরাস্তার কাছাকাছি এল তখন আকাশে চড়া রোদ। চারিদিকে ধুলো ওড়া ছন্নছাড়া দশা। মানুষজন এখন আর বেশি বাইরে নেই, যে যার দোকানে ঢুকে গল্প-গুজবে ব্যস্ত। এই অলস সময়ে পবনের কিছু ভাল লাগে না, মিষ্টি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তার মেনির কথা মনে পড়ে। অবুঝ মেনির এই মিষ্টির দোকানটা খুব প্রিয়। এখানে এলে সে বড় লোভী হয়ে ওঠে, চোখের তারায় উদ্‌ভাসিত হয় চাপা, সংযত এক লোভ। এই লোভ পবনকেও গ্রাস করে কখনও।

খটখটে দুপুরে পবন যখন ঘেমে-নেয়ে ঘরে এল তখন সুভদ্রার দু'চোখে রঙিন স্বপ্নের আঁকিবুকি। জল হাত আঁচলে মুছে সে ব্যস্ত পায়ে নেমে এল উঠোনে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সাইকেলটা দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, বাবু তার কথা রেখেছে, এবার তুই তার কথা রাখ। কথাগুলো শেষ না হতেই বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এল তার চোখে-মুখে, তোর বাবার কথা আজ খুব মনে পড়ছে। সে যদি সন্‌সারটা দেখত তাহলে তোকে আর সমুদ্রে যেতে হোতনি মাছের ধান্দায়।

চুপ করে থাকল পবন, সুভদ্রা আপন মনে বলল, কার দায় কে বয় তা আগাম কেউ জানে না। তবে সাবধানে কারবার করবি। সমুদ্রকে আমার খুব ভয় করে।

স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হাসতে গিয়েও গলা বুজে এল পবনের, মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনমতে সে বলল, বাবার জন্য আমি ভাবি নে। সে যেখানেই থাকুক ভাল আছে।

—তুই কী করে জানলি?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পবন বলল, আমি জানি। আমার মন যা বলে তাই হয়।

সামান্য একটা সাইকেলকে নিয়ে পুরো পরিবারে আনন্দের আর শেষ নেই। ব্রজবুড়া উঠতে পারে না, উঠলে বসতে পারে না—তবু আনন্দে আটখানা হয়ে হৈমবুড়ি তাকে টেনে আনল উঠোনে। কুলগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মজা করে বলল, দেখো গো, তোমার লাতির কাণ্ড দেখ! দুলুবা- র পটিয়ে সাইকেল এনেছে ঘরে। লাতি তোমার কাল থিকে মাছখটীতে যাবে। কাল থিকে আমাদের আর কোনো দুঃখ থাকবে না গো।

আবেগের কথায় ব্রজবুড়ার থলথলে চোখের কোণে ঠিকরে পড়ে আনন্দ, রোদ গায়ে মেখে সে বলে, কাল থিকে আমরা তাহলে পবনার কামাই খাবো—কি বলো? বাপ যা পারে নি, বেটা তাই করে দেখাবে! কলিকালে এ রকম কত কী যে দেখব! ব্রজবুড়া ফোকলা মাড়ি দেখিয়ে হাসল।

হৈমবুড়ি এ কথায় মোটেও সন্তুষ্ট হল না, ব্রজবুড়াকে ধমক দিয়ে সে বলল, তোমার যত্তো সব ট্যারা-বেঁকা কথা। কোথায় খুশী হয়ে তারে আশীর্বাদ করবে—তা না, যতসব খোঁচা মারা কথা। বলি, তোমার তো চুল পেকে ঝরে গেল—তুমি কি এমন ধারা এট্টা সাইকেল উঠোনে রাখতে পেরেছো? পার নি। কিন্তু তোমার লাতি পারল। তার জন্য তোমার গর্ব হওয়া উচিত।

ফ্যাকাসে হেসে চুপ করে থাকল ব্রজবুড়া। সাইকেল এ সংসারে প্রথম কিন্তু পালকি-পরীযান এ সংসারে নতুন কিছু নয়। আগে হাড়িসাইয়ে ব্রজবুড়ার সুসজ্জিত পরীযান ছিল—দশ গাঁয়ের গর্ব। এই অভাবী পেট সব খায়। পালকি, পরীযান সব খেল। এখন ভাঙা, উইলাগা পালকির কাঠগুলোর দিকে তাকিয়ে পুরনো সুখের দিনগুলো ব্রজবুড়াকে খোঁচা মারে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলে, এ যুগে আমি হলাম

গিয়ে অচল পয়সা। বাপ ঠাকুরদাব কাছ থিকে যা পেয়েছিলাম—তা আমি ধরে রাখতে পারলাম না! আমার হাতের মুঠিটা খুব ছোট। সবই হাত গলে বেরিয়ে গেল।

পবন দাদুর আক্ষেপটা বুঝতে পেরে বলল, তোমার কোনো চিন্তা নেই দাদু। মাছ ব্যবসা করে আবার আমি তোমাকে পরীযান খরিদ করে দিব। তুমি আবার নতুন করে ভাড়া খাটিও।

—তাতে কী লাভ দাদুরে! নিজের জিনিস নিজে যদি কাঁধ দিতে না পারি—তাহলে শান্তি কোথায়? ব্রজবুড়ার ফোকলা মাড়ির হাসি নিষ্প্রভ হয়ে আসে। পবন জোরের সঙ্গে বলে, তুমি না পার, আমি তোমার হয়ে কাঁধ দিব।

—তাতেও কোনো লাভ নেই। দুধের সাধ কি ঘোলে মেটেরে! এখন কেউ আর পরীযান-পালকির কথা মুখে আনে না। গাড়িঘোড়ার চল বেড়েছে। দু'পা হাঁটলে বাস-রাস্তা। সাইকেল রিস্‌কোর কোনো দাম নেই গাঁয়ে। এখন শুধু-মুধু লোকে কেন পালকিতে চড়বে? কার অতো পয়সা আছে বল? যুগ পাল্টালে মানুষের রুচিও চট-জলদি পাল্টে যায়। তুই-আমি কী করতে পারি? আমরা হাড়িসাইয়ের মানুষগুলান এখন বলির পাঁঠা।

ব্রজবুড়ার কথাগুলো অবজ্ঞা ভরে উড়িয়ে দিতে পারে না পবন। বাস রাস্তা হওয়ার পর থেকেই গাড়ি-ঘোড়ার চল বেড়েছে গ্রামাঞ্চলে। চোরপালিয়া হাটের মাঝখান দিয়ে রোজ লাক্সারী বাস যায় দীঘায়। আগে ছিল, হাতে গোনা মাত্র দুখানা ভ্যান-রিকশ, এখন তা ডজন ছাপিয়ে বিশ ছুঁই ছুঁই। মাত্র এক টাকা-দেড় টাকায় পানিপারুল। দীঘা এখন আধ ঘণ্টারও পথ নয়। এই যন্ত্রযুগে মানুষের পা আরাম খোঁজে। অথচ ক'বছর আগেও তো এমন ছিল না। পবনের মনে পড়ে এক বর্ষণ-ক্লান্ত রাতের কথা। বুড়ো-বুড়ি নামল চোরপালিয়ায়। যাবে তিন মাইল ভেতরের গ্রামে। ভ্যান-রিক্সো নেই। পেছল মেঠো পথ। তার উপরে জব্বর আঁধার, উল্টা-পাল্‌টা ঝড়ো হাওয়ার দাপট। ব্রজবুড়ার পালকিই তখন একমাত্র ভরসা। পুরো হড়িসাই খুঁজে মাত্র তিনজন বেহারা। শেষে কাঁধ লাগাতে হল পবনকে। সেটাই তার জীবনে প্রথম পালকি বওয়া। বুড়ো-বুড়িকে পৌছে দিয়ে ফিরে আসতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু বুড়োর ছেলে-বউ তা হতে দিল না। রাতটা থেকে যেতে হল সেখানে। পবন সে রাতের কথা জীবনে কোনদিন ভুলবে না। একটা ফর্সা ধবধবে বউ, লালপেড়ে শাড়ি পরে কাঁসার থালায় খেতে দিয়েছিল তাকে, মিষ্টি করে শুধিয়েছিল, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো, কী করো, বাড়িতে কে-কে আছে ইত্যাদি। পরের দিন সকালে সেই দুর্গার মত বউটাই পবনের হাতে জোর করে পাঁচটা টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, আবার এসো। পড়াশুনাটা কোনদিন ছেড়ো না। ...তোমরা কত কষ্ট করে আমার বাবা-মাকে পৌছে দিলে। সামান্য টাকা দিয়ে এই ঋণ কখনও শোধ করা যাবে না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো কথাগুলো শুনছিল পবন, প্রথম পালকিতে কাঁধ দেওয়ার সেই শিহরণময় শুদ্ধ অভিজ্ঞতার কথা সে এখনও ভোলেনি। ভোলেনি সেই প্রতিমাসদৃশ মুখমণ্ডল যাঁর কাছে মানুষের বড় পরিচয় হল মানুষ, তার জাত নয়—পেশাও নয়। এমন মানুষের দলে বুঝি দুলুবাবু পড়েন।

বিকেল হয়ে এলে গাঁয়ের পথ ঘোমটায় ঢাকা পল্লী মায়ের মত, এই ছায়া পরিবৃতা পথে পবনের হাঁটতে বড় আরাম বোধ হয়। আজ সে হাড়িসাইয়ের সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র। আজ সে সবাইকে টেক্কা দিতে পারে, আজ সে পূর্ণ একজন মানুষ। দুপুরে খাওয়ার সময় মা তার পাশে বসেছিল, মাছের মুড়োটা তার পাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, ছেলে বড় হলে মায়ের আর কোনো দুঃখ থাকে না। ছেলের সুখে মায়ের সুখ। তোর বাবা তো ঘরের চেয়ে বাইরের মানুষকেই বেশী ভালবাসে। ঘর তার কাছে পর, পর তার কাছে আপন। তাকে নিয়ে মনে আমার অনেক অশান্তি ছিল। তোর মুখপানে চেয়ে আজ আমার কোনো অশান্তি নেই। তুই ভাল থাকলে আমারও পরমায়ু বাড়বে।

হাঁটতে হাঁটতে কথাগুলো বারবার করে মনে পড়ে পবনের। ইচ্ছে করে সাইকেলটা সে সঙ্গে আনেনি। দুলুবাবুর ঘরে সাইকেলে চেপে যাওয়া মানে ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়ার অবস্থা। তাছাড়া মালার সামনে

সাইকেল চেপে গেলে তারও কেমন সঙ্কোচ বোধ হবে। দুলুবাবু যখন পুরনো সাইকেলটা ঘরের ভেতর থেকে বের করে দিলেন—তখন মালাই ঝুল ঝেড়ে পরিষ্কার করে দিয়েছে। সকালের আলোয় মালাকে দেখে চোখ ফেরাতে পারেনি পবন। বাবুঘরের মেয়ে মালা; তার চেহারা, কথা-বার্তা, এমন কী হাসিতেও সুগন্ধি ফুলের গাম্ভীর্য। চোখের দৃষ্টিতে অপাপ সরলতা। পবন মুগ্ধ দুচোখ ভরে দেখেছে। সেদিন রাতে মালা নিঃসঙ্কোচে তার পায়ে হাত দিয়েছিল ওষুধ লাগানোর অজুহাতে। সেই চিকণ আঙুলের কোমল স্পর্শ বিদ্যুৎ শিহরণের অনুভূতি নিয়ে টোকা মারে হৃদয়ে। মালা হাসতে-হাসতে চোখ নাচিয়ে বলেছিল, ব্যবসা করতে যাচ্ছ, অথচ তোমাকে দেখে মনে হয় পয়সা গুণতেই জান না। এত সরল—সাদা সিধে হলে চলবে না। বাবা সরল বলে সবাই বাবাকে খুব বোকা ভাবে, আর ঠকিয়ে নেয়। তোমাকে একটা কথা বলি। তুমি কিন্তু বাবার মত হয়ো না। আমি শুনেছি—সমুদ্রধারের মানুষরা খুব চালাক হয়, তারা নাকি চোখে-মুখে কথা বলে। তুমি যখন ব্যবসায় নামছো—তখন একটু সতর্ক থাকবে। জান তো, ব্যবসায় একবার ডুবে গেলে আর ওঠা যায় না।

মালার আগ বাড়িয়ে উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিটা পবন ভুলতেই পারে না। তার মেনির কথা মনে পড়ে। মেনির স্বভাবের সাথে মালার স্বভাব অনেকটা মিলে যায়; আজ যদি মেনি থাকত তাহলে কত কথাই না পোষা ময়নার মত বলত। মেনি নেই কিন্তু মালা যেন অযাচিত ভাবে মেনির স্থান পূরণ করেছে। মালা ঐ অল্প সময়ে কত কথাই না বলল। পবন সব শুনল কিন্তু একটা কথারও উত্তর দেয়নি। আসলে মালার সামনে সে একটা গোটান শামুক। মালা কুঁড়ি থেকে ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছিল তার সামনে। ব্যবসার কিছু বোঝে না, কিন্তু তা বলে কথায় হারবে না মালা। পবন ইচ্ছে করলেই মালাকে যুক্তিতর্কে হারিয়ে দিতে পারত কিন্তু দেয়নি। কারোর বন্ধনহীন, স্বাধীনচেতা আবেগকে সে জোর করে থামিয়ে দিতে শেখেনি। মালা বিজ্ঞস্বরে বলেছিল, মাছগুলো একটু দেখে-শুনে কিনবে। সমুদ্রের মাছ দেখতে ভাল, আর যারা দেখতে ভাল তারা খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়। নোনা জলের মাছ, ডাঙায় আনলে বেশিক্ষণ বাঁচে না। ওরা বড় আদুরে। যারা আদুরে হয়, তারা বেশি ধকল সইতে পারে না। এই আমাকে দেখ না! আমি বাবা-মায়ের খুব আদুরে। তাই আমি বেশী ধকল সইতে পারিনে। একটু কিছু হলেই আমার চোখে জল চলে আসে। আমি আর আমাকে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারিনে।

একমাত্র বোকারাই পারে এমন অকপট স্বীকারোক্তি করতে। মালাকে পবন মনে করেছিল—সে বড় চাপা স্বভাবের মেয়ে, ধনীর আদুরে কন্যেরা যেমন হয় তেমন। কিন্তু তা সে ধারণা বেশীক্ষণ স্থায়িত্ব লাভ করেনি। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের চেয়েও মালার শব্দ বিন্যাস, বাচনভঙ্গী আরো আকর্ষণীয়। তার কাছে আপন-পর, সংকোচের কোন দেওয়াল নেই। একমাত্র সমুদ্র ফেনার মত নরম, কমনীয় মন না পেলে কোন মেয়েই কারোর কাছে এত সহজ, খোলামেলা হতে পারে না।

দুলুবাবু বলেছেন, ব্যবসার মূলধন মালার কাছে গচ্ছিত আছে। শুধু টাকাটা নেওয়ার জন্য নয়—মালাকেও একবার দেখার জন্য পবনের এত দূর ছুটে আসা। ইচ্ছে করলে সন্ধেবেলায় সে আসতে পারত। কিন্তু সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে সে মালাকে দেখবে কী করে, মালাকে দেখার জন্য যথেষ্ট দিনের আলোর প্রয়োজন। যার মন দিনের আলোর চেয়ে পরিষ্কার তাকে দিনের আলোয় দেখাই শ্রেয়।

পিচ রাস্তার একপাশ ধরে হাঁটছিল পবন। দু পাশে ধানমাঠ, কোথাও রাস্তার লাগোয়া শ্যাওলা ভর্তি ডোবা। জলজ বুনো ফুলের গন্ধ মেখে শীতল হাওয়া উঠে আসছিল পথে। শেষ বিকালের আবীর রাঙান আলোয় চরাচরে উৎসবের মুগ্ধ তৎপরতা। পবনের হাঁটার ছন্দে কোন তাড়াহুড়োর লক্ষণ ছিল না। আর মাত্র ক'পা হাঁটলেই অনায়াসে সে দুলুবাবুদের বেড়ার ধারে পৌঁছে যাবে। মালাকে দু চোখ ভরে দেখতে পাবে, শুনতে পাবে তার ডেঁপো ডেঁপো কথাগুলো—যা আদৌ বিরক্তিকর মনে হয় না পবনের। দীঘাগামী একটি বাস ধুলো উড়িয়ে হর্ন দিতে দিতে পবনকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। নাকে-

মুখে ধুলো ঢুকে যাওয়ার ভয়ে রাস্তা থেকে আরও ক'পা দূরে সরে যায় পবন। ধাতস্থ হয়ে চোখ তুলে তাকাবার আগেই সে দেখল—মাতাল মানুষের মত টলমল অবস্থায় রাস্তা কাঁপিয়ে চলে গেল একটা ট্রাক। ট্রাকের যান্ত্রিক শব্দে রাস্তার ধারের গাছের পাখিগুলোও ভীত সন্ত্রস্ত। নিমেষে বিষিয়ে উঠল পবনের মন। ট্রাকের শব্দ তখনও বাতাস থেকে মেলায়নি, পবন বুকের কাছে হাত এনে আবার দূরের দিকে তাকাল; আর তখনই সে শুনতে পেল বাতাস কাঁপানো মোটর সাইকেলের ভট্ ভট্ শব্দ। শব্দটা সরীসৃপের মত বাতাসে ভর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছিল সামনে। এই জ্বালা ধরা শব্দটা হজম করার আগেই ব্রেক দাবিয়ে পবনের মাত্র হাত সাতেক দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল কালো রঙের একটা মোটর সাইকেল। পবন ভ্যাবাচেখা খেয়ে তাকানোর আগেই মোটর সাইকেলের স্টার্ট বন্ধ করে একজন সুবেশ যুবক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, আচ্ছা, দুলুবাবুর বাড়ি কোনটা বলতে পার?

পবন ভয় চোখে সেই সুবেশ যুবকের দিকে তাকাল, তারপর কোন কথা না বলে শুধু আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল টিনের চাল দেওয়া ঘরটা। যুবকটি আবার অদ্ভুত কায়দায় পা নাড়িয়ে স্টার্ট দিল মোটর সাইকেলের, তারপর চোখের নিমেষে গলগল ধোঁয়া ছেড়ে ক্ষুধার্ত হায়নার মত ছুটে গেল টিনের ছাউনী দেওয়া বাড়িটার দিকে। এক রাশ কালো ধোঁয়া আর উদ্ভট কিছু যান্ত্রিক শব্দ পবনের এতক্ষণের স্বস্তিটুকুর গলা টিপে মেরে দিল।

গেট খুলতে এগিয়ে এসেছে মালা, বিকেলে স্নান সেরে সে তার মায়ের শাড়িটা পরেছে। যুবকটি মোটর সাইকেল স্ট্যাণ্ড করে মালাকে শুধোল, দুলুদা আছেন? আমি কাঁথি থেকে আসছি, বিশেষ প্রয়োজন।

মালা ইতস্তত গলায় বলল, বাবা বাড়িতে নেই। আপনি ভেতরে আসুন। মা আছে। অপ্রয়োজনে মালার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল যুবকটি, তার চোখের দৃষ্টি সরাসরি মালার মুখ থেকে পিছলে বুকের উপর নিবদ্ধ। পবন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মালার নত মুখে কুঁড়ি ফুলের গভীর গোপন লজ্জা। যুবকটির হ্যাংলা দৃষ্টি ডাঁশমাছির মত ভনভন করছে মালায় বুকের চারপাশে। একদম প্রথম দর্শনেই মালা হাঁপিয়ে উঠেছে বিরক্তিতে, আসুন। গেটটা বন্ধ না করে দিলে ছাগলে ফুলগাছগুলো খেয়ে নেবে। কথাগুলো শেষ করেই মালার চোখ যায় পবনের দিকে। উৎফুল্লিত হয়ে বলে, কখন এলে? আমি ভাবছিলাম তুমি আসবে। বাবা যাওয়ার আগে তোমার কথা বলে গিয়েছে। আসো—

গেট বন্ধ হওয়ার শব্দ হয়।

যুবকটি বিস্মিত চোখে শুধু একবার পবনের দিকে তাকায়। পবন সেই আগুন দৃষ্টির কাছে শিমুল তুলোর সামান্য একটা রোয়া। কিন্তু মালা তাকে এমন ভাবে জিতিয়ে দেবে—এটাও সে ভাবেনি। হেরো নয়, সংকোচে জড়োসড়ো শামুক নয়—মাথা উঁচু করা মানুষের মত হেঁটে এল পবন। মালা তার পাশে।

যুবকটিও পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে মালাকে বলল, আমি তোমার মামার বন্ধু। তোমার মামাই আমাকে পাঠাল। এই চিঠিটা তুমি তোমার মাকে দাও। তাহলে সব বুঝতে পারবে।

চিঠিটা নিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বড় ঘরে চলে গেল মালা। যাওয়ায় আগে পবনকে বলল, বেঞ্চিটায় বসো। আমি যাব আর আসব। পালিয়ে যেও না কিন্তু—

চরম অস্বস্তির মধ্যে সময় আর কাটতে চায় না পবনের। সুবেশ যুবকটির মুখোমুখি বসে ছিল পবন। হঠাৎ দেশলাই জ্বালার শব্দে পবন মুখ তুলে দেখল সিগ্রেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে কাঁথি থেকে আসা যুবকটি। দুলুবাবুর বৈঠকখানায় বসে কেউ যে এমন স্পর্ধিত ঢঙে সিগ্রেট টানতে পারে—এটা পবনের চিন্তার বাইরে ছিল, ফলে তার অবাক হওয়ার মাত্রাটা উত্তোরত্তর বেড়ে গেল। শহরের মানুষ শুধু পোষাক আষাকে নয়—সব দিক দিয়ে এগিয়ে, তাদের নাগাল হাজার চেষ্টা করেও গ্রামের মানুষরা ধরতে পারে না—এই ভেবে বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকল পবন। নিমেষে সিগ্রেট পোড়ার সুগন্ধে ভরে উঠল

ঘর। এক মিশ্র অনুভূতিতে হাত-পা গুটিয়ে আগের মত জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকল পবন। সময় যেন আর কাটতে চায় না, জড়বৎ পাহাড়ের মত সময়ের অস্তিত্ব এখন অস্বীকার করার উপায় নেই। পবন কিছুতেই টপকে যেতে পারে না সময়ের অদৃশ্য বেড়াকে, তার মনে পড়ে মেনির কথা। সে একবার শুকনো কুমড়োলতির বিড়ি বানিয়ে ঘরের পিছনে গিয়ে মনের সুখে টেনে ছিল। কুমড়োলতির ধোঁয়া বিড়ির ধোঁয়ার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। মেনি কী কাজে যেন ঘরের পিছনে এসে দেখে ফেলেছিল তাকে। অবাক গলায় শুধিয়েছিল, তুই বিড়ি খাচ্ছিস দাদা! দাঁড়া, দাদুরে আমি সব বলে দেবে। মেনির মুখকে চাপা দেওয়া আর বহমান নদীর স্রোতকে থামিয়ে দেওয়া একই কথা। মেনির হাত দুটো ধরে পবনের সে দিন সে-কি আকুতি-মিনতি। শেষ পর্যন্ত মন ভিজেছিল মেনির। দুটো টিকটিকি লজেন্সের বিনিময়ে সে রাজী হয়েছিল মুখে কুলুপ আঁটতে। আজ সব কিছুতেই মেনির অস্তিত্ব পবনকে ছুঁয়ে থাকে। এত সুন্দর একটা সাইকেল, হলোই বা তা পুরনো—মেনি কোনদিন ভাবতেই পারেনি—এমন একটা সাইকেল চালিয়ে তার দাদা রোজ দীঘা যাবে আর আসবে। এমনটা শুধু মেনি নয়—পবনের কাছেও অপ্রত্যাশিত ছিল, শুধু মাত্র দুলবাবুর সহৃদয়তায় আজ তা সম্ভব হল। মেনি মামার বাড়িতে থেকে জানতেই পারল না—মাত্র ক'মাসের ব্যবধানে পবন কত বড় হয়ে গিয়েছে।

মালা এল, তার হাতের মুঠোয় ভাঁজ করা টাকা। পবনকে বলল, এই টাকাগুলো বাবা তোমার জন্য রেখে গিয়েছে। কাল দীঘা থেকে ফিরে সময় হলে বাবার সাথে একবার দেখা করো। বাবা তাহলে খুশী হবে।

মালা যখন কথা বলছিল খৈয়ের চেয়েও ফর্সা দাঁত দেখিয়ে তখন চায়ের কাপ হাতে সামনে এসে দাঁড়ালেন মুক্তা। কিছুটা জড়তা তার চোখে-মুখে তবু পরিচ্ছন্ন হাসির পরশটুকু ঠোঁটের কোণে জড়ানো। ভদ্রালোক হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন; অপ্রস্তুত ভাব কাটিয়ে হাসি মুখে বললেন, আমার নাম সুদেব। আমি পরিতোষের বন্ধু। এখন একটা ফিনান্স কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত। আপনাদের এখানে এসেছি যদি কিছু নতুন 'কেস' করতে পারি। পরিতোষ বলছিল, দুলুবাবুর এ গ্রামে প্রচণ্ড হোল্ড। উনি যদি একটু হেল্প করেন তাহলে কোম্পানীর প্রচার চালাতে আমার অনেক সুবিধা হবে।

মুক্তা সব শুনে বললেন, আপনি বসুন। উনি তো ঘরে নেই। কী একটা কাজে পাশের গ্রামে গিয়েছেন। ফিরে আসার সময় হয়ে এল।

—কিন্তু আমাকে যে কাঁথি ফিরে যেতে হবে। চায়ের কাপটা ধরে মুক্তার দিকে অপলক তাকালেন সুদেব, ঠিক সময়ই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু মাঝ রাস্তায় হঠাৎ মোটর সাইকেলটা খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিলাম—আর আসব না কিন্তু শেষ পর্যন্ত চলেই এলাম। এসে দেখছি ভালই করেছি। না এলে আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ই হোত না। চায়ে চুমুক দিয়ে উদ্দেশ্যপূর্ণ হেসে উঠলেন সুদেব। হাসি সংক্রামিত হল মুক্তার ওষ্ঠে, প্রাসংগিক কথা-বার্তা সেরে তিনি বললেন, আপনি একটু বসুন। এতদূর থেকে আসছেন, না খাইয়ে কিন্তু যেতে দেব না। সুদেব অবার হাসলেন, খাওয়াটা বড় কথা নয়। আপনি আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না; আজ আমি শুধু দুলুবাবুর সঙ্গে দেখা করে চলে যাব। পরে আবার আমি আসব। সেদিন বরং খাওয়া যাবে।

মুক্তা চলে গেলেন কিন্তু পবনকে দেখেও দেখলেন না, এই উপেক্ষা পবনের বুকে বাজল, অনাহুতের বেদনা আচ্ছন্ন করল তাকে। কিন্তু তার এই অভিমান মালার স্বভাবসিদ্ধ কথোপকথনে কিছুটা লাঘব হতেই পবন বলল, আমি এখন যাই। কাল ভোরে দীঘায় যাব। ওখানে আমার কোন অসুবিধা হবে না, চেনা-জানা অনেকেই আছে। নারাণ সাউ আমাকে কথা দিয়েছে, মাছের যোগান সে দেবে। আমি তার মাছখটীতে কাজ করেছি ক'দিন। বড় ভাল মানুষ। আমাকে ছেলের মত দেখে।

পবনের কথা শেষ হল না, মালা শরীরে দোলা দিয়ে হাসল। ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সে বলল, আর একটু বসো। বাবার আসার সময় হল। অতক্ষণ যখন বসলে তখন বাবার সাথে দেখা করে যাওয়াটাই ভাল হবে।

পবন একথার কোন উত্তর দিল না। মালার দিকে শুধু একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। আজ ক'মাস হল সহদেব ঘর ছাড়া। জ্যাঠাও মেদিনীপুর সদর থেকে গাঁয়ে ফিরতে চায় না। শহরে একবার মন বসে গেলে কেউ আর গ্রামের দিকে মন ফেরাতে চায় না। শহর বুঝি সব মানুষকেই এমন করে নিজের ফাঁদে আটকে নেয়। জ্যাঠার কোন দোষ নেই, পবন ভাবে। যে সুখী, নিশ্চিন্ত জীবন জ্যাঠা উপভোগ করছে শহরের জল-হাওয়ায়—তা তাদের গ্রামে অনুপস্থিত। জ্যাঠা মাঝে মধ্যে গ্রামে এলেও পালাই-পালাই ভাব। গ্রামের সবকিছুতেই তাদের চরম অনীহা। এই অনীহা কখনও পবনের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। সে মনে করে কারোরই এত নাকউঁচু স্বভাব ভাল নয়।

মালা তন্নিষ্ঠ চোখে চেয়ে ছিল পবনের দিকে। পবনের চিন্তাক্লিষ্ট মুখটি তাকে বেশ অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেয়। পবনকে সে যতটুকু দেখেছে—ভাল বই মন্দ লাগেনি। গ্রাম্য সরলতা পবনের হাবভাবে। বাড়তি চালকির কোন চিহ্ন নেই। মালা যতটুকু বোঝে—তাতে পবনের মত ছেলেরা কোনদিন মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে না। তাছাড়া তার বাবা কোনদিন মানুষ চিনতে ভুল করে না, যাকে তাকে প্রশ্রয় দিতে আদৌ পছন্দ করেন না তিনি।

মালা উসখুশিয়ে বলল, কী ভবছ?

কিছু না। ছোট্ট জবাব দিল পবন।

সুদেববাবু হস্তক্ষেপ করলেন তাদের কথায়। পবনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি কোথায় থাক?

—হাড়িসাইয়ে। পবন বলল, চোরপালিয়া হাটের ঠিক পাশেই পাড়াটা। বাস থেকে দেখা যায়।

—ওঃ। সুদেববাবু ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবলেন, তারপর শূন্য সিগ্রেটের প্যাকেটটা নেড়ে-চেড়ে বললেন, আমাব একটা কাজ করে দেবে ভাই? এখানে উইলস্ ফিল্টার পাওয়া যায়?

সিগ্রেটের নামটা পবন শোনেনি এমন নয়, তবু অবাক করা চোখে সে তাকাল। সুদেববাবু একটা কুড়ি টাকার নোট তার হাতে দিয়ে বললেন, এক প্যাকেট সিগ্রেট এনে দাও। উইলস্ না হলে যে কোন সিগ্রেট হলেই চলবে। আর হ্যাঁ, একটা দেশলাইও এনো। এখানে মোমের দেশলাই পাওয়া যায় তো?

পবন না সূচক ঘাড় নেড়ে বলল, ঘোড়াছাপ দেশলাই এখানে খুব চলে। আমি আসছি। বলেই সে টাকাটা নিয়ে চলে গেল।

পবন উইলস্ ফিল্টার পেলো না, ফিরে এল চারমিনার নিয়ে। নাক কুঁচকে সুদেববাবু বললেন, আর কিছু পেলে না! প্লেন চারমিনার খুব কড়া লাগে। এসব ট্রাক ড্রাইভারদের সিগারেট।

মালা না থাকতে পেরে বলল, ট্রাক ড্রাইভারবা কি মানুষ নয়, ওবা যদি খেতে পারে—আপনিও পারবেন। আমাদের গ্রামে দোকানপাট অত ভাল নেই। এখানে দামী সিগারেট পাওয়া যায় না।

মালার কথাগুলো নিমেষে সুদেববাবুর মুখের উপর এক দোয়াত কালি ঢেলে দেয়। এমন কাট-কাট কথা শুনতে হবে তিনি আশাও করেননি। রীতিমতন বিস্মিত হয়ে সুদেববাবু বললেন, আমি ঠিক ওভাবে কথাটা বলতে চাইনি। তোমরা, গ্রামের মেয়েরা আজকাল দেখছি খুব একস্‌পার্ট। হিন্দি সিনেমাই এর মূল কারণ।

—আমি হিন্দি সিনেমা দেখি না। অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টাল মালা, সে কঠোর হতে গিয়েও পারল না, কিছুটা আপোষের গলায় বলল, আমরা মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করি। আমার বাবা বলেন, চেহারা নয়, পোষাক নয়, কথার চাকচিক্য নয়, মানুষের আসল পরিচয় হল ভদ্রতা, সৌজন্যতা। মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধই হল মানুষের আসল পরিচয়।

—বাঃ, তুমি তো বেশ সুন্দর কথা বলতে পার! সুদেববাবু রসিকতার সুরে বললেন কথাগুলো। না ঘাবড়ে মালা বলল, ভগবান মুখ দিয়েছেন কথা বলার জন্য! আপনি যে ভাবে, যে চোখে গ্রামকে দেখেন—আপনার এই দেখায় বেশ কিছুটা ভুল আছে। আমার বাবা বলেন—কেউ ভুল করলে সঙ্গে সঙ্গে তার ভুল ধরিয়ে দেওয়া উচিত। কেননা ভুল থেকে ভুলের সৃষ্টি খুব তাড়াতাড়ি হয়।

—বাঃ, সুন্দর বললে তো! সুদেববাবু উচ্চ কণ্ঠে হাসলেন, তুমি বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে। তোমার নাম কী, কোন্ ক্লাসে পড়ো?

দু-হাতে খাবারের প্লেট নিয়ে মুক্তা এলেন। এতক্ষণ রান্নঘরে কাটিয়ে তার চেহারায় ঘামের পোঁচ পড়েছে। তবু এতটুকু ম্লান হয়নি মুখশ্রীর লাবণ্য। সুদেববাবু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, এসবের কী দরকার ছিল! আমি তো ভরপেট খেয়েই এসেছি।

—তা হোক, এগুলো আপনাকে খেতেই হবে। জোর করলেন মুক্তা। প্রশ্রয় পেয়ে সুদেববাবু হাসতে হাসতে বললেন, আমি কিন্তু আপনাকে দিদি বলব না। আপনি আমার বৌদি। জানেন তো, কাউকে দিদি বললে সম্পর্কটা অনেক দূরে থেকে যায়, হাঁসি-ঠাট্টা করা যায় না।

একথা শুনে কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন মুক্তা, অবশেষে গাম্ভীর্য কাটিয়ে তিনি বললেন, যা হোক কিছু একটা বললেই হ'ল। আপনি আমার ভাইয়ের বন্ধু, সেই সম্পর্কটা বজায় থাকলে ভাল হোত।

—তাহলে তো আপনাকে 'দিদি' বলেই ডাকতে হয়। ইমপসিবল্। ওটা আমার দ্বারা কোন দিনও হবে না। বৌদি-ই বেটার। আজ এখন থেকে আপনি আমার বৌদি। কি রাজি তো?

মুক্তা হাসলেন, হাসিই তার সম্মতি।

পবন মাথা নিচু করে নেমে এল অন্ধকারে। সুদেববাবু ফেরৎ পয়সাগুলো দিতে চেয়েছিলেন, পবন তা নেয়নি। প্রত্যাখান করে বলল, কিছুই করিনি, কেন শুধু শুধু আপনার কাছ থেকে পয়সা নেব?

—নাও, আমি দিচ্ছি। সুদেববাবু জোর খাটিয়েও পবনের হাত দুটোকে ভিখারী বানাতে পারলেন না। অবশেষে নিজেই হেরে গিয়ে হুস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, এ গ্রামের মানুষগুলো দেখছি কেমন বেয়াড়া ধরনের। কিছু দিতে গেলে নেয় না। এরা কি বরাবর এরকম? মালার মুখ লাল হয়ে উঠল, কেন নেবে? এ গ্রামের মানুষ গরীব ঠিকই কিন্তু তারা অপ্রয়োজনে কারোর কাছে হাত পাতে না। আপনি জোর করে অন্যায় করছেন।

মুক্তা অত্যন্ত লজ্জিত হলেন মালার কথায়। শাসন করে বললেন, বড়দের সঙ্গে এ ভাষায় কথা বলতে নেই। সুদেববাবু আমাদের আত্মীয়। তোমার মামা উনাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

কোন প্রত্যুত্তর না করে মালাও নেমে এল অন্ধকারে। ততক্ষণে পবন এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা। মালা একরকম দৌড়ে এসে পবনের সামনে দাঁড়াল, যেন সে নিজেই দোষ করেছে—এমন স্বরে বলল, কিছু মনে করো না—শহরের বেশীর ভাগ মানুষই ওরকম। ওরা অনেক সময় মানুষকে মানুষ বলে ভাবতেই ভুলে যায়।

পবন অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, দোষ ওদের নয়, দোষ আমাদেরই। আমাদের চাল-চলন, বেশ-ভূষা এমনই যে চাকরের মত মনে হয়।

এ কথায় আহত হল মালা, কম্পিত গলায় বলল, নিজেকে ছোট ভাবা অন্যায়। আমার সামনে যে কথা বললে—একথা ভুল করেও বাবার সামনে বলো না। বাবা তাহলে খুব দুঃখ পাবে। বাবা মানুষ ভালবাসে। আর মানুষ ভালবাসে বলেই বাবা সর্বদা মানুষের কাছাকাছি যেতে ভালবাসে। বাবা বলে, মানুষই দেবতা। মানুষের সেবাই প্রকৃত ভগবানের সেবা।

কথাগুলো পবন এর আগেও বহুবার দুলুবাবুর মুখে শুনেছে, কিন্তু এই প্রায়ান্ধকারে সেই একই কথা মালার মুখে শুনে অন্যরকম মনে হয়। সাঁঝের বেলায় বেলিফুলের গন্ধে ভরে ছিল বাতাস। দু-

একটা জোনাকপোকা টিপটিপিয়ে জ্বলছে। পবনের মনে হয় মালার চোখ দুটোয় যেন জোনাক পোকার দ্যুতি।

গেটের কাছে এসে মালা বলল, কাল তুমি সমুদ্রে যাবে। আমার একটা কাজ করে দেবে?

পবন উৎসাহী গলায় বলল, কী কাজ?

নম্রতায় ঝুঁকে এল মালার চোখ-মুখ, সমুদ্রে শুনেছি—অনেক রঙ-বেরঙের ঝিনুক পাওয়া যায়। তুমি আমার জন্য ঝিনুক কুড়িয়ে আনবে? মাকে বলো না কিন্তু, মা জানতে পারলে বকবে।

—আনব। এ আর কী এমন কাজ! পবনের কণ্ঠস্বরে আশ্চর্যতার প্রলেপ। গেটটা খুলে বাইরে এসে সে একবার পিছন ফিরে তাকাল। মালা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখের দৃষ্টিতে জোনাকপোকার নীলাভ আলো। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর পবনের মনে হল, মালা নেই; যেন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একটা অতি পরিচিত সুগন্ধী ফুলগাছ। হনহনিয়ে হাটখোলা ছাড়িয়ে হেঁটে এল পবন। পাকা সড়কে দাঁড়িয়ে সে দেখল—হাড়িসাইয়ের মাথার উপর ঝুলে পড়া নিকষ কালো অন্ধকার। অবিকল সুদেববাবুর মোটর সাইকেলটার মতো সেই অন্ধকারের রঙ। আলোর মুগ্ধতা ধীরে ধীরে অপসারিত হল পবনের দু'চোখ থেকে। দু'চোখ জুড়ে এখন শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। শুধু দূরে তাদের চালা ঘরে আলোর ক্ষীণ ধারাটি চোখে পড়ে।

অনেকদিন পরে হাড়িসাইয়ে বাজনার আসর বসেছে পবনদের দাওয়ায়। ব্রজবুড়া ঢোলের তালায় চাটি মেরে বোল তুলছে আর বার বার করে ফিরে যেতে চাইছে তার পুরনো দিনগুলোয়।

ঢোলের বোল শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল পবন। একটা ডিবরির আলোকে কেন্দ্র করে গোল হয়ে বসেছে খালি গায়ের দশ বারজন। তাদের ঘাম ঝরানো, কর্মঠ, পোড় খাওয়া শরীর—বাজনার তালে তালে দুলছে। তাদের মধ্যে কে যেন বলল, খুড়া গো, ঘট তোলার বোলটা এবার বাজাও। কৎদিন হল তুমার হাতের বোল শুনিনি।

সাত

একটা কালো মেঘ থমকে দাঁড়াল হাড়িসাইয়ের মাথায়, টুকি দেওয়া চাঁদ লুকিয়ে গেল মেঘের তলপেটে। এলোমেলো হাওয়ায় কলাপাতা কাঁপে জ্বরো রোগীর মতন।

পবন কুপির আলোয় মেনির মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে, বুকের গভীরে কলাপাতা ফেঁসে যাওয়া শব্দ। এই মেনিকে সে যেন চিনতে পারে না। একমেটে প্রতিমাকে বউ করে শার্টিংয়ের কাপড় পরালে যেমন দেখায় অবিকল তেমন দেখাচ্ছে তাকে। কতদিন পরে মেনি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—এই কঠিন হিসাব চট করে মেলাতে পারল না পবন, শুধু তার অনুভূতি জুড়ে তীব্র সুখের এক আলোড়ন শুরু হল।

মেনি বোকার মত শুধোল, এমন করে কী দেখছিস দাদা? আমি কি রাসের পুতুল—তাই যে অমন হা করে তাকিয়ে আছিস?

পবনের নিরুত্তাপ চোখে আশা-আনন্দর দোলা, এতদিন পরে বোনকে কাছে পেয়ে কথার বাঁধ ভেঙেছে, বুকের ভেতর তুমুল আলোড়ন। কিন্তু এই আনন্দ-উচ্ছ্বাসের কথা মেনিকে সে জানাবে কি করে। আর জানালে মেনিই-বা কতটা এই আনন্দের ভাগ নিতে পারবে—এই বিষয়ে গভীর সংশয় ছিল পবনের মনে। দুলুবাবুর ঘর থেকে ফিরে আসার সময় পবনের মনের অবস্থা ভাল ছিল না; ঝড়ো কাকের মত চেহারা না হলেও মনের ভেতর দিয়ে পরাজয়ের চিহ্ন এঁকে দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছে অকস্মাৎ।

সুদেববাবু লোকটিকে আদৌ তার ভাল লাগেনি, ভদ্রলোকের মুখে মিছরি-হাসি, কিন্তু আড়ালে ধার শানানো ছুরি। এমন গিরগিটি স্বভাবের মানুষ পাড়া-গাঁয়ে কদাচিৎ দেখা যায়। এরা কারো না কারোর সর্বনাশ করে, সর্বস্ব লুটেপুটে নিরুদ্দেশ হয়। কিন্তু পবনের মনে যে দুশ্চিন্তা—তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন মুক্তার চোখে দেখেনি। ওরা সহজভাবে মানিয়ে নিয়েছে সুদেববাবুকে। হয়ত বড় ঘরের এটাই রেওয়াজ। কিন্তু সুদেববাবুকে প্রথম দেখার পর পবনের জটিলতার গিঁট খোলেনি। মালা কি সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি সুদেববাবুকে—এ প্রশ্ন এখনও পবনের মনে ধোঁয়াশা। তবু মালার প্রতিবাদী ভঙ্গিটাকে সে মনেমনে তারিফ করে।

মালার মুখের পাশে মেনির মুখটা দিব্যি মানিয়ে গেলেও—দু-জনের বিরাট ফারাক নজর এড়ায় না পবনের। সে এতক্ষণ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জহুরী চোখে মেনিকে দেখছিল। এই ক'মাসে চেহারার আমূল পরিবর্তন হয়েছে মেনির। ছাপা, চোখ ঝলসান একটা শাড়ি পরেছে সে। ঠোঁটে লেগে আছে পরিচিত সেই হাসি।

এলোমেলো হাওয়ায় কালো মেঘ শরীর এলিয়ে ছুঁড়ে দিল বৃষ্টি কণা। অবিরাম বৃষ্টিতে স্নাত হল পথঘাট। এসময় সাপ পোকামাকড় ঘরে উঠে আসা এমন কিছু বিচিত্র নয়। পবন তাই যেমন দ্রুত বেগে এসেছিল, ততোধিক ঠাণ্ডা চালে ঘরে ঢুকে এল ভয়ে ভয়ে। ছাগলটার পিঠে হাত রেখে সে বুঝতে পারল পচা খড়ের চাল ভেদ্ করে অসময়ের বর্ষা ভিজিয়ে দিয়েছে ছাগলটার পুরো শরীর। লোমগুলো ভেজা তুলোর মতন নেতিয়ে রয়েছে সারা গায়ে। শীতে জড়োসড়ো হয়ে কাঁপছে ছাগলটা। পবনের খুব মায়া হয়, এই ধাড়ী ছাগলটা তারও খুব প্রিয়। মেনি ছাগলের দুধ খেতে ভালবাসে বলে—সহদেব খাকুড়দার হাট থেকে ছাগলটাকে কিনে এনেছিল সস্তায়। দেখাশোনা আর চরানোর দায়িত্ব ছিল পবনের। মেনিও পবনের সঙ্গে মাঠে যেত। ছাগলটাকে ঘিরে তাদের কত স্বপ্ন। গত বছর ধাড়ী ছাগলটা যখন কালো-সাদা দুটো বাচ্চা দিল—তখন সেই বাচ্চা দুটোকে নিয়ে সময় কাটত মেনির। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কালো-সাদা ছাগলছানা দুটোকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি ওরা। এক বৃষ্টি-বাদলার রাতে বাঁশবনের ধূর্ত শেয়ালটা এসে একটা বাচ্চাকে মেরে অন্যটার ঘাড় মটকে নিয়ে পালায়। পরের দিন সকালবেলায় মেনি অঝোর নয়নে কাঁদছিল, পবন তাকে কিছুতেই বোঝাতে পরেনি। তার কান্নার কাছে পৃথিবীর যাবতীয় সান্ত্বনাবাক্য বুঝি বেমানান।

ধাড়ী ছাগলটার দড়ি খুলে দাওয়ায় আনল পবন, তার উপস্থিতিতে ভাবানী থামিয়ে ছাগলটা গোল-গোল ভয়ার্ত চোখ তুলে দেখছে। তার কাঁপুনি তখনও থামেনি। কিন্তু পবনেরও কিছু করার নেই, ধারে কাছে ছেঁড়া বস্তা বা ঐ জাতীয় কিছু থাকলে সে নিজের হাতে চাপিয়ে দিত ছাগলটার গায়ে।

শেষ রাতের নিকষ কালো অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে বাঁশ বাগানের ভেতরে। কোথা থেকে একদল কাক উড়ে এসে 'কা-কা' করে ডাকতে শুরু করল বাঁশডগালে বসে। এত ভোরে পবন খুব কমই ওঠে। আশ্চর্য প্রসন্নতায় তার চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল বারবার।

দেরীতে ঘুম ভাঙার জন্য সুভদ্রার অপরাধী মনে হল নিজেকে; চোখ ডলতে-ডলতে সে ঘরের বাইরে এসে দেখল ঐ অত ভোরে পবন বাঁশের ডগা ধাপিয়ে কচিপাতা ভেঙে দিচ্ছে ধাড়ী ছাগলকে।

—পবন। দূর থেকে ডাকল সুভদ্রা, দীঘায় যাবি নে? বেলা বাড়লে সাইকেল ঠেলতে অসুবিধা হবে, যা করার তাড়াতাড়ি কর।

দীঘা যাওয়ার কথা এক মুহূর্তের জন্য ভোলেনি পবন। সারা রাত স্বপ্নে দীঘার বালিয়াড়িতে সে ঘুরে বেড়িয়েছে খালি পায়ে। দু-হাত ভর্তি ঝিনুক। মালা তার সামনে দাঁড়িয়ে উৎসাহ ভরা গলায় বলছে—দাও না, এগুলো আমি সাজিয়ে রাখব ঘরে। কিন্তু ঝাউবনের অদূরেই দাঁড়িয়েছিল মেনি, তারও সেই একই প্রশ্ন, দাদা রে, ঝিনুকগুলো আমাকে দে-না? এগুলো দিয়ে আমি এট্টা সোন্দোর পারা মালা

গাঁথব। ঝিনুকগুলো কাকে দেবে, কাকে দেওয়া উচিত—এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি পবন। ঠিক তখনই বর্ষার ছাঁটে ঘুম ভেঙে যায় তার, ধাড়ী ছাগলের গোঙানী শব্দ তার কানে এসে বেঁধে।

গেল রাতে ভাতের সাথে দুটো গোল আলু সিজিয়ে নিয়েছিল সুভদ্রা, সে আলু দুটোর 'রাইতা' বানিয়ে দিল তেল-লঙ্কা-পিঁয়াজ দিয়ে। ঐ অত ভোরে খেতে বসে অস্বস্তি লাগছিল পবনের, তার মনে পড়ে গেল সরস্বতী পূজার আগের রাতের কথা। দুপুর পর্যন্ত উপোস থেকে অঞ্জলি দেওয়ার ভয়ে ভোর থাকতে উঠে জলঢালা ভাত পেট ভরে খেয়ে নিত সে। খুব সকাল থেকে খাওয়ার অভ্যাস—যদি ক্ষিদে লাগে সেই জন্য। এখন অঞ্জলি দেবার জন্য নয়, পেটের জন্যই পেট ভরাচ্ছে সে। সুভদ্রা বলল, আর দুটো ভাত দিই?

ঘাড় নাড়ল পবন। সুভদ্রা পবনের মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন দুঃখী স্বরে বলল, তোর বাবা তো থেকেও নেই। কবে যে তার যাত্রার নেশা ছুটবে—এ আমি জানি নে। এত বড় সন্সার তোর দাদু একা টানতে পারে না। চোখ-কান খোলা রেখে কাজ-কারবার করবি, নাহলে সবাই তোকে ঠকিয়ে নেবে।

—ঠকিয়ে নেওয়া সহজ নয়। পবন জোরের সঙ্গে বলল, হিসাব আমি ভালই বুঝি। জোর করে কেউ ছিনিয়ে না নিলে—কেউ আমার কাছ থেকে এক পয়সাও বাড়তি নিতে পারবে না। পবনের কণ্ঠস্বরে আত্মপ্রত্যয়ের সুস্পষ্ট ছাপ। সুভদ্রা বলল, দুপুরে কিছু খেয়ে নিস দোকানে। কারবার করতে গেলে শরীরটা ঠিক রাখা দরকার আগে। গায়ে শক্তি না থাকলে মাছের ভার বইবি কী করে?

সাইকেলটা ঠেস দেওয়া ছিল খুঁটিবাঁশে। যাতে না পড়ে সেইজন্য শাড়ির পাড় দিয়ে বেঁধে রেখেছিল পবন। গিঁট খুলে দাওয়া থেকে সাইকেলটা নামাল সে। ঝুড়িটা কেরিয়ারে বেঁধে আগড় সরিয়ে বাইরে এল সে।

পেছল পথ। উঁচিয়ে থাকা ঘাসের ডগা ভিজে আছে শেষ রাতের বৃষ্টির জলে। পবনের পরনে ঢোলা, খাকী রঙের একটা ফুলপ্যান্ট। ছেঁড়া গেঞ্জির উপরে রঙ জ্বলা একটা শার্ট। পায়ে এগরা হাটে থেকে কেনা সাড়ে সাত টাকার চপ্পল। লাল গামছাটা সে বেঁধে নিয়েছে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে। একটা চটের থলিতে সের-বাঁটখারা, কাঁটা দাঁড়িপাল্লা—যা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কিনে দিয়েছেন দুলুবাবু।

পবন যখন সাইকেলে চাপতে যাবে তখন পুকুরঘাট থেকে চোখে-মুখে জল দিয়ে এগিয়ে এল মেনি। সুভদ্রা তাকে জোর করে ঘুম থেকে তুলে দিয়েছে। ঘুমের আলিস্যি তার তখন যায়নি। আড়ষ্টতা কাটিয়ে হাই তুলে মেনি বলল, দাদারে, যাওয়ার আগে মা শীতলা বুড়িকে গড় করে যা।

মেনির বুদ্ধি দেখে সুভদ্রা, হৈমবুড়ি, ব্রজবুড়া সকলেই থ। পবন সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে শীতলাথানের দিকে বিনম্র, শ্রদ্ধাবনত চোখে তাকাল। মনে মনে বলল, মা শীতলা বুড়ি, আমি যেন দুলুবাবুর মুখ রাখতে পারি। আমি যেন ভালোয় ভালোয় সব কাজ সারতে পারি। জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে পবন আর দেরী করল না, সাইকেলের ঘন্টি বাজাতে বাজাতে সে উঠে এল পিচসড়কে। অস্পষ্ট অন্ধকারে পিছন ফিরে দেখল—তার মা তখনও পাথর প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে মেনির হাত ধরে। পুরো হাড়িসাই স্থির চিত্রের মতন, বৃষ্টি ভেজা চালাঘরগুলো তখনও গুঞ্জনহীন।

ভুড়িমগরের পেটের মত বালিয়াড়ির গায়ের রঙ, সারারাত একটা নোঙর পড়ে মাখা ময়দার চেয়েও নরম হয়ে আছে চরাচর। ঝাউবনের পূব দিকে সাইকেল দাঁড় করিয়ে চা খেল পবন, এতটা রাস্তা সাইকেলে ঠেলে এসে চরম হাঁপিয়ে পড়েছিল সে। বড় বড় শ্বাস নিয়ে, গায়ের ঘাম গামছায় মুছে সে বিস্ময় ভরা চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল সমুদ্রের দিকে। সকালবেলায় সমুদ্রের ধার শীতলা থানের আঙিনার মত। মৌন সাধক হাওয়ায় উড়ছিল ঝুরো বালি—যার গায়ের রঙ স্বর্ণকুঁচির সমতুল্য। এই বালি এবং বালিয়াড়ি পবনকে বরাবরই হাতছানি দিয়ে ডাকে। ধর্মাবাবুর ভয়ে সে যেবার পালিয়ে এল—তখন এই সমুদ্রই তাকে অজ্ঞাতসারে ডেকেছিল। জলের ডাক বিশেষত সমুদ্রের ডাক পবন কোনদিন

ফিরিয়ে দিতে পারে না; সমুদ্রধার তাই তার কাছে তীর্থক্ষেত্র। এখানে কতরকমের মানুষ, কত বিচিত্র জাতের পাখি-মাছ তাকে আকর্ষণ করে—একথা সে মেনিকেও বলে বোঝাতে পারবে না।

গরম কাচগ্লাসে চুমুক দিয়ে আনমনা হয়ে গেল পবন, মালার মুখটা দুলে উঠল মনের কোণে। মালা বলেছিল, যাওয়ার সময় দেখা করতে। একথা পবনও ভোলেনি। তারও ইচ্ছে ছিল দেখা করার কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কালো মোটর সাইকেলটা দুলুবাবুদের উঠোনে দেখে—সাহস করে গেট খুলে সে আর ভেতরে ঢোকেনি। কেন না সুদেববাবুকে তার একটুও পছন্দ নয়। ভদ্রলোকের মুখ মিষ্টি কিন্তু ভেতরটা তেতো—এটা পবন বুঝতে পেরেছে হাড়ে-হাড়ে। যারা চিবিয়ে কথা বলে, হ্যাংলার মত মেয়েদের দেখে, ঘন ঘন চুলে চিরুণী চালায়, নিজেকে বিজ্ঞাপিত করে অকারণে তাদের চরিত্রের বিশুদ্ধতা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে পবনের। আসার সময় মালার সঙ্গে দেখা হল না শুধু সুদেববাবুর জন্য। কাল রাতে যার কাঁথি ফিরে যাবার কথা ছিল—তিনি কেন কাঁথি ফিরলেন না—এর অন্তরালে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। সেই রহস্য উন্মোচনে আদৌ সচেষ্ট হ'ল না পবন, একরাশ ঠাণ্ডা হাওয়া যখন তার বুকের উপর আছড়ে পড়ল, যখন আয়েসী সমুদ্র মালার মত খিলখিলিয়ে হেসে উঠল শরীরে উথাল-পাথাল ঢেউ তুলে—তখন পবন মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ফেনিল সমুদ্রের দিকে। সে যে মাছ সংগ্রহের আশায় এসেছে—একথা বেমালুম ভুলে গেল।

পুব দিগন্তে সূর্যের লাল আভা টুকটুকে সিঁদুরে রঙকেও হারিয়ে দেয়। এই সিঁদুর মাথা পবিত্র লাল রঙ কদাচিৎ পবন তার মায়ের সিঁথিতে প্রত্যক্ষ করে। যেদিন শীতলা থানে পুজো দিতে যায় মা, কেবল সেদিনই পাতা সিঁদুরের মোহনী রঙটি শোভা পায় সীমন্তে; এছাড়া সিঁদুর ধোয়া সিঁথির লাল রঙ তার চোখকে পীড়া দেয়। একজন সধবা মানুষ সিঁদুর কিনে পরার পয়সা পায় না—একথা ভাবতেও খারাপ লাগে পবনের। অভাবের বিশাল হা-মুখ যেন পিঁতাথেঁতা মগরমাছের হাঁয়ের চেয়েও বড়। অভাবের ধারাল দাঁতের কামড়ে শুধু পবন নয়—হাড়িসাইয়ের প্রতিটি মানুষই জ্বলছে।

শূন্য চায়ের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে দাম মিটিয়ে দেয় পবন। বুকের ভেতর জ্বালা ধরা উত্তেজনায় নীরবে সে পুড়ছে। পুরো হাড়িসাই যেন অভাবের ধারাল দাঁতের ফাঁকে আটকে গিয়ে মুক্তির জন্য ছটফট করছে এখন। প্রাত্যহিক জঠর যুদ্ধের নিরন্তর, অনমনীয় যে সংগ্রাম—তার ছত্রছায়ায় এতগুলো হাড় জিরজিরে মানুষ দাসত্বের বেড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারছে না। জেদটা মস্তিষ্ক কোষে অহরহ কামড়ায়। শুধুমাত্র পয়সার অভাবে পড়াশুনা হল না পবনের, একথা কী করে সে বিস্মৃত হয়ে থাকতে পারে? অভাবের থাবাটা কত বড়, কত ভয়ঙ্কর তা দেখতে চায় পবন। দুলুবাবু না গিয়ে এলেও সে কিছু না কিছু করত। একটা ভাগাড় অতগুলো মানুষের জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। ভাগাড় কখনও মানুষকে স্বচ্ছলতা দিতে পারে না, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে পবন সাইকেল ঠেলতে শুরু করল বালিয়াড়িতে। কাঁটা দাঁড়িপাল্লা আর ধাতব বাঁটখারার সংঘর্ষ হয় চটের থলিতে। ঐ সংঘর্ষ-শব্দ অনুপ্রাণিত করে পবনকে। বেঁচে থাকার জন্য এই জটিল পৃথিবীতে কোন কাজই ছোট নয়। পবন হারবে না, সে হারতে শেখেনি। তার মনোবলই তাকে সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করবে। মায়ের আশীর্বাদ, মেনির ভালবাসা তাকে ক্রমশ জেদী করে তোলে। ভেজা বালিতে আটকে গিয়েছে সাইকেলের টায়ার, হাত-পায়ের পেশীতে অদম্য শক্তি সঞ্চয় করে প্রকিূলতার বিরুদ্ধে হেঁটে যাচ্ছে পবন; তার কোন ক্লান্তি নেই, অবসাদ বা বিষণ্ণতা নেই। সে যেন সমুদ্রের নতুন ঢেউয়ের মতন।

নারাণ সাউয়ের সারণি জাল যত ডাঙার কাছাকাছি এগোয়, টেঁটিয়া আর কেরিপাখির ডাক বাড়তে থাকে তত। নোনা মাছের আশায় মাঝ আকাশে ছেঁড়া ঘুড়ির মত এলোমেলো ওড়ে লোভী সমুদ্র চিল। প্রসারিত ধূসর ডানায় কাঁপুনী তুলে সমুদ্র চিলের ছোঁ মেরে নিচে নেমে আসার দৃশ্য দেখার মতন। চিলের স্বভাব পবনের মনঃপূত নয়, কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে ওড়ার ভঙ্গিটা ভাল লাগে তার।

সারণি জাল টানছে দশ-বারটা মুনিষ, দূর থেকে তাদের নোনাজলে ভেজা চেহারাগুলো আলকাতরা পোঁচ দেওয়া নৌকোর কাঠের মত দেখায়। একটা সমবেত সুর প্রতিটি পদক্ষেপে নোনা বাতাস ভরিয়ে আছড়ে পড়ছে পাড়ে। এক পা-এক পা করে কোমর জল থেকে ডাঙার দিকে এগিয়ে আসছে মানুষগুলো। ভেজা বালিতে পা ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে আছে অগুন্তি ফড়ে-দালাল, মাছকারবারী আর মাছকুড়োনীর দল। চার-পাঁচটা ভ্যান-রিক্সো বালিয়াড়িতে মাছ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী। সারণিজাল যত এগিয়ে আসছিল, তত বেশী চিন্তিত দেখাচ্ছিল পবনকে। জলের মাছ ডাঙায় না উঠলে আন্দাজ পাওয়া মুশকিল। যারা বাঁধা কারবারী, রোজ মাছ নেয় মহাজনের কাছ থেকে—তারাই আগে মাছ পাবে। অবশিষ্ট থাকলে পবনের মত আনকোরা নতুন'রা মাছ কেনার সুযোগ পাবে। প্রথম দিনেই যদি শূন্য হাতে ফিরে যেতে হয়—তাহলে আফশোষের আর শেষ থাকবে না। সমুদ্র পাড়ে যথেষ্ট হাওয়া ছিল তবু এসব দুশ্চিন্তায় ঘেমে উঠছিল পবন। দশ-পনের কেজি মাছ যে করেই হোক—আজ তার চাই। প্রথম দিনে শূন্যহাতে ফিরতে সে নারাজ। ফড়ে কারবারীদের গুঞ্জনের মাঝে অস্থির পবন নারাণ সাউকে খুঁজছিল। শুধু নারাণ সাউ নয়—মাছখটীর চেনা-জানা কাউকে দেখতে পেলেও এযাত্রায়•সে উদ্ধার হোত। কিন্তু চোখের সামনে কাউকেই সে দেখতে পেল না। হতাশ পবন ঝুড়িটা পায়ের কাছে নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ।

নারাণ সাউ এল অনেক পরে, তখন রোদের নম্রতা মুছে গিয়ে গায়ে জ্বালা ধরান উত্তাপ। পবন ভেবেছিল, নারাণ সাউ হয়ত তার মুখটা ভুলে গিয়েছে—কিন্তু তার এই অনুমান মিথ্যা। চোখাচোখি হতেই নারাণ সাউ হাত উঁচিয়ে ডাকল, পবন না? কী ব্যাপার, এখানে?

ভেজা বালিতে পা ছুঁইয়ে এগিয়ে গেল পবন, তোমার কাছে এসেছি বাবু, আজ আমার বিশ সের মাছ চাই।

—এত মাছ দিয়ে কী করবি?

ঢোক গিলল পবন; হাত কচলে বলল, পেটের জন্য মাছ ব্যবসায় নেমেছি। গাঁয়ে-ঘরে খেটে খাওয়ার মত কাজও নেই। কী করব, ধার-দেনা করে তোমার কাছে ছুটে এলাম; তুমি বলেছিলে—আপদে-বিপদে দেখবে।

নারাণ সাউ অভিজ্ঞ চোখে হাসল, সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল, মাছ ব্যবসায় ঝামেলা অনেক—তুই কি পারবি?

—মানুষ পারে না এমন তো কোন কাজ নেই। পবনের দৃঢ়তায় খুশি হল নারাণ সাউ, মাছের ঝুড়িগুলো গুণে নিয়ে বলল, মেঘলায় মাছের আমদানী কম। দাঁড়া, দেখি কী করা যায় তোর জন্য। বলেই এগিয়ে গেল চেটো জলে। ফিস্‌ফিস্ করে লুঙ্গি পরা একজনের সঙ্গে কী সব কথা বলে ফিরে আসল আবার। পবনকে বলল, কী ধরনের মাছ চাই তোর?

—গাঁয়ে-ঘরে দামী মাছ বিকবে না। বাবু, তুমি আমাকে পাঁচমিশেলী মাছ দিও।

—তাহলে রূপাপাটিয়া আর পানিখিয়া মাছগুলো যতটা হয়—সবটা তুই নিয়ে নে। আমি আলমকে বলে দিয়েছি। সে তোকে সস্তায় দিয়ে দেবে।

—বাবু? পবন কিছু বলতে চাইল।

নারাণ সাউ বলল, বল।

পবন সহজ হবার জন্য ঢোক গিলল, মাছ ব্যবসা ছাড়া আমার এখন আর কোন গতি নেই। তুমি যদি আলমচাচাকে একটু বলে দিতে—তাহলে আমার সুবিধা হোত। রোজই আমার মাছ দরকার।

—ভাল কথা। মন লাগিয়ে কারবার কর। মাছের জন্য তোকে ভাবতে হবে না।

নারাণ সাউয়ের কথায় বুকে বল ফিরে পেল পবন, কৃতজ্ঞতায় চকচকিয়ে উঠল তার চোখের তারা।

শুধু রূপাপাটিয়া আর পানিখিয়া মাছ নয়, আলম তাকে লহরা আর টাউরী মাছ দিয়ে দিল সের চারেক। মহাজনের পেয়ারের লোককে সে-ও খাতির করল সুযোগ মত, মাছ-ঝুড়িটা সাইকেলের পিছনে

চাপিয়ে শনরশায় বেঁধে দিল জুঁত করে। এতটা সহযোগিতা আশা করেনি পবন; ফলে খুশী হয়ে সে বলল, কাল সকালে আবার দেখা হবে আলমচাচা। আমি রোজ আসব।

ভেজা দাড়িতে হাত বুলিয়ে আলম বলল, এই কাঁচা বয়সে মাছ বইতে পারবে তো? এ লাইনটা বড় খারাপ লাইন। নোনা জলের মানুষগুলো কেউ কাউকে দেখতে পারে না। এখানে বড় ক্কেয়োক্কেয়ি।

পবন নিরুত্তাপ স্বরে বলল, আমি কারোর সাথে-পাঁচে থাকব না। শুধু আমার কারবার নিয়ে থাকব। লোকের কাছ থেকে ধার করে ব্যবসায় নেমেছি আমি, সে সব টাকা আমাকে শুধবে হবে।

—কোন্ কোন্ হাটে বেচবা?

আলমের মুখের দিকে তাকিয়ে পবন উত্তর হাতড়ায়। কোন হাটে সে মাছ নিয়ে যাবে—এটা এখনও সে ভাবেনি। তবে দুলুবাবু বলেছেন, চোরপালিয়া, পানিপারুল, আর আশেপাশের হাটগুলোতে বেচতে।

—মাছ কারবার হলো গিয়ে গোলকধাঁধার মতন। বলল আলম, এই কারবারে চোখ-কান-নাক সব কিছু খোলা রাখতে হয়। সেই সাথে সময় জ্ঞানও থাকার দরকার। নাহলে মাছ পচবে, পয়সা আঁশজল হয়ে ধুলোয় মিশে যাবে, আর কোনদিন তাহলে মাজা সোজা করে দেঁড়ুতে পারবা না। গতরের চোট যত জলদি মেলায়, কারবারের চোট অত খপখপ মেলায় না। এ লাইনে আমার চুল-দাড়ি পাকল। তুমি আমার ছেলের মতন, কথাগুলো মনে রেখো। ঠক্‌বা-না তাহলে।

অথচ প্রথম দিনেই ঠকে যাচ্ছিল পবন, পানিপারুল বাজারের অন্যান্য মাছ বেপারীরা কিছুতেই তাকে বসার জন্য জায়গা দেবে না। পবনের সব কাকুতি-মিনতি কথার তোড়ে শুকনো পাতার মত উড়িয়ে দিল তারা। নেতা গোছের একজন পবনকে বলল, সবাই যদি বেশ্যাখাতায় নাম লেখায়—আমরা তাহলে যাব কোথায়? এই হাটে তোমার জায়গা হবে না, অন্য কোথাও দেখো। কোথায় যাবে পবন? মাথার উপর অকাশ ভেঙে পড়ার চিন্তা। সাবাড়জালে জড়িয়ে যাওয়া মাছের মত তার শোচনীয় অবস্থা, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দরদরিয়ে ঘামছিল। মাছের ঝুড়ি চুঁইয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জলে ভিজে যাচ্ছিল সাইকেলের মডগার্ড এবং টায়ার। আলমের সতর্কবাণী মনে পড়ল তার, অমনি ভয়ে ছোট হয়ে এল চোখের দৃষ্টি। ঝুড়ি ভর্তি মাছ সময় মত বেচতে না পারলে পচে-গলে দুর্গন্ধ ছাড়বে—সেই সঙ্গে পুঁজির সবটাই মাঠে মারা যাবে।

নোনা মাছের ধকল ক্ষমতা কম, বিশেষত লহরা মাছ সময়ে না বেচতে পারলে পচে-সড়ে গায়ে গায়ে মিশে যাবে, তখন বিনে পয়সায় বিলোলেও কেউ নেবে না। সাইকেলটা ধ[illegible] বাজারের দিকে মুখ করে ঠায় বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল পবন। হাট না ঠিক করে হাটে আসা তার ঠিক হয়নি, নিজের বোকামীর জন্য নিজেই অনুতপ্ত হল সে। দুলুবাবুও হাটের এত মারপ্যাঁচ, রাজনীতির কথা তাকে বলেননি, এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু অজ্ঞতার অজুহাত দিয়ে এক ঝুড়ি মাছ কোনমতেই বাঁচানো যাবে না। যা করার তা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই করতে হবে।

নেতা গোছের লোকটি পবনকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিল, তার ধূর্ত চোখে-মুখে অভিসন্ধির পূর্বাভাব। পবন ভাবল, যদি কিছু করতে পারে তো ঐ লোকটাই পারবে। এই ভেবে সে এগিয়ে গেল লোকটার কাছাকাছি। সবিনয়ে বলল, আমি গরীব মানুষ। জীবনে এই প্রথম কারবার করতে নেমেছি। একেবারে প্রথম দিনে আপনারা যদি আমাকে কারবার করার সুযোগ না দেন তাহলে আমার মাছগুলো সব পচবে। ধূর্ত লোকটি চোখের দৃষ্টিকে খোঁচা মেরে হাসল, মাছ পচবে না, পাইকারী দরে বেচে দাও। বলো কত দিতে হবে ঝুড়ির দাম?

পবন হিসাব কষে যে দাম বলল তাতে অচমকা সাপের গায়ে পা দেওয়া মানুষের মত পিছিয়ে গেল লোকটা, অত দাম তো এক ঝুড়ি ইলিশমাছেরও নয়। তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হলো?

পবন জোরের সঙ্গে বলল, দাম আমি ঠিকই বলেছি। আসা-যাওয়া খায়-খরচ ধরলে ঐ দাম ছাড়া কিছুতেই আমার পড়তা হবে না। দু-চার টাকা আমার যদি লাভ না থাকে তাহলে আমি খাব কী?

—তোমার খাওয়ার দায়িত্ব কি আমাকে নিতে হবে? লোকটা চোখ কপালে তুলে তাকাল, তারপর বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, যা পার কর, আমি চললাম। লোকটা কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল, আমার দামে না দিলে মাছগুলো ঘরে নিয়ে গিয়ে শুকিয়ে ফেল। নাহলে ঝোলচচ্চড়ি, টক রেঁধে গুষ্টিশুদ্ধু খাওগে যাও। এ হাটে তোমার জায়গা হবে না, এ হাট আমাদের। এখানে ছুঁকছুঁক করে কোন লাভ নেই। যাও, চলে যাও। কথা না শুনলে ঝুড়ি শুদ্ধ মাছ আমি কুকুরের মুখে ঠেলে দেব।

কথাগুলো বিষাক্ত সাপের মত বার বার ছোবল মারল পবনের মনে। রাগে-অপমানে নীল হয়ে গেল তার অপাপস্পর্শী মুখমণ্ডল। লোকটার ক্রূর চোখের দিকে তাকিয়ে সে বজ্রকণ্ঠে বলল, আমার অত কষ্টের মাছগুলো আপনি কুকুরকে খাইয়ে দেবেন? কই দিন দেখি?

ক্ষিপ্র গতিতে লোকটা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটে এল সাইকেলের কাছে, তারপর হ্যাঁচকা টানে সাইকেলটা ছাড়িয়ে নিয়ে গায়ের শক্তিতে ঠেলে দিল দূরে। পড়েই যেত কিন্তু মাছ বেপারী বাঁকা গিয়ে কোনমতে ধরে ফেলল সাইকেলটা। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, লালুদা, কাজটা কিন্তু তুমি ভাল করছো না। পবনা আমার ভাই, ওর একটা মাছ নষ্ট হলে আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে কথা বলব না।

লালু বাধা পেয়ে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়াল; ঠাট্টার সুরে বলল, দুনিয়া জুড়ে তোর শুধু ভাই আর ভাই। তাই না? আরে শালা, রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই ছিল—আব সব বেইমান-দুশমন। আজ যারে ভাই বলে তুই বাঁচালি, কাল সে তোরে বাঁশ দেবে। দুনিয়াটা বড় কঠিন জায়গা, এখানে কেউ কারোর ভাই নয়—সব দুশমন।

লালু আপন মনে বকতে-বকতে চলে যাবার পর সাইকেল ঠেলে বাঁকা এল পবনের সামনে। খুবই সংকোচের সঙ্গে সে বলল, লালুদার কথায় তুই কিছু মনে করিস না পবনা, লালুদা ঐ রকমই। ওর এক ভাই ছিল—সে সব টাকা-পয়সা চোট করে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে কলকাতায়। সেই থেকে লালুদার মাথার কোন ঠিক নেই। বাঁকা দম নিল, তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বলল, দেখ, দেখ পবনা, কেমন মেঘ করেছে আকাশ জুড়ে; এ মেঘে কিন্তু বরষা হবে। আর দেরী করিসনে, মাছের ঝুড়িটা সত্বর নামিয়ে নিয়ে আমার পাশে বসে পড়। হাট ভেঙে গেলে এত মাছ নিয়ে তুই এখন কোথায় ঘুরবি?

মাছের ঝুড়িটা একা নামাতে পারল না, বাঁকা এসে হাত লাগাতেই পবন খুব আশ্চর্য হল। এই বাঁকাই ক'দিন আগে ওকে ধরিয়ে দিয়েছিল ধর্মাবাবুর কাছে, এই বাঁকাই মাছের ঝুড়িটা ধরাধরি করে নিয়ে গেল মাছ বাজারে। মানুষের চরিত্র বোঝা মুশকিল—পবন হাঁ করে দেখছিল বাঁকাকে। বাঁকা তাড়া দিয়ে বলল, হাঁ করে কি দেখছিস কী? খপখপ চিকচিকি কাগজ বিছিয়ে বিক্রি-বাটা শুরু করে দে। বরষা এল বলে—

সের খানিক মাছ বেচতে বাকি ছিল তখন হুড়মুড়িয়ে বরষা এল আকাশ ভেঙে, সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুৎ-এর হুঙ্কার-ধ্বনি। পবন অসহায় চোখে বাঁকার দিকে তাকাল। বাঁকা বলল, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী হবে? চট করে এ বরষা থামবে না। দাড়িপাল্লা, বাঁটখারা ধুয়ে নে। চল এবার আমরা পালাই। এখনকার বরষা ভাল না, মাথায় জল বসে গেলে ভোগাবে।

পবন অবিক্রিত মাছগুলোর দিকে তাকাল, এগুলোর কী হবে?

বাঁকা ভেজা কাকের চেহারা নিয়ে ঐ দুর্যোগের মধ্যে হাসল, ঘর খরচের জন্য শালপাতা মুড়িয়ে বেঁধে নে। মাছ ব্যবসার এটাই তো সুখ।

ঘর ফিরতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামল তবু আকাশের ছ্যারানো ব্যামো ধরার কোন লক্ষণ নেই। পানিপারুলের ছিঁটে বেড়ার হোটেলে পাশাপাশি বসে ডাল-ভাত-তরকারী খেল বাঁকা আর পবন। দামটা পবনকে কিছুতেই দিতে দিল না বাঁকা। বরং জোর খাটিয়ে বলল, তুই আমার পাড়ার ছেলে। বলতে গেলে ভাইয়ের মতন। আজ থাক, অন্যদিন তুই দিবি। বিড়ি নয় একটা সিগ্রেট ধরিয়ে হঠাৎই উদাস হয়ে গেল বাঁকা। প্রায়শ্চিত্ত করার মত গলা করে বলল, ভাইরে, সে দিনের ঘটনার জন্য তুই আমারে ক্ষমা করে দে। কাক হয়ে কাকের মান্‌সো আমি খেয়েছি। এই চিন্তায় রাতে আমার ঘুম হয় না।

—পুরনো কথা ভুলে যাও। পবন বলল, ঘটি-বাটি এক সাথে থাকলে ঠোকাঠুকি হয়—আর আমরা তো মানুষ। আমাদের তো কাজিয়া-বিবাদ হতে পারে।

—ভাইরে, তোর মনটা বড় উঁচা, তুই অনেক উঁচুতে উঠবি। পবনের ভেজা হাতটা ধরে ক্ষমা-প্রার্থীর ঢঙে দাঁড়িয়ে থাকল বাঁকা। বৃষ্টি থামতেই সে বলল, চল, এবার ঘরের দিকে যাই।

সন্ধের অন্ধকারে বাঁকার কথাগুলো বেশী করে মনে পড়ছিল পবনের, আজ বাঁকা তার কাছে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ বলে মনে হল। মনের বোঝা হাল্কা করে মাঝপথেই বাঁকা চলে গিয়েছে ভাঁটিখানায়, যাওয়ার সময় বলে গেল, আজ মনের সুখে মদ খাব। আজ দু'চোখ ভরে ঘুমাব। আজ মনের সুখে বাজাব ঢাকের পুরনো বোল্‌গুলো ঃ টি-যা, তাকে,—উ রু রু—টি-ই যা তাকে। ঝাঁ-ঝাঁ গৌর-নিতাই। তা-গুড়-গুড়—রাধেশ্যাম গৌর-নিতাই। তা-গুড়-গুড় ধিনাকে, ধি-ই-নাকে।

আগড় খোলার সামান্য শব্দ পেয়ে কুপি হাতে বাইরে এল মেনি. আকাশ তখন টিপটিপিয়ে ঢালছে। মেনির হাতে ভেজা টাকাগুলো ধরিয়ে দিয়ে পবন বলল, তুই ঘরে যা, আমি পুকুব থেকে ডুব দিয়ে আঁশ-জলগুলো ধুয়ে আসি।

—এত ভিজেও কি তোর গায়ের আঁশজল ধোয়নি, দাদা? মেনির প্রশ্নে পবন হাসল, নোনা মাছের ঘ্রাণ মিঠে জলে ডুব না দিলে মেলায় না।

স্নান সেরে পবন যখন ঘরে এল তখন আঁখার পাড়ে উৎসাহ ভরে হুমড়ে পড়েছে সুভদ্রা আর হৈমবুড়ি। কাঠের জ্বালে গরম হচ্ছে রুটি-সেঁকা তাওয়া। তাতে ভেজা টাকাগুলোকে রুটির মত সেঁকে নিচ্ছে সুভদ্রা। দুরে দাঁড়িয়ে সেই উত্তাপ পায় পবন। মেনি তার কাছে সরে আসে; বলল, দাদারে, আমার ঝিনুক কোথায়?

পবন তার জলে ভেজা চোখ দুটোকে দেখিয়ে দেয়।

আট

চোখের সামনে দুলে উঠল পৃথিবী, কপালে করাঘাত করে চাঙ্গা আলের উপর বসে পড়ল মেনি। দু'চোখ ভাসিয়ে নিশ্চুপে নেমে এল অশ্রুধারা। মেনির মুখের দিকে তাকিয়ে কোন কথা সরল না বাঁকার মুখে, শুধু কম্পিত অধরযুগল কেঁপে উঠল বারংবার।

চোখ মুছে, হেলে পড়া উসকো-খুস্‌কো চুল ফাঁকা সিঁথির উপর বিছিয়ে মেনি ভারাক্রান্ত স্বরে শুধোল, হ্যাঁ গো বাঁকাদা, দাদু এখন কেমন আছে গো?

তার আর্ত জিজ্ঞাসা ফাঁকা মাঠে ছড়িয়ে পড়ে মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে। বাঁকা উত্তরহীন নিষ্পলক চোখে তাকাল। আলের ঘাস ছুঁয়ে উঠে দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করল মেনি, কিন্তু ঝাঁ করে মাথাটা ঘুরে যাওয়াতে দু-হাত নোঙর করার মত মাটিতে বিছিয়ে সে আবার চকিতে বসে পড়ল শুকনো আলে। টপটপিয়ে ঝরে পড়ল অশ্রুফুল; তার নিষ্পাপ মুখমণ্ডলে সেই অশ্রুকষ গভীর আঁচড় কাটল অপারগতার।

ফাঁকা মাঠে হেমন্তের বাউল বাতাস দৌড়ঝাঁপ খেলায় মত্ত। মেনির পায়ের কাছে চরম অনাদরের বস্তু হয়ে পড়ে আছে গোবর ভর্তি ঝুড়িটা। দু-হাতের কাঁচা গোবর শুকিয়ে খড়খড় করছে রুখাশুখা আবহাওয়ায়। এ সময় গা-গতরের চামড়ায় খড়ি ফোটে। খুব ভোরে সূচলো ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু মুক্তো দানার মত টলমল করে সূর্য কিরণে। খালি পায়ে ঘাস মাড়িয়ে হাঁটলে নোঙরে ভিজে যায় পা।

পুকুরঘাট থেকে ফিরে এসে মেনি ব্রজবুড়াকে নিষেধ করেছিল গাঁ ঘুরতে যেতে। তার কথা বুড়া মানুষটা কানে তোলেনি। রাতভর যে মানুষটার গা পুড়ে গেল জ্বরে, সেই জ্বরো মানুষটা ভোর বেলায় উঠে গাঁ ঘুরতে যাবে এটা কিছুতেই মন থেকে মানতে পারেনি মেনি। অথচ হৈমবুড়ি মনে-প্রাণে চাইছিল, ব্রজবুড়া গাঁ ঘুরতে যাক। অভাবের হিমসাপ কাউকে ছোবল মারতে ছাড়ে না। ব্রজবুড়া গাঁ ঘুরতে গেলে দু-চার পয়সা কামাই হয়। বরাত ভাল হলে ক্ষুদ গুঁড়া, আতপ চাল, কলাটা-মুলোটাও জুটে যায়। এই আক্রাগণ্ডার দিনে এগুলোই বা আসে কোথা থেকে? পবনের একার আয়ে এতবড় সংসার ধুঁকো বকের মত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। সমুদ্রমাছের বাজার এখন মন্দা। উত্তরা হাওয়ায় মাছেরা সব নিরুদ্দেশ হয়েছে স্থির জলে। সারণি বা সাবাড় জালে মাছ না পড়লে মাছ ব্যবসায়ীরা বাঁচে কী করে। পবনের মনমেজাজও ভাল নেই। বাঁকা তো লোকসান দেখে মাছ ব্যবসা ছেড়ে দিল। এমন একটা কঠিন সময়ে সংসারের ঘানি টানা মুখের কথা নয়। ব্রজবুড়া চোখের সামনে সব দেখে ঘরে বসে থাকে কী করে? যাব চোখে পাতা আছে সে মানুষ কুড়িয়া হয়ে ঘরে বসে থাকে কী করে?

ব্রজবুড়া পারেনি।

দিনের আলো ফুটতে চাকু-ক্ষুর, ঝুলি-ঝাঁপি নিয়ে সে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘব থেকে। তাব অনেক আগে পবন চলে গিয়েছে দীঘায়। মেনি উঠান পেরিয়ে আগড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে পবনকে। সাইকেলের সীটে বসে পবন আর পিছন ঘুরে তাকায়নি! মেনি তবু চিৎকাব কবে বলেছে, সাঁঝলাগাব আগে ফিরে আসিস দাদা। তুই সময় মত ঘব না আসলে মা খুব ভাবে। শুধু ঘর আর বার করে।

প্রতিটি সকাল মেনির বুকে গভীর এক আঁচড় কেটে দেয় যার যন্ত্রণায় সারাদিন মেনি বড় উন্মনা। হাড়িসাইয়ে তার সহেলী খুব কম। আগে টুকি তার সঙ্গে গোবর কুড়াতে আসত বিলমাঠে। এখন টুকিও আসে না। এবার ধানের ফলন ভাল। যাদের জমি-জিরেত আছে তারা কেন ঝুড়ি কাঁখে নিয়ে গোবর কুড়াবে মাঠে? টুকি আসে না কিন্তু মেনিকে আসতে হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। একদিন গোবর কুড়াতে না এলে বড় মুখ করে সুভদ্রা। মুখ ভার করে বলে, অতবড় ধাড়ী মেয়ে ঘবে বসে থাকিস, লাজ লাগে না। বলি তোর বাবা তো রাজকোষ রেখে যায়নি যে তা ভাঙিয়ে ঠ্যাং-এর উপর ঠ্যাং তুলে খাবি। গরীবের ঘরে জন্মেছিস যখন তখন হাত-পা নাড়িয়ে তোকে খেতে হবে। অত সোহাগী হয়ে ঘরে বসে থাকলে চলবেনি। তোর দাদার কথাটা ভাব। খেটে খেটে শরীরটা তার কালি হয়ে গেল। অথচ তার এখন খাটার বয়সই হয়নি।

সুভদ্রার দীর্ঘশ্বাস মেনিকে যে স্পর্শ করে না তা নয়। অভাবের হা মুখে শরীর আটকে গেলে কারোর কিছু করার থাকে না। অভাব অনটনের দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন পীড়িত করে মেনিকেও। সব বুঝেও তার যে কিছু করার নেই। মাঝে মাঝে বাবার প্রতি অভিমানে তার বুকের ভেতরটা গুমরে ওঠে, ব্যথা-যন্ত্রণার অব্যক্ত অভিব্যক্তিতে নীল হয়ে যায় চোখ-মুখ। বাবা কবে ঘরে ফিরবে মেনি ভাবে। আর ভাবে বলেই সবার চোখ এড়িয়ে এক ছুটে সে চলে যায় শীতলাতলায়। মানত করে বলে, মা শীতলাবুড়ি, তুমি আমার বাবাকে খপখপ ঘর ফিরিয়ে দাও। সে না থাকাতে মার কষ্ট হয়। আমি যে মার মুখের দিকে তাকাতে পারিনে। কাঁদলে আমি যে চোখে জল আটকে রাখতে পারিনে।

কেউ তার কথা শোনে না।

বাঁকার মুখের দিকে তাকিয়ে হারানো মনোবল ফিরে পাবার চেষ্টা করে মেনি। দুঃসংবাদটা শুনেই হাড়িসাই থেকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছে বাঁকা। ব্রজবুড়া ছাল ছাড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে হুমড়ে পড়েছে মরা গোরুর শিংয়ে। আঘাত মারাত্মক। সংজ্ঞাহীন মানুষটাকে ভাগাড় থেকে তুলে এগরা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে গ্রামের মানুষরা। হৈমবুড়ি সংবাদ শুনে কেঁদে-কেটে অস্থির। সুভদ্রা বাক্যহীন। পাড়া-পড়শীরা বুড়োর এই অবস্থার জন্য পুরোপুরি দায়ী করছে সুভদ্রাকে। তাদের বক্তব্য বুড়া মানুষটা যখন রাতভর জ্বর ধাদসে কোঁকাল তখন সকাল হতেই তারে কেনে চাম কাটতে পাঠালে? বলি দুটা দিন কী বিশ্রাম দেওয়া যেত না বুড়া মানুষটাকে।

সুভদ্রা বরাবরই শামুক প্রকৃতির। পড়শীদের অভিযোগ অনুযোগ তাকে আরও গুটিয়ে দিয়েছে। কাকে বোঝাবে সে, কার মুখ চাপা দেবে?

হৈমবুড়ির বাতাস ফাটান কান্না ধান মাঠ থেকে যেন শুনতে পায় মেনি। একটা শিকারপ্রিয় চিল মেনির মাথার উপর দিয়ে ভৌতিক ছায়া ফেলে উড়ে যায় দিকচক্রবালে। চারা বাবলাগাছের মাথায় কম্পমান সাদা ওড়নার মত ডানা কাঁপিয়ে সরু সরু ঠ্যাং জড়োসড়ো বুকের কাছে টেনে এনে বসে আরামপ্রিয় বক। এই খণ্ডিত দৃশ্যাবলী মেনির মনে কোনো রেখাপাত করে না, সাময়িক আচ্ছন্নতা কাটিয়ে সে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলে, চলো বাঁকাদা। আমিও তোমার সাথে এগরা যাব। আমি আর ঘর যাব না।

—তোর গোবর ঝড়া কোথায় রাখবি? বাঁকার প্রশ্নে মেনি চারা বাবলাগাছটার দিকে তাকাল। তারপর শুকনো মুখে বলল, তুমি টুকে দাঁড়াও, আমি গোবর ঝড়াটা বেবুরগাছতলায় রেখে আসি। হাসপাতাল থেকে ফিরে গোবর ঝড়া আমি নিয়ে যাবো।

কথা নিঃশেষ করে লম্বা লম্বা পা ফেলে মেনি এগিয়ে গেল বাবলাগাছটার কাছে, গোবর ভর্তি ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে সে ফিরে এল হন্তদন্ত হয়ে।

আলপথে সাইকেল চালানো ঝক্কি বলেই বাঁকা সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে এসেছিল হাইস্কুলের থামে। আজ রবিবার। ইস্কুল বন্ধ। পাকা সড়কে ওরা যখন এসে পৌছাল তখন প্রচ্ছন্ন দুপুর, ঝাঁকড়া বটগাছের ঘন পাতার আড়ালে ঘুঘু ডাকছিল ঘুঘুর ঘু-উ-উ শব্দে। এই ক্লান্তিকর ডাক মেনির মনে এখন কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না বরং তার গা-টা কেমন গুলিয়ে ওঠে এই নিরবচ্ছিন্ন ক্লান্তিকর শব্দে। বাঁকা বাঁই বাঁই করে সাইকেল চালিয়ে তার সামনে আসতেই মেনি শুকনো মুখে বলল, দাদা ঘরে নাই। দাদা ঘরে থাকলে আমার এত চিন্তা ছিল না।

—তোর দাদা নেই তো কী আছে, আমি তো আছি। সাহস দেবার চেষ্টা ক বাঁকা। মেনি বাঁকার উদ্‌ভ্রান্ত, ঈষৎ বিব্রত চোখের দিকে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা স্বরে শুধোল, বাঁকাদা, দাদুর হুঁস আছে তো?

বাঁকা এ প্রশ্নের উত্তর সরাসরি দিল না। সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে পাকা রাস্তায় উঠে এসে সে বলল, আর দেরী করা ঠিক হবে না। তুই সাইকেলের পিছনে লাফ দিয়ে বসে পড়। আমি ঝড়ের মত সাইকেল উড়িয়ে নিয়ে যাব। এগরা তো বেশী দূরের পথ নয়। দেখতে দেখতে পৌঁছে যাব।

মেনির পিছনে বসার অভ্যাস ছিল। পবনের চলন্ত সাইকেলে সে কতবার লাফ দিয়ে বসেছে তার কোন গোনাগুনতি নেই। তবে সেই বসা আর আজকের বসার মধ্যে বিস্তর ফারাক। লাফ দিয়ে বসতে গিয়ে মেনির তাঁত শাড়িটা আর একটু হলে জড়িয়ে যাচ্ছিল পিছনের চাকায়। কিন্তু মেনি তা শারীরিব পটুতায় সামলে নিল আশ্চর্যজনকভাবে। পিচ রাস্তার দু-ধারের মাইল খানেক জনবসতি পিছনে ফেলে এলেই নজরে পড়ে বিস্তৃত ধানমাঠ। গোরুরা আয়েশী ভঙ্গিতে চরছে পুরো মাঠে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে।

বেশ কিছুটা আসার পর বাঁকা বলল, কীরে মেনি, কথা কইছিসনা কেন? চুপচাপ বসে থাকলে ঝিম ধরবে হাতে-পায়ে। কথা ক। কথায় পথ ছোট হয়ে আসে।

হাসতে গিয়েও কাঠিন্য প্রকাশ পেল মেনির ওষ্ঠযুগল আর চোখের দৃষ্টিতে। বয়সের তুলনায় সে একটু অতিরিক্ত গম্ভীর। এতটা পথ নিশ্চুপ আসাতে সেই গাম্ভীর্যের সর আরো পুরু হয়ে ধরা পড়েছে

চোখে-মুখে। বাঁকা চাইছিল মেনি কথা বলুক মন খুলে, দম ধরে থাকলে কষ্টের গভীরতা বাড়ে বই কমে না। কিন্তু মেনিকে নিরুত্তর দেখেই বাঁকাই আলাপ জমাবার চেষ্টা করল, জানিস, মাছ ব্যবসায় এখন আর তেমন সুখ নাই। দালাল মাতব্বরদের উৎপাত বেড়েছে সমুদ্র পাড়ে। সেদিন হাট সেরে ফেরার সময় সাঁঝ হয়ে গিয়েছিল। ঠিক বাঁকা খেজুরগাছটার কাছে তিনজন খালি গায়ের মানুষ ঘিরে ধরল আমাকে। তাদের হাতে টাঙ্গি, কাতান। আমাকে একলা পেয়ে গালিগালাজ করে বলল, সাথে যা আছে দিয়ে দে। নাহলে টাঙ্গি চাটানে তোর ধড়-দেহ আলাদা করে দিব। কী করব বল, জানের দায়ে সব দিয়ে দিলাম। সেই যে পুঁজিতে চোট খেলাম—তারপর থেকে আর উঠে দাঁড়াতে পারিনি।

বাঁকার দীর্ঘশ্বাস স্পর্শ করে মেনিকে, লোক তিনটারে তুমি চিনো না?

—চিনি। চিনলে কি কিছু করতে পারব? গাঁয়ে এখন পঞ্চায়েতরাজ চলছে। কিছু বললেই গাঁ ছাড়া হতে হবে। ওরা দলে ভারী। আমি ওদের সাথে লড়ে পারব কেন? সাইকেলের সীটে বসেও মাঝে মাঝে মুখ ঘোরাচ্ছিল বাঁকা। মেনি সমব্যথীর চোখে তাকিয়ে। সেই দৃষ্টিতে বুঝি ব্যথা উপসমের রসদ ছিল। বাঁকা সেই একই ভঙ্গিতে বলল, পবনটার ব্যবসা ভাগ্য ভাল। নারাণ সাউয়ের মাছখঁটী থেকে সে বরাবরই মাছ পায়। তাছাড়া নারাণ সাউ ওকে ধার-বাকিতে মাছ দেয়। যে নারাণ সাউয়ের মন পেয়েছে তার ব্যবসা তো রমরমিয়ে চলবে। হাঁপু ধরলে বড়গাছের ছায়া না পেলে মানুষের যে দম আটকে যায়।

এগরা হাসপাতালের চৌহদ্দিতে ঢুকতেই নিজেকে বড় হাল্‌কা বোধ করে বাঁকা, দায়িত্ব পালনের আনন্দ সব সময় যে আকাশছোঁয়া এটা অনুভব করতে পারে সে। সাইকেল থেকে নেমে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল মেনি, মাটিতে পা ছোঁয়াতেই সে টের পেল এতক্ষণ একভাবে বসে থাকাতে পা দুটো হাঁটুর কাছ থেকে কেমন অবশ হয়ে আছে। জোর করে হাঁটতে গেলেই গোড়া কাটা গাছের মত হুড়মুড়িয়ে পড়বে সে। মেনি হাঁটার চেষ্টা না করে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ, তার অস্থির চোখ দুটো পরিচিত কাউকে যেন খুঁজছিল।

বাঁকা সাইকেলটা গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে মেনিকে ইশারা করে ডাকল, মেনি পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে বলল, দাদু কোথায় বাঁকাদা?

ছোট হাসপাতালটায় ব্যস্ততা ছিল না কোথাও, তবু কিসের দুর্ভাবনায় ভার হয়ে ছিল মেনির বুকটা। খুব কষ্ট হচ্ছিল তার। চোরপালিয়া যাওয়া-আসার পথে এই হাসপাতালের পাকা দালানগুলো সে কত-বার দেখেছে, কোনদিন যে এখানে তাকে আসতে হবে স্বপ্নেও ভাবেনি।

ব্রজবুড়ার জ্ঞান তখনও ফেরেনি, সুভদ্রা দুশ্চিন্তা বোঝাই মুখ নিয়ে তার শিয়রের কাছে বসে। বাঁকাকে দেখে তার ধড়ে প্রাণ এল। অতি সন্তর্পণে ব্রজবুড়ার মাথার কাছ থেকে উঠে সে দেওয়ালের এক পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আঁচলের খুঁট খুলে একটা ভাঁজ করা কাগজ বাঁকার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ডাক্তারবাবু বলেছে, এই ওষুধ খপখপ কিনে আনতে। আমার কাছে টাকা-পয়সা কিছু নেই। কি দিয়ে যে ওষুধ কিনব কিছু বুঝে উঠতে পারছিনে।

বাঁকা শূন্য চোখে তাকাল। ডাক্তারবাবুর লেখা কাগজটার দিকে তাকিয়ে তার মুখে কোন কথা সরল না। সুভদ্রা বুদ্ধিমতী। বাঁকার অসহায়ত্ব তাকে হঠাৎই কেমন বিবশ করে তুলল, কোন কথা না বলে সুভদ্রা রূপোর বাউটি দুটো খুলে বাঁকার হাতে দিল, এটা তুমি নিয়ে যাও। সোনা দোকানীর কাছে বেচে যা হোক করে ওষুধটা কিনে আন। মানুষটা বেঁচে থাকলে অমন বাউটি আবার আমি পরতে পারব। দুচোখ জলে ভিজে উঠল সুভদ্রার, আঁচলের খুঁটে সেই সিক্ত চোখ দুটো মুছে নিয়ে সে আবার নিশ্চুপ পায়ে ফিরে গেল ব্রজবুড়া কাছে। মেনি দূর থেকে বোকার মত সব দেখল, মায়ের স্যাঁতসেতে চোখ দুটো তার চোখের পাতা ভিজিয়ে দিল মুহূর্তে।

কাল বিলম্ব না করে এগরার দিকে সাইকেল হাঁকিয়ে চলে গেল বাঁকা। বাউটি দুটো নিতে গিয়ে তার হাত কেঁপে উঠেছিল, শরীরের সেই কাঁপুনী এখন ভর করছে বুকে। কিছুটা আসার পর বাঁকা ভাবল—এ সংসারে যার টাকা নেই তার বুঝি কিছু নেই, তার মত অসহায় মানুষও বুঝি একটি নেই।

হাট সেরে পবন যখন হাসপাতালে এল তখন জ্ঞান ফিরেছে ব্রজবুড়ার। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ঝড়ের বেগে সাইকেল চালিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল সে। সংবাদটা শুনেই সে আর সময় ব্যয় করেনি। জালিমনিতে টাকাগুলো ঢুকিয়ে নিয়ে সে সিধা চলে এসেছে হাসপাতালে। মেনি আর বাঁকা হাসপাতালের বেঞ্চিতে বসেছিল ঝিম ধরে। পবনকে দেখে বিড়ির ছাই ঝেড়ে বাঁকা এগিয়ে গেল সামনে, এই এলি বুঝি? যা দেখ গে যা। বুড়ার অবস্থা ভাল নয়। এ সময় তোর বাবা থাকলে সুবিধা হোত।

—কী করে হলো এসব?

বাঁকা নির্লিপ্ত স্বরে বলল, যা হবার ছিল তা তো হয়ে গিয়েছে। বুড়া মানুষ এখন কি এত পরিশ্রম সইতে পারে? শরীলের তো ভার সইবার একটা ক্ষেমতা আছে। বয়সকে অগ্রাহ্য করলে যা হয় তাই হয়েছে।

কথাগুলো শুনে ঝাঁ ঝাঁ করছিল পবনের কান। ছায়া-ছায়া অন্ধকারে ভয়ের লিকলিকান সাপটা ক্রমশ এগিয়ে আসছিল ছোবল মারতে। যাত্রা-পাগল সহদেব ঘর ছাড়ার পর থেকে সংসারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ব্রজবুড়ার ঘাড়েই ন্যস্ত। এতবড় সংসারের হাল ধরার মত সে ছাড়া আর কেউ নেই। সংসারের চাপ, আর্থিক দুশ্চিন্তা, প্রত্যহ এতগুলো পুষ্যির দুবেলা অন্নসংস্থানের উপায় নির্ধারণ করা মুখের কথা নয়। ব্রজবুড়া এসব চাপের কাছে মাথা নত না করেই দিব্যি মাথা উঁচু করে বেঁচে ছিল। পবন সেই শ্রীহীন সংসারে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। ব্রজবুড়ার অসুস্থতার সংবাদ তাকে বড় ব্যথিত করে তোলে।

ব্রজবুড়ার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে পবন ভাবছিল আজকের ক্লান্তিকর দিনটার কথা। কর্মব্যস্ততায় আজ সে একটু বিশ্রাম নেবারও সময় পায়নি। এই দীর্ঘপথ সাইকেল ঠ্যাঙ্গালে শরীরের আর কিছু থাকে না। পবন অবসন্ন চোখ তুলে নীরবে তার মায়ের মুখের দিকে তাকাল।

অসংযত ফুঁপানি থামিয়ে জড়োসড়ো ভঙ্গিমায় পবনের কাছে উঠে এল সুভদ্রা, আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে নিয়ে বলল, বুড়া মনে হয় এ যাত্রায় আর বাঁচবে না। হাসপাতালের ডাক্তার বলছে কাল কাঁথি নিয়ে যেতে। এখানে এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই।

—দাদুর কী হয়েছে মা? অস্ফুটে শুধাল পবন।

সুভদ্রা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, তার যে কী হয়েছে আমি তার কী জানি বাপ। তবে বুকটায় বড় বেদনা হচ্ছে বুঝতে পারছি। সব সময় জল কাটছে চোখে। মাঝে মাঝেই ডুকরে উঠছে দুই ছেলের নাম নিয়ে। অথচ তার এমন ভাগ্য—দু' ছেলের কেউই তার ছিমুতে নাই। তুই কাল ভোরের বাসে একবার মেদিনীপুর চলে যা। তোর জ্যাঠারে ডেকে আন। সে না আসা পর্যন্ত আমি এই হাসপাতালে পড়ে থাকব। কপালে যতটুকু দুর্ভোগ আছে তার সবঠাই তো আমাকে সইতে হবে। শেষের দিকের কথাগুলোয় সুভদ্রা তার কান্নাকে চেপে রাখতে পারল না। আঁচলটা মুখে ঠুসে সে বিপন্ন চোখে আবার পবনের দিকে তাকাল।

ভোরের বাস রোদ কড়া হওয়ার আগেই পবনকে পৌঁছে দিল মেদিনীপুরে। কেরাণীতলায় নেমে পবন ভাবছিল এতগুলো রাস্তার কোনটা তার জ্যাঠার বাড়ির দিকে গিয়েছে। সেই কবে বাবার সঙ্গে সে একবার এসেছিল, তখন বাবার হাত ধরে জ্যাঠার বাড়ি পৌঁছাতে তার কোন কষ্টই হয়নি। সহদেব এই শহরের রাস্তা-ঘাট ভালই চেনে, দশ জায়গার জল পেটে পড়ে সে তাদের পাড়ার অন্যান্য লোকদের চেয়ে চালাক-চতুর। সকালের একঝাঁক তাজা রোদ বড় বড় বাড়ি ছুঁয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে পিচ

রাস্তায়। সেই আলোকিত পরিমণ্ডলের মধ্যে দাঁড়িয়ে পবন দেখল তাকে বয়ে আনা বাসটা একগাদা ধুঁয়ো উড়িয়ে ভিড় কাটিয়ে ছুটে যাচ্ছে শহরের মাঝখানে। পবন বোকার চোখে তাকাল। সুভদ্রার সতর্কবাণী মনে পড়ল তার। মা বলেছে, বুঝেশুনে শহরের পথ-ঘাট পেরতে। কেরাণীতলায় নেমে রিকশ নেওয়ার কথাও বলে দিয়েছে তার মা। যদিও পথ বেশী নয়, পায়ে হেঁটে গেলে মাত্র মিনিট পনেরর রাস্তা তবু অচেনা-অজানা রাস্তা বলেই পবন দরদাম করে রিকশ চেপে বসল। দাদুর অসুস্থতার খবর দিয়ে তাকে ফিরে যেতে হবে কাঁথিতে। বাঁকা আর তার মা এগরা হাসপাতাল থেকে সোজা কাঁথি চলে যাবে। সেইমত পবন তার ব্যবসার টাকা বাঁকার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্তে বাস ধরেছে।

রিকশর হর্ন শুনে ভেজা হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল পবনের জ্যেঠিমা। পবনকে দেখেই নিমেষে গম্ভীর হয়ে উঠল মাঝ বয়েসী মানদার মুখ। তবুও শুষ্ক ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে পবন বোকার মত হাসল।

মানদা জলহাত আঁচলে মুছে পবনের কাছে এগিয়ে এসে বিস্ময় ঘন চোখে তাকাল, কী-রে, হঠাৎ করে কোন খবর না দিয়ে চলে এলি, ঘরের সব ভাল তো?

পবন লক্ষ্য করল মানদার চোখে কৃত্রিম দুশ্চিন্তার ছাপ, পবনকে দেখে সে যে আদৌ সন্তুষ্ট হয়নি তা তার চোখ-মুখ দেখলেই অনুমান করা যায়। পবন সঙ্কুচিত চোখে মানদাব মুখের দিকে তাকাল, পূর্বের তুলনায় আরো স্থূল হয়েছে মানদা। দীর্ঘ সময় শহরে থাকার দরুণ চেহারা এবং কথা-বার্তায় মেকি ভদ্রতার আস্তরণ পড়েছে।

—আয়, ঘরে আয়। মানদার ডাকে মাথা নীচু করে বারান্দায় উঠে আসে পবন। পাকা ঘর। চুনকাম করা দেওয়ালে নীলবড়ির উগ্রতায় চোখ ধাঁধিয়ে যায় পবনের। বসার জন্য একটা টুল এগিয়ে দিয়ে মানদা বলল, তুই বোস, আমি তোর জন্য চা করে আনি।

—জ্যাঠা কোথায়?

—সে তো সকালে উঠেই টিউটি চলে গিয়েছে। কেনরে, তোর জ্যাঠাকে বুঝি খুব দরকার? টুলের উপর বসে পবন উশখুশিয়ে উঠল, আমি এখনই চলে যাব। দাদুর খুব অসুখ। বাবা ঘরে নেই, যাত্রাদলে গিয়েছে। মা তাই আমাকে পাঠাল। দাদুকে আজ কাঁথি হাসপাতালে ভর্তি করাব কথা। মা আর বাঁকাদা দাদুকে নিয়ে সিধা চলে যাবে হাসপাতালে।

সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মানদা। চা তৈরীর অজুহাতে সে আর রান্না-ঘরে গেল না। পবনের মুখোমুখি বসে শুধোল, কী হয়েছে বাবার?

পবন বলল, কি হয়েছে আমি তার কিছু জানি না। তবে ডাক্তারবাবু বলেছে—দাদুর অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। তাড়াতাড়ি কাঁথি না নিলে গেলে—। কথা আটকে গেল পবনের, নিমেষে ভিজে উঠল চোখের কোণ তবু অপলক চেয়ে থাকল মানদার সুখী কবুতোর মুখের দিকে।

মানদা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল, ভয় পাবি নে, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই বস, আমি তোর জন্য চা করে আনি তাড়াতাড়ি।

মানদা রান্নাঘরে চলে যাবার পর আবার একা হয়ে গেল পবন। রাত্রি জাগরণে তার চোখের কোণ বসে গিয়েছে পাড় ধসা নদীর মতো। শুধু চোখ নয়, সমস্ত শরীরে প্রকটিত হয়েছে রাত্রি জাগরণ আর দৈহিক ক্লান্তির জলছবি। এই একভাবে বসে থাকা ক্লান্তিকর, বাসের দুলুনী পবনের শরীর বেয়ে উঠে আসে ধীরে ধীরে। দীর্ঘ বাসযাত্রায় আরো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। ফলে অবসাদ-বিষাদে মাথা তুলে তাকাবার ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলে ক্রমশ। তবু বারবার ঘুরে-ফিরে দাদুর কথা তার মনে পড়ে। দাদু তাদের সংসারে বিরাট একটা বটগাছের মত, এই ছায়া পবনের অশান্ত হৃদয়কে বারবার শান্ত করেছে, বৃদ্ধ মানুষটির উত্তাপ পবনকে জিইয়ে রেখেছে সমস্ত দুঃখ-বেদনা ভুলিয়ে। পোড় খাওয়া মানুষ সহজে হার মানে না তবু অসুখের কাছে, জরা-ব্যাধি আর বয়সের কাছে মানুষকে এই ভাবেই হয়ত

একদিন হেরে যেতে হয়। একটা দীর্ঘশ্বাস পবনের সমস্ত স্নায়ুগুলোকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে নেমে আসে বাইরে। চোখ তুলে পবন দেখে হলুদ হয়ে যাওয়া একটা কাপ হাতে নিয়ে মানদা তার সামনে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। ব্রজবুড়ার অসুস্থার খবর তাকেও যে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে এটা তার চোখ মুখ দেখে অনুমান করা যায়।

মুড়ি ভর্তি কাঁসার বাটি আর চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে মানদা বলল, এগুলো খেয়ে নিয়ে চটপট চান করে আয়। বারোটার পরে তোর জ্যাঠা আসবে। তখন এক সাথে ভাত খাবি।

পবন এত সময় নষ্ট করতে নারাজ, তার কাছে প্রতিটি মুহূর্তের গুরুত্ব অনেক বেশি।

চায়ের কাপটা হাতে ধরে পবন কাচুমাচু মুখে বলল, জেঠি গো, বারোটা অব্দি আমার এখানে থাকা হবে না। তুমি এক কাজ কর। জ্যাঠার ঠিকানাটা আমায় একটু বুঝিয়ে দাও। আমি সদর হাসপাতালে গিয়ে জ্যাঠার সাথে দেখা করে নেব।

—তা বললে হয়! কত দিন পরে এলি?

পবন অসহায়, বিপর্যস্ত দৃষ্টি মেলে তাকাল, পরে আর একদিন আসব। দাদুকে ঐ অবস্থায় ফেলে রেখে আমার গলা দিয়ে ভাত নামবে না। আজ আমাকে খপখপ ফিরতে হবে নাহলে মা আমার জন্য ভেবে অস্থির হয়ে যাবে।

পবনের দায়িত্ববোধ মানদার মনুষত্বে ঘা মারে, সে বোকার মত চেয়ে থাকে পবনের উলঝাল চেহারার দিকে। বৃদ্ধ শ্বশুরের প্রতি সে যে বিন্দুমাত্র কর্তব্য করেনি, এই ভাবনা তাকে আরো হীন করে তোলে।

চা-মুড়ি খেয়ে পবন যখন উঠে দাঁড়াল, তার অনেক আগেই মানদা শাড়ি বদলে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য তৈরী। অতবড় হাসপাতালে নকুলকে খুঁজে বের করা মহা ঝক্কির কাজ। পবনের দ্বারা তা সম্ভব হবে না জেনেই আগে-ভাগে তৈরী হয়ে নিয়েছে মানদা।

হাসপাতালের গেটের কাছে এসে ঈষৎ হাঁপিয়ে ওঠা মানদা পবনকে বলল, তুই এই চা-দোকানটায় বস। তোর জ্যাঠাকে ডেকে আনি। আমি না ফেরা পর্যন্ত তুই কোথাও যাবিনে।

পবন 'হ্যাঁ' সূচক ঘাড় নাড়তেই মানদা চঞ্চল পায়ে হাসপাতালের মাঠে ঢুকে গেল।

ঠিক আধঘণ্টা পরে ফিরে এল মানদা।

সব শুনে নকুল চোখ কপালে তুলে বলল, বাবার অসুখ! খবরটা কানে শুনে গিয়ে আমি থাকতে পারব না। তবে মাসের শেষ। হাতে পয়সা-কড়ি মোটে নেই। দেখি কারোর কাছে উধার পাই কিনা।

মানদা মুখ বেজার করে বলল, কোনদিন বা তোমার হাতে টাকা থাকে শুনি। তোমরা হলে গিয়ে হাঁড়ি উবুড় করা জাত। যা পাও তা-ই গোগ্রাসে গেল। আপদ-বিপদের কথা তখন তোমাদের মনে থাকে না। অথচ লোক ভাবে তোমার কত টাকা আছে। এসব কথা ভাল লাগছিল না নকুলের, সে প্রায় ধমকের স্বরে বলল, চুপ কর, বিপদের সময় কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিওনা।

এক কাপ চা খেয়ে নকুল আবার ফিরে গেল হাসপাতালে। শুধু টাকা যোগাড় করা নয়—ওয়ার্ড-মাস্টারের কাছে ছুটিও নিতে হবে তাকে। নিদেন পক্ষে দিন দশেক ছুটি তো দরকার। অনেকদিন সে বাড়িমুখো হয়নি। কেন হয়নি এর কোন যুক্তি বা ব্যাখা নেই। তবে প্রধান কারণ অবশ্যই অর্থ। তাছাড়া মানদা গ্রামের বাড়িতে যেতে চায় না। গ্রামে হাজার রকমের অসুবিধা। শহরের ঝরঝরে জীবন গ্রামে সে পাবে কোথায়? মানুষ তো অভ্যাসের দাস। পাকা ঘরে থেকে মাটির ঘর মানদাকে আর আকর্ষণ করে না। সে হাঁপিয়ে ওঠে। ঐ ঘিনঘিনে পচা গলা জীবন প্রণালীকে সে ঘেন্নার চোখে দেখে।

দুপুরে ভাত খেয়ে বেলা একটার বাস ধরল নকুল। টাকার জন্য এই অযাচিত বিলম্ব। মাসের শেষে সবারই হাত ফাঁকা। অবশেষে কাবুলিওলার কাছে থেকে চড়া সুদে টাকা ধার এনেছে সে। শুধুমাত্র

টাকার চিন্তায় মুখের হাসিটুকু ঝিমিয়ে গিয়েছিল নকুলের, কিছু টাকা ধার পেয়ে সে হাতে স্বর্গ পেয়েছে এমন গর্বের চোখে পবনের দিকে তাকাল।

জ্যাঠাকে বরাবরই যমের মতো ভয় করে পবন, পাশাপাশি সীটে বসেও তার মুখে কোন কথা ছিল না। বাস কাঁসাই নদীর ব্রীজ পেরতেই একটা চারমিনার ধরিয়ে নকুল অবিভাবকমূলক চোখে পবনের দিকে তাকাল; পবন কেঁপে উঠল, কোন কথা না বলে সে চেয়ে থাকল দূরের দিকে।

সিগারেটের ধুঁয়ো ছেড়ে নকুল শুধোল, তোর বাবা কৎদিন হল ঘর আসেনি।

—তা, অনেকদিন হবে।

—অনেকদিন। নকুলের বিস্ময়ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার উৎসাহ পেল পবন। নিচু স্বরে বলল, বাবা যাত্রাদলে গেলে ঘরের কথা ভুলে যায়। বাবা চলে যাওয়ার পর সংসারের পুরো দায়িত্ব দাদুর ঘাড়ে পড়েছে। সে বুড়ো মানুষ। একা এত দায়িত্ব সামলাতে পারবে কেন? আমরা অধপেটা খেয়ে কোনমতে কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে আছি।

—কেন, গেল বছর বুঝি ধান হয়নি?

—হয়েছিল। কিন্তু ধান কাটার সময় ঝড়-জলে পাকা ফসল সব ঝরে গেল।

—অঃ। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল নকুল। নিজের স্বার্থপরতা তাকে ছোবল মারল বারবার। চাকরির বাঁধা মাইনেয় নকুলের খাওয়া-পরার কোন চিন্তা নেই। ভরা পেট প্রায়শ অভুক্ত মানুষের কথা ভাবে না। অথচ তার চাকরির পিছনে ব্রজবুড়ার যা অবদান, তা গায়ের চামড়া কেটে দিলেও কোনদিন শোধ হবার নয়। বুড়া বাপের প্রতি আজ অব্দি সে কোন কর্তব্য পালন কবতে পারেনি। চাকরির উপার্জনে সে বউ-ছেলে-মেয়েদের সুখে রাখার চেষ্টা করেছে।

কখনও প্রয়োজনবোধ করেনি বুড়ো মানুষটার জন্য একটা মোটা ধুতি বা দু-দশ টাকা পাঠিয়ে দেওয়ার। আজ তার শেষ সময় কাবুলিওলার কাছ থেকে সুদে টাকা ধার করে সে একাই চলেছে পিতৃঋণ পরিশোধ করার অভিপ্রায়ে। বিবেক দংশন সব মানুষের সমান নয়। মানদা তাড়াহুড়োতে কোথাও বেরতে পারে না, তাছাড়া সামনেই ছেলে-মেয়েদের ইস্কুলে পরীক্ষা, এ অবস্থায় সে কি করে যাবে বৃদ্ধ শ্বশুরকে দেখতে? তবু নকুল জোর করে বলেছিল, চলো, দু'দিন থেকেই আমরা আবার চলে আসব। এসময় সবাই মিলে গেলে মা মনের জোর ফিরে পাবে।

—খালি হাতে কারোর মনের জোর ফেরান যায় না। ক'হাজার টাকা নিয়ে যাচ্ছো যে এত বড় বড় কথা বলছ? মানদার যুক্তির কাছে কেঁচো হয়ে গেল নকুল। মানদা বুঝিয়ে বলল, তুমি একা যাও। আমরা সবাই মিলে গেলে গাড়ি ভাড়াতে অনেক টাকা বেরিয়ে যাবে। যে টাকা গাড়ি ভাড়াতে যাবে সেই টাকা বাবার জন্য খরচ করো। এখন সেখানে প্রচুর টাকার দরকার। টাকা ছাড়া তুমি সেখানে এক পা-ও চলতে পারবা না। তোমাকে ওরা ডেকে পাঠিয়েছে টাকার জন্য—যেহেতু তুমি সরকারী চাকরি করো। অথচ ওরা জানে না তোমার অবস্থা ওদের চেয়েও আরো খারাপ। নামে তালপুকুর অথচ ঘটি ডোবে না—তোমার এই খবর গাঁয়ের অনেকেই জানে না।

মানদার কথাগুলো অতি বাস্তব তবু ঝাঁ-ঝাঁ করছিল নকুলের কান। বিশেষত পবনের সামনে মানদার কথাগুলো তার শরীরে বিষ পিঁপড়ের কামড়ের জ্বলন ধরিয়ে দেয়। ছোটদের কাছে ছোট হতে কে চায়? অথচ নকুল এ কথার কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। সারা গায়ে ঘা নিয়ে নিজেকে সুস্থ জাহির করা সাজে না। পবন বুদ্ধিমান ছেলে। সে শুনেও না শোনার ভান করে তাকিয়েছিল অন্যদিকে। রাগে গজগজিয়ে নকুল চলে গিয়েছিল বড় ঘরে। সে কী মানসিক শান্তি পেয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তর পবন সঠিক জানে না। সে শুধু জানে মানুষ কারো না কারোর কাছে বন্দী জীবনযাপন করে, এটা মানুষের ধর্ম, এই ধর্মের বেড়া টপকে সে খুব কম মানুষকেই দেখেছে বেরিয়ে আসতে।

তখন শেষ বিকাল।

কলেজ মোড়ে বাস পৌঁছতেই সঙ্গে সঙ্গে রিকশ নেয় নকুল। পবনের গলাটা শুকিয়ে এসেছিল তেষ্টায়, তবু জল খাওয়ার ইচ্ছেটা সে জ্যাঠার কাছে অকপটে বলতে পারে না। ব্রজবুড়ার কথা ভেবে তার গলা আরো শুকিয়ে আসছিল। রিকশ থামিয়ে গাদা-গুচ্ছের ফল কেনে নকুল। ঠোঙাগুলো পবনের হাতে দিয়ে নকুল শুকনো গলায় বলল, হ্যাঁরে পবন, আসার সময় বাবার সাথে কি তোর কথা হয়েছিল? বাবা কি একবারও আমার নাম মুখে এনেছে?

পবন চুপ করে থাকল ঠিকই কিন্তু তার ঠোঁট দুটো অসহায়ভাবে কেঁপে উঠল ইচ্ছের বিরুদ্ধে। নকুল আর কথা না বাড়িয়ে মনের অস্থিরতা ঘোচাতে আর একটা সিগারেট ধরাল। জোরে ধোঁয়া ছেড়ে রাস্তার দু'পাশের পরিবর্তনশীল দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে এক সময় সে মুখ ফসকে বলে ফেলল, আগে কাঁথি শহর আমার ভাতবাড়ি ছিল অথচ এখন কত কী যে বদলে গিয়েছে, কোন কিছু আর চিনতে পারি না, এই ভাবেই মনে হয় সব কিছু বদলে যায়।

পবন জ্যাঠার মুখের দিকে তাকিয়ে কষ্ট পেল খুব। এই প্রথম তার অনুভূত হল, রক্তের সম্পর্ক বড় মধুর যা দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদেও এতটুকু মলিন হয় না। চলমান রিকশটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠতেই পবনের সুন্দর অনুভূতিগুলো ছেঁড়া লাল-নীল কাগজের মত দীর্ঘশ্বাস হয়ে হারিয়ে যায় বাতাসে। অসাবধানবশতঃ হাত থেকে খসে পড়ে ফলের ঠোঙা। রাস্তায় গড়িয়ে যায় আপেল লেবু বেদানা। পবন দেখে ফল নয়, যেন জীবনই গড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে রাজপথে, ধুলোয় এবং হাইড্রেনে।

নয়

অসময়ে বৃষ্টি গোদের উপর বিষফোঁড়া।

দু-দিন ধরে বৃষ্টির আর শেষ নেই; কখনো ঝমঝমিয়ে, কখনো বা থেমে থেমে ঠাণ্ডা জলের ছিঁটে মেরে হাসি-তামাশা করার মত এই ফিচেল স্বভাবের বৃষ্টি। হাসপাতালের বারান্দায় শীতে কুঁকড়ে যাওয়া চড়ুইছানার মত কাঁপছিল পবন, ক-পা হেঁটে হোটেলে গিয়ে যে খেয়ে আসবে তেমন ইচ্ছা ছিল না।

সাতদিন হল ব্রজবুড়ার অবস্থার কোন উন্নতি নেই, ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হলে তিনিও মুখ ঘুরিয়ে চলে যান, কোনরকম মন্তব্য করতে তাঁরও তীব্র অনীহা। সুভদ্রা ব্রজবুড়াকে হাসপাতালে ভর্তি করে ফিরে গিয়েছে চোরপালিয়া। এখানে তার অসুবিধার শেষ ছিল না। দুঃসংবাদ শুনে এক কাপড়ে সেই যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে, তারপর টানা দেড়দিন তার নাওয়া-খাওয়ার কোন ঠিক ছিল না। সুভদ্রার সঙ্গে গিয়েছে মেনি আর বাঁকা। না গেলে অতগুলো মানুষের খাওয়া খরচ এই শহর জায়গায় কে জোগাবে? নকুল আর পবনকে দেখে সুভদ্রা আর কাল-বিলম্ব করেনি। হৈমবুড়ির উপর ঘর ছেড়ে এসেছে সে, তাছাড়া এখন গাঁয়ের অবস্থাও ভাল নয়। চুরি-ডাকাতি আকছার লেগে আছে। যদিও ধানমাঠ এখনও ফাঁকা, চাষকাজ নেই বললেই চলে তবু এই শহর জায়গায় মন ধরেনি সুভদ্রার। ঘরের মানুষটা যে তার কবে ফিরবে তা ভগবানই জানে। আপদে-বিপদে মানুষ তার নিজের মানুষকেই খোঁজে। কিন্তু সহদেব যেন অগস্ত্যযাত্রায় গিয়েছে—তার ফেরার কোন নাম-গন্ধ নেই। এই ঘনঘোর বিপদের দিনে সহদেব যদি হাজির হোত—তাহলে এতটা ভেঙ্গে পড়ত না সুভদ্রা। হাসপাতাল চত্বর ছেড়ে আসার পর তার মনে একটা প্রশ্নই উঁকি দিয়েছে, বুড়োটা ঘর ফিরবে তো! এ ব্যাপারে ডাক্তারও মুখ ফুটিয়ে স্পষ্ট কিছু বলেননি। তবে মুখের হাবভাব দেখে যা বোঝার তা সে অনুমান করে নিয়েছে।

বয়সের ভারে অপুষ্টি আর দুর্বলতায় ব্রজবুড়া মাত্র এক মাসেই আরো বুড়িয়ে গিয়েছিল; তার হনু হাড় জাগান মুখটা দেখে মায়া হোত সুভদ্রার। এই অভিভাবকহীন ছন্নছাড়া সংসারে ব্রজবুড়া ছিল প্রাচীন

বটবৃক্ষের মতো। সেই মানুষটাই শেষ পর্যন্ত বিছানা আকঁড়ে ধরল। তার এই অনুপস্থিতি সুভদ্রাকে পীড়া দেয়, অসহায় করে তোলে। এ দুঃখ সে কাকে বোঝাবে? শুধু দুঃখ নয়, মনে তার ভয়ও ঢুকেছে। দেড় দিনের মাথায় ব্রজবুড়ার জ্ঞান ফিরলেও কথা বলার এমন কী ভাল মতন চোখ মেলে তাকাবার শক্তি ছিল না। পাখির ছায়ের মত চিঁ চিঁ স্বর যখন একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষের গলা দিয়ে বেরয় তখন তার বাহ্যিক এবং শারীরিক শক্তি নিয়ে সংশয় জাগে মনে। দেখে শুনে সুভদ্রাও ভেঙ্গে পড়েছে। তাই নকুল যখন হন্তদন্ত হয়ে শুধোল, বাবা কেমন আছে এখন? এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারেনি সে। পবন মায়ের মুখ দেখে আঁচ করে নিয়েছিল বিপদের গন্ধ। বাঁকা এবং মেনির মুখ থমথম করছিল শীতকালীন জমাটবাঁধা মেঘ আঙ্গিনার-মতন। এই হঠাৎ উড়ে আসা মেঘকে শুধু পবন নয়, সুভদ্রাও ভয়ের চোখে দেখেছে। ক্রমশ আলোহীন হয়ে আসা পৃথিবীতে দমবন্ধ হয়ে আসছিল পবনের। মায়ের কম্পিত অধর আর নয়নযুগলের দিকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে সে-ও হারিয়ে ফেলেছিল তার অন্তর্গত উচ্চারণ।

শহরে থেকে নকুলে্র চেহারায় বাড়তি একটা চমক এসেছে যা গ্রামের অন্য ছা-পোষা মানুষগুলোর চেয়ে আলাদাভাবে বোঝা যায়। এই বাড়তি চমককে পবন ভাল চোখে দেখে না, কেননা এই পরিবর্তনশীল চমকই নকুলকে গ্রামের মানুষগুলোর সাথে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, এমনটা প্রায়শ মনে হয় পবনের। কৃত্রিমতার রঙ মুখে পড়লে—মনুষ্যত্বের আসল রঙ ফিকে হয়ে আসে। নকুল রক্ত-মাংসের মানুষ হলেও পবনের মনে হয়—সে একটা যান্ত্রিক মানুষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দম দেওয়া খেলনাগুলোর সঙ্গে সে নকুলের কোন ফারাক খুঁজে পায় না। এই মাঝ বয়েসী মানুষটাকে পবন কখনো মন থেকে মেনে নিতে পারে না। কেন পারে না এর উত্তরও পবনের জানা নেই।

নকুল ব্রজবুড়ার সম্বন্ধে কতটা উদাসীন তা তার হাবভাব, কথা-বার্তা দেখে সবই অনুভব করতে পারে পবন। অথচ এমন নিষ্ক্রিয়তার কোন অর্থই হয় না। জন্মদাতা পিতার প্রতি যতটা কর্তব্যে উদ্বেলিত হয়ে ওঠার কথা তার সিকি অংশও নকুলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাই সুভদ্রা যখন বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি।' —তখন নির্লিপ্ত গলায় নকুল বলেছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ যাও। তোমরা থেকে আর কী করবা। গাঁয়ে গিয়ে বরং কিছু টাকা ধার-উধার করে পাঠিয়ে দিও। বুড়ার অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না। কিছু হয়ে গেলে এতবড় দায় আমি একা সামলাবো কীভাবে।

নকুলের কথায় আশাহত সুভদ্রা মেঘমুক্ত আকাশের মত মন নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে পারেনি। বরং চাঁওড় বাঁধা দুঃখটা হঠাৎ করে চেপে বসেছিল তার বুকে। ব্রজবুড়া জমিজমা বিক্রি করে ছেলেকে শহরে পাঠিয়েছিল চাকরি করাতে, সেই যোগ্যমান ছেলে এখন বুড়ো বাপের খোঁজ নেয় না।— এ-ও কি ঘোরতর কলিকালের বিধ্বংসী এক নিদর্শন! নকুলের চাকরি পাওয়ার ইতিহাস কোন কিছুই অজ্ঞাত নয় সুভদ্রার কাছে। সে ঘরের ছোট বউ, তার চোখের সামনেই তো ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙের রূপান্তরের মতো সহজে বদলে গেল নকুল। আগে ডাকযোগে ব্রজবুড়ার নামে মাসে মাসে টাকা পাঠাত নকুল, কিন্তু চাকরীর বয়স পাঁচ বছর না হতেই পুরোপুরি পাল্টে গেল সে। ব্রজবুড়া ফি মাসে পিওনের কাছে খোঁজ নিত, শেষে হতাশ হয়ে ফিরে এসে বিড়বিড় করত দেওয়ালে পিঠ দিয়ে। দেওয়ালে পিঠ দেওয়া মানুষগুলো অভাব-অনটনে এক সময় কুঁজো হয়ে যায় ব্রজবুড়ার মত। তারা মনের দুঃখ মনেই পুষে রাখতে ভালবাসে। শত অভাব-অনটনে ব্রজবুড়া কোনদিন নকুলের কাছে যায়নি, আসলে ছেলের কাছে হাত পাততে বিবেকে বাধত্ তার। যতদিন তাগত ছিল ততদিন মানুষটা মাথা উঁচু করে বেঁচেছে। আজ সেই মানুষটা বিছানায় মিশে আছে রোগ-যন্ত্রণায়। তাকে দেখে সুভদ্রার চোখ ফেটে জল আসে। কেন বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে দুরুদুরু—তা সে নিজেও বুঝে উঠতে পারে না।

সুভদ্রা শহর ছাড়তেই আকাশের মেঘ লতিয়ে-চরিয়ে বেড়ে যায়, পুরো নীলাকাশ ছেয়ে যায় মহিষবর্ণ মেঘে। দুরন্ত হাওয়ারা ছোবল মারে, উড়িয়ে নিয়ে যায় শহরের ধূলিকণা। কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়া গাছের

পাতা অসহায়ভাবে কেঁপে উঠলে সুখী পায়রাগুলোও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে উড়ে যায়। শুধু পবন আর নকুলকে হাত-পা গুটিয়ে থেকে যেতে হয় ব্রজবুড়ার জন্য।

টানা বৃষ্টিতে পথেঘাটে জল জমেছে থিকথিকে, সেই জলে পা ছুঁয়ালে কনকনানী শুলোনী বেড়ে যায় শত গুণ। নকুল বিড়িতে শেষ টান দিয়ে বলল, বুড়া মনে হয় এযাত্রায় আর টিকবে না। এদিকে আমার ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এল। টাকা যা এনেছিলাম তা-ও শেষের দিকে। তুই এক কাজ কর পবন। আজ দুপুরের বাসে গাঁয়ে ফিরে যা। কিছু টাকাকড়ি না নিয়ে এলে আমি এখানে থাকব কী করে। শহর জায়গায় দুটা মানুষের খরচ তো কম নয়। সব তো চোখের উপর দেখছিস।

পবন জ্যাঠার মুখের দিকে তাকিয়ে হ্যাঁ-না কোন কিছুই বলে না। নকুল ক্ষোভের সঙ্গে বলে, ছোট বউ সেই যে গেল—আর একবারও এল না। অথচ আমি রোজ ভাবছি—সে আজ আসবে। যাওয়ার সময় তাকে আমি বার বার করে টাকার কথা বলে দিয়েছি—সে আমার কথার কোনো গুরুত্বই দিল না।

জ্যাঠার কথা পবন মনোযোগ সহকারে শুনলেও মায়ের সমালোচনা তার ভেতরটাকে তেতো করে দেয়। গ্রামাঞ্চলে নগদ পয়সার অভাব যে কী তীব্র পবন তা হাড়ে হাড়ে জানে। একটা ক্ষোভ তার বুকের বাগানে ধীরে ধীরে বাড়ে, জ্যাঠাকে সে তখন সহ্য করতে পারে না। তবু প্রতিবাদ করা এই মুহূর্তে যথাযথ হবে না ভেবে সে মুখ নিচু করে দাঁড়ায়।

নকুল স্পর্ধিত স্বরে বলে, সহদেবের জন্য আজ আমি খাদে পড়ে ঘোলা জলে হাবুডুবু খাচ্ছি। সে থাকলে এত ঝড় [illegible] উপর দিয়ে বইত না। বাবা তো শুধু আমার একার নয়, তারও। বাবার এই শেষ সময়ে তার কি একবার এখানে আসা উচিত ছিল না?

পবন এ কথায় আরো বিচলিত বোধ করে, বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে কী জবাব দেবে এই প্রশ্নের মনে মনে ভাবে সে। সহদেবের উপর তার ক্ষোভ-জ্বালা-অভিমানের শেষ নেই। মানুষটা এই সংসারে থেকেও যেন নেই। অথচ তার অস্তিত্ব পলে পলে বিধ্বংস করে সবাইকে। এমন ছন্নছাড়া মানুষ সংসারে সে বুঝি আর দেখেনি। মায়ের নিরাসক্ত দুঃখী মুখের দিকে তাকিয়ে পবন প্রতিদিনই ভেবেছে, মায়ের দুঃখের গভীরতা কোন অংশে তার চেয়ে কম নয়। মা যদি পারে মুখ বুঝে নীরবে সব কিছু সহ্য করতে, সে কেন পারবে না। তাছাড়া এই বিশ্ব চরাচরে কোন কিছুই অপরিহার্য নয়, মানুষ পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়—এটাই মানুষের ধর্ম। সে তো চেয়েছিল পড়া-লেখা শি[illegible] মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচতে কিন্তু সহদেবের উদাসীনতা তাকে সে সুযোগ দেয়নি। এই ক্ষোভ-[illegible] নিয়ে জীবনযুদ্ধে নেমেছে সে। সংসারের চুলায় সেও তো নিজে পুড়ছে। তার এই দগ্ধানো শরীর জ্যাঠার হয়ত নজরে পড়ে না, না পড়লেও একজন পোড়া মানুষের অন্তর্গত জ্বালা কি জ্যাঠার নজর এড়িয়ে যাবে?

অভিমানে মুখ কাচুমাচু করে পবন বলল, বাবার জন্য আমার খুব চিন্তে হয়। অতবড় সংসার আমার একার আয়ে চলে না। আমি মাছ ব্যবসায় নেমেছি ঠিকই কিন্তু খুব কম দিনই লাভের মুখ দেখি। পুঁজি যদি সংসারের গর্ত ভরাতে চলে যায় তাহলে ব্যবসাটাকে কী ভাবে বাড়াব? দাদুর বয়স হয়েছে। তার উপর আমি জোর খাটাতে পারিনে। বাবার কোনো খোঁজ-খবর পাইনা। তার যাত্রা গান যে কবে শেষ হবে জানিনা। আমরা সবাই শুধু তার কথা ভেবে-ভেবে মরি, সে হয়ত আমাদের কথা ভাবে না।

—সহদেব তো বরাবরই ঐ রকম। নকুল পোড়াটে ঠোঁট উল্টে কুৎসিৎ চোখে তাকাল।

পবন বলল, বাবা যদি গাঁয়ে থাকত তাহলে হয়ত এত অসুবিধে হত না। সে না থাকাতে যত রাজ্যের ঝামেলা। দাদু সব দিক সামাল দিতে পারত না। একবার ভাগাড় থেকে ঘুরে আসলেই হাঁপিয়ে উঠত সে। তার শরীরের কথা ভেবে আমি তাকে বেশি জোর দিতে পারিনা।

নকুল অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সব বুঝি, কিন্তু আমারও হাত-পা বাঁধা। যে কটা টাকা মাইনে পাই তাতে আমার নিজের সংসারও চলে না। এত বড় সংসার শহর জায়গায় টানা কী মুখের কথা!

বৃষ্টি তখনও টিপটিপিয়ে পড়ছিল। নকুল উশখুশিয়ে বলল, তুই এখানে থাক, আমি একবার লক্ষ্মণের দোর থেকে ঘুরে আসি। যাই দেখি—যদি কিছু টাকা লক্ষ্মণ আমাকে বিপদের দিনে উধার দেয়।

লক্ষ্মণ এখানকার হাসপাতালের ঝাড়ুদার, চাকরি পেয়ে গাঁ ছেড়ে এসেছে বিশ-বাইশ বছর হল। তার মধ্যে গ্রাম্য সরলতার আর কোনো চিহ্নই নেই, কেননা পবনের সঙ্গে যতবারই দেখা হয়েছে হাসপাতাল চত্বরে—অত্যন্ত নিপুণ ভাবে পবনকে এড়িয়ে গিয়েছে সে। চেনা মানুষ অপরিচিতের ভাণ করলে তার কাছে দ্বিতীয়বার মুখ না দেখানোই ভাল। গ্রাম সম্পর্কে লক্ষ্মণ তার কাকা হলেও বিপদের দিনে লক্ষ্মণ একবারও তাকে বলেনি, চল পবনা, আমার ঘরে গিয়ে থাকবি। আমি থাকতে তুই কেন শীতের দিনে এই হাসপাতাল বারান্দায় কুঁকড়ে-মুকড়ে পড়ে থাকবি? লক্ষ্মণ খরচের ভয়ে পাশ কাটিয়ে গিয়েছে। যে মানুষটা সম্পর্ক ধরে রাখতে ভয় পায় তার কাছে উজানের মাছের মত সাঁতার কেটে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

একলা পবন হাসপাতালের বারান্দা ছেড়ে বকুলগাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে বকুলগাছের পাতাগুলো চকচক করছিল আপন গরিমায়। বাতাসের মাথার ওপর বৃষ্টির ফোঁটাগুলো কাচজল ছড়ানো ওড়নার মত বেঁধেছিল, ডানহাতে সেই ফোঁটা-ফোঁটা জলবিন্দুগুলো ঝরিয়ে দিয়ে এক ছুটে পবন পাকা রাস্তা পেরিয়ে একটা চায়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। এই তীব্র শীতে চায়ের খিদেটা তাকে ব্যাকুল করে তুলল। পকেটে যে কটা টাকা আছে—তা ভাঙিয়ে অনায়াসে পবন চা খেতে পারে, কিন্তু তার মন তাকে শাসন করল। পবন চায়ের অর্ডার না দিয়ে তাকিয়ে থাকল—প্রায় ফাঁকা হয়ে আসা পাকা সড়কটার দিকে। মায়ের উপর এই মুহূর্তে তার অভিমান জন্মাল প্রচণ্ড। মা কি পারত না দশ-বিশ টাকা ধার-উধার করে পাঠাতে? কেন পাঠাল না। মায়ের এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতা পবনকে ভাবিয়ে তুলল। বেঞ্চির একধারে বসে পবন যখন এসব ভাবছিল তখন কাক ভেজা হয়ে একরকম ছুটতে-ছুটতে চা-দোকানে এসে মাথা বাঁচাল বাঁকা। তার হাতে একটা চটের থলি, গায়ে তুষের চাদর জড়ানো। বাঁকাকে কাছ থেকে না দেখলে পবন হয়ত তাকে চিনতে পারত না—এমন তার বেশভূষা। মাত্রাতিরিক্ত শীতের জন্য বাঁকার সাবধানতার কোন শেষ নেই। ফুলহাতা জামার ওপর রংজ্বলা একটা সোয়েটার সে পরেছে—যা শীতের দিনে কোথাও যাওয়া-আসার সময় তাকে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। বাঁকাকে দেখে কিছুটা স্বস্তিবোধ করে পবন, এগিয়ে গিয়ে হাসি মুখ করে শুধোয়, গাঁ থেকে এলে বুঝি? মায়ের খবর কী? তার টাকা পাঠানোর কথা ছিল—। পবন আর পরবর্তী কথাগুলো বলতে পারে না, বাঁকা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তোর মা-ই আমাকে পাঠাল। কাকির কথা কি আমি ফেলতে পারি, তাই চলে এলাম। কথা শেষ করে বাঁকা থামল, তার চোখে-মুখে জিজ্ঞাসা—জ্যাঠা কোথায়, তাকে তো দেখছি না?

—সে গিয়েছে টাকার খোঁজে। এই তো সবে গেল লক্ষ্মণ কাকার বাড়ি।

—তুই একা এখানে কী করছিস? চা খাবি?

—চা খাওয়ার জন্যই এসেছিলাম।

—তাহলে খাসনি কেন?

পবন একথার কোন উত্তর দিল না, তার অসহায় চোখদুটোই সব প্রশ্নের উত্তর সাজিয়ে রেখেছে।

দু'কাপ চায়ের কথা বলে বাঁকা শীত তাড়াতে হাতের তালু ঘষল বার কয়েক। শীত দূরীভূত হল না; কুঁকড়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল বাঁকা। চায়ের দোকানটা ছোট, তবু অনেকগুলো রুগ্ন বেঞ্চি যত্ন

করে পাতা। এতক্ষণের বাস সফরে গা-হাত-পায়ের গিঁটগুলোয় ব্যথা অনুভব করে সে। অগত্যা বেঞ্চিতে গিয়ে আরাম করে বসে সে। পবনও তার পাশাপাশি বসে। অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলে না, আলোর অস্বচ্ছতায় ঝিমধরা কোন প্রাণীর মতো বসে থাকে ওরা। চা-দোকানী চা দিয়ে গেলে নড়ে-চড়ে বসে পবন। বাঁকা চায়ের ভাঁড়টা হাতে ধরে ছ্যাঁকা খায়, মুখটা বিকৃত করে এক চুমুক দিয়ে বলে, গাঁয়ের অবস্থা ভাল নয়। কেউ কাউকে এখন আর বিশ্বেস করে না। তোর মা বহু কষ্ট করে কিছু টাকা যোগাড় করে দিল। আমাকে বারবার করে বলেছে তোকে ঘর নিয়ে যেতে।

পবন খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শোনে, কিন্তু কোন উত্তর দিতে গিয়ে ভয়ে তার ঠোঁটদুটো থরথর করে কেঁপে ওঠে। বাঁকা পবনের মুখের দিকে তাকিয়ে সেই একই ভঙ্গিমায় বলে, আমিও অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিছু টাকা উধার আনার। দশ-বার জনের কাছে গিয়েছি কিন্তু গিয়ে কোন লাভ হয়নি।

চায়ের ভাঁড়টা পাশে ফেলে দিয়ে বাঁকা একটা বিড়ি ধরায়, পবন তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে হা করে। ব্রজবুড়ার অসুস্থতা তাকেও মুষড়ে দিয়েছে, সে যে তার মনের জোর অর্দ্ধেক হারিয়ে ফেলেছে তা তার চোখ-মুখ দেখে সহজে অনুমান করা যায়। এই মুহূর্তে ঘরের কথা ভেবে পবনের গলা শুকিয়ে যায় ভয়ে। কথা বলার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে সে।

চায়ের দাম মিটিয়ে বাঁকা যখন রাস্তায় পা রাখে তখনও পবন সর্বস্ব হারান মানুষ। পরপর বেশ কয়েকদিন ব্যবসা বন্ধ। পুঁজি যা ছিল সব এখন হাত ফসকে গলে যাওয়া গঙ্গাগলের মত নিঃশেষ। গাঁয়ে ফিরে গিয়ে আবার ব্যবসাটাকে যে কোন উপায়ে চাঙ্গা করতে হবে তাকে। ব্যবসা ছাড়া এতবড় সংসারটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এখন সমুদ্রমাছের বাজার মন্দা। মহাজনরা চড়া দাম ছাড়া মাছ ছাড়তে রাজি নয়, তাছাড়া নগদ পয়সা ছাড়া মনমত মাছও পাওয়া যায় না। জীবিকার জন্য মাছ ব্যবসায় ভিড়েছে অনেকে। তাদের পুঁজিপাতি পবনের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে ব্যবসায় থৈ পায় না পবন। তবে বালিগড়ের ব্যবসায় সমুদ্রমাছের তুলনায় লাভ বেশি। কাজটায় ঝুঁকি আছে, পুলিশী হুজ্জুতির ভয়ও কম নেই। একবার মাল সমেত ধরা পড়লে শ্রীঘর বাস অনিবার্য। তবু পবন ভেবেছিল, মাছ ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে সে বালিগড়ের ব্যবসাই করবে এবং সেইমত সে বালিগড়ের মহাজনের সঙ্গে পাকা কথা বলে রেখেছিল। গ্রামের হাটগুলোয় দু'চার পিস যা বালিগড় আসে তা কাটার সাথে সাথে ফুৎকার উড়ে যায়। এসব পবন নিজের চোখে দেখেছে, দেখে তার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। সহদেবের অনুপস্থিতিতে ব্রজবুড়া তার মাথার ছাতা। বিপদে-আপদে এই বুড়াই তাকে সৎ-পরামর্শ দেয়। লতা যেমন গাছকে জড়িয়ে ধরে পরম নির্ভরতায় বেড়ে ওঠে, পবনের বেঁচে থাকাটা অনেকটা সেইরকম। তার এই ক্ষুদ্র জীবনে ব্রজবুড়ার দান অপরিসীম। তাকে অগ্রাহ্য করার অর্থ নিজের অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করা। ক'দিন থেকে পবনের খেয়ে-বসে সুখ নেই, অসময়ের এই বৃষ্টি তাকে আরো কাহিল করে তুলেছে। আকাশের ছিন্ন-ভিন্ন মেঘরাশি মনের গহ্বরে ঢুকে গেলে তাকে সমূলে উৎখাত করা পবনের পক্ষে সহজসাধ্য কাজ নয়। তবু এই দুঃসময়ে জ্যাঠাকে পাশে পেয়ে কিছুটা হারান মনোবল ফিরে পেয়েছে সে। যদিও সে জানে জ্যাঠা তার কাছে কোন প্রাণদায়ী টনিক নয়, জ্যাঠা ভয় এবং ত্রাসের উৎস।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বৃষ্টি-ছাঁট এসে লাগে ওদের গায়ে, বাঁকা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে এই উগ্র শীতকে দমন করার চেষ্টা করে বৃথা। পবনের গায়ে দেওয়ার যথোপযুক্ত জামা-কাপড় নেই, তার হাত দুটো কুঁকড়ে উঠে এসেছে বুকের কাছে। চোখের শূন্য দৃষ্টিতে শীতল হাওয়ার ছাঁট এসে লাগে—বাঘের নখের চেয়েও ধারাল সেই শীতল হাওয়ার নখ। পবন তবু একটুও বিচলিত হয় না, পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া বাবু-ভদ্র লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস সে লুকিয়ে ফেলে নিজের ভেতরে।

নকুল ফিরে আসে শূন্য হাতে। তখন শৈত্যপ্রবাহে বিদীর্ণ ধরিত্রীর মুখ। শুধু পৃথিবী নয়, পবন এবং বাঁকা জবুথুবু চেহারায় বসেছিল হাসপাতালের বারান্দায়, ঠিক ঝড়ো কাক নয় অথচ ঝড়ো কাকের

মত মিয়ান, নিষ্প্রভ চেহারায়। নকুল এসে তাদের সম্মুখে দাঁড়াতেই পবন চমকে উঠে বলল, জ্যাঠা গো, তুমি যে একেবারে ভিজে গিয়েছ। ভিজে কাপড়ে তুমি থাকবা কী ভাবে? যাও, যাও চা-দোকানের আঁচে গিয়ে হাতটা একটু সেঁকে আস।

হাত সেঁকার মত মানসিকতা ছিল না নকুলের, শূন্য হাতে ফিরে আসার প্রতিক্রিয়ায় কচি লতার ডগার মত ক্ষীণ আশা পুট্ করে কে যেন ভেঙ্গে দিয়েছে। অভিমান আর রাগে তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে; শীতে কাঁপতে-কাঁপতে সে বলে, টাকা না থাকলে এই শহর জায়গায় থাকব কী করে; আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। টাকা না থাকলে আমার সমস্ত বুদ্ধি হারিয়ে যায়।

পবন কিছু বলার আগে বাঁকা বলল, টাকার জন্যি ভেবনা জ্যাঠা। আমি কিছু টাকা এনেছি, তাতে তোমাদের চলে যাবে।

তবু আশ্বস্ত হতে পারে না নকুল, আড়ষ্টতায় গলার স্বর বুজে আসে, ক'টাকা আর দিবি, এখানে যা খরচ। হোটেলে পেট ভরে ভাত খেতে পারি না পয়সার অভাবে। ক'দিন থেকে আমরা দু-জনে আধপেটা খেয়ে আছি। নকুল কথা শেষ না করেই পবনের দিকে তাকায়, কিন্তু পবনের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে সে আর দ্বিতীয় কোনো কথা বলার সাহস পায় না।

ভোর রাতে বৃষ্টির মাত্রা আরো বাড়ল, এলোমেলো হাওয়ায় কেঁপে উঠল রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচুড়া গাছের শাখা। বিদ্যুৎ-এর শব্দে নয়, একজন উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের কণ্ঠস্বরে তন্দ্রা ছুটে গেল পবনের, জড়তা মাখানো চোখে সে দেখল—হাসপাতালের খাকি পোষাকের মানুষটা নকুলের ঘাড়ে হাত রেখে ডাকছে, উঠুন উঠুন। আপানাদের রোগীর অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। দিদিমণি ঢেকে পাঠালে—

নকুল ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল ঠিকই কিন্তু ক'মুহূর্ত তার গলা দিয়ে কোন স্বর বেরল না। পবন তার জ্যাঠাকে বলল, চলো, দাদুর শরীর মনে হয় ভাল নেই।

নকুল তবু হা করে তাকিয়ে আছে সেই খাকি পোষাকের লোকটার মুখের দিকে। যমরাজের দূত সমন দিয়ে গেল তার কাছে এমন ভ্যাবাচেকা খাওয়া চোখ করে সে শুধু তাকিয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে ধাতস্থ করে নকুল ছুটে গেল ডিউটি রুমের দিকে; তাকে অনুসরণ করল পবন আর বাঁকা।

তবু শেষ দেখা হল না ওদের।

ভোরের আলো ফুটছিল ধীরে ধীরে, শিশিরপাতের শব্দের মতো টুপটুপিয়ে ঝরে পড়ছিল পাতায় আটকে থাকা গতরাতের বৃষ্টির জল। পবনের চোখের জলও ঠিক এই ভাবে পড়ছিল নীরবে।

নকুল তার ঘাড়ের উপর আস্তে করে হাত রেখে বলল, কাঁদিস নে, কাঁদলে তো সে আর ফিবে আসবে না। তার বয়স হয়েছিল, সজ্ঞানে মরতে পেরেছে এই আমাদের ভাগ্য!

নকুলের এই ধরনের সান্ত্বনা বাক্য পবন কিছুতেই হজম করতে পারে না, শুধু চোখ নয় তার বুকের চারপাশটাও জ্বালাপোড়া করে। ব্রজবুড়ার মৃত্যু পবনকে ঢেউয়ের মাথায় ভেসে যাওয়া একটা পচা ফুলের মত অসহায় করে তোলে। অনবরত তার দু'চোখ ধুয়ে যায় চোখের জলে। মর্মাহত বাঁকার সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা নেই। সে ভাবছিল অন্য কথা। ব্রজবুড়ার লাশ গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে—এবং অপ্রতুল অর্থে তা যে কত শ্রমসাধ্য কাজ এই ভেবে সে শিউরে উঠছিল মনে মনে।

নকুল হয়ত বাঁকার মনের কথা কিছুটা আঁচ করত পেরেছিল, একবার কেশে সে বলল, বাবাকে গাঁয়ে নিয়ে যাবার মত ট্যাকের জোর আমার নেই। একটা বাসি মুড়দা গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কী হবে? তার চেয়ে এখানেই সৎকার করে ফিরে যাই।

আর্দ্রস্বরে প্রতিবাদ করল পবন, তা হয় না জ্যাঠা। গাঁয়ের মানুষটাকে যে করেই হোক গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে মা-ঠাকুমা আছে, তারা কি শেষ দেখাও দেখবে না? দাদুকে এখানে দাহ করে গাঁয়ে ফিরে গেলে তাদের কাছে তুমি কী কৈফিয়ৎ দেবে? জীবন-ভর তারা তোমাকে দুষবে।

নকুল থমথমে গলায় বলল, লাশ গাঁয়ে নিয়ে যাওয়ার খরচ অনেক। এত টাকা পাব কোথায়! এখান থেকে চোরপালিয়া টেম্পু ভাড়া নিতে গেলে গায়ের চামড়া বেচলেও হবে না।

পবন উষ্ণ চোখে তাকাল, টেম্পু না পাই ভ্যান রিক্সোয় নিয়ে যাব। রিকসা ভাড়া যদি না থাকে তাহলে গাঁয়ে গিয়ে চেয়েচিন্তে দেব। একবার গাঁ অব্দি পৌঁছালে টাকার অভাব হবে না। বাঁকাও সমর্থন করল পবনকে, জ্যাঠা টাকার জন্যি তুমি ভেবনা। গাঁয়ে একবার পৌঁছালে টাকার ব্যবস্থা হবেই।

কোণঠাসা হয়ে নকুল যখন ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছিল তখনও কুয়াশা ভেজা বাতাসে শোকের গন্ধ। মাঝে মাঝে পবনের বুক ঠেলে উঠে আসছিল ফোঁপানী। অদূরে বকুলগাছের গেড়ায় ব্রজবুড়ার নিথর দেহটি শায়িত ছিল হাসপাতালের স্ট্রেচারে, একটা সাদা চাদর শরীরটাকে ঢেকেছিল নির্মমভাবে। গাছ থেকে দু-একটা শুকনো পাতা ঝরে পড়েছে ব্রজবুড়ার বুকের উপর। ভারী হাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল পবনের, খড়িফোটা শরীরের দিকে তাকিয়ে নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছিল তার। কাল রাতভর ঘুম হয়নি, শুধু উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় সময় অতিবাহিত হয়েছে শ্বাসকষ্টের রোগীর মত।

ব্রজবুড়ার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ক'মুহূর্ত বাক্যহীন হয়ে গিয়েছিল নকুল, এই মৃত্যু তাকে তেমনভাবে বিচলিত করতে পারেনি। নকুলের পরিবর্তনহীন মুখের দিকে তাকিয়ে মনুষ্য সম্পর্কের অতলস্পর্শী ফাটলের কথা ভেবে ব্যথিত হয়েছিল পবন, পরক্ষণে সে এটাকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। নকুল সদর হাসপাতালের কর্মচারী, প্রতিনিয়ত মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে মৃত্যুর বেদনাবহ গভীরতা তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু পবনের ক্ষেত্রে এই মৃত্যু ভিন্ন মাত্রা নিয়ে মন ও শরীরে আঁচড় কাটে। এই প্রথম সে তার [illegible]নের মৃত্যু দেখল। এই মৃত্যু তার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল, এই মৃত্যুকে সে এখন কী ভাবে মেনে নেবে!

পবন ব্রজবুড়ার মৃতদেহের পাশে হাঁটু মুড়ে বসেছিল, নকুল আর বাঁকা আলোচনায় মগ্ন। এই ফাঁকে হাসপাতালের ঝাড়ুদার এসে স্ট্রেচারটা চাওয়াতে নকুল দ্বিধাহীনভাবে ব্রজবুড়াকে শুইয়ে দিল খোয়া ওঠা মাটিতে। এই বিসদৃশ ঘটনায় আরেকবার বিরক্ত হ'ল পবন, নকুলের মুখের দিকে কঠোর চোখে তাকিয়ে উথলে ওঠা রাগকে সামলে নিল কোনমতে।

এই ভাবেই মাটির বিছানায় শুয়ে থাকল ব্রজবুড়া।

কুয়াশায় দল উড়ে গেল রোদের তাড়া খেয়ে। আকাশের সেই গুমোট ভাব এখন আর নেই, তাজা ফুলের মত রোদ গায়ে মেখে হেসে উঠেছে ভাসমান মেঘের দল। এ সময় সজ[illegible] গাছে ফুল আসে, ঘাসের ডগায় জমে থাকে মুক্তাবিন্দুর মতো টলমলে শিশির বিন্দু। বৃষ্টি নেই কিন্তু রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের শুলোনী কমে না। রাধাচূড়াগাছের পাতাগুলো তিরতিরে হাওয়ায় ছন্দোবদ্ধ কাঁপছে।

পায়ে পাতলা চাদরটা জড়িয়ে বাঁকা এল পবনের কাছে, অস্ফুটে প্রায় আর্তনাদের স্বরে বলল, জ্যাঠা লাশের কাছে থাকুক, চল তুই আমি ভ্যান-রিকশার খোঁজে যাই। বাসস্ট্যাণ্ডে না গেলে ভ্যান-রিকশো পাওয়া যাবেনা।

পবন 'হ্যাঁ' সূচক ঘাড় নাড়তেই বাঁকা বলল, কাল যে টাকাগুলো জ্যাঠার কাছে রেখেছিলাম ওগুলো তুই চেয়ে নে। আসার সময় কয়েকটা বস্তা কিনে আনব। ভ্যান রিকশার কাঠে পেতে দিলে বুড়া একটু আরামে যাবে। তোর জ্যাঠা যেভাবে বুড়াকে মাটিতে শুইয়ে দিল, তা দেখে আমার খুব খারাপ লেগেছে। মানুষ মরার পরও যে এত অনাদর পেতে পারে তা আমার ধারণায় ছিল না।

বাঁকার কথাগুলো পবনকে আরো বিচলিত করে তোলে। ব্রজবুড়ার প্রতি নকুলের অসহিষ্ণু, বিরক্তিকর মনোভাব কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না পবন। জন্মদাতা পিতার উপর নকুলের এই অসামাজিক আচরণ প্রত্যক্ষ করে মনে মনে বিমর্ষ হয়ে পড়েছে পবন। তাই বাঁকার কথাকে গুরুত্ব

দিয়ে সে সরাসরি উঠে আসে পিচ রাস্তায়, জ্যাঠার কাছে টাকা-পয়সার জন্য হাত পাততে তার বিবেকে বাধে। বাঁকাও দ্বিতীয়বার টাকা-পয়সার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে না।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে বাস স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছাল। গতরাতের বৃষ্টিতে রাস্তা-ঘাট সব ভেজা স্যাঁতসেতে। পবন একটু রোদের জন্য যাঞা চোখে আকাশের দিকে তাকাল। একটু আগের রোদ ঝলমলে পরিবেশ আর নেই, মেঘ-রোদ্দুরের খেলা শেষে আবার মেঘলা হয়ে উঠেছে চারপাশ। দীঘাগামী একটা বাস এসে থামতেই হুড়মুড় করে নেমে আসে জনা দশ-বার লোক। পবন সেইদিকে তাকিয়েছিল নিবিষ্ট চোখে, যদি কোন পরিচিত মানুষের দেখা পায়—এই ভেবে সে তার সতর্ক দৃষ্টি যাত্রীগুলোর মুখের দিকে ফেলছিল সরাসরি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মুখচেনা কারোর সঙ্গেই দেখা হল না তার।

বাঁকা দরদাম করছিল ভ্যান রিকশোওয়ালার সঙ্গে। মৃতদেহ বহনে রাজি নয় অনেকে। সমস্যাটা ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল ওদের কাছে। পবন বাঁকাকে কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়ে বলল, ওরা যা চায় তাতে তুমি রাজি হয়ে যাও বাঁকাদা। বিপদের সময় বেশি দরদাম করে সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। দুপুরের আগে ঘর না পৌঁছালে শবদাহ করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

হাসপাতাল চত্বর থেকে রিকশ ছাড়তে বেলা প্রায় দশটার কাছাকাছি হয়ে গেল।

বাঁকা ব্রজবুড়ার পা দুটো ধরে আছে শক্ত ভাবে, ভাঙা-চোরা রাস্তায় রিকশর টায়ার পড়ে লাফিয়ে উঠলে মাথাটা হেলে যাচ্ছিল রিকশর কাঠে। পবন তাই ব্রজবুড়ার মাথার কাছে বসেছে। নকুল বিরস বদনে বিড়ি টানছে একের পর এক। তার এত কিসের চিন্তা পবনও বুঝে পায় না।

ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ভ্যান-রিকশো ছুটছিল সাঁইসাঁই করে, এখন আর শীত হাওয়ার নামগন্ধ নেই, রোদ উঠেছে ঝলমলিয়ে। দু-ধারে সারি সারি মাঠবাবলা আর খেজুরগাছের ঝোপ। তারই ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ছে খাপ খোলা তরবারির চমকিত দ্যুতিতে। ভাল লাগছিল না বলেই পবন চেয়েছিল ফসলশূন্য মাঠের দিকে। বাঁকা ব্রজবুড়ার পা দুটো ধরে ঝিমোচ্ছিল রিকশর দুলুনীতে।

এমন সময় নকুল গলাটা ঝেড়ে নিয়ে আক্ষেপের স্বরে বলল, বাবা যে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে—আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন মাকে যে কীভাবে সামলাব সেই চিন্তায় আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

বাঁকা যুক্তি দেখিয়ে বলল, দাদুরে ইস্কুলের মাঠে রেখে তুমি একলা ঘরে যাবে। পাড়ার সবাইকে খবর দিলে আমরা তারপর পাড়ায় ঢুকব। না হলে কান্নাকাটির তোড়ে আমাদের কোন কাজ আর হবে না।

প্রস্তাব মত রিকশ এসে থামল হাইস্কুলের মাঠে। দুঃসংবাদ বুঝি হাওয়ার বে ছোটে। খবর পেয়ে পিল পিল করে ছুটে এল গাঁ উজাড় করা মানুষ। কেউ দুঃখে কপাল চাপড়ে বলল, বুড়াটা বড় ভাল ছিল গো। কে জানত—এভাবে হুট করে মরে যাবে। মানুষের মরণ যে কখন হয় কে বলতে পারে।

শোক-প্রলাপের ধ্বনিও এক সময় ফিকে হয়ে আসে। মূর্ছিত হৈমবুড়িকে ঘিরে সুর তুলে কাঁদছে পাড়ার বউ-ঝিউড়িরা। সুভদ্রার চোখে আর বুঝি জল অবশিষ্ট ছিল না, সে মেনির হাত ধরে উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারা চোখ তুলে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। মেনি তাকে সান্ত্বনা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

পুকুরপাড়ের চারা নিমগাছটাকে কাটা হল ব্রজবুড়াকে দাহ করার জন্য। বাঁকা আর রতন বাঁশ কেটে খাটিয়া বাঁধছে। পবনকে দেখতে পেয়ে বাঁকা বলল, যা তো একপণ খড় নিয়ে আয়।

পবন কথাটা শুনেই চলে গেল খড়গাদার দিকে। ঠিক বিকেল শুরু হওয়ার মুখে পুরো দলটা রওনা দিল মুড়দার ঘাটের দিকে।

দুলুবাবু কাঁথি গিয়েছিলেন, সংবাদ পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে তিনি শ্মশানযাত্রীদের ধরে ফেললেন বাজারের শেষ মুড়োয়। তিনি পবনকেই খুঁজছিলেন কিন্তু পবন ভিড়ের মধ্যে ছিল না। সে কাঁধ দিয়েছে ব্রজবুড়ার অন্তিম যাত্রায়।

দুলুবাবু পবনের পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, তুই সরে আয়, আমাকে এবার কাঁধ দিতে দে, ভাল মানুষকে শ্মশানে বয়ে নিয়ে যাওয়াও পুণ্যের।

পবন ছলছলে চোখে সরে দাঁড়াতেই চলমান অবস্থায় কাঁধ লাগিয়ে দিল দুলুবাবু।

হাড়িসাইয়ের একদল মানুষ বিস্মিত চোখে দেখল দুলুবাবুর আজব কাণ্ডকারখানা। একজন অচ্ছুৎ নিম্নবর্গের মানুষের শবযাত্রায় এই প্রথম একজন বাবু ক্লাসের মানুষ কাঁধ দিল। এমন ঘটনা আগে কোনদিন এ গাঁয়ে ঘটেনি। দুলুবাবু নির্বিকার হেঁটে চলেছেন। তার পিছন পিছন পবন।

খৈ আর খুচরো পয়সা ছড়িয়ে দিচ্ছিল বাঁকা। তার চোখের তাবা কাঁপছিল। এলোমেলো বাতাসে খৈ আর খুচরো পয়সা ফুলের মত উড়ে-উড়ে পড়ছিল রাস্তায়।

দশ

ঘাট-কাজ মিটে যাবার পর নকুল আর দাঁড়াল না। বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল সে। মানদার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা সুভদ্রার বড্ড গায়ে বাধে। নিরুত্তর থেকে কথাগুলোকে হজম করে নেয় সে। শহরে গেলে এত দ্রুত বদলে যায় মানুষ সুভদ্রা তা জানত না, মানদার হাবভাব দেখে সে একদিন পবনকে আড়ালে ডেকে দুঃখ করে বলল, তোকে আমি কোনদিন শহরে যেতে দেব না। শহরে গেলে গাঁয়ের মানুষ চটজলদি বদলে যায়। চোখের চামড়া না থাকলে সেই মানুষের কী দাম?

মানদার চোখের চামড়া নেই, যদি থাকত তাহলে ছোট ছোট সাংসারিক বিষয় নিয়ে হৈমবুড়ির সঙ্গে বাকযুদ্ধে নামত না। নকুল বউয়ের রণচণ্ডী মূর্তির কাছে জুজু দেখা মানুষ। প্রতিবাদ তো দূরে থাক, তার গলা দিয়ে কোন স্বর বেরয় না। বউকে সে যমের মত ভয় করে। মূলত মানদার তাড়াহুড়োতে মেদিনীপুরের বাস ধরতে হল নকুলকে, নাহলে ঘাট কাজ মিটে যাবার পর আরো দু-চারদিন থাকার তার ইচ্ছে ছিল। নকুলের এই মনোভাব রাতে জানতে পেরে ধমকে উঠেছিল মানদা, চাপা গলায় নয় অত্যন্ত চড়া স্বরে সে বলেছিল, আর মা-মা করো না। বুড়ো বয়সে আর মা-মা ভাল লাগে না। ওদিকে তোমার ঘর ফাঁকা পড়ে আছে, চুরি-চামারি হলে পথে বসবা। তাছাড়া ছেলেদের ভবিষ্যৎও তোমাকে দেখতে হবে, এখানে আর একমাস থাকলে ওরা মাছকারবারী হবে, ভাগাড়ে গিয়ে শকুনের সাথে লড়াই করে চাম কাটবে।

মানদার কথাগুলো ঐ অতরাতে কানে ঢুকেছিল পবনের, আর তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গোটান শামুক নয়, থেঁতলে যাওয়া দূর্বাঘাসের মত হাঁটুতে ঘাড় গুঁজে মনমরা হয়ে বসেছিল সে। মানদা সম্পর্কে জ্যেঠিমা হলেও ঐ মহিলার কাছে পবনের কোন আব্দার আজ অব্দি ফলপ্রসূ হয়নি। পবন রীতিমতন ভয় করে মানদাকে, শুধু সে নয় তার মা-ও যে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। মানদার নির্দয়তা পবনের আদৌ ভাল লাগে না। তাই নকুল যখন মেদিনীপুর ফিরে যাবার প্রস্তাব দিল তখন ক'মুহূর্ত কোন কথা বলেনি পবন। নকুল স্বেচ্ছায় বলল, আর থেকে কী করব? থাকা মানেই তো খরচ। আমি ভাবছি কাল ভোরের বাসেই চলে যাব। অনেকদিন তো হল। সময়মত না গেলে তোর ভাইদের আবার ইস্কুল খুলে যাবে। তাছাড়া, তোর জ্যেঠিমাও থাকতে চাইছে না, বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছে।

পবন নিঃস্ব চোখে তাকাল, জ্যেঠিমার অসুবিধা হচ্ছে এখানে? অসুবিধা হওয়ারই কথা। তোমরা যেখানে থাক সেখানে তোলা জল, পাকাঘর। সেখানে কত হাজার রকমের সুবিধে। এখানে কী আছে, কিছু নাই। নকুল হতভম্ব চোখে পবনের মুখের দিকে তাকাল, পবনের কথায় তার গায়ে ফোসকা না পড়লেও শীতের দিনে ঠাণ্ডা জল ছিটানোর মত হুহু করে কেঁপে গেলে বুকের ভেতরটা। হাঁটুর বয়সী

ছেলের কাছে তার মধ্যবয়স্ক মন গলে গলে পড়ল পচা সড়া ফলের মত। সে ভাবল বয়স নয়, মানুষকে প্রকৃত শিক্ষা দেয় অভিজ্ঞতা। সুখ-স্বাচ্ছন্দ নয়, মানুষকে মানুষের মত মানুষে পরিণত করে অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম আর নিশ্ছিদ্র সততা। পবন তার মাথা হেঁট করে দিয়েছে, আধা শহুরী বিকৃত মনটাকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়েছে। ফলে পবনের সম্মুখে সে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না, নিজের অক্ষমতা তাকে হেয় আর পঙ্গু করে দেয়। ব্রজবুড়া হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে পবনের ভূমিকা প্রশংসনীয়, তুলনায় নকুল বড় হয়েও সর্বার্থে ছোট মনের পরিচয় দিয়েছে। তার স্বার্থপরতাকে হাড়িসাইয়ের মানুষ সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছে। যেটুকু কর্তব্য তার করার কথা ছিল—নকুল তা পালন করেনি। আর্থিক দুশ্চিন্তা যদিও এর মূল কারণ তবু সেই বাধা কখনও পাহাড় প্রমাণ ছিল না। ঘাট-কাজের খরচাপাতি পবন চেয়েচিন্তে এনেছে। দুলুবাবু প্রতিবারের মত সাহয্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তার দিকে। এ ব্যাপারে সব চাইতে বাঁকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা মাছ ব্যবসা ছেড়ে দেবার পর সে একটা জনমজুর ছাড়া আর কিছু নয়! বাঁকা পবনকে বলেছে, তোর দাদু তো আমারও দাদু। ঘরে তোর বাপ নেই, সে থাকলে আলাদা কথা। তুই এখন একা, আমি তোর পাশে সব সময় থাকব। টাকা পয়সা দিয়ে না পারি মেহনত দিয়ে আমি তোকে সাহায্য করব।

টাকা পয়সার সমস্যাটা বিরাট হয়ে দেখা দিয়েছিল এক সময়। সামান্য জমি যা আছে তা বিক্রি করে দিতে চেয়েছিল নকুল। সে যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল, যার জমি তার কাজে বিক্রি করা কোন অন্যায় নয়। পবন, তুই খদ্দের দেখ। জমি আমি সব বিক্রি করে দেব। বাবার ঘাট-কাজের জন্য ভিখিরির মত আমি কারোর কাছে হাত পাতব না।

—জমি বিক্রি করে দিলে বছরভর আমরা খাব কী? সুভদ্রার প্রশ্নকে কোন গুরুত্ব দেয়নি নকুল।

—তোমরা কী খাবে আমি তার কী জানি। নকুল উত্তেজিত হয়ে উঠছিল ক্রমশ। গুরুজনদের বাক-বিতণ্ডায় আদৌ জড়িয়ে পড়ার মন ছিল না পবনের। তবু সে জড়িয়ে পড়ল সুভদ্রার যুদ্ধক্লান্ত অসহায় মুখচ্ছবির দিকে তাকিয়ে।

জ্যাঠা! ঘাট-কাজের জন্য জমিগুলো হাতছাড়া করা ঠিব হবে না।

—তাহলে খরচাপাতি কোথা থেকে আসবে শুনি?

নকুলের প্রশ্নবোধক মুখের দিকে তাকিয়ে পবন একটুও বিচলিতবোধ করেনি, সে স্বাভাবিক স্বরে বলেছিল, ঘাট-খরচের সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমার। আমি দুলুবাবুর কাছ থেকে টাকা উধার নেব। মাছ ব্যবসা করে ধীরে ধীরে তার টাকা আমি শোধ করে দেব। তোমরা এ নিয়ে আর ভেব না। দাদুর নামের জমিগুলো বিক্রি করে তোমরাও শান্তি পাবে না। এক কাটা জমি যখন কিনতে পারব না তখন যেটুকু আছে সেটুকু হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। দাদু হাজার অভাবে পড়েও জমি বিক্রির কথা কোনদিন ভাবে নি।

পবনের সপ্রতিভ জবাব শুনে স্বস্তির শ্বাস ফেলেছিল সুভদ্রা। নকুল জোঁকের মুখে নুন পড়ার মত মরমে জ্বলছিল। কিন্তু মানদা সহজে দমবার পাত্রী নয়। স্বামীর পক্ষ নিয়ে সে বাজখায়ী গলায় বলল, বছর বছর ধান হয়—সেই ধানের ভাগ আমরা পাই না। যা হয় সব তোমরা পেটে ঢুকিয়ে নাও। অমন জমি থাকা না থাকা আমার কাছে এক কথা। একবার যখন বিক্রির কথা উঠেছে—তখন আর ঐ সখের জমি ধরে রেখে লাভ নেই। বাবা যখন বেঁচে ছিল তখন আলাদা কথা। বাবার অবর্তমানে শুধু জমি নয়, এই বসত ভিটাও দু-ভাগ হবে। এক ভাগ বড়োর, এক ভাগ ছোটর। পৈতৃক সম্পত্তি তো দুই ভাইয়ের মধ্যে সমান ভাগ হওয়া উচিত। একজন শুধু মেরে খাবে এ তো হতে পারে না।

মানদার কথায় এত ঝাঁঝ ছিল যা নকুলেরও অসহ্য লাগে, যেন ঝাঁক ঝাঁক কাঠ পিঁপড়ে আক্রোশে দংশন করে তার কর্ণকুহরে। মানদা রাগী চোখে তার দিকে তাকিয়ে বিশাল বপু নিয়ে হাঁপায়।

অপমানে চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠে সুভদ্রার। মানদার যুক্তিকে সে খণ্ডন করে বলে, শ্বশুরের সম্পত্তি দু-ভাগ হওয়াই দরকার। কিন্তু দিদি, এখন কি ভাগ বাটোয়ারার সময়? বুড়িটার থান কাপড়ের দিকে চেয়ে কি আমাদের চুপ করে থাকা উচিত নয়?

মানদা একথায় শান্ত হল না; ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, এতদিন তো চুপ করে ছিলাম। চুপ করে থাকলে বেড়ালও ডিঙিয়ে যায়। যা যুগ পড়েছে তাতে হিসাব না বুঝে নিলে পথে বসে কাঁদতে হবে। আমি তো তোমার ভাসুরের মত মেড়া নই, আমার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। আমাকে ঠকিয়ে নেবে তেমন মানুষ হাড়িসাইয়ে এখনও জন্মায় নি।

—তাহলে তুমি কি করতে চাও? সুভদ্রা মিনমিনে স্বরে বলল কথাগুলো। মানদা ভ্রু-বেঁকিয়ে বলল, জমি-জিরেত যা আছে তার দুটো ভাগ হবে। এক ভাগ ঠাকুরপোর, এক ভাগ আমাদের। তোমার ভাসুর চাকরি করে বলে ভেব না আমরা রাজসুখে আছি। শহর জায়গায় যেমন আয় আছে তেমন খরচও আছে। হাতি যেমন খায়, তেমন নাদেও।

—তুমি চুপ করো দিদি। তোমার ঠাকুরপো আসুক তখন বরং একবার এসো। তোমার ঠাকুরপো না থাকলে জমিতো ভাগ করা যাবে না। হাজার হোক সে যখন মাথার উপর আছে, তাকে বাদ দিয়ে তো এ সংসারে কোন কাজ হবে না।

রাজ্য জয় করার প্রশান্তি মানদার চোখে মুখে: রুগ্ন, শীর্ণ নকুল জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানদার কথাগুলো সে সমর্থন করে না, আবার প্রতিবাদও করে না। তার ভূমিকা দুই পুকুরের শোলমাছের মত। পবন কিছুটা কোণঠাসা হয়ে বাক্যহীন চোখে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে। তার নিরপরাধ চোখে ফুটে উঠেছে চাপা অভিমান। সম্পর্কের সিঁড়িগুলো মানুষ এত দ্রুত গুঁড়িয়ে দিতে পারে! পবনের চাপা অভিমান চোখের কোণে সূক্ষ্ম জলকণার জন্ম দেয়। ক্ষুদ্র স্বার্থের নিপুণ লড়াইয়ে পবনের মনে অস্তিত্বহীনতার প্রশ্ন জাগে।

নকুল একটা বিড়ি ধরিয়ে ঘনঘন টান দেয়, তার চোখের নিচের কালি এবং কুঁচকান চামড়ায় অদ্ভুত মিশে যায় ধোঁয়া। মানদা তার স্থূল শরীর নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। সে যে হাড়িসাইয়ের সবার চেয়ে আলাদা এ প্রমাণ সে তার চেহারা এবং বেশভূষায় রেখেছে। তার কাটা কাটা কথাগুলোয় সৌজন্যতার কোন স্পর্শ নেই। নারী অহঙ্কারী হলে কখনও ভয়ঙ্করী হয়ে ওঠে। তখন তাকে সামলান দায় হয়ে ওঠে সবার।

সুভদ্রার চোখের কোণে অক্ষমতার বাষ্প জড়ো হতেই হৈমবুড়ি এল ছোট বৌক উদ্ধারের জন্য। সে ছোট বৌয়ের পক্ষ নিয়ে বলল, তোরা এত হীন তা আমি জানতাম না। যে মানুষটা মরল তাকেও তোরা শান্তি দিবি না দেখছি। ছিঃ ছিঃ, এদের আমি গর্ভে ধরেছিলাম।

কথা শুনে লেজে পা দেওয়া সাপিনীর মত ফুলে ওঠে মানদা, মা, যা বোঝনা তা নিয়ে আগ বাড়িয়ে কথা বলো না। ছোট ছেলেকে তো সব দিয়েছ—আমাদের তুমি কী দিয়েছ?

—কী দিইনি? নকুলের চাকরির টাকা যোগাতে দু'বিঘা ধানী জমি বুড়াটা জলের দামে বেচে দিল। এখন যে দু-বিঘা আছে—সেটুকুও খেতে চাও। চাকরি পাওয়ার পর নকুল ঘরের জন্য কী করেছে? উল্টে আরো নিয়েছে। সে শুধু তার নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দের কথা ভেবেছে। সে তার বুড়া বাপকে দুটা টাকা দিয়েও বলেনি, এই নাও বাপ, তামাক খাবা।

মানদার রাঙা মুখে কথার পচা পাঁক ছুঁড়ে দেয় হৈমবুড়ি। উত্তেজনায় তার কুচকান চোখের চামড়াগুলো নড়ে। বলিরেখা ফুটে ওঠা মুখমণ্ডলে কাঠিন্যের ছায়া পড়ে, বুড়ির নোলা-ঝোলা হাতের চামড়াগুলো থরথর করে কাঁপে। অত্যন্ত কঠিন গলায় সে বলে, নকুলরে, তোর যদি না পোষায়, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে তুই এ ভিটে ছেড়ে এক্ষুণি চলে যা। তোর মত কুলাঙ্গার ছেলের মুখ দেখলেও আমার

পাপ হয়। বাপের কাজ যদি না করতে পারিস তাহলে তোকে আমি দোষ দিব না। আমার নাতি আছে—সে-ই বুড়ার সব কাজ করবে। যার ছেলে মরে যায় তার কি কাজ-ঘর হয় না?

বিবাদের জল অনেক দূর গড়াত কিন্তু সুভদ্রা পারিবারিক শান্তিরক্ষার জন্য হৈমবুড়িকে টেনে নিয়ে যায় চুলাশালে, মৃদুস্বরে বুঝিয়ে বলে, তুমি চুপ কর মা। এখন মাথা গরম করলে লোক হাসবে। দিদির কথায় তুমি কিছু মনে করো না।

হৈমবুড়ি চুপ করলেও তার বুকের আগুন নেভে না। ধিকি ধিকি করে জ্বলে। সন্তানের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা তাকে আরো জড়বৎ করে তোলে। নকুল মুখ নিচু করে শিকড়-বাকড়ে বশ মানা সাপের মত সুড়সুড় করে চলে যায় খলাবাহিরে। মানদার অবস্থাও তথৈবচ, সে তার অন্তর্গত জ্বলাময়ী দহনকে ধৈর্যের হাড়িকাঠে বলি দিয়ে কাজের আছিলায় চলে যায় বড় ঘরে। সবাই চলে যাবার পর বুক ঠেলে উঠে আসা কান্নার জোয়ারকে কিছুতেই প্রশমিত করতে পারে না হৈমবুড়ি। তার শুকনো গাল চুঁইয়ে খরদাহের বালিয়াড়ি চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবিন্দু নেমে এসে ঝুলে থাকে তোপড়া টোল খাওয়া চিবুকে। নীরব অশ্রুপাত নয়, সে উচ্চকণ্ঠে কেঁদে ওঠে। তার কান্নার ধ্বনিতে দণ্ডায়মান পবন নিজেকে বিচলিতবোধ করে। একভাবে হৈমবুড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তারও অন্তরাত্মা ডুকরে ওঠে। এই বিচ্ছেদ বিবাদ সে কখনও কামনা করে না, সে তার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে এসব অপ্রীতিকর ঘটনাকে এড়িয়ে চলতে চায় যথাসাধ্য। সুভদ্রা কান্নার শব্দ পেয়ে ছুটে আসে রান্নাঘর থেকে। হৈমবুড়ির অশ্রুসিক্ত মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে কথা জড়িয়ে যায় তার। তবু সে কম্পিত কণ্ঠে শুধায়, মা গো, তুমি কান্‌ছো কেন, কী হয়েছে তোমার?

হৈমবুড়ি ক্ষণিক কান্নার গতিবেগ থামিয়ে ঘোলাটে চোখে তাকায়, আমার কিছু হয়নি বৌমা। জ্ঞানমান ছেলে থাকতে আমার কপাল পুড়েছে—এই আমার দুঃখ। আমার এই দুঃখ ঘোচানোর মত এ পৃথিবীতে কেউ নেই। যে ছিল সে তো আমার আগে চলে গেল। আমার হয়েছে মরণ, আমি না পারছি মরতে, না পারছি বাঁচতে।

—এসব আর ভেব না মা।

—ভাবব না বৌমা।

সুভদ্রা হৈমবুড়ির স্থির, অনুজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে কোন জবাব দিতে পারে না, শুধু টলোমলো পায়ে এগিয়ে গিয়ে কোনমতে জোর করে দাওয়ায় বসিয়ে দেয় বুড়িকে। সুভদ্রার আন্তরিক স্পর্শে কেঁপে ওঠে হৈমবুড়ি। তার চোখের জল পিছলে পিছলে নেমে আসে চিবুক ভিজিয়ে। হৈমবুড়িকে জড়িয়ে ধরে নীরবে কেঁদে ওঠে সুভদ্রা।

হাজার কাজের তাড়া পবনকে তার নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করার সুযোগ দেয় না। দুলুবাবু কাল হাটে বলেছিল, দু'মণ চাল দেবে ব্রজবুড়ার শ্রাদ্ধের জন্য। বাঁকা এসে সাইকেলের বেল বাজাতেই পবন দুশ্চিন্তা সব ঝেড়ে ফেলে ভাঁজ করা বস্তা দুটো নিয়ে নেমে গেল উঠোনে। কচার বেড়ার ওপিঠে সাইকেল খাড়া করে বাঁকা দাঁড়িয়েছিল তার জন্য। পবন পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে বাঁকা বলল, আমার টুকে দেরী হয়ে গেল। ঘরে তোর বৌদির সঙ্গে জোর অশান্তি চলছে। অভাবের সন্‌সারে অশান্তি তো নিত্যকার খোরাক। আজকাল তোর বৌদির কথাগুলো আমার সহ্য হয় না। মেয়েরা বুঝি খোঁচা দিয়ে কথা বলতে ভালবাসে।

বাঁকা অনর্গল কথা বলতে বলতে হাঁটছিল, হাটখোলায় এসে সে হাঁটার গতি শ্লথ করে বলল, মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানিস—হাড়িসাই ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাই। গাঁয়ে কাজ-কর্মের বড় অভাব। গতর আছে কিন্তু গতর খাটাবার কোন সুযোগ পাইনে। ধর্মাবাবুর কাছে কাজ চাইতে আমার বড় বিবেকে বাধে। মানুষটাকে কেন জানিনা আমি একদম সহ্য করতে পারি না। ওর চোখে চোখ ফেললে ভেতরটা

আমার গুলিয়ে ওঠে। এত খচ্ছড় মানুষ আমি আর দুটি দেখিনি। বিতর্কিত কথাগুলো হজম করে নেয় পবন। কিছু শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছিল বাঁকা। পবন নিরাশ না করে বলল, অভাব হাড়িসাইয়ের ঘরে ঘরে। এত অভাব—মাঝে মাঝে মনে হয় এর থেকে কি আমাদের রেহাই নেই।

ভ্রু কুঁচকাল বাঁকা, অভাবের সাথে লড়ে লড়ে পেরে উঠিনে। কাজ-কর্ম না থাকলে কুঠিয়া মেরে যায় গা-গতর। আগে মাছ ব্যবসা করতাম। এখন পুঁজি খুইয়ে মাথা কাটা খেজুরগাছের মত বেঁচে আছি। বৌ-ছেলের মুখে সময়মত দুটো ভাত জুগাতে পারিনে। ওরা অষ্টপ্রহর আমাকে দুষে। সব সময় মাথার ঠিক থাকে না; কখনো ঝগড়া কাজিয়া হয়ে যায়। আসলে পুরুষমানুষ কখনোই মেয়েছেলের গরম তেলে জলের ছিঁটে দেওয়ার মত কথা সহ্য করতে পারে না। সে যে শালা পারে পারুক; আমি তো পারিনা।

বাঁকা যে ঝড়ে বিধ্বস্ত মানুষ তা তার কথা শুনে অনুমান করতে পারে পবন। এই বাঁকা একদিন তার বিরোধিতা করেছিল, সে কথা পবন মুছে ফেলেছে মন থেকে। ব্রজবুড়ার অসুখের পর থেকে বাঁকা পবনের পাশে ছায়ার মত লেগে আছে। ঘরে যে তার বউ-ছেলে আছে একথা সে একবারও ভাবেনি। মানুষের বিপদে দাঁড়াতে পারলে সে সুখী। বাঁকার এই পরিবর্তন কখনোই লোক-দেখানো নয়, একথা আর কেউ না মানলেও পবন মানে। বাঁকা না থাকলে কাঁথি শহরে একা হাবুডুবু খেত পবন। বিপদে-আপদে বাঁকা বড়দার মত তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাঁকার এই মানসিক অস্থিরতা পবনকেও ভাবিয়ে তোলে। অনেক ভেবে-চিন্তে সে বলে, দাদুর কাজঘর মিটে যেতে দাও। তারপর আমি তোমাকে নিয়ে মাছখটীতে যাব। সেখানে আমার জানাশোনা একজন খটীমালিক আছে, তাকে বলে আমি সেখানে তোমার একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারব।

বাঁকার ঠোঁটের কোণে বিতৃষ্ণাজনিত হাসির রেখাটা শোলবুড়ির হঠাৎ জেগে ওঠা শরীরের মত দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল। পবন বিব্রতভরা চোখে তাকাল। বাঁকা বলল, মাছখটীর কাজ আমি করব না। নোনা জলের নোনা ধান্দায় শরীর শুধু ক্ষয় হয়—কাজের কাজ কিছু হয় না। নোনা মাছের ব্যবসা আমি তোর চার বছর আগে থেকে করছি। এতদিন ব্যবসা করে মহাজনের অবিশ্বাস ছাড়া আর আমি কিছু পাইনি। সমুদ্র কিছু নিলে ঘুরোন দেয় আবার। সমুদ্র আমার যৌবন নিয়েছে, আমাকে বুড়া বানিয়েছে কিন্তু ঘুরোন কিছু দেয়নি। উল্টে তোর বৌদি আমাকে সন্দেহ করে। তার ধারণা আমি মাছখটীর কোন মেয়েকে নাকি ভালবাসি। দেখ দেখি জ্বালা। পুঁজি চোট খেয়ে মাজা সোজা করে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু মনে চোট খেয়ে আমি দগ্ধে দগ্ধে মরছি। সব সময় তোর বৌদির সন্দেহবাতিক চোখ দুটো আমাকে তাড়া করে। আমি ওকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারিনে....

—সন্দেহ রোগ ভয়ানক খারাপ রোগ। পবন বলল, এ রোগ চট জলদি মিটিয়ে ফেলার দরকার। এ রোগে মানুষ মরে না কিন্তু মন শুকিয়ে চিমড়ে মেরে যায়।

বাতাসে শীতের গন্ধ ছিল। পবন আর বাঁকা সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে হাটখোলা পেরিয়ে আসে দ্রুত। এ পৃথিবীতে একটা মানুষ নেই, তার এই না থাকা কারোর মনে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। হাটখোলা পেরিয়ে এসে পবন ভাবছিল, পৃথিবীর কোন ক্রিয়াকর্ম কারোর জন্য থেমে থাকে না। প্রথমে সে ভেবেছিল, ব্রজবুড়ার মৃত্যুতে হৈমবুড়িকে আর হয়ত বাঁচানো যাবে না। কিন্তু তার এই অনুমানও ভুল হয়েছে। আঘাতটা পোড় খাওয়া শরীর দিয়ে সামলে নিয়েছে হৈমবুড়ি। তার নিজের ক্ষেত্রেও একথা অনেকটা প্রযোজ্য। দাদুর অবর্তমানে সে অভিভাবকের ভূমিকায় নেমেছে। দুলুবাবুর কাছ থেকে দু'মণ চাল নিয়ে গিয়ে পুরো হাড়িসাই খাওয়াবে সে। মাছখটীর সাউয়ের পো কিছু টাকা কর্জ দেবে তাকে। সেই টাকায় আনুসাঙ্গিক খরচ করবে সে। ব্রজবুড়ার শ্রাদ্ধে শুয়োর মারা হবে হাড়িসাইয়ে। পাড়া-প্রতিবেশীর আব্দার ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারেনি। নাম-সংকীর্তনের আয়োজনও করছে সে। খোলপার্টি কথা দিয়েছে কম পয়সায় রাতভর কীর্তন গাইবে। এত সব কিছুর আয়োজন পবন একাই করছে। সে আদৌ হাঁপিয়ে ওঠেনি। তবে প্রায়ই তার মনে হয়েছে—এ সময় বাবা তার

পাশে থাকলে মনের জোর দ্বিগুণ হোত। জ্যাঠা তো থেকেও না থাকার মত। সব সময় কূট-কাচালিতে ব্যস্ত। জ্যেঠিমা কী কারণে পবনের সঙ্গে ভালভাবে কথা বলে না। নেহাৎ-ই দায়ে পড়ে তারা যেন এখানে এসেছে এমন মনোভাব। এই ছাড়া ছাড়া, বিচ্ছিন্ন অনাত্মীয় মনোভাব পীড়া দেয় পবনকে। কিন্তু মনের কথা সে তার মায়ের কাছেও খুলে বলে না। মা তাহলে আরো ভেঙ্গে পড়বে, দুঃখ পাবে। মেনি কি তার মনোভাব কিছুটা বুঝতে পেরেছে? না পারলে সে কেন বলল, যা না দাদা একবার বালিঘাই আর বেলদা থেকে ঘুরে আয়। এখন তো যাত্রার মরশুম। বাবা সেখানে থাকলেও থাকতে পারে।

পবন মেনির কথামত গিয়েছিল। গিয়ে কোন লাভ হয়নি। আপ-ডাউন বাস ভাড়াটা নষ্ট হল তার। বেলদার যাত্রা কোম্পানীর ম্যানেজার মাইতিবাবু বললেন, সে তো এ জেলায় নেই। বাঁশি বাজাতে হায়ার গিয়েছে কোলকাতায়। কবে ফিরবে তা জানি না বাপু। আমরা তাকে ঘর যাওয়ার কথা বলেছিলাম। সে আমাদের কথা শোনে নি। একরাশ দুঃখ বুকে পুরে নিয়ে ঘর ফিরে এসেছে পবন। বাবা কেন ঘরমুখো হয় না এ প্রশ্ন তারও। তবে কি মায়ের সাথে সংঘাত, দ্বন্দ্ব? এর মূল কারণ কী? অতসী বোষ্টমীর উপস্থিতি কী তাহলে ছেদ টেনেছে স্বামী-স্ত্রীর সহজ সরল সুন্দর সম্পর্কে? সাইকেলের প্যাডেলে হোঁচট খেয়ে পবন থমকে দাঁড়ায় দুলুবাবুদের বেড়ার সামনে। বাঁকা সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে পবনের মুখের দিকে হা-করে তাকিয়ে। কুয়াশার দল উড়ে বেড়ায় মাথার উপর দিয়ে। কোথায় একটা পাখি ডাকে কুব কুব শব্দে। পবন বাঁকাকে দাঁড় করিয়ে ইট বিছান পথ দিয়ে হেঁটে এল অনেকটা। কতদিন পরে পবন এই রাস্তা দিয়ে হাঁটল, ভাবতে গিয়ে খেই হারিয়ে গেল তার হিসাব। মালার সঙ্গে কতদিন তার দেখা হয়নি। কেমন আছে মালা? মালার মুখটা মনে পড়তেই পবনের হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে এল।

দুলুবাবু এসময় কোনদিন ঘরে থাকেন না, এবারও পবনের সঙ্গে দেখা হল না তার, মনমরা হয়ে পবন দাঁড়িয়েছিল মাটির ঘরটার সামনে, আলো প্রচ্ছায়ার খেলা চলছিল প্রকৃতিতে। পবন গলা খেকারী দিতেই ঘর থেকে আলো হাতে বেরিয়ে এল মালা। পবনকে প্রথমে সে চিনতে পারেনি, কাছে এসে চিনতে পেরে সহাস্যে বলল, দাঁড়িয়ে আছো যে—ঘরে আস।

পবন আশৌচের কারণে ইতস্তত করছিল। মালা জোর গলায় বলল, সঙ্কোচ করোনা, বারান্দায় উঠে আস। বাবা আজও ঘরে নেই। বামুনপাড়ায় গিয়েছে, ওখানে নাকি দু'দলের ঝগড়া হয়েছে। ধর্মাবাবুর লোক এসে বাবাকে ডেকে নিয়ে গেল।

সব শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পবন। মালার হাসি মুখ দেখে সে ঘরের যাবতীয় ঝগড়া বিবাদের কথা ভুলে গেল। মালা আবার বলল, চলো, মাকে বলি তোমার জন্য চা বানাতে।

পবন যে এত গুরুত্ব পাবার লোক—এটা তার বিশ্বাসই হয় না। মালার আন্তরিকতা বানানো নয়। পবন তা হৃদয় দিয়ে বোঝে।

—বাঁকাদা বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আমি ওকে ডেকে আনি।

পবন চলে যাচ্ছিল, পিছন থেকে মালা বলল, দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাই। সারাদিন তো ঘরের মধ্যে বন্দী থাকি। মার সঙ্গে কতক্ষণ আর কথা বলব। মাঝে মাঝে আমিও হাঁপিয়ে উঠি। কিছুটা আসার পর মালা আবার বলল, অনেকদিন থেকে ভাবছি তোমাকে একটা কথা বলব। কিন্তু কী ভাবে যে কথাটা বলব তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। মালা রহস্যময় চোখে তাকাল। মালার চোখের দিকে তাকিয়ে সারা শরীরে অদ্ভুত একটা শিহরণ ছড়িয়ে গেল পবনের, সে বুঝে পেল না কী বলতে চায় মালা।

গাঁদাফুলে ভরে ছিল বাগান। মালা থোপা গাঁদাফুল গাছের গোড়ায় চকিতে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, কথাটা তোমার কাছে বলা ঠিক হবে কিনা ভাবছি। আমি এখন খুব অশান্তির মধ্যে বেঁচে আছি। কখনো মনে হয় এঘর ছেড়ে পালাই। এখানে থাকতে আমার আর ভাল লাগে না। নিচু গলায় মালা কথা বলছিল, একটু থেমে আশপাশ লক্ষ্য করে সে বলল, পালিয়ে যেতাম, শুধু বাবার জন্য পারি না। আমি

কোথাও চলে গেলে বাবা পাগল হয়ে যাবে। মাকে যত সহজে আমি আঘাত দিতে পারি—বাবাকে তা পারি না। বাবা আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে বিরাজ করছে। তার আদর্শ আমাকে অনুপ্রাণিত করে, তার আদর্শ নিয়েই আমার বেঁচে থাকা। মালা অন্ধকারে চোখ মুছে নিয়ে চুপ করে থাকল।

পবন এসব হেঁয়ালী কথার কোন মানে উদ্ধার করতে পারে না। মালা অন্যদিনের তুলনায় আজ অনেক দুর্ভেদ্য। কী তার সমস্যা পবনের জানা হয়ে ওঠেনি, তবু মেয়েটির অন্তর কুন্দফুলের চেয়েও পবিত্র এটা পবন বোঝে। কী অধিকারে মালা তার কাছে সমস্যার কথা বলতে চায়—এর সঠিক কারণ পবনের কাছে অজ্ঞাত। মালার সামাজিক অবস্থান পবনের চেয়ে অনেক উঁচুতে। পবন তার নিজের ওজন বোঝে বলেই মালাকে কোন প্রশ্ন করতে সাহসই পায় না। মালা ঘনিষ্টভাবে সরে এসে বলল, আজ থাক, পরে একদিন বলব। যদি বলতে পারতাম তাহলে আমি নিজেই খুশি হতাম। মালা আবার সেই একই রকম হেঁয়ালীপূর্ণ চোখে তাকাল, তোমার দায়-দায়িত্ব মিটে গেলে একবার আমাদের বাড়িতে এসো। অনেক কথা আছে।

—তোমার কথা শুনে আমি কি কিছু করতে পারব?

মালা পবনের প্রশ্নটা নাস্যাৎ করে বলল, বুকে পাথর চেপে রাখা সহজ কিন্তু কথা চেপে রাখা খুব কঠিন। এ গ্রামে আমার কোন বন্ধু নেই। এ গ্রামে আমাকে সাহায্য করার মত কেউ নেই। আমার মনে হয়েছে—তুমি আমার উপকার করতে না পারলেও অপকার কোনোদিন করবে না। তাই তোমার কাছে সব কথা বলে আমি বুকের বোঝা লাঘব করতে চাই।

মালার বিচলিত উদ্‌ভ্রান্ত অক্ষিযুগল পবনকে সমস্যার কাঠগড়ার দাঁড় করিয়ে দিল। মালা কম্পিত স্বরে বলল, তোমার কোন ভয় নেই। আমার দ্বারা তোমার কোনদিন অপকার হবে না।

দু-বস্তা চাল আগে থেকেই ওজন করে বাঁধা ছিল। বাঁকার সহযোগিতায় চালের বস্তা দুটো সাইকেলে চাপিয়ে দিল পবন। ফেরার সময় তার বড় মন খারাপ, মালার কথাগুলো বারবার করেই মনে পড়ছিল। একটা মানুষ অন্য মানুষের সাহায্য কখন চায়? আশ্চর্য হল—সে কীভাবে মালাকে সাহায্য করতে পারে এই ভেবে। মালা অন্যদিনের তুলনায় আজ অনেকটা নিষ্প্রভ। চিন্তায় তার সুন্দর মুখশ্রী স্বাভাবিকতা হারিয়ে ম্লান-বিধূর। পাকা রাস্তায় উঠে এসে পবন ভাবছিল মালার আকুতিভরা কথাগুলো।

ব্রজবুড়ার শ্রাদ্ধের দিন শুয়োর মারা হল হাড়িসাইয়ে। শুয়োর মারার মুখ্য ভূমিকায় বাঁকার অবদান অনস্বীকার্য। খালি গায়ে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়েছিল পবন, তার পাশাপাশি ছেলে-বুড়ো আরো অনেকেই। দশ বার জন লোক জলের গভীরে বাঁশ দিয়ে ঠুসে ধরেছে দশাসই শুয়োরটাকে। ওরা জলের তলায় দম বন্ধ করে মারতে চায় পশুটাকে। মানুষ আর পশুর এমন আজব লড়াই হাড়িসাইয়ে মাঝে মাঝে দেখতে পায় পবন। এই নৃশংস দৃশ্য তার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

ব্রজবুড়া শুয়োরের মাংস খেতে ভালবাসত। পবন গালে হাত দিয়ে ভাবছিল, মাত্র মাস দুয়েক আগেও ব্রজবুড়া এই পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে গোরুর চামড়া শুকিয়েছে রোদে। আজ সেই মানুষটা নেই। ছায়াও সরে গিয়েছে কোথায়। একটা দীর্ঘশ্বাসের মত ঝুলে আছে রক্তাক্ত স্মৃতি।

পুকুরের মাঝখান থেকে মানুষের ক্রোধ উন্মত্ততার শব্দ ভেসে আসছিল। স্থির জলে ঢেউ উঠেছে মানুষের দাপাদাপিতে। শুয়োরটা বাঁশের লাঠি ফসকে ভেসে উঠেছে দশ হাত দূরে, তার ক্ষুদে চোখ দুটোয় জড়ো হয়েছে রাজ্যের ভয়। নকুল মাতব্বরি করার জন্য এগিয়ে এল বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে; গলায় তিরস্কার, কী রে বাঁকা, এখনও কাবু করতে পারলিনে জানোয়ারটাকে? কেমন মরদ তোরা!

বাঁকা গলা জলে কাঁপতে-কাঁপতে বলল, হিমজলে পেরে উঠছি নে। তবে এবার ও শালাকে ঠিক কাবু করবই—নইলে শেষ অস্ত্র তো আছেই। শেষ অস্ত্র মানে বল্লম। হাতে বল্লম নিয়ে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল রতন। সে প্রস্তুতই ছিল, বাঁকার নির্দেশ পেলে বল্লম হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে জলে। জোয়ান রতনের পরনে লেংটির মত পরা গামছা। গায়ে গেঞ্জিও নেই। খসখসে চামড়ায় খড়ি ফুটেছে শীতকালীন রুক্ষতায়।

অবশেষে দশ মানুষের লাঠির ঘায়ে কাবু হয়ে গেল শুয়োর। বাঁকা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল, খুব দম ছিল ঘুসুরটার। কিন্তু মানুষের দম আর বুদ্ধির কাছে শুয়োর কতক্ষণ পেরে উঠবে! ওঠা শালাকে, নিয়ে চল ডাঙ্গায়।

দশজন মানুষ মৃত শুয়োরটাকে জলে ভাসাতে ভাসাতে পাড়ের কাছে নিয়ে আসে। গামছার জল নিংড়ে হাত মুছে বিড়ি ধরায় বাঁকা। তার হাত-পায়ের আঙুলগুলো ঠাণ্ডায় টিকটিকির তেলোর মত কুঁচকানো। শীতে হু-হু করে সে কাঁপছিল, দাঁতে দাঁত ঠেকে অদ্ভুত শব্দ তুলছিল সে। শুকনো কলাপাতা, বাঁশপাতা আর খড়কুটোর আগুন ধরাল রতন। সেই প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখাকে কেন্দ্র করে গোল হয়ে দাঁড়াল বাঁকা, রতন এবং আরও অনেকে। নকুল ট্যাপামাছের চুপসে যাওয়া পেটের মত মুখ করে বলল, আগুন পোহালে চলবে না। পুরা পাড়া খাবে। এখনই মাংস কেটে কড়াই চাপিয়ে দে চুলায়।

বাঁকা তির্যক চোখে তাকাল, সে চিন্তা তোমার নয় জ্যাঠা। ছেলে-ছোকরার উপর এ দায়িত্ব ছেড়ে দাও। তোমার টাইমে সব কিছু পেলেই তো হল।

পাত্তা না পেয়ে নকুল বিড়বিড়িয়ে কী সব বলে চলে গেল উঠোনের দিকে। ঐ অত ভারী শুয়োরটার দু'পায়ে রশি বেঁধে লম্বা বাঁশে ঝুলিয়ে আগুনে ঝলসে নিল বাঁকা আর রতন। লোম পোড়ার দুর্গন্ধে মেনি নাক টিপে সরে গেল বিচিকলা ঝাড়ের আড়ালে। পবন এতক্ষণ মেনিকে দেখেনি, হঠাৎ নজর পড়তেই নিজেকে তার বড় অপরাধী মনে হল। লম্বা লম্বা পা ফেলে পবন এগিয়ে গিয়ে মেনির মুখোমুখি দাঁড়াল।

—মা কোথায় রে?

মেনি মুখ নিচু করে বলল, হাঁড়িশালে। দিদিমা কান্‌চে, মাও কান্‌চে। আমার ভাল লাগল না বলে চলে এলাম।

—এখানে না এলেই ভাল করতিস। পবন কেমন নিরুত্তাপ গলায় বলল কথাগুলো। মেনি বলল, না এলেই ভাল হোত। কিন্তু আমি কী জানতাম এখানে এমন ঘটনা ঘটতে চলেছে। মেনি থামল। হেলে পড়া চুলগুলো ফাঁকা সিঁথির উপর শুইয়ে দিয়ে বলল, দাদা, একটা কথা শুধাই—রাগ করবি না বল?

—কী কথা? উৎসাহ নিয়ে মেনির আরো কাছে সরে এল পবন।

মেনি ব্যথিত স্বরে বলল, আজকের দিনে শুয়োরটা না মারলে কি চলত না? আমার খুব খারাপ লাগছে।

তর্জনী কামড়ে মেনির মুখের দিকে তাকাল পবন, অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, দাদু যে শুয়োরেব মাংস খেতে খুব ভালবাসত।

দাদার মুখের উপর কোনদিন কথা বলা পছন্দ করে না মেনি। পৃথিবীর এই একজন মানুষের সঙ্গে সে কোনদিন অহেতুক তর্ক করে না। পবনও বোনের স্বভাব জানত। মেনির বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে পবন বলল, আজকের দিনে যে যেটা খেতে ভালবাসে তাকে সেটা খেতে দিতে হয়। নাহলে মরেও যে মানুষ সুখ পায় না। আজ জ্যাঠা দাদুর জন্য বিলভাত নিয়ে যাবে পূবমাঠে। আমি সাথে যাব। বাবা থাকলে আমি অবশ্য যেতাম না। বাবা না থাকার জন্য আমাকেই যেতে হবে পাহারাদার সেজে।

মেনি এসব কথা শুনে আরো অবাক হয়। বিলভাত শব্দটার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে জ্ঞান পড়ার পর থেকেই। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে হাড়িপাইয়ের মানুষরা মৃত আত্মার শান্তি কামনায় বিলভাত নিয়ে যায় পূবের মাঠে। সে দৃশ্য চোখে দেখার মত।

রাতের অন্ধকার গাঢ় হতেই নকুল তৈরী হয় পূবমাঠে যাবার জন্য। অন্য একটি কাঠের চুলায় নকুল মাটির হাঁড়িতে ভাত রান্না করে শুচিসম্মত উপায়ে। তরি-তরকারী সাজিয়ে সে পবনকে ডাকে, কই রে পবনা, চ। আর দেরি করা সাজে না। পবন তৈরী হয়েই ছিল। নকুলের ডাকটা কানে যেতেই

পাকা বাঁশের লাঠিটা হাতে নিয়ে সে হাজির হল সামনে। নকুল সতর্ক গলায় বলল, সাবধানে চল। অমাবস্যা রাত্রি। হাতে একটা হ্যারকেন নিয়ে নে, নাহলে এতটা পথ আঁধারে যাবি কী করে।

সুভদ্রা কান্না ছলছলে চোখে কাচ মোছা হ্যারিকেনটা পবনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে দূরে সরে দাঁড়াল। নকুল দুয়ারের খুঁটিবাঁশে তিনবার বাড়ি মারতেই হৈমবুড়ি কোথা থেকে ছুটে এসে ভেঙ্গে পড়ল কান্নায়। মেনি গিয়ে হাত ধরল বুড়ির, অত্যন্ত মরমী গলায় বলল, দিদিমা গো, কেঁদোনা। চলো, ঘরে চলো, হৈমবুড়ি তবু সুর করে কাঁদছিল। হ্যাজাকের আলোয় উড়ে আসা পোকাগুলো তার মাথার উপর উড়ছিল বিচিত্র সুর করে। সেই সুরেও বিষণ্ণতার প্রলেপ। বুড়ি যদি মূর্চ্ছা যায় এই ভয়ে সুভদ্রা চোখ মুছে নিয়ে বুড়ির বাঁ হাতটা ধরল শক্ত করে, এ সময় কাঁদতে নেই মা। তুমি চুপ কর। বাবার জন্য বিলভাত নিয়ে যাচ্ছে। তুমি একবার চোখ মেলে তাকাও। তবু চোখ মেলে তাকাল না হৈমবুড়ি, সে তার অবসন্ন শরীরটা কাঁদতে কাঁদতে এলিয়ে দিল সুভদ্রার বুকে। সুভদ্রা তার অশক্ত হাত দিয়ে কোনমতে বুকে জড়িয়ে ধরল বুড়িকে।

এই ভাবে শ্রাদ্ধের রাতটাও কেটে গেল শান্তিপূর্ণ।

পরের দিন সকালে সূর্য উঠল বাঁশবাগান চিরে একেবার হামা দেওয়া শিশুর মেজাজে। পবন গিয়েছিল জলকাজ সারতে, এসে সে দেখল মেনি পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছে একা একা, তার স্থির চোখ জলের দিকে নিবদ্ধ। পবন তাকে ছুঁয়ে দিতেই চমকে উঠল মেনি, কী রে দাদা, না বলে আমাকে ছুঁয়ে দিলি—আমি বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছি।

হাসল পবন, দিনের বেলায় ভয় কীরে! ঘবে গিয়ে খপখপ আমার জন্য এক কাপ লাল চা বানা দেখি।

চায়ের পাঠ ব্রজবুড়া গত হওয়ার পর থেকেই উঠে গিয়েছে এ সংসার থেকে। শুধু নকুলের আব্দারে পবন চা-পাত্তি কিনে এনেছে হাট থেকে। ব্রজবুড়ার জন্য রোজ দু-বেলা চা হোত। বিশেষ করে সকালে আধা গেলাস লাল চা না পেলে ব্রজবুড়া পাড়া মাথায় তুলে চেঁচাত। বলত, টুকে গরম জল তা-ও তোমরা সময় মত দিতে পারনি। ঘরে কী কর গো বউ।

শুধু এইটুকু কথাতেই লজ্জায় লাল হয়ে যেত সুভদ্রার মুখ। আর কিছু হোক না হোক সকালবেলায় চায়ের গেলাস হাতে সে হাজির হোত ব্রজবুড়ার সামনে। বুড়া মারা যাবার পর সুভদ্রার দায়িত্ব কমেছে কিন্তু তার মনে কোন শান্তি নেই। অভ্যস্ত একটা দৈনন্দিন চিত্রের পরিবর্তন সহজে মানিয়ে নেওয়া কষ্টকর। তবু মানুষ অভ্যাসের দাস, সব কিছুকে তার মত কেউ মানিয়ে নিতে পারে না।

মেনি গিয়ে চায়ের জল চড়াতেই সুভদ্রা তার দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকাল, কে খাবে রে চা?

মেনি এমন একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না, নকুল চলে যাবার পর এসংসারে কে আবার চা খেতে পারে এটা জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সুভদ্রা। মেনির উত্তর শুনে কিছুটা বিস্মিত হল সে, মনে-মনে ভাবল—আর কিছু না হোক ছেলে তার শ্বশুরের একটা গুণকে ভালবেসেছে। পবনের হাতে চায়ের গেলাসটা ধরিয়ে দিয়ে সুভদ্রা বলল, তোর দাদু রোজ সকালে একটু চা না পেলে ছটফট করত। বুড়োটার কোন বাজে নেশা ছিল না, শুধু এই চায়ের নেশাটা ছাড়া। হাজার অসুবিধের মধ্যেও আমি তাকে চা করে দিয়েছি। আজ মানুষটা নেই, তার কথা বারবার করে মনে পড়ছে। পুরো ঘর-সংসার ফাঁকা লাগছে আমার। এখন আমি ভাবছি—তোর বাবা ফিরে এলে তারে আমি কী জবাব দেব। এতবড় একটা ধস এ সংসারে নামল, তার কোন কিছুই টের পেলনা মানুষটা।

সহদেবের প্রসঙ্গ উঠলেই পবন বরাবর কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। সুভদ্রার চোখের দিকে তাকিয়ে সে কী বলতে চায় আঁচ করার চেষ্টা করল সে। এক সময় বিরক্ত হয়ে বলল, বাবার কথা তুমি আর আমার কাছে কিছু বলো না। হাজার গণ্ডা লোকের কাছে তার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে-করতে আমিও হাঁপিয়ে উঠেছি। এমন ছন্নছাড়া মানুষ আমার বাবা এটা ভাবলে বুকটা ধড়ফড় করে। তখন মানুষটার ওপর আমার আর কোন শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকে না।

নিমেষে ধকধকিয়ে উঠল সুভদ্রার চোখ, পবনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাগুলোর প্রতিবাদ করে সে বলল, যে তোকে জন্ম দিয়েছে তার উপর এমন অভিমান সাজে না। হাজার দোষ করলেও সে তোর বাবা। তাকে অসম্মান করে তুই কখনও কোন কথা বলবি নে। যদি বলিস সেটা তোর পাপ হবে।

—পাপ কি আমার একার, তার নয়? পবনের প্রতিবাদী গলা ঝ্যানঝ্যান করে উঠল, আপোষী মনোভাব নিয়ে সে বলল, তোমার কথা আমি মানছি মা। কিন্তু তার কি কোন দায়িত্ব নেই আমাদের ওপর? সে কেন এমন ভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে? যাত্রা কোন্ মানুষটা না করে? যাত্রা করলে কি ছেলে-মেয়ে-মা-বউকে ভুলে যেতে হয়? যে পেশা মানুষের অতীত-বর্তমানকে ভুলিয়ে দেয়, সেই পেশায় পেট পেলে কখনও কী তৃপ্তি হয়? তুমি যাই বল মা, বাবার কিন্তু এভাবে সংসার থেকে আলাদা থাকা উচিত হচ্ছে না। বাবার জন্য কত লোক আমাকে কতভাবে টিটকারী মারে। তাদের মুখের মাপে আমি জবাব দিতে পারি না, অথচ তাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাব আমার ঠোঁটে আছে। তর্কটা কতদূর গড়াত তা ওরা কেউই জানত না, সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিল বাঁকার কান ফাটানো তীব্র আর্তনাদ। জাড়াগাছের গোড়ায় কাটা পায়রায় মত ছটফট করছিল বাঁকা, তার পেটে তখন অসহ্য যন্ত্রণা—সে কিছুতেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। হঠাৎ করে এই উন্মাদ যন্ত্রণা কোথা থেকে এসে হাজির হল? কেউ বলল, গ্যাস অম্বল। গতকালের অনিয়মই এর জন্য দায়ী।

বাঁকা বলল, আমি কিছু অনিয়ম করিনি গো, আমার বুকের কাছটা কেমন ধড়াস ধড়াস করছে। বড় কষ্ট হচ্ছে ...আঃ। ছেলে কোলে নিয়ে বাঁকার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ভ্যালভ্যাল করে দেখছিল যমুনা। তার মুখে কোন কথা নেই।

ভিড় ঠেলে পবন যখন বাঁকার কাছে গেল তখনও ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে ছটফট করছিল বাঁকা। পরনের লুঙিটা তার এলোমেলো। চোখের কোণে কষ্ট, যন্ত্রণার চিহ্ন।

—বাঁকাদা, ও বাঁকাদা। পবন বাঁকার হাত দুটো শক্ত করে চেপে ধরল মাটির সাথে। তার দেখা-দেখি রতন এগিয়ে এসে হাতুড়ির মত ক্রমাগত আঘাত করা পা দুটোকে চেপে ধরল শক্তভাবে। তবু খিঁচুনি থামান গেল না বাঁকার।

যমুনা কোলের ছেলেটাকে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে আঁচলে বাতাস করতে শুরু করল বাঁকার মাথায়। এই শীতের দিনেও বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে বাঁকার কপালে। বিকৃত শক্ত মুখের দু-পাশে গ্যাঁজরা। চোখ দুটো ভেতরের দিকে ঢুকে গিয়ে বড়ই বীভৎস দেখাচ্ছে তাকে।

পবন আবার ডেকে উঠল, বাঁকাদা, ও বাঁকাদা।

কোন সাড়া এল না।

যমুনার বুক পিঠ গলা এমন কী চোখের তারাও থরথর করে ভয়ে । তবু ভয়ার্ত চোখ মেলে আর্তনাদের স্বরে কঁকিয়ে উঠল সে, ও আমার কী সর্বনাশ হল গো। একে যে দেখছি ভূতে ধরেছে!

তার বিচিত্র কান্নার স্বর বাতাস কাঁপিয়ে ছুটে গেল বহুদূর। কাজঘরের এঁটো খাওয়া কুকুরগুলো তখনও কামড়া-কামড়ি করছে খড়্গাদায়। পবন ভয়ে ভয়ে একবার যমুনার মুখের দিকে তাকাল। বউটার সিঁথিতে লাল সিঁদুর বাঁশ-ঝাড়ের গর্ভ চিরে বেরিয়ে আসা সূর্যের মত দগদগ করে জ্বলছে। হাতের ময়লা শাঁখায় কোজাগরী পূর্ণিমার দ্যুতি।

এই শাঁখা সিঁদুরের মায়ায় যমুনার কান্নার রোল হাড়িসাইয়ের বাতাসে ছড়িয়ে হাটখোলা অব্দি পৌঁছে গেল।

সকলবেলায় ময়রা দোকানে চা খাচ্ছিলেন দুলুবাবু। তিনি চায়ের ভাঁড় ছুঁড়ে দিয়ে ছিলা পিছলান তীরের মত ছুটে এলেন হাড়িসাইয়ে। গাঢ় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, কী হয়েছে রে পবনা?

কিছু বলতে গিয়ে পবন বুঝতে পারল তার গলাটাও ভীষণ কাঁপছে। বাঁকার শরীরের কাঁপুনিটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে তার শরীরে।

এগারো

রুক্ষ বাতাসে চড় চড় করছিল গায়ের ত্বক, পবন বাঁ হাতটা গালে ঘষছিল আলতোভাবে। হাসপাতালে আসার পর থেকে তার চিন্তার শেষ নেই। বাঁকার অবস্থার উন্নতি হয়নি মোটে। যমুনাও শুকনো মুখে দাঁড়িয়েছিল, চোখের কোণ ভেজা, কেমন কাঁদো কাঁদো মুখ তার। পবন এগিয়ে গেল তার দিকে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে সে বলল, বৌদি দেরী করে লাভ নেই, চলো ঘর চলো।

পবনের কথায় যমুনা মুখ তুলে তাকাল, ভেজা চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল জলধারা, কোনমতে নিজের অবুঝ আবেগকে শান্ত করে সে বলল, ঘর যেতে আর মন করে না ঠাকুরপো, মানুষটার চিন্তায় কাল রাতভর ঘুমোতে পারিনি। ওর যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে ছেলেটারে নিয়ে আমি কোথায় যাবো, আমার তো যাবার মত জায়গা নেই। ভয়ে পাংশু দেখাল যমুনার মুখ, জলের ধারা হাতের তালুতে মুছে নিয়ে সে ধরা গলায় বলল, ভাল মানুষটার কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল আমি কিছু বুঝতে পারছিনে।

—শরীর থাকলেই অসুখ হয়, ও নিয়ে আর ভেব না তো। পবন জোর দিয়ে বলল, মাথার উপর ভগবান আছে, সে সব ঠিক করে দেবে। মনে জোর রাখো। ডাক্তার বলেছে ভয়ের কিছু নেই। পেটের ফটো তুলতে হবে। ফটো তোলার পর বোঝা যাবে অসুখটা কী। তার আগে কিছু চিকিৎসা হবে না। বাঁকাদাকে কালই সহরে নিয়ে যাওয়ার দরকার। তা বৌদি, তোমার কাছে কি টাকা হবে? যমুনা এবার কান্নার গতিকে সামাল দিতে পারল না, টাকার যে প্রয়োজন এটা সে ভালভাবে জানে কিন্তু চিকিৎসার জন্য টাকা কোথায় পাবে সে। খালি হাতে গ্রাম-গঞ্জে কেউ ধার-উধার দিতে চায় না। অবিশ্বাস মৌচাকের মৌমাছির মত ঘিরে থাকে মন। বিশেষত যাদের অবস্থা দিন-আনা দিন-খাওয়ার তাদেরকে কেউ নগদ টাকা কর্জ দিতে চায় না। যমুনা হাতের চুড়ি, গলার হার, কানের দুল বন্ধক রেখে কিছু টাকা ধার এনেছিল সোনাদোকানীর কাছ থেকে। রোগা পেটঢোকা লোকটা টাকাটা গু' দিয়ে বারবার করে বলেছিল, শ' টাকায় দশ টাকা লাগবে। নিতে হলে নাও, নাহলে যাও। তার কাঁ.. পাকা গোঁফে চতুর বেড়ালহাসি। হাতওলা গেঞ্জিতে হাওয়া ঢুকে দানবের হাতের চেয়েও বিশাল হয়ে উঠছিল যমুনার চোখে। হাতি যখন কাদায় পড়ে চামচিকিতে লাথি মারে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে টাকাগুলো হাতে ধরে নিয়ে আঁচলে গিঁট দিয়েছিল সে। তারপর আর পেছন ঘুরে তাকায়নি। তার তখন সময় কোথায়? বাঁকাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে হাড়িসাইয়ের লোকেরা। সন্ধের বাসে তাকে যেতে হবে এগরা হাসপাতালে। দুলুবাবু তেমন নির্দেশ দিয়ে গেছেন। গয়না বন্ধক রাখার টাকাগুলো কাল থেকে খরচ হতে হতে এখন তলানীতে ঠেকেছে। পবন দ্বিতীয়বার টাকার কথা বলাতে যমুনা ছলছলে চোখে তাকাল। সর্বাঙ্গে অক্ষমতার চিহ্ন। পরাজিত, বিধ্বস্ত মানুষের চেয়ে করুণ তার মুখ। সপাটে শীতহাওয়া আছড়ে পড়ল তার চিন্তিত চোখে-মুখে। ফরফরিয়ে উড়তে লাগল আটপৌরে পুরনো শাড়ি। সন্ধে লাগার আগেই জানান দিচ্ছে শীত, শানিয়ে নিচ্ছে দাঁত। যমুনা উশখুশিয়ে বলল, আমাকে ঘর যেতে হবে। তুমি কি আমার সাথে যাবে ঠাকুরপো?

—যেতে তো হবেই, কিন্তু...। পবন কোথায় যেন হারিয়ে গেল, অবশেষে খেই হারিয়ে বলল, তুমি চলে যাও বৌদি। আমি যাওয়ার আগে বাঁকাদাকে আর এক বার দেখে যাই। রাতভর ওর কাছে কেউ তো থাকবে না—

যমুনা দুঃখী চোখ মেলে তাকাল, থাকতে পারলে ভাল হোত কিন্তু উপায়ও নেই। গাঁয়ে গিয়ে আমাকে টাকার যোগাড় করতে হবে। টাকার যোগাড় না হলে কাল ওকে সদরে নিয়ে যাবা কী ভাবে। যমুনা কথা বলতে বলতে থামল, তারপর মুখের উপর ঠিকরে পড়া চুলগুলো সরিয়ে নিয়ে বলল, টাকা ছাড়া তো কোন কাজ হবার নয়। পাড়ায় টাকা উধার দেবার মত কেউ নেই। এসময় দুলুবাবুর সাথে একবার দেখা হলে ভাল হোত। তাহলে আমার বোঝা কিছুটা কমত।

পবন বলল, বাবুর সাথে আমার সেই সাঁঝেরবেলায় দেখা হয়েছিল। বড় ব্যস্ত দেখলাম তাকে। কী সব মিটিং নিয়ে ঝামেলায় আছে বললেন।

যমুনা কী ভেবে বলল, তবু আমার মন বলছে—বাবু একবার আসবেই। আর একটু দাঁড়িয়ে গেলে ভাল হোত। হয়ত বাবুর সাথে দেখা হয়ে যেত । যমুনা নিজেকে সান্ত্বনা দেবার মত বলল কথাগুলো।

মরা আলোয় বিকেল ম্লান-বিধুর। বিসর্জনের প্রতিমার মত পুরো পৃথিবীর মুখ। পাকা বাড়িগুলোর ছায়া এসে পড়েছে হাসপাতালের উঠোনে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দু-একটা মানুষ গল্পগুজবে ব্যস্ত। আলো কমে যাওয়ার পর যে যার গহ্বরে ঢুকে যাবে। যতক্ষণ আলো আছে, ততক্ষণ গোরু ছাগলগুলো লেজ দুলিয়ে চরছে। একটা গোরুর পিঠের উপর ফিঙে পাখি বসেছে আয়েশ করে। সারাদিন চরে চরে ক্লান্ত চোখ। পাশের নালাগুলোয় সাদা সাদা জলজ ফুল ফর্সা মহিলার কপালে সাদা টিপের চেয়েও সুন্দরভাবে ফুটে আছে। এগরা হাসপাতালটা জমজমাট এলাকা ছাড়িয়ে আসার অনেক পরে। বিকালের দিকে নির্জনতা থাবা বসায়। হাওয়ারা উসকে দেয় নির্জতার আগুন। মন পোড়ে, বুক পোড়ে। যমুনার কাছে ক্ষণিক নির্জনতার কোন মূল্য নেই এই মুহূর্তে। বাঁকার চিন্তায় তার মনে মেঘ ছেয়ে আছে। সে ভালভাবে জেনে গেছে—বাঁকা ছাড়া তার আর কোন গতি নেই, অবলম্বন নেই।

পা চালিয়ে হেঁটে এলেই দীঘা যাওয়ার বাসরাস্তা। যমুনা হাঁটছিল, ভীতু পা দুটোয় কাঁপন উঠছিল মাঝে মাঝে। এই কাঁপন পা ছুঁয়ে শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে আসছিল মাথায়। অমনি ভয়ের পোকাগুলো একসাথে কামড়ে দিচ্ছিল রক্তকোষে। টাকার চিন্তায় তাব মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ আগেই। পবন বাঁকার কাছে ফিরে গিয়েছে আবার। ওর শরীরে দয়া-মায়া আছে। দয়া-মায়া না থাকলে দ্বিতীয়বার সে বাঁকার কাছে যেত না।

শীত হাওয়ায় কেঁপে-কেঁপে উঠছিল-যমুনা। পবনের গায়ে একটা চাদরও নেই। ফিরতে রাত হবে ওর। খুব কষ্ট পাবে। এই শীতে মানুষের হাঁটাচলা এখন ঘরমুখো। এগরা বাজারের ভিড় অন্য দশটা দিনের মত। যমুনা বাসের জন্য হা-পিত্তেশ করে তাকিয়েছিল। এ লাইনে বাস কম, বিশেষত সন্ধের পরে বাসের যাতায়াত কমে যায়। তবু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল যমুনার, সে একটা বাস পেয়ে গেল। কোলের ছেলেটাকে সে সুভদ্রার কাছে রেখে এসেছে। যত তাড়াতাড়ি ঘর ফেরা যায়—ততই তার পক্ষে মঙ্গল। বুক দুটো টনটনিয়ে উঠছে দুধের ভারে। কতক্ষণ ছেলেকে দুধ খাওয়ায়নি সে। কষ্টটা চাওড় দিয়ে উঠছিল বুকের মাঝখান থেকে। তবু ঠোঁটে ঠোঁট টিপে কষ্টটাকে সে হজম করার চেষ্টা করল।

বাঁকার কাছ থেকে পবন যখন ফিরে এল তখন হাসপাতাল চত্বরে অন্ধকারের কালো সর পড়েছে, হাওয়ায় তীব্র শীতের গন্ধ। এখান থেকে বাসস্ট্যাণ্ড অনেকটা দূর, হেঁটে যাওয়াই ভাল মনে করল সে। কিন্তু বাসস্ট্যাণ্ডে এসে তার মন ভেঙে গেল, চেনা-জানা কাউকে না দেখতে পেয়ে মনের ভেতরে ভয় এসে বাসা বাঁধল। শীতের হাওয়া কাউকে ক্ষমা করে না। চাবুক মারার মত উদ্ধত হাওয়া এসে আছড়ে পড়ছিল পবনের শরীরে। শীতে কুঁকড়ে গিয়ে পবন প্রতীক্ষালয়ের দেওয়াল ঘেষে দাঁড়াল। দূর থেকে সে দেখল—কুয়াশার দল উড়ে এসে ঘিরে ধরেছে লাইট পোস্টের আলোগুলো। ধোঁয়াশা হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল আলোক উৎস। সেই কখন দুটো খেয়ে ঘর ছেড়েছিল পবন, দীর্ঘসময়ে ক্ষিদের জলকেঁচো পেটের ভেতরে হুলুস-স্থুলুস বাধিয়ে দেয়। পাকা রাস্তার একপাশে ছোট তেলেভাজার দোকান।

সুগন্ধ ভুরভুর করে ছিটকে আসছিল সেখান থেকে। কিন্তু পকেটের রুগ্নতা পবনকে ভাবাল, হতদ্যোম হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। তার অস্থির চোখের তারা আঁকপাকুভাবে খুঁজতে থাকল পরিচিত কোন মুখকে। রোজই এই বাসস্ট্যাণ্ডে পরিচিত কারো না কারোর সঙ্গে তার দেখা হবেই। দেখা হলে ভাল লাগে, পবন এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে গল্প করবে, আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠবে তার সমস্ত সত্তা। আজ এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না সে। আজ বড্ড দেরী হয়ে গেছে। গ্রামে ফেরা মানুষগুলো আঁধার ঘনালে আর ঝুঁকি নিতে চায় না। বাস ফেল্ হলে হাঁটা পথ অনেকটা। দিনের আলোয় এই পথটুকু কোন সমস্যার নয়, কিন্তু রাতের আঁধারে এই পথে ভয় মিশে থাকে। পবন একে-তাকে জিজ্ঞেস করেও বাসের সঠিক খোঁজ পেল না, ভয়ে-দুশ্চিন্তায় পাংশু হয়ে উঠল তার মুখমণ্ডল। কুদী পর্যন্ত ভ্যানরিকশ চলে, কিন্তু রিকশ ভাড়া অনেক। পবনের রিকশয় যাওয়ার ক্ষমতা নেই; সে ভাবল, বাস না এলে হেঁটেই চলে যাবে। কিন্তু এতটা পথ হাঁটার জন্য তার একটা কথা বলার সঙ্গী দরকার। একা না বোকা। দু-জন থাকলে দীর্ঘপথও ফুরিয়ে আসে একসময়। আজ পবনের সত্যি ভয় করতে লাগল, দায়িত্বের ভূতটা তার মাথা থেকে নামতে চাইল না কিছুতেই। কাল দশটার বাসে বাঁকাকে নিয়ে সে সদরে যাবে। তার আগে টাকা-পয়সার যোগাড় হওয়া দরকার। রাতের মধ্যে গ্রামে না ফিরলে এসব করবে কে। দুলুবাবুর সঙ্গে আজ রাতেই তার দেখা হওয়া দরকার। এই বিপদের সময় তিনিই তো একমাত্র ভরসা। যমুনা তার সাধ্যাতীত করবে কিন্তু তারপরেও অনেক কিছু করার থেকে যায়। পবন মাথার চুলে আঙুল ঢুকিয়ে যখন এসব ভাবছিল তখন তার চোখের তারায় ভেসে উঠল মালার মুখটা। খুবই হন্তদন্ত হয়ে মালা হেঁটে আসছিল বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে। তার হাতে ঝোলান কাপড়ের ব্যাগ। হাঁটার তালে তালে ব্যাগটাও দুলছিল সমানভাবে। এমন অসময়ে মালাকে সে দেখতে পাবে স্বপ্নেও ভাবেনি। ওকে দেখামাত্রই ভয়ের পাথরটা বুক থেকে সরে গেল তার। পবন চেয়েই থাকল। এত লোকজনের মাঝে মালাকে চিনে নিতে তার কোন অসুবিধা হল না। মালা সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে। সরস্বতী পুজোর দিন কিংবা অষ্টমী পুজোয় গ্রামের মেয়েরা শাড়ি পরে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। তখন রঙিন প্রজাপতির চেয়েও সুন্দর ওদের চলাফেরা। আজ তো তেমন কোন বিশেষ দিন নয়—পবন ভাবল। মালা আনমনে এগিয়ে আসছিল বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে। এখন ওর ভেতরে আগের সেই চনমনে স্বতস্ফূর্তভাব নেই। মালা কী ভাবছে, ওর সুশ্রী কপালে কাচে চিড় ধরার মত সূক্ষ্ম একটা দাগ। মালা নিশ্চয়ই বাসের কথা ভাবছিল। বাস না পেলে তারও ভোগান্তির শেষ নেই। পবন দেরী না করে এগিয়ে গেল মালার দিকে, নিজের অজান্তেই হাসি ফুটে উঠল চোখে-মুখে। শুধোল, কোথায় গেছিলে? এত রাত করে যে ফিরছ?

মালা ধাতস্ত হওয়ার জন্য সময় নিল কিছুক্ষণ তারপর ফুলের মত হাসিমুখ করে বলল, বাবার সাথে এসেছিলাম দুপুরের বাসে। একটা জরুরী কাজ ছিল।

—বাবু কোথায়?

—বাবা পার্টির কাজে আটকে গেল। নাহলে বাস স্ট্যাণ্ড অব্দি আসত। কী একটা জরুরী মিটিং আছে ন'টার সময়। কাঁথি থেকে নেতারা সব আসবেন। বাবা মিটিং শেষ করে ফিরবে। তুমি তো জান—খুব অসুবিধা ছাড়া বাবা রাতে কোথাও থাকে না। মালা একনাগাড়ে কথাগুলো বলে নিজেকে হালকা করতে চাইল কিছুটা, কিন্তু তার মনের ভয় কাটল না, ভার গলায় বলল, সব বাস কি চলে গিয়েছে? তুমি কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছ?

পবনের ভেতরে এখন ফুরফুরে একটা মেজাজ, মালাকে সঙ্গী হিসাবে পেয়ে দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গেছে তার। খুব সহজ স্বাভাবিক গলায় সে বলল, আমি প্রায় ৩/৪ ঘণ্টা হল দাঁড়িয়ে আছি। বাস কেন, একটা লরীও যায়নি এদিকে। তবে বাস আছে, দু-একজনকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি। তুমি চিন্তা করো না। লাস্ট বাস আমরা পাবই। তার আগে যদি লরীটরী পাই তাহলে চলে যাব।

পবনের শীতে কুঁকড়ে যাওয়া ভঙ্গিতে বিষণ্ণতা মিশেছিল, মালার চোখ এড়াল না, সে একটা লাল রঙের বুকচেরা সোয়েটার পরেছে, শাড়ির উপর সেই লাল রঙ অদ্ভুতভাবে মানিয়ে গেছে। এই সামান্য শীতে শাল গায়ে দিতে তার সঙ্কোচবোধ হল। বাসন্তী রঙের শালটা মালার কাপড়ের ব্যাগের মধ্যে ভাঁজ করা অবস্থায় পড়ে ছিল। বাসের হাওয়ায় যখন ঠাণ্ডা লাগবে তখন শালটা গায়ে জড়িয়ে নেবে এই ছিল তার ইচ্ছা। তার আগে ওটার কোন প্রয়োজন নেই। আসার সময় মুক্তা জোর করে শালটা দিয়ে দিল। মালা নিতে চায়নি। মৃদু প্রতিবাদ করে বলেছিল, শাল গায়ে দেবার মত শীত পড়েনি মা। শুধু শুধু বোঝা বাড়িয়ে কী লাভ? পবনের শীতকাতুরে দশা দেখে মালা সহানুভূতির সঙ্গে বলল, আমার ব্যাগে একটা শাল আছে। যদি মনে কিছু না করো তাহলে ওটা নিতে পার।

—না, না। তার আর দরকার কী। পবনের ইতস্ততা দেখে কাপড়ের ব্যাগ থেকে শালটা বের করে আনল মালা; তারপর মুচকি হেসে বলল, শীতে কষ্ট পাওয়ার কোন মানে হয় না। শালটা গায়ে দিয়ে নাও।

—আমি জীবনে কোনদিন শাল গায়ে দিই নি। পবনের কথা জড়িয়ে গেল, মালার উদারতায় সে মুগ্ধ না হয়ে পারল না। তার দাদু বলত, চন্দনগাছের ছিমুতে গেলে সুগন্ধ পাওয়া যায়। তবে কি মালা সেই চন্দনগাছগুলোর একটা? বাসন্তী রঙের শালটা ধরে মালা দাঁড়িয়ে ছিল উদগ্রীব নয়নে, পবন শালটা ফিরিয়ে দিলে তার দুঃখ পাওয়ার গভীরতা যে আরো প্রকট হবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হল পবন। কাউকে দুঃখ দেওয়া পবনের ধাৎ-এ নেই। শাল গায়ে দিতে তার কোন আপত্তি নেই তবে এই চেহারায় অমন পাট করা, সুগন্ধি শালটা তাকে যে একদম বেমানান ঠেকবে এ সম্বন্ধে তার আর কোন দ্বিধা থাকল না। মালা আবার জোর গলায় বলল, নাও, এটা হয়ত মা তোমার জন্যই দিয়েছিল। আমি তো গায়ে দিতাম না, তবু তোমার তো কাজে লাগল। মা শুনলে খুশি হবে। তোমার এত ভাববার কিছু নেই। শালটা তোমাকে আমি কিছুক্ষণের জন্য দিচ্ছি, চোরপালিয়ায় নেমে ওটা তুমি আবার আমাকে ফিরিয়ে দিও।

মালার জেদের কাছে হার মানতে হল পবনকে। ব্রজবুড়ার মুখটা সুখের মুহূর্তে বারবার করে তার মনে পড়ল। জড়তা, সংকোচ কাটিয়ে শালটা গায়ে দিল সে। পাটভাঙা শালের মোহিনী গন্ধটা নাকে লেগে গেল তার। পুনরায় মালার দিকে তাকাতেই কেঁপে গেল চোখের দৃষ্টি। মালার কমলা কোয়া ঠোঁটে হাসির ঢল নেমেছে। সে-ও খুশি, পরিতৃপ্ত।

অতীত রোমন্থনে ডুবে গেল পবন; ঢোঁক গিলে বলল, জান, আজ দাদুর কথা বড় মনে পড়ছে। দাদু বয়সকালে খুব সৌখিন মানুষ ছিল। কোথাও যেতে আসতে পাটভাঙা উড়নী পরত। তার উড়নী চাপানোর ধরনটা ছিল একেবারেই তার নিজস্ব। একবার কী হয়েছিল জান? পবন স্মৃতির দরজায় টোকা মেরে থামল, দাদু একবার কুটুমঘর যাচ্ছিল। গায়ে উড়নী, পরনে ধুতি। এঁটেল মাটিতে ফোলান চুল হাওয়ায় উড়ছিল ফরফরিয়ে। দাদুর তখন যুবক বয়স। হাঁটত মাজা সোজা করে। গায়ের তাগদ ছিল হাতির মত। সেই যোয়ান দাদু একবার বিপদ ঘটিয়ে বসল। তার উড়নী বোশেখের হাওয়ায় উড়ে গিয়ে লাগল গাঁয়ের ডাক্তারের গায়ে। আর যাবে কোথায়? ছোটলোকের উড়নী বাবুর গায়ে লাগাতে জাত গেল বাবুর। বিচার বসল হাটখোলায়। এই অপরাধে তিন হাত নাকখৎ দিতে হল দাদুকে। যে উড়নীর জন্য দাদুর নাকের চামড়ায় নুন ঘাম ফুটে উঠেছিল, সেই উড়নী দাদু আর মনের দুঃখে কোনদিন পরেনি। আজ যুগ অনেক পাল্টেছে। তোমার শাল আমি গায়ে চড়িয়েছি। অথচ দেখ তো বিশ-ত্রিশ বছর আগেও গাঁঘরে এমনটা সম্ভব হোত না। তখন মানুষের ছায়া মাড়ালে অন্য মানুষ ডুব দিত পুকুরের জলে। এখন মানুষের ছায়ায় মানুষ দাঁড়ালে কারোর আর জাত চলে যায় না। আমি জানি—আমি কী বলতে চাইছি তুমি তা বুঝতে পেরেছো।

ঘাড় নাড়ল মালা। বিস্ময়ে তার চোখ দুটি আধো বোজা। পবন তার লাবণ্যভরা মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ভগবান তোমাকে শুধু সুন্দর করে নি, সেই সঙ্গে দিয়েছে সুন্দর একটা মন। এই মনটাকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো।

মালার কোন কথাই কানে ঢুকছিল না, সে একদৃষ্টিতে চেয়েছিল পবনের মুখের দিকে। লেখা-পড়া তেমন না শিখেও কেউ যে এমন গুছিয়ে কথা বলতে পারে এটা তার চিন্তার বাইরে ছিল। পবন তার চিন্তার জগতটাকে তছনছ করে দিল মুহূর্তে। কিছু বলতে গিয়ে গলা কেঁপে উঠল মালার, তবু সে নিজেকে সংযত করে বলল, তুমি তো চমৎকার কথা বলতে পারো। তোমার ভেতরে যে কথার খনি লুকান আছে, তা তোমার মুখ দেখে বোঝা যায় না। আসলে কাউকে জানতে হলে তার সাথে আগে মেলামেশা করার দরকার। আগে বাবা তোমার সুখ্যাতি করত, তখন ঈর্ষায় টনটন করত আমার শরীর। এখন বাবার কথা যে কতটা সত্যি তা আমি বুঝতে পারছি। মালার বিস্ময়ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে পবন বলল, ছাড়ো এসব কথা, এখন কী ভাবে ঘর যাওয়া যায় তা নিয়ে ভাবো। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে—

—কী আর ভাবব। বাস না পেলে আমি মহুয়াদের বাড়ি ফিরে যাব। মহুয়া আমার বন্ধু। ওর বাবা রাজনীতি করে। প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসে। তুমি হয়ত তাকে দেখেছ। আর একটু অপেক্ষা করা যাক তারপর কিছু একটা করা যাবে।

—তুমি তো বন্ধুর বাড়িতে থেকে যাবে কিন্তু আমার কী হবে? পবনের প্রশ্নে মালা সশব্দ হাসল, আমি যেখানে থাকব, তুমিও সেখানে থাকবে ফলে তোমার অত চিন্তা কীসের। তোমাকে ফেলে আমি একা যাব না।

তুমি আমাকে নিয়ে গেলেও আমি সেখানে যাব না। পবন মনমরা চোখে তাকাল, আজ আমাকে ঘর ফিরতেই হবে। কাল বাঁকাদাকে নিয়ে আমি মেদিনীপুর যাবো। তুমি নিশ্চয়ই জানো বাঁকাদা ভর্তি আছে এগরা হাসপাতালে।

মালা লজ্জা পেল তার কথা শুনে, গ্রামের খবর আমি আর কতটুকু রাখতে পারি। ঘরে ঢুকলেই চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী থাকি। তা ছাড়া মা-ও পছন্দ করে না। বাবা পরের ঝামেলায় নাক গলায় বলে ঘরে কত অশান্তি হয়। চোখের উপর এসব দেখার পর আমার আর সাহসে কুলায় না। মায়ের উপর আমার অনেক অভিমান আছে তবু মায়ের কথা আমি অমান্য করতে পারি না।

পবন কী ভেবে বলল, দেরী না করে তুমি তাহলে চলে যাও। আজ মনে হচ্ছে লাস্ট বাসও আসবে না। আজ কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে। আজ যে কার মুখ দেখে ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম কে জানে। যে কাজে গেলাম, কোন কাজটাই হলো না। পুরো দিনটাই আমার মাটি হয়ে গেল।

—তোমাকে ফেলে আমি একা যাই কী করে? —মালার কণ্ঠস্বরে দুশ্চিন্তা, যেতে হলে দু-জনেই যাব নাহলে চলো অন্য কোন ব্যবস্থা করি।

পবন শুধাল, কী করতে চাও তুমি? বাস না এলে এতটা রাস্তা পায়ে হেঁটে যাবে কী ভাবে? তাছাড়া পথঘাট ভাল নয়। রাতও অনেক হল।

—বাস না এলে তুমি কী করবে?

—আমাকে যেতেই হবে। আজ রাতে ঘর না ফিরলে সব কাজ মাটি হয়ে যাবে। কাল বাঁকাদাকে নিয়ে আমার সহরে যাওয়ার কথা। সে বেচারী রোগযন্ত্রণায় ছটফট করছে। তাকে আমি কষ্ট দিতে পারি না।

মালাকে চিন্তিত দেখাল বেশ কিছু সময়। পবনের দায়িত্ববোধ তার মনুষত্বের খুঁটিটা ধরে নাড়িয়ে দিয়েছে। সে কিছু না বলে ভাষাহীন চোখে আশেপাশে তাকাল। বাস স্ট্যাণ্ডে রাতের অন্ধকার বোঝা

যায় না, বিদ্যুৎ-এর আলো ইলেকট্রিক পোষ্ট ছুঁয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে পাকা রাস্তায়। শুধু শীতহাওয়ার দৌড়ঝাঁপ ছাড়া এখন আর বিরক্তিকর কিছু নেই। মালা আঁচলে মুখ মুছে নিয়ে বলল, চলো লরী-টরী পাওয়া যায় কিনা দেখি। এখন শীতের সময়। দীঘার দিকে প্রায়ই তো এখন লরী যায়।

পবন স্মিত হাসল, লরী যদি যায় তো এই রাস্তা দিয়েই যাবে। আমরা ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের ডিঙ্গিয়ে কোন কিছুই যেতে পারবে না।

মালা তবু নিশ্চিত হতে পারল না, পবনের মুখেব দিকে তাকিয়ে সে সন্দিহান স্বরে বলল, এত রাতে লরী যদি না থামে—তখন কী হবে? পবন এবার মুখ ভরিয়ে হাসল, লরীওলা লরী থামাতে বাধ্য হবে। তুমি সঙ্গে আছ এটাই আমার ভরসা। তোমাকে দেখে লরীওলা কেন দীঘার ট্যাক্‌সিগুলোও থেমে যাবে।

—কেন এমন বলছ?

—বলব না—তুমি যা সুন্দর দেখতে। পবনের মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে এল কথাগুলো। রূপের প্রশংসা কার না ভাল লাগে। সারা মুখে চাপা গর্ব মিশ্রিত সুস্থির হাসি ছড়িয়ে পড়ল মালার। দু-গালে টোল খাওয়া গোলাপের পাপড়ির আভা। পবন কথাগুলো বলেই লজ্জায় পড়েছে, এমন কথা তার মুখে শোভা পায় না। আকাশের চাঁদের সঙ্গে কাদা-মাটির কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। সে তার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। ছোট মুখে বড় কথার জন্য সে মনে মনে অনুতপ্ত। কী ভাবে মালার কাছে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইবে এইজন্য ছটফট করছিল সে। হাতের ছুঁড়ে দেওয়া ঢিল আর মুখের কথাকে তো আর ফেরান যায় না। মালা নির্বিকার ঢঙে দাঁড়িয়ে। ওর সাজ-সজ্জায় আভিজাত্যের ছাপ পরিস্ফুট। আভিজাত্যের সঙ্গে রুচির এক অপূর্ব মিলন ঘটেছে ওর সমস্ত শরীরে। কপালেব টিপ এমন কী প্রসাধনের রঙও উগ্র নয়। ওর চেহারায় শান্ত শরৎ নদীর ছায়া। চোখ দুটোয় সবুজ শাকখেতের শুদ্ধতা। এ মেয়ে কারোর অনিষ্ট করতে পারে না, এ যেন সবার, এর কাছে উচ্চ নীচ কোন ভেদাভেদ নেই। জলের যা স্বভাব, সেই স্বভাব বুঝি মালার। পবন লজ্জা আরক্ত চোখে ওর দিকে তাকাতেই মালা চোখ নামিয়ে নিল না বরং চোখে চোখ ফেলে খুবই সংযত কণ্ঠে বলল, খুব ক্ষিদে লেগেছে, কিছু খেলে ভাল হোত।

—তেলেভাজা খাবে? পবনের প্রশ্ন শুনে লাফিয়ে উঠল মালা, গরম চপ-বেগুনী খেতে আমার খুব ভাল লাগে। মা আমাকে তেলে ভাজা জিনিস খেতে দেয় না ডাক্তার বারণ করেছে বলে। এখানে ডাক্তারও নেই, মাও নেই। চলো মনের সুখে আজ খাবো।

পাশাপাশি হাঁটছিল মালা আর পবন। বেশী দূরও যায়নি, মাত্র ক'পা এগিয়েছে হঠাৎ একটা মোটর সাইকেল এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল ওদের সামনে। রাস্তার ধুলো-ধোঁয়া আছাড় খেয়ে পড়ল ওদের মুখের উপর। মোটর সাইকেলের হেড লাইটের আলোয় পবনের চোখে ধাঁধা লাগার অবস্থা। মালা তার হাত দিয়ে চাপা দিয়েছে চোখ। আলোর তীব্রতা সহ্য করার ক্ষমতা বুঝি তার নেই। আচমকা এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হবে—এর জন্য ওরা কেউই প্রস্তুত ছিল না। ঘোর কাটিয়ে ওঠার আগেই সুদেববাবু গায়ে পড়া হাসি হেসে বললেন, এত রাতে তোমরা এখানে কী করছ?

মালা অবাক না হয়ে বলল, রাত তো বেশী হয়নি, সবে আটটা। দয়া করে আপনি মোটর সাইকেলের আলোটা অফ করে দিন। ঝাঁঝাল আলো চোখে বড় লাগছে।

সুদেববাবু মালার দিকে শাণিত চোখে তাকালেন, তারপর চকিতে পবনকে দেখে নিয়ে রুষ্ট স্বরে বললেন, এগরা কিন্তু জায়গা ভাল নয়, তোমাদের অনেক আগেই ঘরে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল।

—উচিত তো ছিল, সেটা আমরাও বুঝি কিন্তু বাস না পেলে যাব কী করে? মালার গলায় বিরক্তির অনু-কণিকা। সুদেববাবু হারবার পাত্র নন, তিনি মালার কথা গায়ে না মেখে বললেন, ঠিক আছে, বাস

না থাকল তো কি আছে। চলো, আমি তোমাদের পৌঁছে দিই। তোমার বাবার সাথে আমার একটু দরকারও আছে। ভালই হল, এক কাজে দু কাজ হয়ে যাবে।

—আপনি শুধু শুধু কেন কষ্ট করবেন। তাছাড়া বাবা বাড়িতে নেই। মালা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, বাবার সাথে যদি দেখা করতে হয় তাহলে পার্টি অফিসে চলে যান, বাবার দেখা পেয়ে যাবেন।

—সে নাই হল, কিন্তু তোমরা এখান থেকে যাবে কী ভাবে?

—যে ভাবে এসেছি ঠিক সেইভাবেই চলে যাব। তাচ্ছিল্য মিশে গেল মালার কণ্ঠস্বরে, আপনি চলে যান, আমি আপনার মোটর সাইকেলে যাব না।

—কেন আমার দোষটা কোথায়?

দোষের কথা তো বলিনি। আমি শুধু বলেছি, আমি আপনার মোটর সাইকেলে যাব না। মালা চুপ করে থাকল অনেকক্ষণ। পবণ মালার এ ধরনের রূঢ় ব্যবহার প্রত্যাশা করেনি। সুদেববাবুর উপর তার একটা চাপা ক্ষোভ বা অভিমান আছে কিন্তু এই সঙ্কট মুহূর্তে সুদেববাবুর উপস্থিতি তার কাছে মহার্ঘ বলে মনে হয়। কিন্তু মালার বিরূপ আচরণে সব কিছু ভেস্তে যেতে বসেছে। লাস্ট বাস আসবে কিনা এ বিষয়ে মালা নিশ্চিত নয়। বাস না পেলে লরী যে পাওয়া যাবে—এমন কোন ভরসাও নেই। অথচ হাতের কাছে সব কিছু পেয়ে—মালা কেন তা অবহেলাভরে প্রত্যাখান করছে, এ কথা পবনের মাথায় ঢোকে না। সে শুধু বোকার মত বলল, তুমি মোটর সাইকেলে চলে যাও মালা, আমি ঠিক চলে যাব।

মালা অগ্নিবর্ণ চোখ তুলে তাকাল, তোমার যদি মন চায় তাহলে তুমি চলে যাও। আমার জন্য ভেব না। মালার কথায় প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বের ছাপ, পবন আর দ্বিতীয় কোন কথা বলার সাহস পেল না।

সুদেববাবু মোটর সাইকেলের স্টার্ট বন্ধ করেননি, ফলে রাগী ঘোড়ার মত থরথর করে কাঁপছিল মোটর সাইকেলের যন্ত্রাংশ। সুদেববাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন হয়ত বা, মালা তাকে সেই সুযোগ না দিয়ে পবনের কাছে সঁরে এল আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে। তারপর সুশ্রী গ্রীবা নাড়িয়ে সে বলল, চলো।

বাধ্য ছেলের মত হাঁটতে শুরু করল পবন। এই দেখে রাগে গা জ্বলে গেল সুদেববাবুর। তিনি মোটর সাইকেলের স্টার্ট বন্ধ করে ওটা ঠেলতে-ঠেলতে রাস্তার একপাশে দাঁড় করালেন। তারপর মালার দিকে ছুটে এসে তর্জনী তুলে বললেন, তোমার ঔদ্ধত্য তোমাকে একদিন পথে বসাবে। জীবনটা কত কঠিন তুমি তা জান না, যদি জানতে তাহলে এই রাস্কেলটার সঙ্গে ঘুরতে না।

কী বললেন? দপদপিয়ে উঠল মালার চাখ, সমস্ত রক্ত বুঝি উথলে উঠল মুখে, চাপা ক্রুধিত স্বরে সে বলল, যাকে আপনি রাস্কেল বললেন আসলে সে আপনার চেয়েও দামী মানুষ। আপ নার কী আছে—যা ওর নেই? বরং ওর যা আছে আপনার তা নেই। হাজার তপস্যা করলেও তা আ পনি পাবেন না। মালা শান্ত হতে গিয়েও শান্ত হতে পারল না। তার গলায় তীরবেঁধা সারসপাখির অসহায় ধুঁকপুকানী, তবু সে কঠিন গলায় বলল, ভাল প্যান্ট-জামা-জুতো পরলেই মানুষ মানুষ হয় না। মানুষ হতে গেলে গায়ে যে পশুর চামড়া আছে তাতে আগে পালিশ লাগাতে হয়। পশুর চামড়া গায়ে পরে মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ হতে গেলে গায়ে মানুষের চামড়া থাকা জরুরী। আপনি ভাবেন পৃথিবীতে আপনিই একমাত্র চালাক মানুষ। কিন্তু ভুল। আপনার সব চালাকি আমি ধরে ফেলেছি। আপনি এবার যেতে পারেন।

তুমি কি সজ্ঞানে এই কথাগুলো বলছ? সুদেববাবু গরম নিঃশ্বাস ছেড়ে শুধোলেন, তোমার উষ্মার কোন কারণ বুঝতে পারছি না। তবে তোমার কথাগুলো আমার মনে থাকবে। গায়ে যার পশুর চামড়া সে কিন্তু যখন তখন পশু হয়ে যেতে পারে। আমার কথাটাও তুমি মনে রেখ।

আমার মনে নোংরা কোন মানুষের স্থান নেই। মালা আঁচলে মুখ মুছে পুরো ঘটনাটাকেই মুছে ফেলতে চাইল। সুদেববাবু অপমানে জবালাল হয়ে ফিরে যাওয়ার পরও স্বাভাবিক হতে পারল না মালা। ঘন

ঘন উদভ্রান্ত শ্বাস ফেলে সে পবনকে বলল, চলো ফিরে যাই। এরপরে আর তেলেভাজা ভাল লাগবে না। জান, আজ আমার খুব ভাল লাগছে। একটা শয়তানকে আজ আমি মুখের উপর কিছু বলতে পেরেছি। জান, অনেকদিন পরে আজ আমার ভাল ঘুম হবে।

পবন এই রহস্যমোড়া কথার কোন অর্থ উদ্ধার করতে পারে না। সে শুধু ভ্যাবাচেখা খাওয়া চোখে দেখতে থাকে মালাকে। তার মনে হয়—মালা ফুল নয়, কাঁটাও নয়; আগুনের ফুলকি। বুকের ভেতর দাবানল না থাকলে মানুষ কি কখনও আগুন উগলাতে পারে?

মাথার উপর তারায় ভরা রাত, মরা চাঁদ হামাগুড়ি দেয় মেঘের বিছানায়। হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের উপর, মালার কপালের কুঁচো চুল ছটফটায়, উড়ে উড়ে ঢেঁকির পাড় দেয় মুখের স্বল্প পরিসরে। রাত যত এগোয় পথ-ঘাট তত ফাঁকা হতে থাকে। এবার মালার কপালে ভাঁজ পড়ে চিন্তার। পবন সেই তখন থেকে দমধরা হাওয়া। এক সময় ফেটে পড়ল রাগে উত্তেজনায়। মালার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, যাচা অন্ন ছাড়তে নেই আমার দাদু বলত। তুমি একটু আগে সুদেববাবুর সাথে যা ব্যবহার করলে তা তোমার মত মেয়ের পক্ষে বেমানান। আমি ভাবতেই পারছি না তুমি এত কঠোর হতে পার! কী করে এত কঠোর হলে—এটাও আমার বোধগম্যের বাইরে।

—কেন যে কঠোর হয়েছি তা যদি তোমাকে আমি বলতে পারতাম! মালা অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকাল, তবে বলার জন্য কতবার চেষ্টা করেছি। ভেবেছি—কাউকে না কাউকে বলে নিজের বুকের বোঝা হালকা করব। তা আর পেরেছি কই। কথাগুলো আমার ঠোঁটের ডগায় চুলবুল করে কিন্তু ভাষা হয়ে বেরয় না।

—কী এমন কথা যা বলতে গিয়ে তুমি নিজেই ভেঙে পড়ছ?

কিছু কথা থাকে যা বলার অর্থ নিজের গায়ে থুতু ফেলা। মালার কণ্ঠস্বর ঝ্যানঝেনিয়ে উঠল, তবে আমি বলার চেষ্টায় আছি। হয়ত একদিন বলেও ফেলব। না বললে আমারও যে বাঁচন নেই!

হিমরাত্রির বুক কাঁপিয়ে দীঘাগামী একটা লরী ছুটে এল। সচকিত পবন মালাকে সচকিত করে বলল, ঐ দেখ মাছের লরী। আমার মনে হচ্ছে দীঘা যাবে। তুমি হাত তোল, দেখি থামে কিনা।

মালা রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে হাত উঠাল শূন্যে। পবনও তার বাঁ হাত ভাসাল শূন্যে। একরাশ ধুলো উড়িয়ে হঠাৎই ব্রেক কষে দাঁড়াল লরীটা। লরীর হেল্পার মুখ ঝুঁকিয়ে বলল, কোথায় যাবে?

পবন জোরে জোরে বলল, চোরপালিয়া। বাস নেই...। এরকম আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে কিন্তু একটা মাঝবয়েসী হাতের ইশারা তার কথা থামিয়ে দিল। সেই কর্মঠ হাতটা ইশারা করে বলল, ঝটপট উঠে এসো। আমাদের সময় কম।

প্রথমে পবন তারপর মালা কষ্ট করে উঠে এল ড্রাইভার কেবিনে। ওরা উঠে আসার পরেই লরীটা ছেড়ে দিল। মালা আশ্বস্ত হয়ে ঈষৎ অন্ধকারে পবনের দিকে তাকাল, পাশে বসে পবন কোন কথাই বলল না। রাতের ট্রাকে তার যাতায়াতের অভিজ্ঞতা থাকলেও মালা এ ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ। কত রকমের যে বিপদ ঘটে যেতে পারে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। তবু মালা দুঃশ্চিন্তাহীন। পবন চোরাচোখে ড্রাইভার আর সঙ্গীটির হাবভাব অনুধাবন করার চেষ্টা করছিল। বেগতিক দেখলে সেও যাতে কিছুটা প্রতিরোধ করতে পারে এই জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল সে। মালা তার মানসিক অস্থিরতার কোন হদিশ পেল না। বসার জায়গা পাওয়াতে তাকে বেশ সুখী সুখী দেখাচ্ছিল। ড্রাইভারের সঙ্গীটি মালাকে দেখছিল সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে। তার সেই সরল অবুঝ চোখ দুটোয় কোন কু' মতলব ছিল না। ড্রাইভার লরীটাকে চালাচ্ছিল ভাল, চেনা পথ কুয়াশায় ঢাকা পড়ে মোহময়ী হয়ে উঠেছিল রাতের যাদুময়তায়। পবন হা করে দেখছিল কাচের উল্টো পিঠের জগতকে। মালাও এক দৃষ্টিতে চেয়েছিল বাইরের দিকে, তার চোখেও মুগ্ধতার রেশ। লরী যে ভাবে চলছিল তাতে আর কিছুক্ষণের

মধ্যে চোরপালিয়া এসে যাবে। পবন তৈরী হচ্ছিল নামার জন্য। কিন্তু তার প্রস্তুতিপর্বে ছেদ ঘটল যখন মাত্র ক'বার গোঁ গোঁ শব্দ করে লরীটা থেমে গেল রাস্তার একপাশে। ড্রাইভার ব্যর্থতার সঙ্গে বলল, লরী আর যাবে না। ইঞ্জিনে গোলমাল দেখা দিয়েছে। তোমরা এখান থেকে হেঁটে চলে যাও। মাত্র মাইল খানিকের মধ্যে চোরপালিয়া হাট। আশা করি তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

পবন ভাড়ার প্রসঙ্গ উঠাতেই 'না-না' করে উঠল ড্রাইভার। মাথা ডানে-বায়ে ঝুঁকিয়ে সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, তোমাদের কাছে আর কী ভাড়া নেব? এই তো সামান্য পথ। যাও, তোমরা চলে যাও। এর মধ্যে যদি ইঞ্জিন ঠিক হয়ে যায় তাহলে রাস্তায় তোমাদেব তুলে নেব। শুধু শুধু আমাদের সঙ্গে থেকে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। শীতের রাতে হিম লেগে গেলে সর্দিজ্বর হতে পারে।

মালা মাঝ বয়েসী ড্রাইভারের মুখের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল, তারপর পবনকে বলল, চলো।

মাইল খানিকের মধ্যে চোরপালিয়া হাট। শুনশান পাকা সড়কের দু-পাশে বুনো আগাছা আর জামগাছের ভিড়। রাস্তার পাশের ডোবাগুলোয় মাছ ঘাই দিয়ে ওঠে। জল নড়ে ওঠে, নড়ে ওঠে সাদা জলজ ফুলগুলোর অবহেলিত শরীর। কত যে ফুল ফুটে থাকে শীতের খালে-বিলে, সব ফুলের নামও জানে না পবন, তবে তার দেখতে ভাল লাগে। ব্রজবুড়া বেঁচে থাকলে প্রতিটি ফুলের নাম বলে দিত গল্পের ছলে। দাদুর অভাব, শূন্যতা পবনের বুকে প্রায়ই বাজে, তখন সে ভীষণ রকমের অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তার চোখের সাদা জমিতে তখন দুঃখের মেঘ চরে বেড়ায়।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মালা শুধোল, আজকের এই ঘটনার কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে থাকবে।

পবন মাথা নাড়ল, মালা কিছু উচ্ছ্বাস ভরা শব্দ শুনতে চেয়েছিল ওর মুখ থেকে, তেমনটা না হতেই হতাশ হয়ে বলল, কী হল বোবা হয়ে গেলে যে—

দাদুর কথা খুব মনে পড়ে। পবন আর্দ্র চোখে তাকাল, এই পথ ধরে দাদুর সাথে কতবার যাওয়া-আসা করেছি। ঐ যে জামগাছটা দেখছ—ওখানে খরাবেলায় দাদু জিরোন নিত। পাশের পুকুরটায় আঁজলা ভরে জল খেত। আমাকেও বলত, চোখে-মুখে জল দিয়ে নিতে।

মালা সমব্যথীর চোখে তাকাল, আমার দাদুর কথা মনে নেই। তবে বাবার কাছে গল্প শুনেছি—দাদুর মেজাজ নাকি ছিল রাজা মহারাজদের মত। যা মন চাইত, তা সে করতই। তার মেজাজী গল্প-গুলো শুনতে আমার এখনও ভাল লাগে। আসলে ওরা একটা সাক্ষীবটের মত। ওরা চলে যাবার পর আমরা বড় কোণঠাসা হয়ে আছি। বাবা মাঝে মাঝে দুঃখ করে। বলে—বড় একা হয়ে গেলাম। আমরা এতজন আছি তবু বাবার একাকীত্ব ঘোচে না। ঐ বৃদ্ধ মানুষটার জন্য তার মন এখনও কাঁদে। আসলে এ সংসারে কারোর জায়গা বুঝি কেউ পূরণ করতে পারে না।

তুমি ঠিক বলেছ মালা। পবনের চোখে-মুখে সম্মতির ঝিলিক। আজ মালাকে তার খুব আপন মনে হয়। এত দীর্ঘ সময় মালাকে যে কাছে পাবে ভাবতেও পারেনি। মালাও সমপরিমাণ উচ্ছ্বসিত, আনন্দিত। মেঘে ঢাকা তারার মত তার ব্যক্তিত্বময় চাহুনী তবু সেই চাহুনীতে মিশে ছিল দুঃখের জলরেখা। সুদেববাবু মালার মামার বন্ধু, তার সাথে দুর্ব্যবহার করার জন্য তাহলে কি সে মনে মনে অনুতপ্ত! পবন পাশাপাশি হাঁটছিল, মালার শরীরের স্পর্শ তাকে রোমাঞ্চিত করছিল, মনে মনে গর্ব বোধ করছিল সে। মালার পাশাপাশি হেঁটে যাওয়ার যোগ্যতা তার নেই, এই হীনমন্যতা পবনের মনে তখন বিন্দুমাত্র স্থান দখল করে বসেনি। বরং তার মনে হচ্ছিল—মালা তার বন্ধু, আত্মার আত্মীয়। এই সৌভাগ্য তো ভগবানের দান। ঘরে গিয়ে সুভদ্রাকে সে সব কিছু বলবে। মাকে স সব দুঃখ-আনন্দের ভাগ দেয়। মা-ও তো তার বন্ধু। পথ যতই ফুরিয়ে আসছিল ততই পবন দুঃখী হয়ে পড়ছিল। মালার সান্নিধ্য তাকে যে উষ্ণতা দিয়েছে এই শীতের রাতে—তাকে কী ভাবে অস্বীকার করবে সে। মনে মনে সে মালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

ফাঁকা রাস্তায় মালা বোবার ঢঙে হাঁটছিল, হয়ত পথক্লান্তি তাকে গ্রাস করেছিল সাময়িক। পবন ইচ্ছে করেই মালার সঙ্গে কথা বলছিল না। তারও সব কথা বুঝি শেষ। কিন্তু কথার নটেগাছটি বুঝি কোনদিনও মুড়ায় না। ক'পা হাঁটার পরই মালা আপন মনে বলে উঠল, আমার যদি কোনদিন বিপদ আসে তুমি আমাকে বাঁচাবে তো?

পবন হাসল, তোমার বিপদ তুমি নিজেই সামলে নিতে পারবে। তাছাড়া তোমাকে সাহায্য করার জন্য অনেকেই এগিয়ে আসবে।

তা হয়ত আসবে কিন্তু আমি তোমার সাহায্য চাই। মালার গলায় দাবী; আমি এই মুহূর্তে খুবই বিপদের মধ্যে আছি। এটা এমন বিপদ যা আমি তোমার কাছে বলতেও পারছি না। অথচ বুকের ভার হালকা করার জন্য কাউকে তো বলার দরকার। আমি তোমার কাছে সব কিছু বলে নিজেকে বাঁচাতে চাই। তবে তার আগে তোমাকে কথা দিতে হবে—আমি যা বলব তুমি তা দ্বিতীয় কোন লোকের কাছে বলবে না। যদি বলো তাহলে আমাদের পুরো সংসার ভেঙে যাবে। বাবাকেও বাঁচানো যাবে না।

কী এমন কথা যার জন্য বাবুর ক্ষতি হতে পারে? স্তব্ধতা পবনের বুকের ভেতরে ঘোট পাকাল। মালা এই প্রথম পবনের হাত ধরল, অনেকক্ষণ ধরেই থাকল, তারপর ধরা গলায় বলল, তুমি আমার কেউ নও এটা আমি জানি তবে তুমি যে সবার এটা আমার জানতে বাকি নেই। তাই তোমার কাছে সব কথা অকপটে বলা যায়।

কী এমন কথা যার জন্য বাবুর ক্ষতি হতে পারে? পবনের জিজ্ঞাসায় মালা কিছু সময় নিরুত্তর থাকল, তারপর কী ভাবে কথাটা শুরু করা যায় এসব ভেবে নিয়ে সে ধীর গলায় বলল, মায়ের সাথে অনেকদিন হল আমার মনোমালিন্য চলছে। মায়ের ব্যবহার আমার আর ভাল লাগছে না। আর আমিও দিন দিন মায়ের চোখে অসহ্য হয়ে উঠছি। এ সবের মূলে ঐ একটা মানুষই দায়ী, তিনি হলেন সুদেবমামা। ও আমার মামার বন্ধু। বাবা ওনাকে বিশ্বাস করে। এ গ্রামের অনেককেই বাবা সুদেবমামার কোম্পানীর পলিসি করে দিয়েছে। কিন্তু সুদেবমামা—। কথা আটকে গেল মালার, অন্ধকারে ছলছলিয়ে উঠল চোখ, আবার পবনের হাত দুটো জোর করে আঁকড়ে ধরে বলল, মায়ের সম্বন্ধে খারাপ কিছু বলতে আমার গলা কাঁপছে। কিন্তু কী করব, না বলেও যে পারছি না। প্রায় রাতেই সুদেবমামা আমাদের বাড়িতে হল্ট করেন। বাবা যখন থাকে না তখনই তিনি আসেন। মা তার জন্য জোরদার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। তা করুক। এসবে আমার কোন আপত্তি নেই। মামার বন্ধু, সেও তো আমার মামার মত। তার কাছ থেকে আমি কোনদিনও এমন ব্যবহার আশা করি না। মালা তার সিক্ত চোখ মুছে নিল আঁচলে, কান্নার তোড়ে কেঁপে গেল তার পলকা ফুলের শরীর, একসময় ফোঁপানী থামিয়ে সে বলল, জান সুদেবমামা আর মায়ের সাথে একটা বিশ্রী সম্পর্ক আছে। একদিন রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায়। দেখি পাশের ঘরে যেখানে সুদেবমামা শোয়—সেখানে মায়ের গলা। ওরা ফিসফিসিয়ে কথা বলছিল। আমার কেমন সন্দেহ হতে পা টিপেটিপে বিছানা ছেড়ে এগিয়ে গেলাম। দেখি সুদেবমামার বিছানায় মা শুয়ে আছে, ওরা এমনভাবে শুয়েছিল আমি আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি। অনেকক্ষণ পরে মা যখন তার নিজের বিছানায় ফিরে এল তখনও আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারিনি। আমি বড় হয়েছি, নারী-পুরুষের সম্পর্কটা বুঝি। মা কেন এমন নষ্ট হয়ে গেল—তুমি বলো। এ ঘটনা একদিন নয়, আমি বহুবার দেখেছি। এ পাপ বেশী দিন চলতে দেওয়া যায় না। এর যদি কোন গতি না হয় তাহলে আমি নিজেই আত্মহত্যা করে মরব। রোজ রাতে আমি নিজেকে শেষ করে দিতে পারব না। তুমি জান, মা এখন আমাকে সহ্য করতে পারে না। সে তো প্রায়ই আমার মুখের উপর বলে দেয়, আমি হিংসুটে, আমি একদম সুদেবমামাকে সহ্য করতে পারি না। এর জন্য মা-ও আমাকে আগের মত ভালবাসে না। দিনরাত শুধু কড়া শাসনে রাখে। সুদেবমামা আসলে আমি আমার ঘর ছেড়ে বেরতে

পারি না। মা আমাকে সব সময় চোখে চোখে রাখে। নিজে সাজগোছ করে, ভালমন্দ রাঁধে। তুমি বিশ্বাস কর, সত্যি সত্যিই সুদেবমামাকে সহ্য করতে পারি না। ও আমাদের ঘরে আসলে আমার গায়ের রক্ত ফুটে ওঠে। আমার মাথায় যেন বিছে কামড়ে দেয়। তখন মনে হয়—আমি ওকে খুন করে ফেলব নয়ত নিজেই মরব।

মালা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। পবন ওর হাতটা ধরে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, কেঁদো না, নিজেকে শক্ত করো। একজন বদ মানুষের জন্য চোখের জল ফেলে কী হবে? চোখের জল অত সস্তা নয়।

মালা তবু শুনল না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, এই বদমায়েশ লোকটার জন্য আমি চোখের জল ফেলছি না, আমি শুধু আমার মায়ের কথা ভেবে কাঁদছি। জান মায়ের উপর আমার কত শ্রদ্ধা ছিল, ক্লাশে বন্ধুদের বলতাম—আমার মায়ের মত কেউ হয় না। আমার মা এই মর্তের দেবী। আজ সেই দেবীর মুখ আমি চোখ মেলে দেখতে পারি না। আমার দু-চোখে কেউ বুঝি লঙ্কা গুঁড়ো ছিটিয়ে দেয়। এবার তুমি বলো—বুক ভরা এত অসুখ নিয়ে আমি কী ভাবে বাঁচব।

পবন সহসা কোন উত্তর দিতে পারল না, মালাও ওর কাছে কোন উত্তরের প্রত্যাশা করল না। সে জানে অসুখটা কঠিন এবং দুরারোগ্য। চটজলদি এ রোগের কোন সমাধান নেই। হাটখোলা পেরিয়ে আসার পরই মালা বলল, এবার তুমি চলে যাও, আমি চলে যেতে পারব। আজ আমার জন্য তোমার অনেক কষ্ট হল। কাল যদি সদরে যাওয়ার আগে সময় পাও তাহলে একবার এসো। রাতের অন্ধকারে আমি যা বলেছি—কাল হয়ত দিনের আলোয় তোমার মুখ দেখে লজ্জায় পড়ে যাব। যদি সেরকম কিছু ঘটে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও।

পবন মালার কোন কথাই শুনল না, সে বেশ জোরের সঙ্গে বলল, রাত যখন হয়েছে তখন আমি তোমাকে ঘর অব্দি পৌঁছে দিয়ে আসব। এটাই আমার উচিত কাজ হবে। তুমি আমাকে নিষেধ করো না।

মালা হাসল, তাহলে চলো। তুমি গেলে মায়ের কাছে আমারও মুখ থাকে। নাহলে মা ভাববে আমি হয়ত এগরায় কোন ছেলেকে নিয়ে ঘুরছিলাম।

গেট খুলতেই সবার আগে মালার নজরে পড়ল সুদেববাবুর মোটর সাইকেলটা। অমনি আষাঢ়ের কালো মেঘ ছুঁয়ে গেল তার পুরো মুখে। সে ভীতু চোখ তুলে পবনের দিকে তাকাল। পবন বলল, বুকের রাগ বুকের ভেতরেই পুষে রাখ। সময় আসলে রাগের আগুন সব কিছু লিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে।

কবে আসবে সেই সময়? তার আগে যে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। মালার আকুতিভরা কথায় পবনের সুস্থির মাথাটাও কেমন বিগড়ে গেল। হাতের মুঠি পাকিয়ে সে বলল, তোমাদের কেউ ক্ষতি করে এ গ্রাম থেকে পালাতে পারবে না। তুমি যাও, আজ রাতটা অন্তত আমাকে ভাবতে দাও।

মালা মুখ নীচু করে হাঁটছিল। ইট বিছানো পথ মাড়িয়ে সে যখন ঘরের কাছাকাছি এল তখন মুক্তা এগিয়ে এলেন সামনে। পবনকে এক ঝলক দেখে নিয়ে কঠিন গলায় বললেন, ছিঃ মালা, তুমি আমার মেয়ে হয়ে আজ এত নীচে নামতে পারলে? শেষ পর্যন্ত কিনা ঐ ছোটলোকের ছেলেটার সাথে এত রাত করে ঘরে ফিরলে।

—মা। ধক-ধকিয়ে উঠল মালার চোখ, পবনের অ[illegible]ননীল মুখের দিকে তাকিয়ে সে-ও ফুঁসে ওঠা গলায় বলল, কাকে তুমি কী বলছ? তুমি যার দিকে আঙুল তুলছো—সে কিন্তু সব সময় তোমার পায়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলে।

—ওসব আদিখ্যেতার কথা ছাড়ো। সুদেবদা আমাকে সব কিছু বলেছে।

—সুদেবমামা তোমাকে কী বলেছে? মালার কণ্ঠনালী ঝ্যানঝ্যানিয়ে উঠল বিদ্বেষে, যার কথা শুনে তুমি আমাকে শাসন করছ—সে কী আদৌ মানুষের পর্যায়ে পড়ে?

কথা শেষ হল না, তার আগেই মালার গালে সজোরে একটা চড় মারলেন মুক্তা, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! মনে রেখ—সুদেবদা না থাকলে আজ তোমার বাবা কোথায় হারিয়ে যেত। তোমারও এত ফুটানী থাকত না।

মালার ফর্সা গালে আঙুলের দাগ বসে গেল লাল কেঁচোর মত; পবন মুখ নীচু করে ফিরে এল সেই দাগ বুকের ভেতরে পুরে নিয়ে। মরা চাঁদ তখনও খেলা করে যায় আকাশে। হাওয়ায় তীব্র শীতের চুম্বন। কাঁপতে কাঁপতে পবন আগড় সরিয়ে ঢুকে এল তার উঠোনে, তখনও তার গায়ে চাপান সেই বাসন্তীরঙের শালটা।

বারো

জাতসাপের থেঁতলান মাথার মত কাঁচা পথ, মরা জ্যোৎস্নায় দুধের শিশুর মত হাসছিল। রাং-চিতাগাছের পাতা থেকে টুপটুপ করে খসে পড়ছিল হিম জল। পুরো হাড়িসাই ঘুমিয়ে পড়েছে, শুধু জেগে আছে টেরের দুটি ঘর। বাঁকার ছোট্ট ঘরের দাওয়ায় এখনও টিমটিম করে ডিবরি জ্বলছে, ডিবরির সামনে পাথর প্রতিমার মত মুখ ঝুঁকিয়ে বসেছিল যমুনা, ওর কোলের ছেলে ঘুমোচ্ছিল অন্ধকার ঘরের ভেতর। এতগুলো ঘর অথচ কেরোসিন তেলের অভাবে সব ঘরে অন্ধকারের হুড়োহুড়ি। যুগলবুড়ার কাশির শব্দ ভেসে আসল বাস রাস্তার পাশ থেকে, বুড়োটা মনে হয় রাতভর ঘুমায় না, ওর কাশি হাড়িসাইয়ের ছেলে বুড়ো সবাই চেনে।

সুভদ্রা আগড় আটকিয়ে পবনকে শুধাল, এত যে রাত হল?

পবন নির্বিকার স্বরে বলল, হাসপাতাল থেকে ফিরতে রাত হয়েছে। তাছাড়া শেষ বাস ছিল না। বহু কষ্ট করে ট্রাক ধরে এলাম। আমার সঙ্গে বাবুর মেয়ে মালাও ছিল।

এত রাত অব্দি মেয়েটা কী করছিল এগরায়? পড়া লেখা জানা মেয়ে রাত-বেরাতে বাইরে থাকা ভাল নয়, এটা বুঝি জানে না। সুভদ্রার অসন্তোষ ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে মোটেও খুশি হল না পবন। নিজের মায়ের মধ্যে সে হঠাৎ মুক্তার ছায়া দেখতে পেল, আর ভাবল—পৃথিবীর সব মা-ই কি একই ধরনের প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় মেয়েদের? কই ছেলেদের জন্য তো এত বাধা নিষেধের ঘেরাটোপ নেই?

সুভদ্রা বাতি উসকে বলল, কেরোসিন কম আছে, তুই গাড়িয়াঘাটে হাত-পা ধুয়ে এসে খেয়ে নে। আমার শরীরটাও ভাল নেই। সারাদিন খাটা-খাটনী করে শরীরটা বড় আরাম চায়। তোর খাওয়া হয়ে গেলে আমি একটু ঘুমাব।

দিদি কোথায়, তারে তো দেখছি নে? পবনের প্রশ্নে সুভদ্রা কী জবাব দেবে ভাবল, এই প্রশ্নটা পবন যে করবে এ বিষয়ে একরকম নিশ্চিত ছিল সে। হেমবুড়ি ধাইবুড়ি সেজে বাবুপাড়ায় গিয়েছে। ধর্মাবাবুর বউয়ের ব্যথা উঠেছে হঠাৎ। কিন্তু একথা পবনের কাছে কী ভাবে বলবে সুভদ্রা। কথা শুনে পবন জ্বলে উঠবে ধরান বারুদের মত কেননা ধর্মাবাবুর উপর তার রাগ এখন ফণা তোলা সাপের মত। যে তার শত্রু, তার ছায়ায় দাঁড়িয়ে পবন শান্তি পেতে চায় না। শত্রু তফাৎ-এ থাকুক--এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী সে।

পবন আবার শুধাল, মা, দিদি কোথায়?

তোর দিদি ঘরে নেই।

ঘরে যে নেই সে তো আমি দেখতে পাচ্ছি। অস্থির হয়ে উঠল পবন, বুড়া মানুষটারে তুমি আবার রাত বেরতে কোথায় পাঠালে! যেখানেই পাঠাও কাজটা কিন্তু ভাল করোনি। দিদি রাতে ভাল চোখে দেখে না, দু-চোখে ছানি পড়েছে। তাছাড়া শরীরও ভাল নেই। তার যখন আরাম করার দরকার তখন তারে তুমি খাটতে পাঠালে?

পবনের কথায় সুভদ্রার নিজেকে অপরাধী মনে হল, সে নিস্তেজ স্বরে বলল, ধর্মাবাবুর ঘরে বড় বিপদ। তিনি ঘর বেয়ে এসে বড় পীড়াপীড়ি করলেন। পাড়ায় আর কেউ ছিল না যাওয়ার মত। তাই আমি বাধ্য হলাম মাকে পাঠাতে। তাছাড়া মা-রও যাওয়ার মন ছিল। সেকেলে মানুষ, না গেলে কষ্ট পেত। এসব কথা কানে শুনলে যেতে হয়, না হলে পাপ হয়।

শরীরের সমস্ত রক্ত বুঝি পবনের চোখের মধ্যে খেলে গেল, কিন্তু মায়ের সম্মুখে তার আর কিছু বলার থাকল না। এই মুহূর্তে কিছু বলার অর্থ মাকে দুঃখ দেওয়া। ধর্মাবাবু তার সাথে শত্রুতা করলেও বিপদে পড়ে ঘর পর্যন্ত এসেছেন। সে যদি ঘরে থাকত তাহলে কি ধর্মাবাবুকে ফিরিয়ে দিতে পারত? পারত না। তেমন শিক্ষা তার রক্তে নেই। ব্রজবুড়ার আদর্শ তার মধ্যে সঞ্চারিত। ব্রজবুড়া বলত, মানুষকে মানুষেরই দরকারে লাগে। যাকে তুমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করো আসলে সেও তুমার মতন মানুষ। কাকে যে কার কখন লাগে—একথা আগাম কে বলতে পারে।

বহুদর্শী ব্রজড়ার কথাগুলোই এখন পবনের কাছে সান্ত্বনার মলম। হৈমবুড়ি 'ছেলে ধরতে' গিয়ে মানুষের কাজই করেছে। বরং তাকে না যেতে দিলে মনকষ্টে ভুগত—যা এই বার্দ্ধক্যবেলায় সহ্য করা কঠিত হোত। পবনকে চুপ করে থাকতে দেখে সুভদ্রা একটু ভরসা পেল। বাতাসে আবার ভেসে এল যুগলবুড়ার কাশির শব্দ। পুরো হাড়িসাই ঘুমিয়ে পড়েছে, সেই নিঃঝুম ঘুমে এই অনাবশ্যক কাশি বুঝি বিরক্তির কারণ। পবন হাত-মুখ ধোয়ার জন্য যখন পুকুরঘাটের দিকে যাচ্ছিল তখন সুভদ্রা তাকে সাবধান করে বলল, সাবধানে যাবি। ঘাটে নীল পড়ে পেছল হয়ে আছে সিঁড়িকাঠ। পা হড়কে গেলে একেবারে জলের মধ্যে পড়ে যাবি।

ঘাটের কাঠগুলো জল খেয়ে পচন ধরেছে বহুদিন আগে। পবন ভেবেছিল, দাদুর কাজঘরের সময় এ কাজটাও সে করিয়ে নেবে। কিন্তু পয়সার অভাবে তা আর হয়ে ওঠেনি। ঘাট বাঁধার কাজ তার একার দ্বারা হবে না, কম করে দুটো মুনিষ তো লাগবেই। দুটো মুনিষের খরচপত্তর সে জোগাবে কী ভাবে? কত দিন হলো সে আর মাছঝুড়ি নিয়ে সমুদ্রে যায়নি। সমুদ্রে না গেলে হাত ফাঁকা থাকে। তখন ঘরখরচা চালান কঠিন হয়ে পড়ে।

সুভদ্রা ভাতের থালাটা পবনকে এগিয়ে দিয়ে মনমরা গলায় বলল, কাল সমুদ্রে চলে যা। এখন সমুদ্র মাছ পাওয়া যাচ্ছে ভাল। তুই হাটে না গেলে আমি খরচাপাতি জোগাড় করব কী ভাবে। সুভদ্রার সারা মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া, সে খুব আড়ষ্ট গলায় বলল, আমার কাছে যা ছিল তা দিয়ে আমি এতদিন চালালাম। আমি আর পারছি নে, এবার তুই একটু ঘরের দিকে মন দে। সারাদিন টো-টো করে ঘুরলে উনুনে হাঁড়ি চড়বে না।

পবন খেতে খেতে মায়ের দিকে মুখ তুলে বলল, কাল আমি সমুদ্রধারে যেতে পারব না। কাল আমাকে বাঁকাদাকে নিয়ে সদরে যেতে হবে। সদরে না নিয়ে গেলে বাঁকাদা হয়ত বাঁচবে না। বাবু আমার উপর দায়িত্বটা দিয়েছেন। জ্যাঠা সদরে থাকে। সেইজন্য বাবু বলেছেন—বাঁকাদাকে প্রথমে জ্যাঠার কাছে নিয়ে যেতে। জ্যাঠার বাড়িতে থেকে বাঁকাদার চিকিৎসা হবে

বড়বউ অত ঝামেলা নিতে পারবে? সুভদ্রার কথায় পবন না ভেবেই বলল, বাঁকাদা তো চিরদিনের জন্য থাকতে যাচ্ছে না ওখানে। সে যাচ্ছে তার রোগ দেখাতে। রোগ ভাল হয়ে গেলে সে তো ফিরে আসবে।

এবার সন্দেহভরা চোখে সুভদ্রা তাকাল, পবনকে হুঁশিয়ার করে বলল, সবাই সব কিছু সইতে পারে না। ভার বইবার ক্ষমতা সবার সমান নয়। সবাই অন্যের দুঃখকে নিজের দুঃখ ভাবে না।

পবন বলল, আমরা সেখানে বেশী দিন থাকব না, কাজ হয়ে গেলে চলে আসব।

—তুই কবে ফিরবি তার কোন ঠিক নেই বুঝি?

পবন চুপ করে থাকল। সুভদ্রা পবনের বোবা মুখের দিকে তাকিয়ে আফশোষের সঙ্গে বলল, তোর বাবাও এই রকম। কোথাও গেলে কবে ফিরবে বলে যায় না। ঘরের কে খেল না খেল এসব খোঁজ সে কোনকালেও রাখত না। তুইও দেখছি তোর বাবার মত হয়েছিস। ভেবেছিলাম—ছেলে বড় হয়েছে এবার আমার দুঃখ ঘুচবে। ভগবান আমার কপালে মনে হয় সুখ লেখেনি।

সুভদ্রার দীর্ঘশ্বাস ছুঁয়ে গেল পবনের হৃদয়। মায়ের দুঃখী মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখে কোন প্রতিবাদ বাক্য উচ্চারিত হল না। জ্ঞান পড়ার পর থেকে সে তার মাকে হাসতে দেখেছে খুব কম দিন। সুভদ্রা হাসলেও তার হাসি কোনদিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

রাত তার নিজস্ব নিয়মে সাঁতরে সাঁতরে চলে যায় বার্দ্ধক্যের দোরগোড়ায়। বিছানায় শুয়েও তখনও দু'চোখের পাতা এক হয় না পবনের। মালার দুঃখভরা মুখখানি শিশিরপাতের মত বারবার লুটিয়ে পড়ে তার মনের আঙিনায়। বিছানায় শুয়ে শুধু ছটফট করে পবন, এক সময় ভোরের প্রথম আলো এসে ছুঁয়ে দেয় তার শরীর। সুভদ্রা গোবর জলের ছড়া দেয় উঠোনে, মেনি ঘুম ভেঙে পবনের মুখোমুখি এসে বসল। শুধোল, দাদা, কাল তুই কখন ফিরে এলি? জানিস কাল তোর কথা ভাবতে ভাবতে শুয়েছিলাম বলে রাতভর শুধু তোর স্বপ্নই দেখছি। আমার খুব ভয় করছিল দাদা। ভয়ে বিছানায় সিঁটিয়ে ছিলাম।

পবন হাসল, আড়মোড়া ভেঙে বলল, আমি যখন ঘরে এলাম তখন দেখি তুই পাগলের মত ঘুমোচ্ছিস। আমি আর তোকে ডাকিনি। যা, তাড়াতাড়ি চা বসা দেখি। সকালের বাসে আমাকে জ্যাঠার কাছে যেতে হবে। বাঁকাদার শরীর তত বিশেষ ভাল নয়। আমি বাঁকাদাকে সদরে নিয়ে যাব দেখাতে।

আমিও তোর সঙ্গে যাব। মেনি জেদ ধরল, এখানে থাকতে আমার ভাল লাগে না। দিনভর গোবর কুড়াও, ঘষি দাও; কাঠ ভাঙো, ঢিকনি শাক তুলতে যাও—বল দাদা, এটা কি কোন জীবন!

পবন চুপ করে থাকলেও মেনি নাছোড়বান্দা, আমি তোর সাথে যাবই যাব।

আমার কাছে অত গাড়িভাড়া নেই। পরে যাস—

পরে নয়, আজই যাব। বাসভাড়া আমার আছে।

তোর কাছে বাসভাড়া আছে, কোথায় পেলি? পবন সহোৎসাহে ঝুঁকে পড়ল মেনির দিকে। মেনির গাল ফুলে উঠল আহ্লাদে। পবন সেই ফোলা গালে টোকা মেরে বলল, দে না তোব টাকাগুলো। জানিস আমার কাছে মোটে বাসভাড়া নেই। ভেবেছি—মালার কাছ থেকে চেয়ে নেব। তুই যদি আমাকে টাকা দিস তাহলে আর সকালবেলায় কারোর কাছে হাত পাততে হয় না।

তোকে টাকা দিলে আমার কী লাভ হবে? মেনির অবুঝ জিজ্ঞাসায় পবন হা-হা করে হাসল, দশ টাকা হাওলাৎ দিলে আমি তোকে কুড়ি টাকা দেব। কিরে দিবি না?

মা কালীর কিরে কাট।

মা কালীর কিরে। মাছ ব্যবসায় যা লাভ হবে সব টাকা তোর। দে এবার দশ টাকা দে তো।

মেনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে গেল ঘরের কোণায়। ডিবরি উসকে সে একবার পিছন ঘুরে পবনের দিকে তাকাল তারপর আহ্লাদভরা গলায় বলল, তুই আগে ঘরের বাইরে যা তারপর আমি টাকা বের করব। তোর সামনে আমি টাকা বের করব না। তোকে বিশ্বাস নেই, যদি আমার সব টাকা নিয়ে নিস।

মেনির ঠোটের ফাঁকে ফুটে উঠল হালকা হাসির রেখা। পবন বলল, তুই যা, আমি চোখ বন্ধ করে আছি। বিশ্বেস কর—আমি তোর টাকা নেব না।

তবু কথা শুনল না মেনি, পবনকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। টাকার সন্ধান পেলে সে একটা ছিনে জোঁক, যতক্ষণ না টাকাটা নির্মূল হচ্ছে ততক্ষণ বুঝি তার দম আটকে থাকবে।

ছড়া ছিটান শেষ করে পুকুরে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে এল সুভদ্রা। এসময় ব্রজবুড়া থাকলে তাকে চায়ের কথা বলত। সংসারের খোঁজখবর নিত। তারপর তৈরী হোত গাঁ ঘুরতে যাওয়ার জন্য। পবন শুয়ে থাকলে তাকে চিৎকার করে বলত, দাদু ভাইরে, আর শুয়ে থাকিস নে, যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্যও যে শুয়ে থাকে। ব্রজবুড়া নেই কিন্তু তার উপস্থিতি সর্বত্র টের পায় সুভদ্রা। খোলঘরের দিকে তাকালে তার বুক ভেঙে যায় এখনও। ব্রজবুড়ার বেশীরভাগ সময় কাটত খোলঘরে। গ্রাহক আসত খোল নিয়ে। গাব কাজ, খোল ছাওয়া, খোল বাঁধায় তার হাত ছিল খাসা। লোক খুশি হয়ে বলত, বুড়োর হাতের গুণে চামড়াও বুলি বলে। এমন মুরুব্বি মানুষ চলে গেলে কে সামলাবে ব্যবসা। কে বুঝবে গ্রাহকদের মনের কথা। পবন খোল ব্যবসায় গেল না। এ কাজে বুদ্ধি যেমন লাগে তেমন প্রয়োজন ধৈর্যের। চঞ্চল চিত্তে খোল সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। সুভদ্রা বাতাসে দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়ে অসাড় পায়ে ঢুকে এল ঘরের ভেতর। যেন সে অন্ধকার খনির ভেতর ঢুকে এল—এমন অস্বস্তি শুরু হল তার চোখে। ধাতস্থ হতে সময় লাগল কিছু সময়। মেনি বিছানা ভাঁজ করে রাখছিল ঘরের এককোণে। পবন চা খেয়েই চলে গিয়েছে যমুনার ঘরে। সে আর ধৈর্য ধরতে পারেনি, বেলা বাড়লে সব কাজ এলোমেলো হয়ে যাবে—এই ভয়ে সে মুখ পর্যন্ত ধোয়নি। কিন্তু এত সকালে গিয়েও সে যমুনার দেখা পেল না। তখন বাঁশঝাড় থেকে ফিরছিল যুগলবুড়া, পবনকে দেখে সে থামল রাস্তার একপাশে। শুধাল, বাঁকা কেমন আছে বাপ। সে ঘুরবে তো?

চমকে তাকাল পবন, ধাতস্থ হওয়ার জন্য সময় নিল, তারপর ধীর গলায় বলল, বাঁকাদাকে নিয়ে আজ সদরে যাব। এগরার ডাক্তার বলেছে—সদরে নিয়ে যেতে। পেটের ফটো তুলতে হবে।

যুগলবুড়া সব শুনে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, কার কখন যে বিপদ হামলে পড়ে তা বুঝি ভগবানও আগাম জানে না। ছেলেটার কথা ভেবে আমার দুখ হয় রে। আমার শরীলের অবস্থা তো দেখছিস। টুকে ভালা থাকলে আমি ঠিক যেতাম, তার সাথে দেখা করে আসতাম।

শিশিরে ভিজে ছিল পথের ধুলো, বেড়ার ধারের কচাগাছগুলোয় শিশির পড়ে চকচক করছিল সবুজ পাতা। এ সময় হাই তুলে পুরো হাড়িসাই জেগে ওঠে। গোয়াল থেকে ছাড়া পেয়ে গোরু-ছাগল ক্লান্ত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে মাঠের দিকে। মোরগ ডেকে ওঠে গলা চিরে। বাঁশঝাড়ের মগডগায় একদল কাক ডাকে কা-কা। সেই ডাক শুনে পবনের সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। হৈমবুড়ি থাকলে এই কাকগুলোর দিকে ভাত ছুঁড়ে দিত মুঠো মুঠো আর পবনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, হা দেখ তোর দাদু ঘুরোন এয়েচে। এ ঘর ছেড়ে সে যাবে কুথায়। আমি যতদিন থাকব—ততদিন তারে আসতেই হবে। সে যে আমারে না দেখে থাকতে পারবেনি। কী করে থাকবে? এ তো একদিনের সম্পর্ক নয়, এ যে জনম জনমের বন্ধন।

হৈমবুড়ির প্রলাপ অস্বাভাবিক লাগলেও পবন চুপ করে থাকে। ব্রজবুড়ার মৃত্যুর পর তার মাথার কোন ঠিক নেই। শোক তাকে পাথর করেছে। অভাব তাকে ছন্নছাড়া করেছে। ইদানীং সে প্রায় গাল দেয় সহদেবকে। পাড়া মাথায় তুলে বলে, অমন ছেলের মুখ আমি দেখব না। সে আসুক, তার সাথে আমি কতা বলব না। যে ছেলে বাপের মুখে আগুন দি. পারে না—সে আবার কেমন ছেলে! যে ছেলে বাপের শেষ সময়ে ঘরে আসে না তেমন ছেলে থাকার চাইতে না থাকা ভাল। কথা শেষ হয় না, তার আগেই হৈমবুড়ি কেঁদে কঁকিয়ে বুক চাপড়ায়। তার আফশোষ বাতাসে মিশে যায়, তার প্রলাপ যন্ত্রণা হাড়িসাইয়ের সকলের কানে বিঁধে যায়।

পবনকে অন্যমনস্ক দেখে যুগলবুড়া লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ঘরের দিকে চলে গেল। দূর থেকে তার কুঁড়েঘরখানা হুমড়েপড়া খড়ের ঢিপি। পুরনো খড়ের রঙে এখন আর সোনার বরণ নেই, পচা খড় পচা পাঁকমাটির রঙ নিয়ে মাটিতে মিশে সার হতে চায়। তবু ঐ কুঁড়েঘরটাকে ভয় পায় এ গাঁয়ের অনেকে। কুষ্ঠ রোগটা এরা কেউ সহজভাবে নেয়নি, ওদের ধারনা বহু পাপ করলে মানুষের কুষ্ঠ হয়। পবন এসব বিশ্বাস করে না। দুলুবাবু তাকে বলেছেন, কুষ্ঠ একটা রোগ। এটা কোন অভিশাপ নয়। ঠিকমত চিকিৎসা করালে এ রোগ ভাল হয়ে যায়। দুলুবাবুর কথাকে হাড়িসাইয়ের কেউ মুখের উপর অবজ্ঞা করতে পারে না। আবার মন থেকে তারা একথা মেনেও নিতে পারে না। তাই যুগলবুড়োর কপালে জোটে অবহেলা আর বঞ্চনা। সে একঘরে হয়ে পড়ে আছে হাড়িসাইয়ের এককোণে। কেউ ভুল করে তার ঘরের ছায়া মাড়ায় না। কেউ তার সাথে কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করে না। এগরা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা এসে যুগলবুড়োকে ওযুধ দিয়ে যায় নিয়মিত। সেই ওযুধ নিয়ম করে খায় যুগলবুড়া। জীবনধারণের জন্য ভিক্ষাই তার সম্বল। হাটবারে সে রাস্তার এক পাশে বসে থাকে তোবড়ান অ্যালুমিনিয়ামের বাটি নিয়ে। কেউ খুচরো পয়সা দিলে ঘেয়ো হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে। হাটবার ছাড়া অন্য দিন সে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরে ভিক্ষার আশায়। কেউ তাকে ফেরায় না কিন্তু অনেকের চোখেই মিশে থাকে ভয়জনিত ঘৃণা। এত বড় একটা জীবন ঘৃণার সিঁড়ি বেয়ে কতদূব এগোতে পাবে—পবনের তা জানা নেই তবে যুগলবুড়োর উপর তার মনের কোণে শ্রদ্ধাব আসন পাতা আছে। ব্রজবুড়াই বলেছিল, ঝুরি নামান বটগাছ দেখেছিস দাদুভাই, আমাদের যুগল হলো গিয়ে সেই বটগাছ। ওর ছায়ায় কত মানুষ যে পার পেয়ে গেল।

কুয়াশার হিমচাদর সরে যাচ্ছিল আলো ফোটার সাথে সাথে, ঢ্যাঙ্গা তালগাছের মাথার উপর কুয়াশার দল উড়ে বেড়ায়, কখনও বা ছুঁয়ে থাকে দীর্ঘসময়। তিনটে তালগাছ হাড়িসাইয়ের মাঝখানে পাশাপাশি। তালগাছের গোড়া ছুঁয়ে সরু ফিতের মত পথ। পথের দু'পাশে বুনো ঝোপ-জঙ্গল। বড়পুকুরের জল স্থির হয়ে আছে হিম ছোঁয়ায়, মাছও ঘাই দেয় না শীতের ভয়ে। তাল পুকুরের দখল হাড়িসাইয়ের প্রতিটা মানুষের। গরমকালে জল কমে গেলে হুল্লোড় বাধে মাছ ধরার। তখন মুরুব্বি বলতে ব্রজবুড়ার ডাক পড়ত পুকুরপাড়ে। পুকুরের মাছ ভাগ হোত। কারোর কম বেশী নয়—সবাব সমান। এখন ব্রজবুড়া নেই, এ গুরুদায়িত্ব এখন যুগলবুড়োর। এক অলিখিত বন্ধনে হাড়িসাইয়ের প্রতিটি চালাঘর বুঝি সোনার হারের মত বাঁধা আছে। এই বন্ধন ছিন্ন করার উপায় নেই। আত্মীয়তাব ঘেরাটোপ এখানে সবার মধ্যে। অর্থের জোর দিয়ে এখানে মানুষের গুরুত্ব বিচার হয় না, মানুষের আসল পরিচয় হল সে কতটা খাঁটি মানুষ।

যমুনার সাথে দেখা হল না বলেই পবনের মনে চিন্তা ছিল, বেলা বাড়লে সদরে পৌঁছাতে তার দেরী হয়ে যাবে—এই ভয়ে সে কিছুটা ভীত ছিল। টাকা-পয়সা হাতে না পেলে সে-ইবা যাবে কী করে? অর্থের জোর পবনের নেই। যে শুধু তার নিজের বাসভাড়াটা মেনির কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে। এছাড়া তার হাতে আর কোন শক্তি নেই।

ঘরে ফিরে এসে পবন দেখল হৈমবুড়ি ফিরে এসেছে, তার চোখের কোলে রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। এই বয়সে রাত জাগা তার পক্ষে শোভন নয়, তবু কর্তব্যের খাতিরে গতরাতে সে দু-চোখের পাতা এক করেনি। হৈমবুড়ি দাওয়ার উপর বসেছিল, তার সামনে লাল চা ভর্তি ডাঁটি ভাঙা কাপটা এগিয়ে দিয়েছে সুভদ্রা। হৈমবুড়ি সশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, রাতভর বড় কষ্ট পেল বউটা। ছানাটার মাথা কিচুতেই নামছিল না, বড় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম বউরে, শেষটায় ভগমানই সব সড়গড় করে দিল। সে না দয়া করলে আমার মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি হোত। তার দয়াতেই মান বাঁচিয়ে ফিরচি। তবে শেষ রক্ষা হল না। ধর্মটার আবার মেয়ে হল। সে বেচারী খুব ভেঙে পড়েচে। মনে মনে আশা করেছিল

ওর ছেলে হবে। বউটা মেয়ে হয়েচে শুনে কী মরা কাঁদন না কাঁদল। তারে আমি বোঝাতে পারিনি যে ছেলে-মেয়ে সব সমান। ওরা পড়া-লিখা জানা মেয়ে, ওরা যদি অমন করে তাহলে আর সবাই কী করবে?

চা শেষ করেই হৈমবুড়ি সোজা চলে গেল পুকুরপাড়ে। আঁতুড় ছোঁয়া কাপড় ধুয়ে সে আবার পাড়ে উঠে নতুন কাপড় পরল। ধাইবিদ্যায় ছোঁয়া-অছোঁয়ার চল আছে। আঁতুড় ছুঁলে কাপড় ধুতে হয় সবাইকে। হৈমবুড়ির এ ব্যাপারে কোন কুঁড়েমি নেই, শুধু শীতকাল বলেই সে একটু জড়োসড়ো। পবন বাস ধরার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছিল তখন সুভদ্রা এসে হাজির হল। বলল, এট্টা খামালু তুলেছিলাম কাল। তুই যখন যাচ্ছিস তখন ওদের জন্য কিছুটা নিয়ে যা। ওরা তো শহরে থাকে, এসব আর পাবে কোথায়?

মেটে আলুর ভার বইতে হবে বলে পবন কিছুটা নিমরাজী, তবু সুভদ্রার মুখের উপর সে না করতে পারল না।

কাপড় সেদ্ধ করার জন্য আলাদা একটা উনুন আছে উঠোনের এককোণে, সেখানে খোলা হাওয়া আছড়ে পড়ে বলে খেজুরপাতা দিয়ে জায়গাটা ঘিরে দিয়েছে পবন। সে অনেকদিনের কথা, এখন সেই খেজুরপাতা এক বর্ষায় পচে রঙ বদলে ফেলেছে আমূল, সেখানে বসে পিঠে রোদ লাগিয়ে মেনি মাটির হাঁড়িতে ফেনভাত রাঁধছে পবনের জন্য। জ্বালানী বলতে শুকনো আম আর বাঁশপাতা। পাতাগুলো আগুন পাওয়ার সাথে সাথেই পড়পড় শব্দে পুড়ছিল, আর তৈলাক্ত একটা আভা ছড়িয়ে দিচ্ছিল আগুনের পিঠে। মেনি কত চটজলদি এই সংসারের হালচাল রপ্ত করে ফেলেছে—তা ভেবে বিস্মিত হল পবন। সুভদ্রা প্রায় তাকে সংসারের পাঠ শেখায়। মেনির কুঁড়েমী স্বভাবকে সে কোনদিন প্রশ্রয় দেয় না, মুখ ভার করে বলে, মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, সংসারের কাজ না শিখলে শ্বশুরটিপায় গিয়ে কথা শুনতে হবে জীবনভর। তখন বাপ-মার সম্মান নিয়ে টানা-হিচড়া হবে--সেটা কি ভাল দেখায় রে মেনি। ঘরে যখন আছিস তখন হাত-পা নড়া, কাজকর্ম টুকে শিখে নে, যাতে তোরও মুখ না পোড়ে আমাদেরও মুখ বাঁচে।

মার মুখকে মেনি বড্ড ভয় পায়। বাবার কাছে তার যত আদর আব্দার। কিন্তু বাবাকে সে খুব কম সময় কাছে পায়, যতটুকু সময় সে কাছে পায় ততটুকুতে তার মন ভরে না, ফলে বাবা তার কাছে প্রায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এক নিষিদ্ধ দেবতা। মাটির হাঁড়িতে ফেনভাত চড়বড়িয়ে ফুটছিল, সুভদ্রা বুদ্ধি করে দুটো গোল আলু ফেলে দিয়েছিল তাতে কেননা পবন তরকারী না হলেও আলুমাখা আর ফেনভাত খেতে ভালবাসে বরাবর। আজ সদরে যাবে বলে তার খাতির একটু আলাদা। হাট থেকে কেনা শুকনো লহরামাছ ফেলে দিয়েছে আগুনে। শুকনো মাছের গন্ধ ভাসছে বাতাসে, পুরো হাড়িসাইয়ে চক্কর কেটে ঘুরছে সেই বাতাস।

ঠিক খেতে বসার সময় যমুনা এল, তার চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ঘন মেঘছায়া, সে এসে ছেলেটাকে কাঁখে নিয়ে বিষাদপ্রতিমার মত দাঁড়াল। সুভদ্রা তার দিকে চোখ তুলে আবার চোখ নামিয়ে নিল তৎক্ষণাৎ, আসলে এক দুঃখী আরেক দুঃখীর মুখ দেখতে চায় না। যমুনার তর সইছিল না, সে পবনকে বলল, আজ আমি আর যেতে পারলাম না, তুমি ওরে নিয়ে যাও ঠাকুরপো। তুমি না ফেরা পর্যন্ত আমি তোমার জন্য বাস দেখব।

পবন খাওয়া থামিয়ে অর্থহীন চোখে তাকাল, তারপর একঢোক জল খেয়ে বলল, আমি যদি না-ও ফিরি তাহলেও আমার জন্য চিন্তা করবে না। বাঁকাদাকে সদরে যখন নিয়ে যাচ্ছি তখন পুরা সুস্থ না করে আমি ফিরব না। তাছাড়া বারবার যাওযা-আসার খরচা আছে। তুমি অত খরচা পাবে কোথায়?

তোমার উপর আশা করে থাকলাম। আমি গাঁয়ে থাকলেও মন আমার তোমাদের সাথে যাচ্চে। যমুনার চোখ ছলছলিয়ে উঠল, আঁচলের গেরো খুলে ভাঁজ করা কটা টাকা মাটিতে নামিয়ে রেখে সে বলল, হেমন্ত গিরির হাতে-পায়ে ধরে এ কটা টাকা যোগাড় হল। আর পারলাম না ঠাকুরপো। তবে ঘরে কিছু চাল আছে, ওগুলো তুমি নিয়ে যেও।

না, না চাল নিয়ে কী হবে? পবনের গলায় ভাত আটকে যাবার উপক্রম, যমুনা বলল, জ্যাঠারা টাউনে থাকে। সেখানে শুনেচি জিনিস-পত্রের মেলা দাম। জলও তো সেখানে কিনে খেতে হয়। তাই চালগুলো সাথে করে নিয়ে গেলে জ্যাঠার টুকে সাহায্য হবে।

সেজন্য তোমাকেভাবতে হবে না। পবনের আত্মমর্যাদায় খোঁচা দিল যমুনার কথাগুলো, তারা শহরের মানুষ, তাদের কী টাকার অভাব। মাস গেলে মাইনে পায়। তাদের জন্য আমাদের না ভাবলেও চলবে।

একথার পর যমুনার আর কথা বাড়াবার সাহস হল না, সে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। পবন তাকে আশ্বস্ত করে বলল, তুমি কিছু ভেব না বৌদি। সেখানে বাঁকাদার কোন অসুবিধা হবে না। তুমি ঘর যাও। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব।

যমুনা চলে যাবার পর পবন পাত ছেড়ে উঠে পড়ল, আর দেরী করা ঠিক হবে না ভেবে মেনিকে বলল, ঘটীতে জল ভরে দে, আমি আর ঘাটে যাব না। বাস ফেল হলে ভোগান্তি হবে সারাদিন।

ঘটী ভরে জল দিল মেনি, বেড়ার ধারে দুটো থান ইট পাতা আছে, যেখানে দাঁড়িয়ে ওরা রাত্রিবেলায় মুখ ধোয়, পবন ঘটী নিয়ে সোজা চলে গেল সেখানে।

রোদের রঙ তখন পাকা সোনার, হাড়িসাইয়ের মানুষজন ঘরছাড়া হয়েছে। যে যার কাজের ধান্দায়। আর দেরী করা শোভন হবে না জেনে পবন ঘর থেকে বেরিয়ে এল ঝটপট।

নকুলের ঘরখানা ছোট তবু বাঁকা আর পবনকে দেখে ভ্রু বেঁকে উঠল না মানদার, কুশল শুধিয়ে বলল, আজ বারবার হাত থেকে বাসন পড়ে যাচ্ছিল। মনে মনে ভাবছিলাম কেউ আসবে। তা তোমরা এসেছে—ভাল হল। অনেকদিন দেশ থেকে কেউ আসে নি। নানা ঝামেলায় আমাদেরও যাওয়া হয়ে ওঠে না। মানদা অন্তর দিয়ে কথাগুলো বলল যা শুনে আশ্বস্ত হল পবন। বাঁকা একটা কাঠের চেয়ারের উপর কোনক্রমে কুঁকড়ে-মুকড়ে বসেছে, গত দিনগুলোর তুলনায় আজ সে একটু সুস্থ। দীর্ঘ বাসযাত্রায় পবন ভেবেছিল বাঁকা হয়ত ভেঙে পড়বে যন্ত্রণায়, কিন্তু তার সেই আশঙ্কা ভুল হয়েছে। কেরাণীতলায় নেমে পবন যখন রিকশ'র কথা উঠাল তখন বাঁকা ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিল, রিকশর দরকার নেই পবনা, আমি হেঁটেই চলে যেতে পারব। তবু ঝুঁকি নিতে চায়নি পবন, একটা রিকশ ডেকে পাশাপাশি বসেছিল। তখনও মনে ভয় ছিল যদি বাঁকাকে দেখে বিগড়ে যায় মানদা। সেই ভীতি দূর হতে পবন মনে মনে আশ্বস্ত।

নকুল এল দুটোর পরে ডিউটি শেষ করে। পবন আর বাঁকাকে দেখে তার খুশি আর ধরছিল না। পবনের মুখ থেকে সব কিছু শোনার পর নকুল বলল, তোর আর কোন চিন্তা নেই। আমার কাছে যখন এসে গেছিস তখন সব চেক করিয়ে বাঁকাকে আমি ছাড়ব।

বাঁকা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, জ্যাঠা গো, বহু ভরসা করে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। যমুনাটার কাঁচা বয়স। আমার কিছু হয়ে গেলে তারে কে দেখবে বলো? কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল তার। নকুল তার শীর্ণ হাত দুটো ধরে বলল, মাথার উপর ভগবান আছে। তোর চিন্তা কী? সে সবাইকে দেখে।

তের

কী যাদু আছে এই জরা জীর্ণ গ্রামখানায় পবন তা বুঝতে পারে না। পুরো এক সপ্তাহ মেদিনীপুরে কাটিয়ে সে যখন চোরপালিয়া হাটে নামল তখন অন্ধকার জড়িয়ে ধরছে বাসের ধুলো। চারা বটগাছগুলোয় আঁধার বুঝি জমাট হয়ে নেমেছে। এত অন্ধকার যা সহজে চোখে লাগে। পবন চলে যাওয়া বাসটার দিকে হা-করে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। রাস্তার দু-পাশের দোকানগুলোয় টিম টিম করে বাতি জ্বলছে, সেই অস্পষ্ট আলোকমালা ইশারায় বুঝিয়ে দিল আর বেশীক্ষণ নয়—এবার সব দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হবে। শীতের রাতে কে আর বসে মশার কামড় খেতে ভালবাসে। পবন ময়রা দোকান থেকে জিলাপি কিনে সোজা নেমে এল চেনা পথে। অন্ধকারে এতদূর থেকে তাদের ঘরখানা দেখা যায় না কিন্তু মেনির মুখখানা অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে চোখের তারায়। কোথা থেকে ফিরলে তার আর নিস্তের নেই, মেনি মেনিবেড়ালের মত থলি হাতড়ে খুঁজবে তার নিজের জিনিস, না পেলে মুখ ভার করে দূরে সরে দাঁড়াবে। মেঘ না কাটা পর্যন্ত সে কোন কথা বলবে না। পবন ঘরে ফিরে মেনিকে তাই গোমড়ামুখো দেখতে চায় না। আসার সময় মানদা দশটা টাকা দিয়েছিল মেনির জন্য কিছু কিনে নিয়ে যাবার জন্য, সেই টাকায় পবন জিলিপি কিনে বেশ গর্বভরে হাঁটছে। আজ তাকে দুঃখ পেতে হবে না, গোমড়ামুখো বোনের অভিমান দগ্ধান চাহুনী সহ্য করতে হবে না, আজ সে প্রকৃত দাদার মতো ঘরে ঢুকবে। শহরের আলো ঝলমলে রঙ এ পাড়ার কোন ঘরেও খুঁজে পাওয়া যাবে না তবু আলোর বাহারি রঙ না থাকলেও এখানে যা আছে শহরে মাথা ঠুকে মরলেও পাওয়া যাবে না। দু-পা হেঁটে এলেই পবনের অন্যমনস্কতা দূর হয়ে যায়। সে বেড়ার পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার কানে ভেসে এল ঘ্যানা ওস্তাদের ঢোলের বোল। দশ গ্রামের লোক একবাক্যে বলে, ঘ্যানা ওস্তাদের ঢোল কথা বলে। লোক যে মিথ্যে কথা বলে না, পবন তা আবার নিজের কানে শুনল। শীতের বাতাসকে গর্ভবতী করে ঘ্যানা ওস্তাদের ঢোল হাসি-মস্করায় মেতেছে। বাতাস বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই মধুর বোল ঃ তা গুড় গুড়/ ধিনাকে-ধিনাকে/ধি-ই-ই ধি-ই-ই-নাকে/ ধি-ই-ই নাকে তা গুড় গুড়। টেঁ-টেঁ-টেঁ টিনাকে টিনাকে তা গুড়-গুড়-গুড়।

অনেকদিন পরে ঘ্যানা ওস্তাদের বাজনা শুনে মন ভরে গেল পবনের, পথক্লান্তি উধাও হল মন থেকে। সে যা পারেনি, এ পাড়ার অন্য ছেলেরা যা পারেনি সেই অমূল্য সুরবোধটাকে এখনও বালির নীচে বহমান নদীর মত অক্ষুণ্ণ রেখেছে ঘ্যানা ওস্তাদ। এ যেন একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুদির গড়। পবন ঘর না গিয়ে সোজা চলে আসে ঘ্যানা ওস্তাদের উঠোনে। তাকে এই অবস্থায় কেউ দেখবে ভাবেনি, সবাই থম মারা মুখে পবনকে দেখছিল। তার এলোমেলো চুল মুখের উপর আছাড় দিয়ে পড়েছে, কোল বসা চোখের দ্যুতিতে অদ্ভুত একটা বিস্ময় মাখানো। সারা শরীরে ঝুরি নেমেছে অবসাদের। তাকে দেখতে পেয়ে ঘ্যানা ওস্তাদের ঢোল নেমে গেল, তাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে থাকা শিক্ষার্থীদের চোখও ছানাবড়া। ঘ্যানা ওস্তাদ ঢোলটা কোলের উপর থেকে শীতলপাটিতে নামিয়ে রেখে শুধাল, কে, পবনা না? তা কখন এলি বাপ?

তার সুরেলা আবেগী কথায় উদ্বেগ ছিল, উদ্বেগ যত না ছিল তার চেয়ে বেশী ছিল গভীর আন্তরিকতা। পবন কাঁধে ঝোলান ব্যাগটা নামিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল ঘ্যানা ওস্তাদের মুখোমুখি। তারপর হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিল শ্রদ্ধাভরে, কপালে সেই চরণছোঁয়া হাত ছুঁইয়ে সে বলল, এই এলাম

কাকা। বড় থকে গিয়েছি গো! তা বাস থেকে নেমে তোমার ঢোলের বোল শুনতে পেলাম। ঘর যেতে পারলাম না, তুমি যেন আমাকে টেনে হিঁচড়ে এখানে নিয়ে এলে।

সে কী বাপ, তাই কি কোনদিন হয়! ঘ্যানা ওস্তাদের গলায় লজ্জা জড়ান বিস্ময়, বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সে শুধোল, তা এসেছিস ভাল করেছিস। তা বাবা, আমাদের বাঁকার খবর কী? তার বউ তো ভেবে ভেবে মরছে। সে বেচারীর মুখের দিকে আর তাকান যায় না।

বাঁকাদা হাসপাতালে ভর্তি আছে। আর দিন দশেক থাকতে হবে তাকে, তারপর ছাড়া পেয়ে যাবে। পবনের কথা শুনে আশ্বস্ত হল ঘ্যানা ওস্তাদ। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডাক ছাড়ল, মা, মা—দেখ গো কে এসেচে। একবার খপখপ বাইরে আসো দেখি।

চপলাবুড়ি হেঁসেলঘরে চুলায় জ্বালানী ঠেলছিল একমনে, ভাত ফুটছিল টগবগিয়ে, শেষে বৌমাকে জ্বালানী ঠেলতে বলে বেরিয়ে এল বাইরে। অন্ধকারে ছানিপড়া চোখে সে ভাল দেখতে পায় না, তবু আন্দাজে মাটির সিঁড়ি ধাপগুলো পেরিয়ে ধীর পায়ে সে নেমে এল উঠোনে। এসেই হা করে তাকাল সবার মুখের দিকে, কিন্তু ঐ সব নির্বোধ মুখে সে কোন কিছু রহস্য খুঁজে পেল না। ঘ্যানা ওস্তাদ হাত ধরে তার মাকে বসাল পাশে। আব্দার করে বলল, পবনা এসেছে মেদিনীপুর থেকে। সে তার ঘর যায়নি। সিধা এখানে এসেছে। আমার ঢোলের বোল নাকি তারে এখানে টেনে এনেচে। যাও মা, ওর জন্যি টুকে গরমজলের ব্যবস্থা করো।

গরম জল বলতে গরম চা। চপলাবুড়ি ছেলের কথা বলার ধরন শুনে হাসল। বাঁকার কুশল শুধিযে সে আবার চলে গেল হেঁসেল ঘরে। পবন হাঁ করে দেখল তার যাওয়া। মানুষের বয়স হলে সে কত অসহায়। হৈমবুড়ির কথা মনে পড়ল তার। দু-জনেরই পরনে এখন ইঞ্চি পাড় সাদা শাড়ি। জ্যোৎস্নার যা রঙ সেই রঙের শাড়ি ছাড়া ওরা আর কিছু পরে না। তবে হৈমবুড়ির সাথে চপলাবুড়ির ফারাক অনেক। ব্রজবুড়া গত হয়েছে এই সবে। চপলাবুড়ি দুই ছেলে নিযে বিধবা হল সেই কত যুগ আগে। তখন তার এমন শুকনো দড়ির মত চেহারা ছিল না, ছিল বর্ষার মানকচুগাছের মত থৈ-থৈ রূপ। সেই রূপ এখন পুড়ে পুড়ে অঙ্গার। সংসারের হাঁড়ি ঠেলতে-ঠেলতে হাত হয়েছে লিকলিকে, মাজা পড়েছে, কমেছে চোখের দৃষ্টি। টিকাল নাকের হাড়ের উপর এখন শুধু চামড়া। সাবামুখে দল্লান মাংস আর কাটাকুটির খেলা। তার এই রোগা শরীরটা এখন আর আগের মত কর্মক্ষম নয় তবু রোদ উঠলে সে একগণ্ডা ছাগল নিয়ে মাঠে যায়। দিনটা তার মাঠেমাঠেই কাটে। কখনও ছাগল চরায়, কখনও আবার খোটে চিকনিশাক। সে বসে থাকতে জানে না। ভোর হওয়ার অনেক আগেই তার ঘুম ভাঙে। ঘুম ভাঙলে যে ঠাকুরের নাম নেয় না, শুধু সুর ভাসিয়ে কাঁদে। সে কাঁদে তার সোয়ামীর জন্য, পেটেব বড় সন্তানের জন্য। ঝ্যানা তার বড় ছেলে। পেটের ধান্দায় কলকাতায় গিয়ে আর ফিরে এল না। বৌমা দুর্গা এখনও পথ চেয়ে থাকে তার জন্য। এখনও সিঁদুর পরে যত্ন কবে, শাঁখা ভাঙ্গেনি, লোহা খোলেনি। এক যুগ পেরিয়ে গেল, হিসেবমত তার সব খুলে ফেলারই কথা। কিন্তু তার সম্মুখে কেউ দাঁড়াতে পারে না এসব প্রস্তাব নিয়ে। ঘ্যানাও সমর্থন করে না। কেন করবে? মানুষটা বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে—এ বিষয়ে যখন কেউ নিশ্চিত নয়—তখন এত নিয়মের অনুশাসন কেন? হক কথা। দুর্গা তাই চওড়া করে টিপ পরে কপালে। পারা ওঠা আয়নার সামনে সিঁথিতে সিঁদুর দেয় যত্নে। শাঁখা বেড়ে গেলে শাঁখা পাল্টায়। ঠাকুরস্থানে যায় পূজা দিতে। কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। বাধা দিলেও সে কারোর কথা শোনে না।

চপলাবুড়ি নয়, চা নিয়ে এল দুর্গা। দু-হাতে জ্বলজ্বল করছে মোটা শাঁখা। গলায় রূপোর চওড়া হার। কপালের সিঁদুরই বলে দেয় তার পতিভক্তি কত দূর।

গরম গ্লাসে ঠোঁট ছুঁইয়ে পবন দুর্গার দিকে তাকাল। অন্ধকারেও নারীর আলাদা একটা রূপ থাকে, শক্তি থাকে। যে শক্তিতে রাতের ফুলগুলো ফোটে সেই শক্তি বুঝি দুর্গার নয়নে। পবন চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হয়। লালপেড়ে সাদা শাড়িতে ময়লা জমেছে থোক থোক, তবু ঐ শাড়িটা বুঝি দুর্গার শরীরে জ্যোৎস্নার ওড়নার মত মানিয়ে যায়। শরীর ঈষৎ ভারী, বয়স কত বোঝা দুরূহ তবু মনে হয় মা-মা। তবে লোকে যা বলে সেটাই কী সত্যি! ঘ্যানা ওস্তাদ এই শ্যামলীর মায়ায় ঘর ছাড়তে পারে না। না হলে কলকাতার অপেরা থেকে ডাক এসেছিল তার, মাস গেলে দু-হাজার বেতন—খাওয়া পরা সব—তবু কেন সে গেল না? প্রেমের আঠা কি তাহলে বট আঠার চেয়েও ক্ষতিকারক? লোকের কথায় কোন কান নেই ঘ্যানা ওস্তাদের। তার মতে—লোক শুধু উপর দেখে, ভেতর দেখে না। যারে আমি মা জ্ঞানে ভক্তি করি, যারে আমি চোখ তুলে তাকাতে পারি না, যার মুখ দেখতে গেলে আমার চক্ষু দুটা তার পায়ের কাছে ছটফটায়—তারে ফেলে আমি কলকাতা কেন গো সগ্গে গিয়েও সুখ পাব না।

সুখের কত রকমের নিয়মফের। কথার কত রকমের ব্যাখ্যা। ক'জনে বলে—এই ঘ্যানা ওস্তাদই মেরে ফেলেছে ঝ্যানাটারে! এত বড় সন্‌সারে মানুষ কুথায় হারাবে গো। সে হারায়নি, তারে মেরে ফেলা হয়েচে। সে আর ঘুরবেনি। মেয়েছেলেতে কী মধু আচে তা কেবল নাগরই জানে।

ছি-ছি, এমন কথা শুনলেও পাপ! দু'হাতে কান ঢেকে ডানে-বাঁয়ে পাগলের মত মাথা ঝুঁকায় ঘ্যানা ওস্তাদ, চোখেব জলে বুক ভেসে যায়, হাতের পাঁচন থেমে যায় ঢোলের চামড়ায়। তবু মনের জ্বালা কমে না, বুকের ভেতর কে যেন কুয়ো খোঁড়ে শাবল দিয়ে, রক্ত চুয়ায়।

যাকে নিয়ে এত কথা সে কিন্তু অন্য ধরনের। যৌবনের জ্বালায় দ্বন্দ্বে মরে তার শরীর। পদ্মপাতার মত সে কেবল ঢেউ তোলে চোখে-চোখে। কখনও হাসে কখনওবা ছলা কলায় ভুলাতে চায় পুরুষ জীবন। ঘ্যানা ওস্তাদ ওপথের পথিক নয়। সে প্রেমিক তবে নারীর নয়—সংগীতের, সুর-ছন্দ-বাদ্যযন্ত্রের। সে পাগল ঘোড়া তবে নারীকে বাজী ধরে নয়, তার দুরন্ত দৌড় শিল্প কলার অঙ্গনে।

চা দিয়ে দুর্গা আর দাঁড়াল না, সে চলে যাওয়ার পব ঘ্যানা ওস্তাদ দম ছেড়ে বাঁচল। দুর্গা যেন হাওয়া আটকে দিয়েছিল তার, শীতের রাতে বুঝি ঘাম ফুটে উঠেছিল শরীরে, ফস করে শ্বাস নিয়ে ঘ্যানা ওস্তাদ আকাশেব দিকে মুখ তুলে তাকাল। তারপব এক সময় চায়ের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে সে তার প্রাচীন নেশায় ডুবে গেল।

এ পাড়ার সবাই জানে ঘ্যানা ওস্তাদ চরিত্রহীন কিন্তু পবন জানে তার চরিত্র সেখানে শুধু পদ্মপাতারই তুলনা চলে। পাঁক মাটি জল ধুলো পদ্মপাতায় ধুয়ে যায়, জল তাকে ধুয়ে দেয়, এমন কী জল নিজেও দাঁড়ায় না, দাঁড়াবার হিম্মোৎ রাখে না। পদ্মপাতা যা পারে ঘ্যানা ওস্তাদও তাই পারে, তার চরিত্রে পাঁকমাটি এমন কী নোংরা জলের কোন স্থান নেই। কেবলই ছুঁয়ে দিলে কারোর জাত যায় না। গুজবের আগুনে চরিত্র কোনদিন পোড়ে না, মানুষ কলঙ্কের আগুনে না পুড়লে চরিত্র কোনদিন পোড়ে না। ঘ্যানা ওস্তাদের একটাই দোষ যে বড় গ্যাঁজাখোর। গাঁজা না হলে তার এক দণ্ড চলে না। লোকে যাই বলুক, পৃথিবী রসাতলে যাক—তবু তার গাঁজা দরকার। এক ছিলিম গাঁজায় তার হাত ঢাক ঢোলের চামড়ায় যাদু কাঠির মত নড়ে। গাঁজার কলকেয় টান দিয়ে বাঁশিতে ফু দিলে তার শত অপরাধ চাপা পড়ে যায় সুরের মাধুর্যে, সৃষ্টির অপার উল্লাসে। তাই ঘ্যানা ওস্তাদ যেখানে, গাঁজার কটু গন্ধ সেখানে থাকবেই থাকবে। জল আর মাটিকে, চাঁদ আর আকাশকে যেমন আলাদা ভাবা যায না—এ সম্পর্ক অনেকটা তেমন। দুর্গারও সাহস হল না তার হাত থেকে গাঁজার কলকে ছাড়িয়ে নেবার অথচ কত চেষ্টাই না সে করল। তার সব অভিমান যন্ত্রণা দাবী ধুলিসাৎ হল। সে ব্যর্থ। শুধু সে নয় চপলাবুড়িও ব্যর্থ। ছেলের হাত থেকে সেও তো কোনদিন গাঁজার কলকে কেড়ে নিতে পারেনি। পারেনি এজন্য—গাঁজা ছেড়ে দিলে এ ছেলেও আর বাঁচবে না।

চা শেষ করে গাঁজার কলকে সাজল ঘ্যানা ওস্তাদ। তার সাঙ্গোপাঙ্গরা আগুনের রসদ জুগিয়ে দিল। ঘ্যানা ওস্তাদ গাঁজার কলকেয় লম্বা টান মেরে চোখ কপালে তুলে ভকভকিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আয়েসী গলায় বলল, এই হিমে আমাকে তাতানোর কেউ নেই রে বাপ সকল। আমি তাহলে কী নিয়ে বাঁচব। আমার ঘর নেই, সংসার নেই। তোরা যা দেখিস এগুলো কি আমার। আমার বলতে শুধু এই কলকেটা, ক' ছিলিম গাঁজা আর এই তরলা বাঁশের বাঁশিটা। সুর যা বেরয় সে তো বাপ-পিতামহের দান। হাত যে চলে সে-ও তার আশীর্বাদ। আমি তার আজ্ঞা পালন করি। আমার আর ক'দিন। চোখ মুদলে আমি তার হাতছানি দেখতে পাই। সে আমাকে নেবার জন্য তৈরী। কিন্তু আমি এই অসময়ে কী করে যাই বল দেখি? তোরা কেউ মানুষ হলি না। গাছও মরার আগে বীজ রেখে যায়। মাছও পোনা ছাড়ে। তোরা আমার পোনা রে। আমার কিছু নেই। যা দি শিখে নে। তখন দেখবি শীতের রাতেও শীত লাগছে না। এ ঘর সন্‌সার কিছু নয় তার কাছে। যা বাপ, আজকের মত তোদের ছুট্টি। ফির কাল আসিস।

ওরা কেউ ওঠে না, গোল হয়ে ঘিরে থাকে ঘ্যানা ওস্তাদকে। ওস্তাদের কথাগুলো ওদেরকে যেন জোয়ারের জলের মত টানে। কী আকর্ষণী শক্তি ওর কথায়। হিম জলে মাথা ভরিয়ে বসে থাকে ছেলেগুলো। ঘ্যানা ওস্তাদ বলে, মনে গর্ব করবি নে, গর্ব হলে গিয়ে পিঁপড়ের ডানা, খসে পড়ে। কিছু শিখতে হলে কাদা মাটির মত হ। আমি যেমন খুশি গড়ে নেব। ঢেলা মন নিয়ে আমার ছিমুতে আসবি নে। আমার গুরু প্রহ্লাদ বাবাজী বলত—বাদ্যযন্ত্র মানুষই বানায়। আবার মানুষই তাকে বশে রাখে। বশে রাখার কোন মন্ত্র নেই। একমাত্র মন্ত্র হল সাধনা। এ সাধনায় লাভ দেখলে ঠকবি। গোরু-ছাগলের মত দোরে-দোরে চরবি। যদি লাভ-ক্ষতি না দেখিস তাহলে আমি তোরে দেখব। তোরে দেখাব যে তুই ছাড়া আর কেউ নেই।

বেড়ার উপর লতিয়ে বাড়ে নীল অপরাজিতা ফুল। কুয়াশার দল হুড়মুড়িয়ে উড়ে বেড়ায় বাঁশবাগানে। বুনো কচুর পাতা থেকে পিছলে পড়ে শিশির চুম্বন। ঘ্যানা ওস্তাদের কোলের উপর আবার উঠে আসে এক কাঠের ঢোল। হাতের আঙুলগুলো কাঁপে চামড়ার উপর চুলে বিলি কাটার মত। টান টান চামড়ায় অনুরণন হয় মুহুর্মুহু। কুয়াশাও পারে না হিম দিয়ে সেই শব্দজোয়ারকে রুখতে।

টিতাকে, উ-রু-রু টি-তাকে/ উ-রু-রু টি-তাকে/উ-রু-রু ঢ্যা-ঢ্যা-ঢ্যা....। ঝাঁ-ঝাঁ গৌর-নিতাই/তা গুড় গুড় গুড়/রাধেশ্যাম গৌর-নিতাই।

গোল হয়ে ঘিরে বসা ছেলেগুলোর কোলের উপর উঠে আসে যার যার নিজের ঢোল। তাদের শিক্ষার্থী হাতে কাঁপন ওঠে ঘনঘন। ঘ্যানা ওস্তাদের লাল চোখ, চোখের কোল জলে ভেজা, এক সময় ঢোল থামিয়ে সে চিৎকার করে ওঠে, বাজা তোরা, বাজা। আমার আর কত দিন। তোরাই তো মুখ রাখবি হাড়িসাইয়ের।

নিকোন উঠোনে কুয়াশার সাথে নেমে আসে সুরের পরীরা।

চোদ্দ

ভোর রাতের ঝড়বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিল সব। এত বৃষ্টি লুকিয়ে রাখে আকাশ? এত অন্ধকার, তুমুল আস্ফালন?

সাইকেল ঠেলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল পবন। পায়ের চেটো ডুবে গিয়েছিল কাদা জলে। হিম গুলোনী ছড়িয়ে ছিল ঘোলা জলে।

সুভদ্রা মানা করেছিল পবনকে, আজ আর সমুদ্রে গিয়ে কাজ নেই, আকাশের অবস্থা ভাল নেই, আবার ঝড়-বৃষ্টি নামতে পারে।

পবনের অস্থির মন সায় দেয়নি সে কথায়। ঝড়ো হাওয়ায় কাঁপছিল বাঁশের পাতা। টুপ টুপ করে ঝরে পড়ছিল জল। সেই পা খোঁড়া শালিকটা উড়ে এসে বসেছে খড়গাদায়। রোদ লুকোচুরি খেলছে মেঘের সাথে। সুভদ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে পবন কোন কথা বলেনি। কাজ না করলে সংসারের হাঁড়ি চড়ে না। হৈমবুড়ির ধাইগিরির পয়সায় সংসারের রাশ টেনে রাখা মুশকিল।

মাছের ঝুড়ি সাইকেলের ক্যারিয়ারে বাঁধা। দুটো বাঁশের পাটা কেরিয়ারে বাঁধা লম্বালম্বি। বড় ঝুড়ি রাখতে সুবিধা হয় তাতে। অনেকদিন পরে ঝুড়ি দুটো জুৎসই বেঁধে স্বস্তি পাচ্ছিল পবন।

ঘর ছাড়ার আগে সুভদ্রা এসে দাঁড়াল আগড় গোড়ায়, তুই তোর জেদ নিয়ে যাচ্ছিস যা তবে হাট সেরে ঘর চলে আসিস। রাত করবি নে। রাত করলে আমার চিন্তা বাড়ে।

হাড়িসাইয়ের পথটুকু পেরতেই বুকের কাছটায় খিঁচ ধরে গেল পবনের। জল কাদায় আটকে গিয়েছিল টায়ার। মাডগার্ড খোলা সাইকেলটার টায়ার ভিজে জল ঝরছিল অনবরত। পাকা রাস্তায় উঠে হাঁফ ছাড়ল পবন। তালগাছটার ভিজে মাথায় রোদ এসে থমকে দাঁড়িয়েছে, অভিমানী মেঘের ছায়া পড়েছে সেখানে। আর বেলা করলে মাছ পাওয়া মুশকিল। তালসারিতে খদ্দের বাড়লে মনের মত মাছ পাওয়া যাবে না। তখন এতটা পথ সাইকেল ঠেঙ্গিয়ে আসা অসার। সাঁই সাঁই করে সাইকেল ছুটছিল গায়ের জোরে, পথ ছোট হয়ে আসছিল আর ঘাম ঝরছিল পবনের গা থেকে। শীত হাওয়া জড়িয়ে ধরছিল আষ্টেপৃষ্টে।

পবন যখন দীঘার বালিচড়ায় পা দিল তখন কোটিমণির চা দোকানে হাঁড়ি তেতে গিয়ে জল ফুটছিল টগবগিয়ে। সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে পবন শীতে কুঁকড়ে যাওয়া হাত দুটোকে সেঁকে নিল আঁচের উপর। কোটিমণির বাসি সিঁথিতে বাসি সিঁদুর। পবনকে দেখে এক মুখ হেসে বলল, এদ্দিন পরে আমাদের কথা মনে পড়ল। সাউয়ের পো তোমার কথা বলছিল।

বাবুর সাথে আজ দেখা হয়ে যাবে। আমি তালসারিতে যাচ্ছি। কোটিমণি বিষণ্ণ গলায় বলল, সাউয়ের পো আজ তালসারিতে যাবে না। তার শরীল বিশেষ ভাল নেই। কাল দুকুরে একবার এসেছিল চা খেতে। বলছিল, গাটা ম্যাজ ম্যাজ করছে, জ্বর জ্বর ভাব।

বাবু না গেলে আমাকে কে মাছ দেবে?

কেন বাবুর লোক তো আছে।

গরম চা গলায় ঢেলে পবন আর সময় নষ্ট করেনি। ভেজা পাড় ধরে সে সাইকেল ছোটাচ্ছিল বনবনিয়ে। আগে গেলে পছন্দসই মাছ পাবে সে। ভিড় বাড়লে মাছ পেলেও পড়তা হবে না তেমন। বাছা মাছের দাম ভাল। ভাল মাছ হাটে বিকোয় ভাল দামে। হাট ধরতে পারলে মাছ বিকোবে হুড়হুড়িয়ে।

তালসারির আকাশে মেঘের কোন স্পর্শ ছিল না। সাতসকালে রোদের রঙ সোনা গলানো। মেছো চিল আর কাক উড়ছিল ডানা কাঁপিয়ে। পিছু নাচানো পাখিগুলো ভেজা বালিতে ছুটছিল। সারণি জাল ঝাড়ছিল মাছমারাদের দল। ওদের চোখে রাতজাগার ধকল। পবন ঝুড়ি নামিয়ে ওদের দিকে তাকাল। হাসতে হাসতে বলল, আর কেউ আসেনি দেখছি। তা ভালই হল। আমার একার দেড়মণ মাছ চাই।

কী মাছ নেবা?

তেলতাপড়ি ভোলা ভেটকি যা পাই—সব নেব। শীতকালে গাঁয়ের মানুষ এসব মাছ ভাল খায়। আজ খড়িকাহাটে যাব। এট্টু জলদি করলে ভাল হয়। জাল ঝাড়া থামিয়ে বুড়োমতন লোকটা বিরক্তির সঙ্গে তাকাল, আমরা কেউ বসে নেই ভাই। নোনাজলে হাতদুটো একেবারে জড়িয়ে গেছে। কাল রাতে শীত তো কম পড়েনি। পুরা রাতের হিম আমাদের মাথার উপর পড়ল। গলার স্বর জড়িয়ে গেছে ঠাণ্ডায়। এখন আর জল ঘাটতে ভাল লাগছে নি। ঝটপট জাল ঝেড়ে নিয়ে পাড়ে উঠে চা খাবো। চা না খেলে শরীর আর চলছে না।

নীলবড়ি গোলা জলে সূর্যের কচিমুখটা দেখা যাচ্ছে। ঢেউ যেখানে শেষ হয় হয়ত সেখানেই তার ঘরদোর। সারি সারি তালগাছগুলো এক ঠ্যাং বগার মত দাঁড়িয়ে। ভেজা বালির ছোঁয়া তাদের শেকড়ে। নোনাজলে বিষ হয়ে উঠেছে গা-গতর। আকাশের ছায়ায় তাদের ঘর সংসার। ঐ তালগাছগুলোর গোড়ায় শ্মশান চত্বর, কখন-সখনো ধোঁয়া উড়তে দেখা যায় পোড়াকাঠের। ভেসে আসে স্বজন হারানো মানুষের বুকফাটা কান্না। এত বড় সমুদ্র সেই কান্নাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, বরং সেই মর্মছোঁয়া কান্নাকে ঢেউয়ের মাথায় বয়ে নিয়ে যায় বহুদূর। দিনের বেলায় ঐদিকে তাকালে ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুক। সন্ধ্যা নামলে ওদিকে যাওয়ার সাহস করে না পবন। নারাণ সাউ হাতে কাজ না থাকলে প্রায় দিন ওখানে গিয়ে মরা তালগাছটার উপর বসে থাকে। উদাস চোখে সে সমুদ্র দেখে। তার তৃষ্ণাভরা চোখে তখন কীসের নেশা—পবন বুঝতে পারে না। যে মানুষটা রোজ সমুদ্র দেখে তার অত সমুদ্র দেখার নেশা কেন? এই ব্যাখ্যা পবনের জানা নেই।

সারণি জালের মাছ বড় ঝুড়িতে ছটফটায়। দেখে মনে হবে কেউ যেন রূপোর পাত ছুঁড়ে দিচ্ছে ঝুড়িতে। ঠং ঠং আওয়াজ নয়, কেবল জীবনের জন্য কাতর আর্তনাদ। অস্থায়ী তে-ঠেকা বাঁশের সাহায্যে টাঙ্গান হয় দাঁড়িপাল্লা। বড় বড় বাটখারাগুলো কাঠের পাল্লায় চাপান। ঝুড়ি ভর্তি মাছ চড়ান হয় তাতে। দাঁড়িপাল্লার কাঁটার দিকে তাকিয়ে থাকে পবন, মনপছন্দ মাছ পেয়ে তার বুকের ভিতরে স্ফূর্তির বান ডেকেছে। কাঁটা করা শেষ হলে দাম মিটিয়ে পবন আব দাঁড়াল না। দুটো হাট ধরতে পারলে এক ঝুড়ি মাছ ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত উড়ে যাবে। তখন—? পবন আর ভাবতে পারছিল না, তার সমস্ত শরীর আনন্দআবেগে থরথর করে কাঁপছিল।

চোরপালিয়ায় পবন যখন ঝুড়ি নামাল তখন জনাদশেক লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেই ঝুড়ির উপর। মাছ দেখার জন্য তাদের যত হুড়োহুড়ি। খবর পেয়ে মেনি এসেছে মাছ নিতে। ভিড় কমতেই সে বলল, দাদা, ঘর খরচের মাছ দে। মা বলেছে—খড়িকাহাটে যাওয়ার আগে তোকে খেয়ে যেতে।

খাওয়ার কি সময় হবে রে? তাছাড়া মাছের ঝুড়ি নিয়ে ঘর যাওয়া যাবে না। আমি ঝুপড়ি হোটেলে খেয়ে নেব, মাকে বলে দিস।

আমি বলতে পারব না, তুই বলগে যা। পাত্তা না পেয়ে মেনির গাল ফুলে উঠল অভিমানে।

পবন বুঝিয়ে বলল, নোনা মাছ সড়ে গেলে পুরা টাকা আমার ভেসে যাবে। খড়িকাহাট তো টুকে পথ নয়, অনেকটা। তুই যা, আমি এবার সেরদাঁড়ি গোছাব। এখানে যা হবার বিক্রি হল, এখানে আর হবে না।

মেনি ফিরে যাবার পর মত বদল করল পবন। খড়িকাহাট অনেক পথ। আকাশেব যা রঙ তাতে যে কোন সময় ঢালবে হড়হড়িয়ে। দু-একটা বৃষ্টির ফোঁটা তার গায়ে পড়তেই চমকে উঠল সে। মাছের ঝুড়িটার দিকে তাকিয়ে তার বুক ভেঙে যাওয়ার যোগাড়। আধা ঝুড়ি মাছ লোকের হাতে হাতে তুলে না দিলে লাভের গুড় সব পিঁপড়েয় খাবে। এতক্ষণের মেহনত মাটি হবে। ভাল করে আকাশ দেখে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলল সে। আর খড়িকাহাট যাওয়া নয়, মাছগুলো সে মোহনপুরের হাটে বেচবে। সাইকেল ছুটছিল হাওয়ার গতিতে। বেলা থাকতে হাট ধরলে তার আর কোন চিন্তা থাকবে না। মাছগুলো বিক্রি করে স্বস্তির শ্বাস ফেলবে সে। তার আগে আর কোথাও থামা নয়। শ্রাবণের আকাশকে সে বিশ্বাস করলেও এই নিম্নচাপের আকাশকে তার কোন বিশ্বাস নেই। এই আর্দ্র আকাশ যে কোন সময় ভিজিয়ে ন্যাতা করে দিতে পারে তার সতেজ স্বপ্ন। তখন এই জুবুথুবু শীতে সে দাঁড়াবে কোথায়? পায়ের তলায় মাটি না থাকলে মানুষের কোন জোর নেই। সুভদ্রা-হৈমবুড়ি তাকে ধরেই তো বাঁচতে চায়। তাদের আশার গাছটা ন্যাড়া হয়ে যাক—পবন তা চায় না। তাই সাইকেলের প্যাডেল ঘোরে বনবন। অসমতল পিচ সড়কে ঘর্ষণ ওঠে চাকার। পেছনে ভার, সাইকেল লাফায় না শুধু টাল খেয়ে যায় বুনো বাতাস

লাগা শিমলতার মতো। শক্ত হাত দুটো আঁকড়ে ধরে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল, বাতাস এলোমেলো করে দেয় চুল, ফাঁকা মাঠের দিকে তাকিয়ে কোনমতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পবন। মোহনপুরের হাট তার কাছে অপরিচিত নয়, ওখানকার মানুষজন প্রায়ই সব তার চেনা, তাছাড়া জ্ঞাতি কুটুমের ছড়াছড়ি সেখানে। হাটে একবার মাছের ঝুড়ি নামাতে পারলেই হলো, তারপর বাকি কাজ তার জ্ঞাতিভাইরাই করে দেবে। মেনি দুঃখ পেয়ে চলে গেল, ওর শুকনো মুখটা পবন কিছুতেই ভুলতে পারছে না। চোরপালিয়া থেকে ঘরে সে একবার যেতে পারত কিন্তু তাতে সময় ক্ষয় হোত, পেটে দানাপানি পড়ত অথচ কাজের কাজ কিছু হোত না। সমুদ্রমাছ একবার ঘামতে শুরু করলে পচন ধরতে বেশী সময় লাগবে না। আকাশের যা অবস্থা তাতে গুমোট ভাব চারিদিকে, যে কোন সময় বাতাস উড়িয়ে আনবে বৃষ্টির রেণুকণা এবং ভিজিয়ে দেবে পবনকে। বরষায় ভিজতে পবনের কোন আপত্তি নেই কিন্তু সে তার ভাগ্যদেবতাকে বৃষ্টিতে অথর্ব করে দিতে নারাজ।

মোহনপুর হাটে পবন যখন মাছের ঝাড় নামাল তখন হাট জমে উঠেছে। শীতের হাটের বৈচিত্র আলাদা, পুরো খেতি-বাড়ি যেন সবুজের ডালি নিয়ে জুড়ে বসে হাটে। এসময় মানুষের মেজাজও ভিন্ন ধরনের, সোনালী ধানের ওম তাদের শরীর ঘিরে থাকে, সেই সঙ্গে অর্থবল বাড়িয়ে দেয় সব মানুষের মনোবল। ধান বিক্রির টাকায় ভাল-মন্দ খেয়ে মন ভরাতে চায় মানুষ।

সব হাটের মত এ হাটেও লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাছঝুড়ির চারপাশে। ঠেলাঠেলি করে বাছতে লাগল মাছ। এই ভিড় পবনের ভাল লাগে, তার ব্যবসায়ী মেজাজটা গরম হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। যে ভাবে মাছ বাছছিল হাটুরেরা তাতে সর খেয়ে দুধ ফেলে রেখে যাওয়ার মত অবস্থা। পবন আঁতকে উঠল এই দৃশ্য দেখে। বড় বড় মাছগুলো সব বেছে নিলে ছোটগুলোর কী দশা হবে? ঝড়তি-পড়তি মাছ তখন হাফ দামেও কাটবে না। পবন ঝোলা থেকে চিকচিকি কাগজ নামিয়ে সেরদাঁড়ি বাটখারা নামিয়ে রাখল তার উপর। চিকচিকি কাগজটা বিছিয়ে জল ছিটাল, তারপর মাছের ঝুড়িটা ঢেলে দিল উবুড় করে। বিনীত ভাবে বলল, বাবু, আমি গরীব মানুষ, দু-পয়সা লাভের জন্য এতদূর ছুটে এসেছি। দয়া করে ওভাবে মাছগুলো ঘাটবেন না। এ তো মিঠে জলের মাছ নয়, বেশী চটকালে আঁশ উঠে মাছগুলো সব গলে যাবে—

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলল, না বাছলে মাছ নেবো কী করে?

পবন ঢোক গিলে বলল, বাছা মাছের দাম আলাদা।

তার মানে? লাল চোখ করে সামনে দাঁড়াল হোমড়া চোমড়া গোছের গোঁফওলা এক মানুষ, তার হাতের মুঠোয় সাত-আটটা রূপাপাটিয়া মাছ। মাছগুলো সে নিতে চায়। দাঁড়িপাল্লার একপ্রান্তে মাছগুলো নামিয়ে রেখে বেশ মেজাজী কণ্ঠে সে বলল, ওজন কর।

ওগুলো পনের করে লাগবে।

পনের করে নোনামাছ? এ কী মগের মুলুক পেলে নাকি?

বাছা মাছের দাম পনের টাকাই লাগবে।

না পনের নয়, আমরা দশ করে দেব।

দশ টাকায় আমার কেনা নেই।

চালাকি ছাড়। আমরা কি জানি না যে নোনামাছের কত দাম? সেই মেজাজী লোকটা পবনের দিকে রক্তবর্ণ চোখ তুলে তাকাল, পনের টাকা করে এ মাছ এ হাটে কেউ নেবে না। দিতে হলে দশে দাও। তোমার সব মাছ বিক্রি হয়ে যাবে। তাছাড়া আকাশের অবস্থা ভাল নয়। জেদ ধরে থাকলে তোমার মাছ ঝুড়িতে পচবে। তখন কিন্তু তোমাকে কপাল চাপড়াতে হবে।

তা বলে লোকসান দিয়ে আমি বেচতে পারি না। আজ তালসারিতে মাছের দাম ছিল চড়া। কথা বলতে গিয়ে গলাটা খসখসিয়ে উঠল পবনের। মাতব্বর গোছের লোকটি গলায় ভাল করে মাফলারটা

জড়িয়ে নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে বলল, এ হাটে মাছ বেচতে গেলে তোমাকে দশ টাকাতেই বেচতে হবে। তা যদি না পার তাহলে মাছ নিয়ে ঘরে চলে যাও।

ঘরে কেন যাব? মাছ বেচেই তবে যাব। পবনকে উত্তেজিত দেখাল কিছুটা। গোলমালটা জমে উঠছিল ধীরে ধীরে। আকাশের অবস্থা গোমরামুখো মেয়ের মত। পবন বোকার মত দেখছিল চারপাশ। এক ধরনের বিপন্নতা গ্রাস করছিল তাকে। সে ভেবেই নিয়েছিল এ হাটে আর মাছ বিক্রি করবে না তাতে যত ক্ষতি হয় হোক। চিকচিকি কাগজ গুটিয়ে পবন যখন ফিরে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল তখন দীননাথ এসে হাজির হল তার সামনে। সে এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল কথাবার্তা। পবনের পক্ষ নিয়ে সে বলল, পবন কোথাও যাবে না, ও এখানেই মাছ বেচবে। ওর মাছ ও যে দামে পরতা হবে সেই দামে বেচবে। এতে কার কী বলার আছে? দীননাথের কথায় ভরসা পেল পবন। কিন্তু মাতব্বর গোছের লোকটিও ছাড়বার পাত্র নয়, সে ভিড়ের দিকে মুখ করে বলল, তা বলে যা খুশি তাই দাম দেওয়া যায় না। আপনারা সব কী বলেন।

চুপ করে থাকে জনতা। দীননাথের সঙ্গে কাঁধ মেলায় গ্রামের চৌকিদার, সে উবু হয়ে মাছ বেছে নেয় কিলোখানিক, তারপর পবনকে বলল, ওজন কর ভাই। তবে পনের করে পারব না, বার করেই দেব। এতে তোমার লস হবে না, ফি কিলো দু-টাকা লাভ হবে।

পবন ভাবল কিলো প্রতি দু-টাকা লাভ মন্দ কী। ঝটপট মাছগুলো বিক্রি করে তাকে আবা‍র গ্রামে ফিরতে হবে। সুভদ্রা হাট থেকে সরাসরি ঘরে ফিরতে বলে দিয়েছে। রাত হলে চিন্তা করবে মা। হৈমবুড়ি বারবার করে শুধোবে, হ্যাঁরে, পবনাটা ফিরল? মেনি সে না যাওয়া পর্যন্ত ভাত খাবে না। বার বার ঘরের বাইরে এসে চেয়ে থাকবে পাকা সড়কের দিকে। সুভদ্রা তুষ ফেলে দেবে চুলায়, সেই তুষের আগুনে হাত সেঁকে ঘুম তাড়াবে সে।

পবনের হাতে দাঁড়িপাল্লা। মাতব্বরের মুখে চুন। মুখ চুপসে দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। দীননাথ পয়সা নিচ্ছিল হিসেব করে। জ্ঞাতিতে সে পবনের কাকা হয়। যেদিন আপদে-বিপদে পবন ঘর না যেতে পারে সেদিন দীনাথের ঘরে সে থেকে যায়। আজ যদি বৃষ্টি ঝরে ঝমঝমিয়ে তাহলে তার আর ঘরে ফেরা হবে না। তাছাড়া রাত বাড়লে টাকা-পয়সা নিয়ে যাওয়া অনেক ঝুঁকির। আসল মার খেয়ে গেলে তার শিরদাঁড়া ভেঙে যাবে। পবন চাইছিল চটজলদি মাছগুলো সব বিকিয়ে যাক। মোহনপুর হাটে অন্যদিনের তুলনায় মাছের আমদানী কম ছিল। যা ছিল মিঠে জলের মাছ। সমুদ্রমাছ নিয়ে কেউ আসেনি এ হাটে। ফলে পবনের পোয়াবার। আধাঝুড়ি মাছ বিক্রি হতে ঘণ্টা দেড়েক সময় নেয়। দীননাথ টাকাগুলো গুছিয়ে রাখছিল হিসাব করে। খুচরো পয়সা একটা পলিথিনে মুড়ে সে পবনের দিকে এগিয়ে দিল, এগুলো তুমি ঝোলার মধ্যে ভরে নাও। টাকাগুলো ভিজে গিয়েছে, ঘর চলো, ওগুলো আমি শুকিয়ে দেব।

পবন কিলোখানিক মাছ শালপাতায় মুড়িয়ে দীননাথের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, আজ আর তোমাদের ওখানে যাব না কাকা। ঘর না ফিরলে মা খুব চিন্তা করবে। সেই কোন সকালে ঘর ছেড়েছি। এখন ঘরে ফিরে আয়েস করে আমি একটু ঘুমাতে চাই। কাল আবার দীঘায় যেতে হবে।

দীননাথ মাছগুলো নিতে কুণ্ঠাবোধ করছিল, পবন খুব স্বাভাবিক ভাবে বলল, নাও কাকা, এগুলো আমি খুশী হয়ে তোমাকে দিচ্ছি। তুমি আজ যা আমার উপকার করলে তা এই সামান্য মাছ দিয়ে শোধ করা যায় না। তুমি না থাকলে আমি হয়ত সব মাছ নিয়ে ঘরে ফিরতাম। দীননাথ উৎসাহিত হল তার কথায়, আমি আর কী করলাম। এটুকু না করলে মানুষ যে আর মানুষ থাকে না। তবে ভাইপো, তোমাকে একটা কথা বলি। সময়টা খুব খারাপ পড়েছে। এখন হাট কেন সর্বত্র এমন চোখরাঙানী। তবে ডরলে চলবে না। ওদের ঐ চোখ দুটোই আছে। গায়ে কোন তাগত নেই।

সঙ্গে নেমে আসছিল মোহনপুরের হাটের উপর। চা-দোকানে দীননাথের সঙ্গে পাশাপাশি বসে ঘুঘনি আর পাউরুটি খেল পবন। শেষে চা খেয়ে পবন বলল, এবার আমি তাহলে যাই কাকা।

হ্যাঁ যাবেই তো। আমি তো তোমাকে ধরে রাখতে পারব না।

পবন তীক্ষ্ণ চোখে দীননাথের দিকে তাকাল, আমি পরে একদিন থাকব। আজ আর সম্ভব হবে না।

সে আমি বুঝতে পারছি ভাইপো। চলো তোমাকে একটু এগিয়ে দিই।

আমি চলে যেতে পারব।

সে আমি জানি। কিন্তু...। দীননাথের কথা আটকে গেল, সময়টা বড় খারাপ পড়েছে। চলো চলো আর দেরী করা ঠিক হবে না।

চা-দোকান থেকে একটা সাইকেল চেয়ে নিল দীননাথ। তার এই ভাবভঙ্গি দেখে মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল পবন। মাঝ বয়েসী এই মানুষটা তাকে কি একদম শিশু মনে করেছে? কিন্তু মুখ ফুটিয়ে সে কিছু বলতে পারে না। দীননাথ পাশপাশি সাইকেল চালাতে চালাতে বলল, তোমার বাবার কোন খবর পেলে? বড় আজব মানুষ সহদেব। ছোটবেলা থেকে তাকে আমি চিনি। সে হলো গিয়ে গাঙের ছাড়া জল, বনের উড়ো পাখি। তবে তোমার মা যদি একটু চেষ্টা করত তাহলে হয়ত আটকে রাখতে পারত।

মা'র নামে দোষ দিও না, তার কোন দোষ নেই।

আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না। দীননাথের সাইকেলের গতি কমে এল, আমি বলছিলাম মেয়েমানুষ পারে না হেন কাজ নেই সংসারে। তোমার মা যদি একটু চালাক-চতুর হোত তাহলে সে ঠিক পারত তাকে আটকে রাখতে। আচ্ছা বল তো একটা পুরুষ মানুষ কখন ঘরছাড়া হয়? যখন ঘরের উপর তার কোন টান থাকে না তখন। ঘরের উপর মানুষের কখন টান থাকে?

পবন ভ্যাল ভ্যাল করে দীননাথের মুখের দিকে তাকাল। এই আপাত নিরীহ মানুষটাকে কথা বলার ভূতে পেয়েছে। পবন গলায় বিতৃষ্ণা ফুটিয়ে বলল, এবার তুমি চলে যাও কাকা, আমি ঠিক চলে যেতে পারব।

কেন আমার কথাগুলো কি তোমার খুব বাজে লাগছে।

না, ঠিক তা নয়। তবে মায়ের নিন্দা আমি কারোর মুখ থেকে শুনতে ভালবাসিনে। আমি জানি আমার মা কী রকম।

তোমার মা অবিকল নোনাজলের মাছের মতন।

পবনের মুখ লাল হয়ে উঠল কথা শুনে। কিছুটা এসেই অন্ধকার আরো গাঢ় হতেই দীননাথ বলল, এখানে একটু জোরে চালাও। জায়গাটা ভাল নয়।

আমার কাছে সব জায়গাই একই রকম।

তা হয় না পবন। তোমার এখন বুদ্ধি কম। এ দুনিয়ার হালচাল তুমি এখনও ঠিকঠাক শেখোনি। একটা পাকা গাছের সাথে চারাগাছের যা তফাৎ তোমার সাথে আমার ঠিক ততখানি তফাৎ। দীননাথ এইটুকু বলে থামল, তারপর চারপাশ দেখে নিয়ে বলল, মাছহাটার সেই মাতব্বর ছেলেটা কিন্তু ভাল নয়। ওর সাথে কাজিয়া করে ভিন গাঁয়ের কোন ব্যাপারী জিততে পারেনি। হাটে ও হার মেনে নিলেও হাটের বাইরে ও কিন্তু রাজা।

কী করবে সে? পবনের চোখ জ্বলে উঠল নিমেষে।

গেল হাটে সে একজনের টাকা কেড়ে নিয়েছিল ঠিক এখানে। আজ ভাল করে দেখ, তাকে তুমি দেখতে পাবে।

অন্ধকারে যতদূর চোখ যায় পবন প্যাটপেটিয়ে তাকাল। বাঁ পাশের ঝোপটায় জোনাকির মত জ্বলছিল সিগারেটের জ্বলন্ত মুখখানা। দীননাথ 'কে-কে' বলে গলা খেঁকারি দিয়ে উঠতেই সিগারেটের আগুনটা নিভে গেল হুস করে। অন্ধকার মাঠের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল মাতব্বর। তার চালবাজি ধরা পড়ে গেছে দীননাথের কাছে। পরিচিত মানুষের গলা পেয়ে সে আর কোন ঝুঁকি নিতে চায় না। অন্ধকার আকাশের নীচে তার ছুটে যাওয়াটা বড় বিচিত্র ধরনের। দীননাথ সাইকেল থামিয়ে বিড়ি ধরাল একটা, তারপর ভকভকিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সে হাসিমুখ করে বলল, আমি জানতাম ও ঠিক থাকবে। তাই তোমাকে একা ছাড়িনি ভাইপো। হাজার হোক তুমি আমাদের সহদেবের ছেলে। তোমার কিছু ক্ষতি হয়ে যাওয়া মানে আমার নিজের ক্ষতি হয়ে যাওয়া।

আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম কাকা। বিড়বিড়িয়ে উঠল পবন, তুমি না থাকলে আমার সব চলে যেত।

দীননাথ পবনের কাঁধটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, আগুন ছুঁলে হাত পোড়ে এটা আমি জানি। হাটে যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সে তো একটা আগুনের হল্‌কা ছাড়া কিছু নয়। কি করবে বলো—চাকরি-বাকরি নেই, সুযোগ পেলে এর ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। তবে এবার তুমি নির্ভয়ে যেতে পার। আমি ক্ষ্যাপা বাঘটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

দীননাথ চলে যাওয়ার পর ঘাম দিয়ে জ্বল ছাড়ল পবনের। সন্ধের পরে ফাঁকা হয়ে যায় এদিকের পথঘাট। খোলা হাওয়া পাগলের মত ছুটে যায় এদিক সেদিক। হাওয়ার শিস কানে বড় বিঁধে। নির্জন পথে পবনের সাইকেল চলছিল শনশনিয়ে। ঝড়ের আর এক রূপ বুঝি সে নিজে। ঘর ধরতেই বিষণ্ণ চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মুখ দেখল তার। সুভদ্রার কাছে টাকার থলিটা এগিয়ে দিয়ে পবন বলল, মা, একটু সরষের তেল দাও, আমি স্নান করে আসি।

এই এত রাতে আবার নাইবি? তার চেয়ে বরং হাতমুখ ধুয়ে আয়।

মেনি দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। পবন ওর দিকে তাকাতেই চোখ নামিয়ে নিল অভিমানে। সকালের কথাগুলোয় সে বড় আহত হয়েছে মনে মনে। সে ভাবেনি পবন তার সাথে অমন দুর্ব্যবহার করবে। তেল মেখে গামছা হাতে নিয়ে পবন যখন পুকুরপাড়ে এল তখন বাধ্য মেয়ের মত হ্যারিকেন হাতে আগে আগে এল মেনি। পবন ঘুরে দাঁড়িয়ে তার গাল টিপে দিতেই মেনি দু-পা সরে নাক কুঁচকে বলল, ইস, তোর গায়ে শুধু মাছের গন্ধ। তারপর পবনের চোখে চোখ ফেলে বলল, জানিস দাদা, আজ না বাবার চিঠি এসেছে। বাবা ঘর আসবে। মেনি হাসি দিয়ে ঢাকতে চাইল বুকের ভাঙন।

পনেরো

ভ্যান রিকশয় পাশাপাশি উল্টান বালিগড়। পাগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল হরিয়া। নোনাজলের জীব, গায়ে তাগদ রাখে বহুৎ। সোজা করে দিলে হরিয়া কেন মহাজনও পেরে উঠবে না ওদের সাথে। জল দেখলে জীবগুলো সব লুলিয়ে ওঠে, তখন দড়ি ছেঁড়ার হাজার রকমের চেষ্টা। তালসারির ডুংরু মহাজন বলেছিল, মাল সাবধানে নিয়ে যেও। পথ ঘাট বিপদে ভরা। পুলিশ ওৎ পেতে আছে মাল খিঁচার জন্য। ঝাউবনটা সাবধানে যেও। বর্ডার পেরলে তোমার আর কোন চিন্তা নেই। হাত দশেক দূরে উত্তাল সমুদ্র। ভেজা বালিতে বুঁজকুড়ি কাটে কাঁকড়া। হাঁটতে গেলে পা দেবে যায় বালিতে। শীতভাবটা পায়ের তেলো ছুঁয়ে বুকের উপর ঘা মারে। বেশ বুঝতে পারে হরিয়া—এটা ভয়ের ঢল, ভয়ের ধস। সমুদ্র কিনারে কি কথায় ঘূর্ণি ওঠে। টুকরো শব্দ বারবার করে ঘুরতে থাকে লাট খাওয়া

ঘুড়ির মত। কে যেন খবরের কাগজ পড়ে বলেছিল, সমুদ্র কাছিম অর্থাৎ বালিগড় ধরা চলবে না। ওগুলো বিরল প্রজাতির জীব। ধরা-মারা দুটোই এখন নিষেধ।

কথা এইটুকু। কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট হরিয়ার বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিতে। ভয়ে ভয়ে সে সমুদ্রে এসেছিল খোঁজ খবর নিতে। ডুংরু মহাজন চুরুক দাড়িতে হাত বুলিয়ে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, ক'দিন যেতে দাও। তারপর দেখবা সব ঠিক হয়ে গেছে। আইন যেমন আছে, তার ফাঁক ফোঁকরও আছে। তবে, টাটকা টাটকি কিছু হবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। লোক ফিট করে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব আমি।

কথা রেখেছে ডুংরু মহাজন। সমুদ্র কাছিম গভীর জলের জীব। এই শীতের সময় ওরা রোদ পোহাতে নির্জন বালিচড়ায় কিংবা দ্বীপের উপর উঠে আসে। তখন ছুটে গিয়ে উল্টে দিলেই হল। তা না হলে কাছিম ধরার জাল তো আছেই। জলের রং দেখে যারা জাল ফেলে সমুদ্রে তাদের কথা আলাদা। তারা জল দেখেই বলে দেবে কোথায় আছে কাছিমের ঘর সংসার। সেখানে দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেই হলো। ডুংরু মহাজনের সতর্ক অভিযান কোনদিনও বৃথা যায়নি। মাছ ধরার নৌকায় মাছ না এনে সে ভরে এনেছে বালিগড়। সেগুলো পাহারা দেবার জন্য নিজেই খুঁচনি লাঠি হাতে রাতভর ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল সে। ওগুলো তখন তার কাছে মামুলি সমুদ্র কাছিম নয়, টাকার বাণ্ডিল। বালিয়াড়িতে একবার নৌকো টেনে তুলতে পারলেই হলো। তখন ধেয়ে আসা পুলিশগুলো তল্লাসী নেবে নৌকোয়। তাদেরকে পয়সা খাওয়ালেও বশ মানে না। তারা বড় বজ্জাৎ প্রকৃতির। ডুংরু মহাজন তাই চুরুক দাড়িতে হাত বুলিয়ে নৌকা দাঁড় করিয়েছে ঝাউবন ছাড়িয়ে আরো মাইল তিনেক দূরে। সেখানে কেয়াবনের ঝাড়। বড় বড় কেয়াগাছগুলো ধার পাতা নিয়ে সমুদ্ররক্ষকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে। ওখানে একবার যুবতীর লাশ পেয়েছিল থানার পুলিশ। শকুন উড়ছিল সেই লাশকে ঘিরে। কারা যেন কাঠ কাটতে এসে দেখেছিল লাশটা। তারপর খবর দিয়েছিল থানায়। তারা যদি খবর না দিত তাহলে পুরো দেহটাই হয়ত খুবলে খেত শকুনে। এমনি নির্জনতায় ডুংরু মহাজনের উদ্দেশ্য সাধন হয়ে যাবে।

হরিয়াকে ডাকতে ঘরে এসেছিল মহাজনের লোক। তড়িঘড়ি গলায় বলেছিল, মহাজন ডেকে পাঠিয়েছে। দেরী করা চলবে না। মাল রেডি আছে। তুমি যত চাও, তত পাবে। মহাজন চায় না শহর এলাকায় এ মাল বিক্রি হোক। তাতে ধরা পড়ে যাবার ভয়। এখন যা কড়াকড়ি চলছে তাতে মাল কলকাতাতেও পাঠান চলবে না। তাহলে পুরো ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।

মহাজনের লোক ভোরবেলায় সাথে এসেছিল হরিয়ার। ভ্যান রিকশয় পাশাপাশি বসে ওরা বিড়ি টানছিল মেজাজে। মহাজন বলে দিয়েছে বড় বড় ঝুড়ি আনতে। মাল ঝুড়িতে ভরে নিলে কারোর নজরে পড়বে না। খুব বেশী ভয় করলে তার উপর সের দশেক নোনামাছ ছড়িয়ে দিলে ঢাকা পড়ে যাবে বালিগড়ের শরীর।

ডুংরু মহাজনের দরদাম মিটিয়ে হরিয়া আর দেরী করতে চায়নি। মহাজনও ঝুঁকি নিতে চায় না। বর্ডার পার করে দিলেই সে নিশ্চিন্তে শ্বাস নিতে পারে। ভ্যান রিকশয় একটা ঝুড়ির জায়গাটুকু বাদ দিলে তিনটে বালিগড় পাশাপাশি রাখা যায়। হরিয়ার পায়ের চাপে প্যাডেল ঘুরছিল বনবনিয়ে। হাওয়া কেটে সাঁইসাঁই করে ছুটছিল ভ্যান রিকশ। মাল পানিপারুল অব্দি পৌঁছে গেলে তার আর কোন চিন্তা নেই। পানিপারুল থেকে চোরপালিয়া যেতে ভয়ের কোন কারণ নেই। ডুংরু মহাজনের নির্দেশে ভ্যান রিকশ ঝাউবনের পাশের পথটা দিয়ে ছুটছিল। এ পথে পুলিশী হুজ্জোতি কম। বালিগড় সমেত ধরা পড়লে পুরো মেহনত মাটি যাবে। ডুংরু মহাজনের সতর্ক চোখ এদিক সেদিক ঘুরছিল। তিনটে বালিগড়ের উপর আড়াইমনি বস্তা চাপান। বস্তার ভারে ওদের দম বন্ধ হবার জোগাড়। ঝুড়ির বালিগড়টা নড়ছিল খলবলিয়ে। হরিয়া পিছন ফিরে বলল, শালোদের হুজ্জোতি দেখ যেন ডাকাত পড়েছে।

ডুংরু মহাজন হাসল, জলেও তেজ, ডাঙায়ও তেজ। এমন হুজ্জোতি করলে রস গোটাতে হবে মালগুলোর। তুমি রিকশা দাঁড় করাও। আমি নুন কিনে আনি। কাঁচা নুন গায়ে ছড়িয়ে দিলে ওদের ছড়ছড়ানী কমবে।

কথা শুনে হায় হায় করে উঠল হরিয়া, এমন ভুল কাজ করো নি। মাল সব মরে কাঠ হয়ে যাবে। এত মাল আমি বেচব কেমন করে। অনেকদিন হাট করিনি। হাটের মেজাজ আমার জানা নেই।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়। ঝাউবন পেরিয়ে পাকা সড়কে উঠতেই টুপী পরা একজন পুলিশ লাঠি হাতে এগিয়ে এল সামনে। ভ্যান রিকশর হ্যাণ্ডেলে লাঠির বাড়ি মেরে বলল, কী আছে ঝুড়িতে?

আজ্ঞে, নোনামাছ।

নোনামাছ! কই দেখি?

ডুংরু মহাজন কাঁপা হাতে উঠিয়ে দিল বস্তা। পানিখিয়া আর লহরা মাছে ঠাসা ঝুড়ি। দূর থেকে দেখেই পুলিশ বলল, বস্তায় ওগুলো কী চাপা দেওয়া?

আজ্ঞে, বরফের চাঁই।

কই বস্তা উঠাও। শিকার ধরার আনন্দে গোঁফ নেচে উঠল পুলিশের। এবার ভ্যান রিকশ থেকে নেমে দাঁড়াল ডংরু মহাজন। চোখাচোখি হল হরিয়ার সাথে। হরিয়া ঢোক গিলে ইশারা করল তাকে।

ডুংরু মহাজন ক' পা এগিয়ে গিয়ে জামার পকেটে হাত দিয়ে বের করে আনল দুটো দশটাকার নোট। কোন কথা না বলে ভাঁজ করা দুটো নোট গুঁজে দিল পুলিটার হাতে, বেআইনী বরফের জন্য বিশটা টাকা রাখুন। আরো বরফের চাঁই যাবে, তখন আরো দেবো।

তুমি আমাকে ঘুষ দিতে চাইছো? আমি ঘুষখোর পুলিশ নই। তোমার টাকা তুমি পকেটে ঢুকিয়ে রাখো। বস্তার নীচে কী আছে আমাকে দেখতে দাও।

কিছু নেই স্যার, তিনটি বালিগড় আছে। হাত কচলাতে লাগল মহাজন। হরিয়া বলল, বাবুরে আর দশ টাকা দিয়ে দাও। ফি-বালিগড় দশ টাকা করে মোট ত্রিশ টাকা।

সমুদ্রে কাছিম ধরা মানা। এটা কি তোমরা জান না?

জানি স্যার। তবে আমরা নিরুপায়। বালিগড়গুলো ডাঙ্গায় উঠে মরে গেল। নোনাজলে যে ছেড়ে দেব সে উপায় নেই। মরা জীব জল পচিয়ে ছাড়বে। তাই ওগুলো আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি হাটে। যা দু-চার টাকা পাওয়া যায়। ডুংরু মহাজনের কথা শুনে শুকনো মুখে হাসল পুলিশটা, তারপর নরম গলায় বলল, সমুদ্রকাছিমের মাংস আমি নিজেও খেয়েছি, খুব সুস্বাদু। আগে তো প্রতি হাটে পাওয়া যেত। এখন আইন হবার পর আর পাওয়া যায় না। ঠিক আছে এবার তোমরা যেতে পার। তবে আর যেন কোন দিন না দেখি। দেখলে সেদিন কিন্তু শ্রীঘর দেখিয়ে ছাড়ব। রুলটায় হাত বুলিয়ে আদর করছিল পুলিশটা। মাত্র ত্রিশ টাকায় রফা, এতে তার মন গলেনি। ঘরে পুষ্যি অনেক। হাজার সমস্যা। প্রায় মাসেই নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। মাছ মাংস, ভাল মন্দ খাওয়া জোটে না। সমুদ্রকাছিমের শরীর দেখে তার জিভে জল আসে। লোভ সামলাতে পারে না সে। কাছে সরে এসে নীচু গলায় বলল, চারটে মালের সবচেয়ে ছোট যেটা সেটা আমায় দিয়ে দাও। আমি রিকশ ডেকে ঘরে নিয়ে যাই।

মাথায় হাত দিয়ে পুলিশটার পায়ের কাছে বসে পড়ল হরিয়া। ডুংরু মহাজনেরও মাথায় হাত। একটা মাল চোট গেলে অনেক টাকার ধাক্কা। পুরো রাত জাগার ফলটাই মাটি হবে। পকেটের ক্যাপস্টেন সিগারেট বাইরে এল, তাতে অগ্নি সংযোগ করে ডুংরু মহাজন আপোষের সঙ্গে বলল, মরা মালে স্বাদ পাবেন না স্যার। এসব গরীব গুবরোরা খায়। খেয়ে পেট ছেড়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। কেউ কেউ আবার পটল তোলে। সেবার দেখলেন না দশজন কেমন মারা গেল ট্যাপা মাছ খেয়ে। আপনার ক্ষতি

হোক আমি চাইনা স্যার। তাই বলছি কী—বালিগড় না নিয়ে আপনি সের দুয়েক নোনামাছ নিয়ে যান। এই ভোরে ধরা। এখনও টাটকা আছে।

বিনেপয়সায় খোলামকুঁচিও ছাড়ে না কেউ, এ তো নোনা মাছ। দূরের দোকান থেকে প্লাস্টিক আনল হরিয়া। আন্দাজমত প্লাস্টিক ধরে মাছ দিল ডুংরু মহাজন। প্যাকেটের বাকি সিগারেটগুলো পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, অপরাধ নেবেন নি স্যার, আমরা এবার চললাম। রোদ চড়ছে। মালে একবার পচন ধরলে আর বাঁচন নেই আমাদের। আপনি তো জানেন—সমুদ্রের মাল নোনা হাওয়ায় বেশীক্ষণ থাকে না।

ছাড়া পেয়ে কপালের ঘাম মুছল হরিয়া। মহাজন হরিয়ার কাছ থেকে বিড়ি চেয়ে ধরাল। ভলভলিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আর দেরী করো না ভাই। এবার গায়ের জোরে ভ্যান চালিয়ে চলে যাও। ফাঁড়া যা ছিল কেটে গিয়েছে। এবার হাটে গিয়ে কেটে কেটে বেচ গিয়ে বালিগড়।

হরিয়ার পায়ের কাঁপন তখনও থামেনি। চোখ থেকে মুছে যায়নি ভয়ের রেখা। তার যত সাহস মুখে কিন্তু মনে মনে সে একেবারে রোগা ক্যাকলে মাছ।

বালিগড় নিয়ে হরিয়া যখন হাড়িসাইয়ে ঢুকল তখন ঝুরি নামান বটগাছের গোড়ায় গায়ে ধুলো মেখে খেলা করছিল শিশুদের দল। ভ্যান রিকশ দেখে ওরা খেলা থামিয়ে তাকাল। হরিয়া খুশি বয়ে আনছিল ওদের জন্য। ওরা খেলা ছেড়ে ছুটে গেল রিকশর দিকে। তারপর মুখে মুখে চাউড় হয়ে গেল হরিয়ার বালিগড় আনার কথা।

সংবাদ পেয়ে সবার প্রথমে এল যুগলবুড়া। লাঠিতে ভর দিয়ে সে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বলল, তা বাপ, অনেকদিন পরে তুই আবার এ ধান্দায় গেলি। হরিয়া রিকশ থামিয়ে দম নিচ্ছিল, এতক্ষণ সে তাড়া খাওয়া শেয়ালের মত ছুটিয়ে এনেছে ভ্যান রিকশ। পাকা সড়কে যে কোন সময় বিপদ আসতে পারে। পুলিশের জিপের সাথে দেখা হলে আর কথাই ছিল না। তখন মালও যেত, সেও ঢুকত হাজতে। ঘরের উঠোনে পা দিয়ে হরিয়ার সেই বুকচাপা ভয় মেলাল না। যুগলবুড়া লাঠি আঁকড়ে পেছন থেবড়ে ধুলোর উপর বসল। হরিয়া চাকু দিয়ে কাটছিল বালিগড়ের বাঁধন। তার হাত কাঁপছিল। ঝুড়ি নামানোর সময় তার বউ মালতী এসে সাথ দিল। বলিগড় দেখে মালতীর চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক। অনেকদিন পরে তার ঘরের মানুষটা কাজের কাজ করেছে। পাড়ায় থাকলে মন-মেজাজ ঠিক থাকে না। তাড়ির ঠেকে বসে থাকে ঝিম ধরে। নয়ত ধর্মাবাবুর দালালী করে। মালতীর এসব পছন্দ নয়। সে চায়—তার ঘরের মানুষটা মেহনত দিক দিনভর। কামিয়ে আনুক টাকা। জমি-জিরেত আছে বলে কেন 'কুঁড়িয়া' হয়ে বসে থাকবে লোকটা। সংসার তো ছোট নেই, দিন দিন বাড়ছে।

বালিগড়ের ঝুড়িটা উঠোনে নামিয়ে একটা বিড়ি ধরাল হরিয়া। তারপর মালতীকে বলল, খোঁটা আর রশা দে। বালিগড়গুলো বেঁধে রাখব পুকুরে। রয়ে সয়ে বেচলে দাম পাব, নাহলে কাজের কাজ কিছু হবে না।

মালতী আনন্দে লাফাতে-লাফাতে চলে গেল দড়ি আনতে। তার এ ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। তার বাবাও তো বালিগড়ের ব্যবসা করেছে শেষ দিন পর্যন্ত। দাদাগুলো এ ব্যবসা করল না। ওরা পূজা পার্বণে ঢোল বাজায়। পালকি নিয়ে যায়।

যুগলবুড়া বসে বসে ভাবছিল একটা বিড়ি পেলে সে-ও মনের সুখে টানতে পারে। কিন্তু হরিয়াটার চোখে পাতা নেই। ও বড় নির্লজ্জ। হরিয়া যখন বিড়ি দিল না, তখন যুগলবুড়া হাতের আঙুল খুঁটে বলল, বাপরে, বিড়ি থাকে তো এট্টা দে দেখি।

একটা বিড়ির কী-ই বা দাম, তবু বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে উঠল হরিয়ার। যুগলবুড়ার ভিখারী চোখের দিকে তাকিয়ে সে একটা বিড়ি ছুঁড়ে দিল অবজ্ঞা ভরে। বিড়িটা ধুলো থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যুগলবুড়া রগড় করে বলল, বাপরে, ঘোড়া দিলি আর চাবুক দিলি না। দে, ম্যাচিসটা দে। বিড়িটা ধরাই।

হাতেপায়ে কুষ্ঠ, হরিয়ার গা ঘ্যানঘেনিয়ে ওঠে যুগলবুড়ার ঘেয়ো শরীরটার দিকে তাকিয়ে। ঐ হাত দুটো দিয়ে ম্যাচিসটা ধরবে—এটা ভাবতে গিয়ে শিউরে ওঠে সে। দেশলাই সে দিল না, বিরক্তি পুষে নিয়ে সরে এল সে যুগলবুড়ার কাছে। কাঠি জ্বেলে যুগলবুড়াকে বলল, নাও ধরাও।

যুগলবুড়া মুখ বাড়িয়ে দিল সামনে, তার খসখসে দুই ঠোঁটের মাঝখানে বিড়িটা ধরা। হাওয়ায় দেশলাই কাঠিটা নিভে যেতেই আবার বিরক্ত হল হরিয়া। কপাল কুঁচকে বলল, নেশা কর যখন তখন সাথে ম্যাচিস রাখলেই পার।

মনক্ষুণ্ণ হল যুগলবুড়া, তবু চুপ করে থাকল। হরিয়াকে আজ চটিয়ে দিলে চলবে না। বালিগড় কাটা হলে দু-চার টুকরা সে পাবেই পাবে। অতএব বোবার শত্রু নেই। দ্বিতীয় খেপে বিড়ি ধরে পোড়া গন্ধ উঠল তামাকের। যুগলবুড়ার দু-চোখে ফুটে উঠল আনন্দরেখা। হুসহাস বিড়িতে টান দিয়ে সে বলল, তা বাপ, এখন মালের দাম কেমন চলছে। এখন তো সব কিছুই আগুন। মন করলে খাসী মান্‌সো আর খাওয়া যাবে না।

বালিগড়টা সোজা করে দিয়ে হরিয়া আবার তাকাল, বিরক্তিতে বেঁকেচুরে গেল মুখ, তুমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজে তোমার কী দরকার। যাও তো ঘর যাও। আমার মাথাটা খারাপ করে দিও না। আমি বলে নিজের জ্বালায় জ্বলছি।

তোর আবার কীসের জ্বালা। তোর মত সুখী মানুষ কে আছে এই হাড়িসাইয়ে। তোর আরো উন্নতি হোক আমি এটা চাই। তোর বাপ দ্বিজপদ ছিল মাটির মানুষ। আমাকে দাদা-দাদা কবত সবসময়। তার ছেলে তুই। তার আশীব্বাদে তোর কুনো দিন অসুবিধা হবে না। এসব তোয়াজ কবা কথা। হরিয়ার বুঝতে বাকি থাকে না। তবু চুপ করে থাকে সে। ব্রজবুড়া মারা যাওয়ার পর এই যুগলবুড়াই তো গাঁয়ের মুরুব্বি। কড়া কথা বলতে বিবেকে বাধে। আবার ভাল কথা বলেও এই মানুষটাকে সামনে বসিয়ে রাখা যায় না। চোখের সামনে থেকে এই মানুষটা সরে গেলেই বুঝি ভাল। কিন্তু যুগলবুড়াব সরার কোন লক্ষণ নেই। সে ধুলোতে পেছন থেবড়ে বসে হা করে দেখছে বালিগড়গুলোর নড়াচড়া। শিশুর আনন্দ তার চোখে-মুখে। বিড়িটা টানতে টানতে সুতোর কাছাকাছি এসে যায়। ছ্যাঁকা খেয়ে চমক ভাঙে তার। হরিয়া তখন পায়ে দড়ি বেঁধে বালিগড় দুটোকে নিয়ে যাচ্ছে পুকুবঘাটে। তার পেছনে পাড়ার সব কাচ্চা-বাচ্চা। মেনিও বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দেখছে সেই আজব দৃশ্য। মনে মনে ভাবছে—তার দাদা কেন অমন একটা বালিগড় সমুদ্র থেকে আনে না। এ পাড়ায় যাদের বালিগড় ব্যবসা—তারা নাকি খুব বড়লোক। মেনির চোখ দুটো সজল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। এক নিগূঢ় অভিমানের বাষ্প ক্রমশ ছেয়ে ধরছে তার চোখ। তার ইচ্ছে করে হরিয়াদের পুকুরয়াড়িতে যেতে। ওখান থেকে সে দেখবে কী ভাবে জলে পড়ে সাঁতরে চলে যাচ্ছে বালিগড়। কিন্তু কী ভেবে সে আর যায় না। তার মা বলেছে—হরিয়াদের সাথে তাদের সম্পর্ক ভাল নয়। যাদের সাথে ভাল সম্পর্ক নেই, তাদের উঠোনে কী ভাবে যাওয়া যায়।

পুকুরয়াড়ির নরম মাটিতে হাতখানিক লম্বা খুঁটি পুঁতে দেয় হরিয়া। বড় বালিগড়টার ঠ্যাং জুৎ-সই বেঁধে জলে ছেড়ে দেয় সে। বালিগড় প্রথমে ভেসে ওঠে জলের উপর তারপর নিশ্চিত আশ্রয়ের খোঁজে শরীর ডুবিয়ে দিল জলের গভীরে। এইভাবে আরো দুটো বালিগড় খোঁটায় বেঁধে জলে ছেড়ে দিল হরিয়া। যুগলবুড়া অস্থির চোখে দেখছিল হরিয়ার কাজ-কারবার। সে ভেবেছিল হয়ত সব কটা

বালিগড়ই জলে ছেড়ে দেবে হরিয়া। জল হয়ে যাবে তার মাংস খাওয়ার আশা। কিন্তু হরিয়া তা করল না। বৌয়ের সাথে কীসব নিগূঢ় আলোচনা সেরে সে সোজা উঠে এল দাওয়ায়। ছোট আকারের বালিগড়টা পড়ে থাকল উঠোনে। দুটো কুকুর ছুঁকছুকান চোখে দেখছিল বালিগড়ের মৃতবৎ দশা। লোকজন না থাকলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে এমন মনোভাব। হরিয়া লাঠি নিয়ে তেড়ে যেতেই কুকুর দুটো আর দাঁড়াল না, লেজ গুটিয়ে দৌড় লাগল সড়কমুখো।

খড়্গাদার পাশে কঞ্চির বেড়া। যদিও পুরনো কঞ্চি, এক বর্ষা খেয়ে তার রঙ বদল হয়েছে তবু তার মলিনতা ঢেকে দিয়েছে সবুজ সিমলতা। থোকা থোকা সিম ধরেছে গাছটায়। হালকা বেগুনে রঙের ফুলের উপর রোদ এসে পড়েছে, সেই উজ্জ্বল রোদে চারিদিক বড় মধুময়। হরিয়া বালিগড়টা উঠিয়ে নিয়ে সোজা চলে গেল বটতলায়। ওখানে নিকোন উঠোনের চেয়েও পরিষ্কার ধবধবে মাটি। হাড়িসাইয়ের কোন ভাল-মন্দ কাজ কারবার বটতলাতেই হয়ে থাকে। নিজের উঠোনে হরিয়া রক্তপাত ঘটাতে চায় না। ওর বউ মালতী দোরে দোরে গিয়ে খবর দিয়ে এল আজ বালিগড় কাটা হবে। শুধু বালিগড় কেন শুয়োর মারার দিনেও খবর রটে যায় ঘরে ঘরে। তখন ছানাপুনাদের আনন্দ আর ধরে না। বউ-ঝিউড়িরাও কম খুশি হয় না। ওরা জিরা ধনিয়া বাটে শিল নোড়ায়, সেদিন বাটনার কষ্টটা তাদের কাছে কোন কষ্টই নয়। বরং ঠোঁটের ডগায় চুলবুল করে গানের কলি। ওরা সেদিন মিঠে তেলে চুল বেঁধে বড় করে সিঁদুর পরে ছোট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।

তেমন সুখের দিন আজ।

পিলপিল করে ছুটে আসছে প্রায় উদোম, ধুলো মাখা, নগ্ন পায়ের শিশুর জটলা। ওদের আগ্রহ ভরা চোখ। বালিগড় কাটা দেখবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মালতী একটা পুরনো ঝোলায় করে বালিগড় কাটার সাজ সরঞ্জাম দিয়ে গেল, সের দাঁড়িটাও সে আনতে ভুল করেনি। হরিয়া ধার চাকুটা শিলপাথরে শান দিয়ে গোলাকারভাবে চিরে দেয় ওলটান বালিগড়ের পেটটা। রক্তে ছয়লাপ হল পেতে রাখা পলিথিন। তালপুকুর থেকে টিনের বালতিতে জল নিয়ে এল মালতী। পাড়ার অন্য বউগুলোর তুলনায় সে আজ সব চাইতে সুখী। সে যেন আজ হাড়িসাইয়ের রাণী। তার চালচলন হাবভাব বলে দিচ্ছিল সে কথা।

বালিগড়টার পেটে গুচ্ছ আঙুরফলের মত ডিম ছিল, যার রঙ অনেকটা দিনের প্রথম সূর্যের মত। মালতী কেন আরো অনেকে হা করে তাকিয়েছিল সেদিকে। আহা, অতোগুলো ডিম সব নষ্ট হয়ে গেল। অবশেষে মালতীর মুখ ফসকে বেরিয়ে এল আর্তনাদ ধ্বনি। হরিয়া আঁতকে ওঠা চাখে তাকাল, তারপর ধাতস্থ হয়ে বলল, অতো দেখতে গেলে মানুষের তাহলে কিছু খাওয়া চলবে না। বালিগড়ের পেটে ডিম তো থাকবেই। ডিম না থাকলে অতবড় সমুদ্র যে শুনশান হয়ে যাবে। মালতী একথার কোন জবাব দিতে পারল না, নির্বাক চোখে সে শুধু তাকিয়ে থাকল ডিমগুলোর দিকে। ছলছলিয়ে উঠছিল তার চোখ।

পলিথিনের উপর পিস পিস করে মাংসগুলো কেটে রাখছিল হরিয়া। সেই সদ্যকাটা মাংসখণ্ডগুলো থরথর করে নড়ছিল। এক ধরনের বিপন্ন উষ্ণতায় ছ্যাঁকা খাচ্ছিল হরিয়া। 'জীবহত্যা মহাপাপ'— এই চিন্তা কুরে খাচ্ছিল তাকে। তবু সে নিরুপায়। জীবিকার জন্য মানুষকে কসাই হতেই হয়, এতে আর দোষ কোথায়। হরিয়ার সান্ত্বনার দেওয়াল কেঁপে উঠল ঐ খণ্ডখণ্ড শিরশিরান কাঁপন ধরান মাংসগুলোর দিকে তাকিয়ে।

যুগলবুড়া এল সবার শেষে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে, ওর হাতে একটা তোপড়ান অ্যালুমিনিয়ামের বাটি। বাটিটা হরিয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে কাঁপা গলায় বলল, দে বাপ, আমার পাওনাটা দে।

ষোল

পুরো শীতকালটা ব্যাঙাচির লেজের মত খসে পড়ছিল।

পুকুরের বালিগড়গুলো তোলপাড় তুলছিল হরিয়ার মনে। জলে বালিগড়ের জোর হাতির মতন। মুখ ধুতে এসে হরিয়া দেখছিল জল তোলপাড়। রাতেই সে ভেবে রেখেছে—এগুলো নিয়ে খড়িকাহাটে যাবে। সকালবেলায় ফেনভাত ফুটিয়ে দিয়েছে মালতী। ক'দিন আগে বাঁশবাগানে ভূতে ধরেছিল তাকে। ভীষনাথ গুণিন তার 'ভূত ছাড়ায়। দাঁতে করে জলভর্তি ঘড়াটা উঠিয়ে নিয়ে মালতী ছুটে গিয়েছিল তালগাছের গোড়া পর্যন্ত। পাশেই ছিল পুকুর, পড়ে গেলে সে আর বাঁচত না। ভাগ্য ভাল যে মালতী পড়েছিল শুকনো ডাঙায়। সে যখন মুখ থুবড়ে পড়ল, তখন তার কাপড় চোপড়ের ঠিক নেই। ভেজা শরীর, সুঠাম বুক স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল দিনের আলোয়। হাড়িসাইয়ের ছোকবাগুলো তা তারিয়ে তারিয়ে দেখছিল। ওরা ভূত দেখতে আসেনি, এসেছে যেন রূপ দেখতে। এ পাড়ায় যুগলবুড়াকে কেউ দেখতে পারে না। ওকে দেখলে অনেকের গা চুলকায়, কেউ ওকে সহ্য করতেই পারে না। সেই যুগলবুড়া না থাকতে পেরে লাঠি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল ছেলেগুলোর দিকে, যা ভাগ, এখানে কি ঠাকুব উঠেছে।

কেউ তার কথা কানে তোলেনি, সবাই নট নড়ন চড়ন। এমন হ্যাংলামী চাহুনি যুগলবুড়া বাপের জনমেও দেখেনি। সে ছেলেপুলেদের দোষ দেয় না, দোষ দেয় ঐ ভিডিও হলের মালিককে। হাতে দু-টাকা জমলেই ওরা ছোটে পানিপারুল, এগরা। ভিডিও হলের মত খোলাখুলি মজা আব কোথায় আছে। সেই মজায় মজে আছে ওরা, এ যেন সেই চিটে গুড়ে পিঁপড়ে পড়া দশা। বাঁচতে চাইলেও আর বাঁচতে পারে না। গায়ে বিষ জড়িয়ে গেলে ধোয়া যায় কিন্তু সেই বিষ যদি রক্তে মিশে যায় তাহলে মুশকিল। যুগলবুড়া ব্যর্থতার শ্বাস ছাড়তেই বৌয়ের আব্রু বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিল হবিয়া। ঘটনাটা তার চোখেও বিসদৃশ। ভেজা শাড়িটা টেনেটুনে জড়িয়ে দিয়েছিল মালতীব গায়ে। ওঝা ভীষনাথ টেনে টেনে বলেছিল, তোর আর চিন্তা নেই হরিয়া। যে তোর বউয়ের মগজে ঢুকেছিল তারে আমি গাঁ ছাড়া কবে দিলাম। এবার বউটারে নিয়ে গিয়ে পোয়াটাক গরম দুধ খাওয়া। দেখবি বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় একেবারে চাঙ্গা হয়ে গেছে।

কাকে দুধ খাওয়াবে হরিয়া? মালতী শুকনো গাছের চেয়েও অনড়। দাঁতে দাঁত লেগে গেছে ওর। ভীষনাথকে সে কথা জানাতেই নড়ে চড়ে উঠল খ্যাংড়াকাঠি চেহারার লোকটা। গলা সপ্তমে তুলে বলল, যা টুকে চামড়া আন ঘর থেকে। দিস্‌লাই আনিস। পুড়িয়ে ওর নাকের কাছে ধরব।

চাম পোড়ার গন্ধ কুচুটে গন্ধ। তবু দাঁত খুলল না মালতী। এমন কী তার নাকের চামড়া কুঁচকে উঠল না ঘেন্নায়। দাঁতকপাটি ছাড়াতে ভীষনাথ আরো মরিয়া। শুধু পাড়া নয়, হাটের লোকও জড়ো হয়েছে মজা দেখতে। ভীষনাথের মান-সম্মান জড়িয়ে যাচ্ছে সময় ফুরোনোর সাথে সাথে। সে-ও হারবার পাত্র নয়। মালতীকে সে কোল্পাঁজা করে তালতলা থেকে উঠিয়ে আনল উঠোনে। ভেজা শরীরের স্পর্শে গরম হয়ে উঠছিল ভীষনাথের খ্যাংড়াকাঠি শরীর। আজ তার সাত খুন মাফ। দশ লোকের সামনে নাড়াঘাটা করছিল মালতীকে। হৈমবুড়ির অসহ্য লাগতেই ভিড় কেটে এগিয়ে এসেছিল সে। তারপর হাত পেতে চেয়ে নিয়েছিল এক টাকার মুদ্রা। ঠোঁট ফাঁক করে দুই মাড়ির ফাঁকে কায়দা করে চেপে ধরেছিল সেই টাকা। বার দুয়েক পিছলে যাবার পরেই দাঁত খুলতে বাধ্য হয়েছিল মালতী। জ্ঞান ফিরতেই

সে আবার কেঁদে উঠেছিল ডুকরে। হেমবুড়ি তার বেসামাল শাড়ি ঠিক করে দিয়ে বলেছিল, কাঁদিস নে বউ, তোর বিপদ কেটে গেছে।

সেই থেকে মালতী খুবই মনমরা। একা থাকতে ভয় পায় ঘরে। ভীষনাথ ওঝাকে দেখলে সে আর ঘরের বাইরে বেরোতে সাহস পায় না। মানুষটার চোখে আগুন আছে। পাপও কম নেই। মালতী তাই গুটিয়ে রাখে নিজেকে।

হরিয়া খড়িকাহাটে যাবার কথা বলতেই মালতীর টাগরা শুকিয়ে আম আঁটি। আর্দ্র চোখে সে একভাবে তাকিয়ে ছিল ঘরের মানুষটার মুখের দিকে। ভয়ে ছাইবর্ণ মুখ। ধক ধক করছিল ঢেঁকির পাড় দেওয়া বুক। তাতেই চূর্ণ হচ্ছিল সাহস। ঘেমে উঠছিল সে। হরিয়া তার অস্বস্তির কারণ বুঝতে পেরে বলেছিল, তোমার এত ভয় কীসের। আমি পুরুষ মানুষ। ঘরের বাইরে না গেলে পেট চলবে নি। তাছাড়া—ঢোক গিলে মালতীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল হরিয়া, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল, বালিগড় ব্যবসায় মাল টেসে গেলে হাজার টাকার লস্। মালের যা দাম এখন তাতে একটা বালিগড় যদি মরে যায় তাহলে আমার বেঁচে থাকাও খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ব্যবসার জন্য আমি ধর্মাবাবুর কাছ থেকে সুদে টাকা ধার এনেছি। যত দিন যাবে সুদ তত বাড়বে।

মালতী আর কোন নিষেধ করেনি।

মুখ ধুয়ে পুকুর থেকে হুইলের সুতো গুটানোর মত একটা দশাসই বালিগড় টেনে তুলল হরিয়া। জীবটা একেবারে কাদার সাথে সেঁটে বসেছিল। জলের ভালবাসা ছেড়ে সে একদম ডাঙায় উঠতে চায় না। পাড়ে দাঁড়িয়ে এসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল মালতী। তার চোখ থেকে তখনও ভয় মোছে নি। এত রক্তপাত মানুষের কি সহ্য হয়। যার সহ্য হয় হোক, তার হয় না। গলা কেঁপে ওঠে মালতীর, ভয়ে ভয়ে আওড়ায়, একটা কথা বলব?

চমকে তাকাল হরিয়া, একটা কেন দশটা বলো।

তুমি বালিগড় ব্যবসা ছেড়ে দাও। আমার ভাল লাগে নি।

ভাল না লাগলে পেট চলবে না। হরিয়া ভেজা হাত দিয়ে চুলকে নিল মাথা, এ ব্যবসায় কাঁচা পয়সা। ভাগ্য সাথ দিলে তুমি ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং তুলে খাবা।

আমি আরামের ভাত খেতে চাইনে। ডুকরে উঠল মালতী, সাদা ভাতে আমার যে রক্ত মিশে থাকে। সে ভাত আমার গলা দিয়ে নামে না।

হরিয়া আশ্চর্যভরা চোখ মেলে তাকাল, দু-চোখ জুড়ে সন্দেহ। আবার কি তাহলে ভূতে ধরল বউটাকে? হতে পারে। ঐ কাঁটা বাঁশঝাড়ের আশেপাশে ভূতগুলো সব ঘোরাফেরা করে। ওদের কু-দৃষ্টি কি তাহলে মালতীর উপর পড়েছে। তাই যদি হয় তাহলে ভীষনাথ ওঝার কাছে তার একবার যাওয়ার দরকার। জড়িবুটি মন্ত্রতন্ত্র করার দরকার। সে ঘরে থাকবে না, বউটার যদি কোন বিপদ-আপদ ঘটে যায়।

হরিয়ার চিন্তাসূত্র জানতে পেরে মালতী করুণ মুখে হাসল, তোমার ভয় নেই গো, আমাকে আর ভূতে ধরে নি। তুমি যাও। তবে যাওয়ার আগে আমার একটা কথা রেখো। বালিগড় তুমি নিজের হাতে কাটবে না। কাউকে দিয়ে কাটিয়ে নিও। যে কোন জীবের শেষ সময়ের দীর্ঘশ্বাস মানুষের যে বড় গায়ে বেঁধে।

ভ্যান রিকশ নয়, সাইকেলের পেছনে বড় ঝুড়ি বেঁধে বালিগড় নিয়ে যাচ্ছিল হরিয়া। মালটার ওজন বহুৎ তাই মাঝেমাঝে টাল খাচ্ছিল সাইকেল। অভিজ্ঞ হাত সামাল দিচ্ছিল সব। পাকা সড়কে উঠতেই দেখা হল যুগলবুড়ার সাথে। হরিয়া চোখ ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল কিন্তু পারল না। একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল যুগলবুড়া। তার ডানহাতে লাঠি, বাঁ পা'টা বাঁশডগালের মত কৌণিকভাবে বেঁকান। মুখে

হাসি ফুটিয়ে যুগলবুড়া শুধোল, সাত সকালে কুথায় চল্লিরে বাপ। আসল সত্যটা ফাঁস করতে চাইল না হরিয়া, এতে তার ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া এ গাঁয়ের সবাই জানে যুগলবুড়া অপয়া মানুষ, তার মুখ দেখে গেলে হওয়া কাজও হয় না। মাঝপথে অসময়ে বুড়াকে দেখে ভ্রু কুঁচকে গেল হরিয়ার। বিরক্তিতে নড়ে উঠল ঠোঁট, পথ ছাড়। সকালবেলায় মাথা গরম করে দিও না, আমার মেলা কাজ।

আমি তো তোর পথের উপর দাঁড়াইনি। যা বাপ, তুই চলে যা। তোরে আমি এটকে রাখবার কে? যুগলবুড়ার গলা থেকে ঝরে পড়ল বিষাদ। হরিয়া উত্তেজিত হয়ে বলল, ফিরে আসি, তারপর তোমার ব্যবস্থা হবে।

আমার আর কী ব্যবস্থা করবি বাপ, আমার ব্যবস্থা তো ভগমানই করে দিয়েচে। কথা বলতে গিয়ে যেন কান্না বেরিয়ে এল যুগলবুড়ার গলা থেকে, বাঁ হাতে লাঠি আঁকড়ে ডান হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলল, যে কাজে যাচ্চিস—সে কাজ তোর পুরা হবে। তবে বাপ—আমার মনটা রেখে যা। রাতভর আমি কোন নেশা করিনি, দুটো বিড়ি থাকলে দিয়ে যা।

আমার কাছে বিড়ি নেই। এড়িয়ে যেতে চাইল হরিয়া।

তার কথা শুনে হাসল যুগলবুড়া, মিচেকথা বলিসনে বাপ, ওতে ধর্ম নাশ হয়। আজ আমার শরীলটার দিকে তাকিয়ে দেখ। এ শরীলটা তো তোদের দয়ায় এখনও পচে সড়ে যায় নি।

বিড়ি না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল হরিয়া। হা-করে তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকল যুগলবুড়া। খড়িকাহাটে গিয়েও সেই আকুতিভরা চোখের তারা তাড়া করছিল হরিয়াকে। বিড়ি ধরিয়ে সুখ টান দিতে গিয়ে বুড়োটার মুখ তার আবার মনে পড়ল। অমনি ভয়ে কেঁপে গেল হৃৎপিণ্ড। ঘরে ফিরে সে যদি হঠাৎ শোনে যুগলবুড়া মারা গিয়েছে—তাহলে কি তার আনন্দ হবে? যুগলবুড়ার অতৃপ্ত আত্মা তাকে কি ছেড়ে দেবে? এসব প্রশ্নের উত্তর বড় জটিল। আর ভাবতে পারছিল না হরিয়া।

দিনের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠছিল খড়িকাহাট। তেলেভাজার দোকান থেকে গন্ধ আসছিল ভুরভুরিয়ে। ওখানে আদিবাসী মেয়েগুলোর জটলা। ওরা সব পানকৌড়ি পাখির চেয়েও চঞ্চল। সারা হাট চষে বেড়াচ্ছে হরিণী পায়ে। কখনও শাড়ি দোকানে, কখনও বা পান দোকানে। ওদের পায়ের তলায় সর্ষে, ওরা স্থির হয়ে দাঁড়াতে জানে না।

হরিয়া সাইকেলটা শালগাছে হেলান দিয়ে ঝুড়ি নামিয়েছে হাটের ধুলোয়। পথক্লান্তি ওর চোখে-মুখে। তবু মনের ভেতর স্ফূর্তি আছে বেজায়। মেয়ে দেখলেই এই বয়সে ওর সর্বাঙ্গ শিরশিবিয়ে ওঠে, মাথায় রক্ত এসে জড়ো হয়। তার এই স্বভাব ধর্মাবাবুর ছায়ায় ঘুরে পাওয়া। বদগুণ তো মানুষের শরীবে চাম উকুনের মত আটকে যায়। চা-দোকানে না গিয়ে ভেজান ছোলা কিনে নিয়ে হরিয়া যায় তাড়ির দোকানে। তিন বাটি তাড়ি মেরে সে যখন ফিরে এল তখন তার পেটটা ডগরের চেয়েও ফোলা। হাঁটতে গিয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল পা, টলে যাচ্ছিল দেহ, মাথাটায় কে যেন বেঁধে দিয়েছিল শিলপাথর। তার টলমল দশা দেখে যুবতী মেয়েগুলো হাসছিল ঠোঁট টিপে টিপে। ওদেব রঙিন হাসি হরিয়ার মনে জ্বালা ধরায় না, বরং বীজ পুঁতে দেয় ব্যাভিচারের। সে-ও চোখে চোখ ফেলে হাসে। ঈশারা করে। ওরাও হৈ হৈ করতে করতে ছুটে আসে কাছে। হরিয়ার মনে তখন নূপুর বেজে ওঠে। ঐ কালো কালো শরীরগুলো তার চোখে পরীর মত দেখায়। হাটের একপ্রান্তে চিকচিকি কাগজ বিছিয়ে বালিগড়টাকে আছড়ে দেয় তার উপর। জীবটা হাঁপুস নয়নে ভিড় দেখে। তার পেটেব নীচে ঈষৎ হলদে হয়ে যাওয়া নরম চামড়া নড়ে থরথরিয়ে। হরিয়ার মনে পড়ে যায় মালতীর কথা। রাতকালে বউটাকে ছুঁয়ে দিলে সে-ও তো অমনধারা কাঁপে। আর দেরী করে না হরিয়া। ধার চাকুটা আবার শিলপাথরে ঘষে নিয়ে সজোরে ঢুকিয়ে দেয় বালিগড়ের পেটে। ফ্যারফ্যার করে কাটতে থাকে চামড়া। ফিনকি দিয়ে ধারা ছোটে রক্তের। যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে ওঠে জীবটা। মেয়েগুলোর চোখ কঠিন হয়ে ওঠে তৎক্ষণাৎ। কেউ বা ভয় পেয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়ায়।

বালিগড় কাটা শেষ হলে ওরা আবার স্বাভাবিক হয়। দূর থেকে ভেসে আসে হাব্বা-ডাব্বা খেলার আওয়াজ। তিনপাত্তির লোকটা তাস নিয়ে রঙ দেখাচ্ছে ভিড়কে। লোক ঠকাতে তার জুড়ি মেলা ভার। মাজনওলাও কম যায় না। তার গলা বসা, ব্যাটারি ডাউন মাইক বারবার উগলে দিচ্ছে মাজনের আশ্চর্য গুণাবলী। হরিয়ার এখন আর কোনদিকে মন নেই। তার মন এখন বাঁধাঘাটের জল, ঢেউ নেই ছলাৎ ছলাৎ।

হাসতে হাসতে এগিয়ে এল তিনজন। ওরা তিনজনই আইবুড়ো। চোখ চঞ্চল ঘাড়ফড়িং। পরনে কমা ছাপা শাড়ি, কারোর বা লাল পাড় সাদা শাড়ি। আঁচল শুধু ঢাকা দিয়েছে বুক, গায়ে কোন জামা নেই। হরিয়ার মনে পড়ল কুচকুচে পাতার আড়ালে বাতাবী লেবুর কথা। অমনি পা থেকে রক্ত উঠে এল চোখে। ঐ ঘোলাটে চোখে সে ব্যবসা ভুলে তাকিয়ে থাকল লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা ভরা যুবতীর দিকে। মেয়েটি জুঁইফুলের চেয়েও সাদা দাঁত বের করে হাসল। সরল স্নিগ্ধ হাসি, চাতুরতার বিন্দুমাত্র কলঙ্ক নেই। ওরা এত সুন্দর হাসতে পারে কেমন করে? মালতী কেন পারে না? হাসি কি তাহলে ওদের বাঁধন হারা শরীরের মত জন্মগত। হরিয়ার কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল গরমে। বুকের ভেতর ব্যাঙ লাফাচ্ছিল ঘনঘন। তার আর কোন দিকে নজর নেই, নজর লকলকে জোঁক হয়ে বসতে চাইছে ঐ সাদা শাড়ি পরা যুবতীর হৃদয়ে। কিন্তু বিদেশ-বিভুঁইয়ে তার সাহসে কুলায় না। এ হাট বড় সর্বনেশে হাট। এখানে পুরুষের তুলনায় মেয়েরা হল অধিক। হাট এদের প্রাণ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। এরা তাই গোঁসা হলে বলে, ভাতার ছাড়ি দিব কিন্তুক হাট ছাড়বোক লাই।

ডালমুট ভাজা খেতে খেতে মেয়েটা এগিয়ে এল হরিয়ার কাছাকাছি। ওর পালিশ করা শরীরে কোথাও একটু অবাঞ্ছিত ভাঁজ নেই। চোখের দৃষ্টি থেকে শুরু করে মুখের হাসি পর্যন্ত সবই যেন একই সুতোয় বাঁধা নিখুঁত মালা। হরিয়া মাংস বিক্রির ফাঁকে ফাঁকে চেয়ে থাকে উদাস চোখে। ভিড় পাতলা হলে মেয়েটি আসে মাংস কিনতে।

আধা সের মান্‌সো কতো লিবা গো? মেয়েটির স্যাপলা পাপড়ি ঠোঁট নড়ে ওঠে। হরিয়া চেয়ে থাকে, স্বপ্ন দেখে। ঐ কালো আবলুশ মুখ সে যেন এ জীবনে দেখেনি। তার মুখের ভাষা হারিয়ে গিয়ে চোখের মধ্যে অকথিত ভাষার ভিড় জমে। বেছে বুছে আধাসের মাংস ওজন করে শালপাতায় মুড়িয়ে সে এগিয়ে দেয় মেয়েটির দিকে।

মেয়েটি দাম দিতে গেলে হায় হায় করে ওঠে হরিয়া, সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে ছুঁয়ে দিতে চায় মেয়েটার কোমল সুন্দর হাতটা। আর তাতেই ফণা তোলা সাপিনী হয়ে ওঠে সেই কালো ভোমরা চোখ। দুমড়ে-মুচড়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সে চিৎকার করে ওঠে আপন ভাষায়। হরিয়া কিছু বুঝতে পারে না, শুধু ভ্যাল ভ্যাল করে তাকায়। তার নেশার ঘোর কেটে যায়। চোখ মেলে দেখে তাকে চোখের পলকে ঘিরে ধরেছে বিশ-পঁচিশজন মানুষ। ওদের চোখে ক্রোধ। ওরা মারমুখী।

সেই লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা মেয়েটা সবার প্রথমে রাগে ঘেন্নায় ছুঁড়ে দিল আধাসের মাংস হরিয়ার মুখের উপর। রক্ত গড়িয়ে পড়ল হরিয়ার চোখ থেকে। মারমুখী জনতার কাছে সে যেন যাঁতাকলে ধরা পড়া ইঁদুরছানা। তার আর প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকল না। ভিড়ের মাঝখান থেকে একটা মেয়ে ছুটে এসে হাঁড়ি ভেঙে দিল তার মাথার উপর। ভাঙা হাঁড়ির টুকরো ছড়িয়ে গেল চারপাশে। আগুনের হল্‌কা এসে গায়ে বিঁধল হরিয়ার। কুলকুল করে ঘামতে থাকল সে। তার চোখের সামনে লুঠ হয়ে গেল মাংস টাকা পয়সা। শালগাছে হেলান দেওয়া সাইকেলটা আছাড় দিয়ে ফেলে দিল একজন যুবক। তারপর রাগে ফেটে পড়ে বললে, তুর হাড়-মান্‌সো সব ছাতু বানায় দিব। তুর চক্ষু দুটা উপড়ায় লিব। তুই জানিস লা, তু কার হাত ধরেচিস।

আমায় মাফ করে দাও গো।

মাফি মাঙলে ইজ্জোত ঘুরবে নি। রুখে দাঁড়াল আরেকজন, তুর জীবনাই লিয়া লিব। দাঁড়া, টুকে সবুর কর।

হাঁটু ভেঙে যাওয়ার যোগাড়। জোর করে হরিয়ার মাথার বাঁ দিকটা কামিয়ে দিল নাপিত। গোঁফ ছেঁটে দিল ডান দিকের। কাপড় চোপড় খুলে নিয়ে মাতব্বর গোছের একজন বলল, জান বাঁচাতে চাস তো পালা—

হরিয়ার পরনে শুধু দড়ি বাঁধা সাদা আণ্ডারপ্যান্ট। শুকনো নাভি শীতে ফাটা ঠোঁটের মত কুঁচকে গিয়েছে ভয়ে। হাট পেরিয়ে, নদী পেরিয়ে সে ছুটছে পাথুরে পথে। বড় বড় গাছগুলো যেন হা-হা গলা ফাটিয়ে হাসছে তার জীবনমরণ দৌড় দেখে।

ঘরে ফিরে আসতে ভোর হয় হরিয়ার। এখনও ঘুম ভাঙেনি হাড়িসাইয়ের। হরিয়াও মনেপ্রাণে চাইছিল সবাই যেন ঘুমিয়ে থাকে। কেউ যেন দেখতে না পায় তার বিকলাঙ্গ রূপ। বাঁশ বাগানের ভেতর দিয়ে চুপি পায়ে হাঁটছিল হরিয়া। সারা গায়ের চুয়ান রক্ত তখন শুকিয়ে কালচে পারা। ব্যথা-বেদনারা জেগে আছে শরীর ঘিরে।

শুকনো বাঁশ পাতায় মচর মচর শব্দ হতেই যুগলবুড়া কাঁটা বাঁশ ঝাড়ের আড়াল থেকে চেঁচিয়ে উঠল ভয়ে, কে, কে যায় গো!

দম ধরে দাঁড়াল হরিয়া। ঐ বুড়োটার মুখ সে আর দেখতে চায় না। ওর মুখ দেখে গিয়েই তো চামড়া ফাটল। রক্ত ঝরল। বালিগড় সাইকেল কিলো বাইট দাঁড়িপাল্লা সব গেল। ঐ অপয়া ঢেঁকির মুখটা সাত সকালে সে আর দেখতে চায় না। তার এই বিকৃত চেহারা দেখলে নির্জন বাঁশঝাড়ে আঁৎকে উঠবে যুগলবুড়া। হয়ত 'ভূত-ভূত' বলে চেল্লাবে। শুকনো বাঁশপাতার মধ্যে বসে পড়ে নিজেকে আড়াল করতে চাইল হরিয়া। যুগলবুড়ার চোখে ছানি পড়লেও শ্রবণশক্তি অক্ষত আছে। ভোরবেলার হাওয়ার যাতায়াত স্থূলকায় ব্যাঙের যাতায়াতের মতন। পায়ের শব্দ পেয়ে কাঁটা বাঁশঝাড়ের পেছন থেকে সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে এল যুগলবুড়া। তার ভূত-প্রেতের ভয় নেই। যদি ভয় থাকত তাহলে ভোরবেলায় উঠে আসত না অশৌচ হাঁড়ির লোভে। ক'দিন থেকে ভিখ মাঙা বন্ধ। ঘেয়ো শরীর নিয়ে সে বেশী নড়তে-চড়তে পারে না। ব্যথা-বেদনারা তাকে কাহিল করে মারে। ঘা মুখ থেকে ঠেলে উঠে আসে রক্ত-পুঁজ। দুর্গন্ধটা নাকে ঠেকে। তখন আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না তার।

তালতলার সম্মুখের ঘরটা গঁড়াদের। ওর এবার পালি ছিল হাট ঝেঁটুবার। তোলা তোলোর দিন যুগলবুড়া হাত পেতেছিল তার কাছে। গঁড়া একটা কানা বেগুনও দেয়নি। বরং মুখ ঝামটা দিয়ে হুকরে ওঠা গলায় বলেছিল, এসব কি মাগনা আসে খুড়া। হাট ঝেঁটুতে গিয়ে মাজাটা আমার ধেপে যায়। আমি একা পারিনে অত বড় হাট ঝেঁটুতে। বউটাও সাথ দেয়। ভাবোদিনি ঘরের বৌ কখন হাট ঝাঁট দেয়। এ মেহনতের ধন আমি তোমাকে কেন দিব?

এই অবুঝ জিজ্ঞাসার কোন উত্তর নেই। যুগলবুড়া শুকনো মুখে শুকনো আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত থরতর করে কেঁপে ওঠে। দু-চোখে চলকে পড়ে আঁধার। এই আঁধার ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছে তার শরীরে-মনে। বাঁশবাগানের আলো-আঁধারী ছুঁয়ে খেলা করে ভয়ের গা ছমছমানী আতঙ্ক। যুগলবুড়ার দু-হাতের একহাতে লাঠি, অন্যহাতে সাউদের অশৌচ হাঁড়ি। ভাত রাঁধার হাঁড়িটা ধুতে গিয়ে ভেঙে গেছে পুকুরঘাটে। সেই থেকে একটা নতুন হাঁড়ির খোঁজে সে হন্যে হয়ে ঘুরেছে, কেউ তার দুর্দশার কথা শুনে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। যুগটা বড় স্বার্থপর। সাহায্যের হাত এযুগে বড় ছোট। যুগলবুড়ার নতুন হাঁড়ি কেনার পয়সা নেই। গঁড়া একটা নতুন হাঁড়ি তোলা তুলে পেয়েছিল হাট থেকে। সেই হাঁড়িটা সে অনায়াসে যুগলবুড়াকে দিতে পারত কিন্তু মন সায় দেয়নি তার। যুগলবুড়াকে নতুন হাঁড়ি দান করে তার কী লাভ হবে? লাভ ছাড়া সে এক পাও চলতে রাজি

নয়। যুগলবুড়া তাই বাধ্য হয়ে ছুটে এসেছে অশৌচ হাঁড়ি কুড়াতে। লোকচক্ষুর আড়ালে কাজটা সারবে ভেবেছিল সে, কিন্তু বিধি বাম। হরিয়া তার পথে এসে দাঁড়িয়েছে এই কুয়াশা মাখামাখি ভোরে।

হরিয়াকে সে এমন আদা ছ্যাঁচা অবস্থায় দেখবে স্বপ্নেও আশা করেনি। গাঁয়ে থাকলে দেমাক ভারে পা পড়ে না হরিয়ায়। তার বউ মালতীরও নাক উঁচু স্বভাব। সেদিন বালিগড় কাটার সময় মালতীর চ্যাটাং চ্যাটাং কথাগুলো সে এখনও ভোলেনি। হাতি যখন কাদায় পড়ে ছুঁচোও তাকে ডিঙিয়ে যায়— এটাই তো দুনিয়ার নিয়ম। কিন্তু নিয়মের চাকা তো একদিন ঘুরে ওঠে। চাকা এক জায়গায় থেমে থাকে না।

যুগলবুড়া শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিল, শিশিরে ভেজা বাঁশপাতাগুলো সরসর করে সরে যাচ্ছিল পায়ের চাপে। ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিল কলিজা। কোনমতে কাঁপা গলায় সে চিৎকার করে ডাকল, কে গো আড়ালে আছো, বাইরে আসো। তখনই কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল হরিয়া। শীতে জড়িয়ে গেছে তার শরীর। কালচে শরীরে সবখানে ফুলে ফেঁপে প্রকটিত হচ্ছে আঘাতের চিহ্ন। তাকে এমন অসহায় অবস্থায় দেখবে যুগলবুড়া কোনদিনও আশা করেনি। হরিয়াকে দেখে প্রথমে তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কাছে সরে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল যুগলবুড়া। তারপর বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে শুধোল, আরে হরিয়া না?

হরিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ খুড়া, আমি গো...

তোর এ দশা কে করল বাপ?

সবই আমার ভাগ্য! হরিয়া কাঁদতে কাঁদতে কুঁজো হয়ে বসে পড়ল যুগলবুড়ার পায়ের কাছে, তারপর ফোঁপানী থামিয়ে বলল, খড়িকাহাটে গেছিলাম সেই সকালে। ওরা আমার বালিগড়, সাইকেল, টাকা-পয়সা সব ছাড়িয়ে নিল।

কেনে তোর দুষ কোথায়?

হরিয়া চুপ করে থাকল। কথা বলার ক্ষমতা নেই তার। শীতে-হিমে জড়োসড়ো বাঁশঝাড়ের মত তার শরীর এক পুঁটলি মাংস ছাড়া আর কিছু নয়। যুগলবুড়ার পায়ের কাছে বসেই সে কাতর স্বরে বলল, ওরা আমার মুচ কামিয়ে দিয়েছে একদিকের। মাথার অবস্থাটা দেখ। এই শরীল নিয়ে আমি গাঁয়ে ঢুকব কী ভাবে? মালতীর কাছে আমার আর মুখ দেখাবার যো নেই। তোমার পায়ে ধরি খুড়া, তুমি কিছু ব্যবস্থা করো।

যুগলবুড়া ঘেয়ো আঙুলে মাথা চুলকে ভাবল, তারপর অভয় দিয়ে বলল, তোর কুনো চিন্তা নেই বাপ। তুই ইখানে বস। আমি ঘর থিকে ব্লেডপাত নিয়ে আসি। তোর পুরাটাই আমি কামিয়ে দিব। কথাগুলো বলেই যুগলবুড়া হরিয়ার মাথায় উবুড় করে দিল অশৌচ হাঁড়ি। বলল, চুপচাপ বসে থাক। কেউ তোরে দেখতে পাবে না। আমি যাব আর আসব।

যুগলবুড়া ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল। হরিয়া ডাকল, খুড়া গো, বড় জার লাগে। একটা বিড়ি হবে? যুগলবুড়া হাসল, সেই হাসিতে মিশেছিল সকালের বিষণ্ণতা।

সতেরো

মাইতিদের ধাড়ী ছাগলটা গলা ফুলো ব্যামোয় মরল।

শুধু একটা শকুন চক্কর কাটছিল উর্দ্ধাকাশে। দাঁতন করতে গিয়ে আকাশের কালো ফুটকিটা নজরে পড়েছিল গঁড়ার। মনের কোণে চিকুর হেনেছিল আশা। সে আর স্থির থাকতে পারেনি, তার উদোম মন তখন আকাশের কোল ঘেঁষে উড়ে বেড়ান বলাকা। বউকে বলেছিল, রাধীরে, চটপট দুটো পাখাল ভাত বেড়ে দে। আমাকে একবার ভাগাড়মুখো যেতে হবে।

রাধিকা এই তাড়ঘাড়ির অর্থ বোঝে। জন্ম কুঁড়িয়া মানুষটা নিশ্চয়ই কোথাও সুখের হদিস পেয়েছে। চটজলদি খড়জ্বালে শুকনো মাছ পুড়িয়ে দিয়েছিল সে। সেই কুঁচুটে বদঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছিল হাড়িসাইয়ের বাতাসে। শুঁটকিমাছের 'রাইতা', তার সাথে ছাঁচি পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচ, জলে ভেজা ভাত খেয়ে গঁড়া আর সময় নষ্ট করেনি। ভাগাড় এখন বারোয়ারী জায়গা। আগে গেলে আগে পাবে এমন একটা ধান্দা। ব্রজবুড়ো গত হবার পর থেকে পবন ভাগাড়মুখো হয়নি। জাতব্যবসা ছেড়ে সে এখন মাছের কারবারী। এতে গঁড়ার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে সুখের; সে হাট ঝাঁটায়, তোলা তোলে—ফাঁক-ফোঁকর পেলে থাবা বসায় ভাগাড়ের মাটিতে।

আসার সময় রাধিকা বলেছিল, যাচ্ছো যাও তবে মিলা দেরী করো না। বামুনঘরের বেড়া বেঁধে দিলে ঘরে চাল আসবে—আমার কথাটা মনে রোখো। ছেলেমেয়েগুলান খিদে সইতে পারে না। ওদের মুখে দানাপানি জোগান তোমার কাজ। এই কথাগুলো রাধিকা এখন প্রায়ই বলে। বিশেষত ধরণীবুড়া গত হবার পর থেকে গঁড়ার সংসার প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল। এতদিন বাবার ঘাড়ে সংসারের জোয়াল ছিল, সে জোয়াল নিজের ঘাড়ে চাপতেই দায়িত্ববোধে কুঁজো হয়ে গিয়েছে গঁড়া। শুধু মজুর খেটে এত বড় সংসার চলে না, ফলে রাধিকাকেও এটা-সেটা করতে হয়। কাঠ কুড়োনো থেকে ঘষি দেওয়া সব কাজে সে সিদ্ধহস্ত। তবে এখন আর গাঁয়ে-ঘরে শুকনো কাঠ মেলে না। সবাই যেন তক্কে-তক্কে ঘোরে, শুকনো ডালপালা দেখলে হাড়িসাইয়ের বউ-ঝিউড়িগুলো হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। কাঠ না পেলে শুকনো পাতাই সম্বল। বাঁশঝাড় এখন সাফ সুতরো ঝাড়ুর আঘাতে। পাতা না পেলে কুড়োই ভরসা। ধানের মোটা কুড়ো জ্বলে ভাল। তাতে ক্ষুদে তুষ ছড়িয়ে দিলে আগুন ধিকিধিকি জ্বলে। মরদগুলো শুধু চাল এনে দিয়ে খালাস, চাল থেকে ভাত কী ভাবে হবে সে খোঁজে তাদের দরকার নেই। রাধিকার সংসারটা ছোট নয়, চার ছেলে-মেয়ে নিয়ে তার অবস্থা অনেকটা পুরনো বাঁশঝাড়ের মত। কোড়াগুলো লকলকিয়ে বাড়ছে। তাদের খাদ্য চাই, পোষাক-পরিচ্ছদ সব কিছু চাই। হাটখোলায় ঝাঁট দিলে তোলা দেয় দোকানীরা। সমুদ্র-মাছ থেকে শুরু করে বেগুন মুলো আলুটা পেঁয়াজটা সব পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখ হল হাট তার একার নয়, হাটের দখল হাড়িসাইয়ের সবার। তাই হাট ভাগ করা আছে ঘর-ঘর। ফি-হপ্তায় লোক বদলায় ঝাড়ু দেবার। হাটের মায়ায় গঁড়ার মন তাই ভোলেনি। হাট তাই তার কাছে 'পরের সোনা'—কানে দিলে কেড়ে নেবে হ্যাঁচকা টানে।

সড়ক পেরিয়ে এলে দিগন্ত খোলা মাঠ। খোলা মাঠে আকাশ হুমড়ে পড়ে সুখ বিলোয়। হাওয়ায় ওড়ে মেঘের ডালপালা। মিঠে রোদ্দুর সর্বাঙ্গে মেখে দাঁড়িয়ে থাকে গাছ। আলের ঘাসগুলো লকলকিয়ে বাড়ে। দুবঘাসের কোমর নড়ে হাওয়ার তোড়ে। সাত সকালে গঁড়ার মাথার চুল ওড়ে হাওয়ায়, তার পেশীবহুল কর্মঠ চেহারায় গড়িয়ে যায় রোদ। পাতলা মোচে খুশির ঝিলিক তুলে সে হাঁটে। নিজের খর্বকায় ছায়ার সাথে সে কথা বলে আপন খেয়ালে। ছায়ার রঙ দেখে মানুষের গায়ের রঙ অনুমান করা যায় না। গঁড়া মনে মনে হাসে। হাড়িসাইয়ের মধ্যে তার গায়ের রঙ কটা। চোখের মণি দুটো বেড়ালের মণির মত। এটা তার গর্ব। রাধিকা রাতেরবেলায় আহ্লাদ করে বলে, তোমার বেড়ালকটা চোখ দেখে আমার ডর লাগে, মনে হয় তুমি বুঝি আমার কেউ নও। আমার মা বলত, যার গায়ের রঙ কটা, চোখের পুতলির রঙ কটা—সে মানুষটা নাকি বড় রগচটা।

গঁড়া হাসত। বাস্তবিক সে একটু রগচটা। কোন কথা মনপছন্দ না হলে তার মাথায় খুন চড়ে যায়, তখন রাগ জল না হওয়া পর্যন্ত তার নিস্তের নেই। অভাব তার সব খেয়েছে—শুধু দেহের রঙ, চোখের বর্ণ খেতে পারেনি। এত করেও যে সংসার পালতে পারে না সে চোর না হয়ে কি সাধু হবে? গঁড়া এখন ডাকসাইটে চোর, প্রায় রাতে চৌকিদার আসে খোঁজ নিতে। থানার নির্দেশ, চৌকিদার না এলে তার চাকরি বাঁচে না। রাধিকা গোঁসা করে বলে, মানুষটারে তোমরা বাঁচতে দেবে না দেখছি। কবে কী করেছিল, তা এখনও থানাবাবুরা ধরে বসে আছে। ধন্য বাবা তোমাদের সেপাই-দারোগাবাবুদের।

চৌকিদারের মলিন হাসি রাধিকার রাগের আগুনে জল ছিটিয়ে দিতে পারে না, সে ডাক দিতে দিতে অন্ধকারে মিশে যায়। রাধিকা যত বড় মুখ করে বলুক না কেন গঁড়া এখনও তার বদ অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। পরের ধন দেখলেই মন নেচে ওঠে তার। নিশপিশ করে হাত। কে যেন হিড়হিড়িয়ে তাকে টেনে নিয়ে যায় কু'পথে। রাতের ঘুম কেড়ে নিয়ে কে যেন তার হাতে তুলে দেয় সিঁদকাঠি। তার বেড়ালকটা চোখ দুটো ধূর্ত হয়ে ওঠে রাত বাড়ার সাথে সাথে। পুরো শরীরে তখন অসুরের তাগত। চুলবুল করা মনটাকে সে কিছুতেই বশ মানাতে পারে না। রাধিকা এসব ব্যাপারে নীরব দর্শক। সে 'হ্যাঁ'-ও বলে না আবার 'না'-ও করে না। পরের ধনে তারও লোভ কম নেই। আসলে অভাব তার সৎ মনটাকে গিলে নিয়েছে পুরোপুরি। সে এখন রক্ত-মাংসের মানবী হলেও তার কচি মনটা শুকিয়ে এখন চামড়া।

ভাগাড়ের পথটা সংকীর্ণ। মাঠপুকুরের পাড়ে গড়ে উঠেছে ভাগাড়। কুকুর-শকুন-পাখপক্ষী পচা মাংস খেয়ে জল খায় পুকুরের। ওদের বসবার জন্য পুকুরপাড়ে অসংখ্য গাছগাছালি ঠাসা। শ্যাকুল ঝোড়ে শেয়াল ডাকে সাঁঝবেলায়। বুনো জামগাছে কাক-শকুনের লড়াই জমে আচ্ছামত। হাড়মটমটীর ঝোঁপে সাঁঝ-সকালে ডাহুক ডাকে, কক-কক—। ভাগাড়খেগো কুকুরগুলোর পোয়াবার। খরানীকালে ওরা পেট ডুবিয়ে বসে থাকে পুকুরের জলে। তখন গ্যাংটা পাথর দিয়ে খেদালেও পালাবে না। ভাগাড় ওদের কাছে তীর্থক্ষেত্র, জীবন ধারণের আশ্রয়স্থল।

গঁড়া ভাগাড়ের মাটিতে পা দিয়ে বিড়বিড়িয়ে ওঠে 'মা ভাগাড়চণ্ডীর' নাম নিয়ে । ভাগাড়ের ঘাসে পা দিলে মা ভাগাড়চণ্ডীর মুখটা ভেসে ওঠে গঁড়ার মনে। এত বড় ফাঁকা মাঠে সে ছাড়া আর কেউ নেই, গাছ-গাছালর দিকে চেয়ে-চেয়ে সে নির্জনতাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করে। তিনটে কাক চারটে শকুন একটা কুকুর ছুঁকছুঁক করছে মাইতিদের ধাড়ী ছাগলটাকে ক্ষামি করার জন্য। গঁড়া তাদের সে সুযোগ দিল না। বুড়ো জামগাছের ডাল ভেঙে সে ছুটে গেল ধাড়ী ছাগলটার দিকে। কাক-শকুনকে তার ভয় নেই, ভয় শুধু ভাগাড় কুকরটাকে।

'জয় মা ভাগাড়চণ্ডী' বলে গঁড়া পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল মরা ছাগলটার দিকে। দু-চোখে পিচুটি, প্রায় চার আঙুল ছাইবর্ণ জিভ বের করে ঠ্যাং উল্টে শুয়ে ছিল ছাগলটা। পেটের চামড়া ফুলে-ফেঁপে টানটান। গলার কাছে যেন চার ফেরতা কালো মাফলার জড়ান এমন ফোলা।

আহা কী খেয়েছিলিসরে, তাই তোর অমন মরণ হলো। বিড়বিড়িয়ে উঠল গঁড়ার ঠোঁট, উবু হয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সে, তারপর আলতো হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিল ছাগলটা" পেট।

পেট ফুলো, গলা ফুলো—নাকি কাশরোগ—কোন রোগ ছিনিয়ে নিল তার মুখের ঘাস? গঁড়া পেটে থাবড়া মেরে কান পেতে শব্দ শুনল। ছাল ছাড়ান তার আর হল না। মন বলে উঠল, ছাল ছাড়িয়ে লাভ নেই, এরে তুই ঘর নিয়ে যা। মান্‌সো বানিয়ে খা। তুই খা, দশজনেরে খাওয়া।

অমনি দু'হাতের হ্যাঁচকা টানে সে তুলে ফেলল ধাড়ী ছাগলের শরীর, তারপর ঘাড়ের দু-দিকে ঝুলিয়ে দিল মরা ছাগলের ঠ্যাং। ছাইবর্ণ জিভ সাপের জিভের চেয়েও হিমস্পর্শ দিল কাঁধে; গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠলেও গঁড়া ভ্রুক্ষেপহীন। ভাগাড়খেগো কুকুরটা দূরে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডাকে, কাক-শকুন ডানা ঝাড়ে আক্রোশে, তাদের লাল চোখে ঠিকরে পড়ে আগুন।

গঁড়ার কাঁধের উপর মরা ছাগল, ছাগলের চারটে পা বুকের উপর বাঁদরলাঠির মত নড়ে। এক হাতে জামডাল, গঁড়া পিছোতে থাকে ভয়ে, আর সতর্ক চোখ কুকুরটার চোখের উপর নিবদ্ধ। কোন কারণে কুকুরটা তেড়ে এলে ঐ জামডাল তাকে বাঁচাবে। জয় মা ভাগাড়চণ্ডী মুখ রেখো মা, আমি তোমার শ্রীচরণের দাসানুদাস। গঁড়ার বিনয় গদগদ চোখ, কোনমতে আলের উপর উঠে এসে সে আর একবারও পিছন ফিরে তাকায় না। হারানো মনোবল ফিরে পায় আকাশের ছায়ায়, এত বড় মাঠটাকে তার মনে

হয় একার জমিদারী। গোরুর গাড়ির নিক্ ধরা পথ ধরে নয়, গঁড়া হাঁটছিল ঢ্যাঙ্গা আল পথ ধরে। পাড়ায় ঢুকলে তার কত কাজ। যাওয়ার সময় আওলাদ মোড়লের সাথে দেখা হলে ভাল হোত, তাহলে চামড়ার দাম বাবদ কিছু টাকা সে অগ্রিম নিয়ে নিতে পারত।

আওলাদ মোড়ল দীর্ঘদিন হাড়িসাইয়ে ঢোকেনি, ব্রজবুড়া গত হবার পর থেকে সে এমুখো বড় কমই আসে। শীতকালে গোরু-ছাগলের অসুখ-বিসুখ তেমন একটা হয় না, আর হলেও গাঁয়ে গো-বদ্যির কমতি নেই। পশুমৃত্যুর হার কমে গেলে আওলাদ মোড়লের চামড়ার ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে না। যেখানে স্বার্থ নেই, সেখানে আওলাদ মোড়লের ছায়া নেই। তবু গঁড়ার চোখ আঁতিপাতি করে খুঁজছিল ঐ একটা লোককে। দেখতে না পেয়ে সে কিছুটা হতাশ হল।

হাড়িসাইয়ে ঢোকার মুখে গঁড়ার সাথে দেখা হল সহদেবের। চোখে চোখ ফেলে হাসল দু-জনে। অবশেষে গঁড়া হাঁফ ছেড়ে বলল, তা কবে এলে গো ভাই। তা তোমার খপর সব ভাল তো।

এই কোনরকমে কেটে কুটে যাচ্ছে, রক্ত ঝরছে না। সহদেব হাসিমুখ করে উত্তর ছুঁড়ে দিল গঁড়ার দিকে। এরকম হাসি মশকরা ওদের মধ্যে প্রায়ই হয়ে থাকে। ওরা সমবয়েসী হয়েও সম্পর্কটাকে আরো ঘনিষ্ঠ করতে পারেনি। এর জন্য দায়ী সহদেব। তার খামখেয়ালীপনা, উড়নচণ্ডী স্বভাব সবার কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছে তাকে। শুধু পাড়া প্রতিবেশী নয় ঘরের মানুষগুলোও সহদেবের প্রতি উদাসীন। গঁড়াকে রাধিকা বলেছিল, জান, দাদার সাথে বৌদির কোন কথা হয় না। আমি শুনেছি ওরা নাকি এক বেছানায় শোয় না। বুড়িটা এসব দেখে-শুনে কাঁদাকাটা করে মরছে।

ছাড়া গোরুর গোয়ালে কি মন ধরে রে। গঁড়া বিছানা কাঁপিয়ে হেসেছে। সেই অবজ্ঞা হাসির ছিটেফোঁটা এখন তার ঠোঁটের ডগায় চুলবুল করে না। এক অলিখিত সম্ভ্রমে তার চোখের দৃষ্টি গদগদ হয়ে ওঠে, ঘাড়ের মরা ছাগল পায়ের কাছে নামিয়ে গঁড়া বলল, তোমার দেখা পাওয়া আর ভগমানের দেখা পাওয়া এক কথা। আমার কী সৌভাগ্য গো, আজ তোমার দেখা পেলাম।

সহদেব গম্ভীর হয়ে ওঠে গঁড়ার খোঁচামারা কথা শুনে, শুধু গঁড়া কেন সবাই তাকে এই এক প্রশ্নে কাবু করে ফেলছে। যদিও কেউ তার মুখের উপর কোন কটূ কথা বলতে সাহস পায় না তবু তাদের চোখগুলোয় লুকানো থাকে ঘৃণার ফল। সেই অপ্রতিরোধ্য ঘৃণাকে সে কী ভাবে হজম করবে। তার হজমশক্তি একটা সাধারণ মানুষের চাইতে বেশী নয়। সুভদ্রা কথা বলেনি এতে সহদেবের কোন দুঃখ নেই। কিন্তু তার একমাত্র ছেলে পবন মুখে কুলুপ এঁটেছে জেনে সহদেবের মুখের গ্রাস পেটে নামছে না। হৈমবুড়িও কম যায় না খোঁচা মারতে। সে তো দুপুরবেলায় খাওয়ার সময় বলেই দিল, বাপ-মা বুড়ো হলে ছেলের ভরসায় বেঁচে থাকে। হ্যাঁ বে বাপ তুই কেমন ছেলে, তোর বাপটা 'সহদেব-সহদেব' করে চোখ মুঁদল তবু তুই একবার তার ডাকে সাড়া দিলি নে। বাপের শেষ সময়ে তোর কি একবার ঘরে আসা উচিত ছিল না? মানুষটা তোরে যে জানের অধিক ভালবাসত। বিনিময়ে তুই তারে কী দিলি—মনকে শুধা—সব জবাব পেয়ে যাবি। গঁড়ার মুখের দিকে তাকিয়ে সাত-সতের ভাবতে ভাবতে কথা আটকে গেল সহদেবের। গঁড়াই তাকে বাঁচাল এই নির্মম যন্ত্রণা থেকে। বলল, তা এসেছ যখন ক'দিন থাকবা তো? নাকি আবার খাঁচা ভাঙা পাখির মত উড়ে পালাবা। তা ভাই, তুমি যাচ্ছ যাও তবে সনসারটাকে সাথে করে নিয়ে যাও। তুমি চলে গেলে বৌদির দুর্দশা আর চোখে দেখা যায় না। সে মেয়েমানুষ, একা আর কদিক সামলাবে? সহদেবের মুখে কেউ বুঝি চুনকালি লেপে দেয় এমন শোচনীয় অবস্থা। গঁড়া বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলল, তুমি তো দিব্যি আরামে দিন কাটাও, এদিকে তোমার বুড়ি মা-টারে নিয়ে বৌদি নাকানী-চোবানী খায়। জান, কোন কোন দিন ওদের খাওয়া জোটে না। তোমার মেয়েটার এখন অতো বুদ্ধিসুদ্ধি হয়নি। তার শুকনো মুখ দেখলে আমারই চোখ ফেড়ে জল আসে।

গঁড়ার কথাগুলো অন্তর উৎসারিত, সহদেব বাধ্য হয় দম ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে। পুরো পাড়া এক দিকে, সে ভিন্ন প্রান্তে। তবু সে কেমন নির্বিকার, প্রতিক্রিয়াহীন।

সকালের রোদ প্রজাপতির মত ডানা মেলে দেয় আলোর, চারদিক রঙিন হয়ে ওঠে সেই রোদ ঝলমলে আলোয়। এই এত আলোয় চোখে আঁধার দেখে সহদেব, অপরাধবোধ জাগ্রত হয় ভেতরে, একটা দুষ্ট বিষপোকা তার মনটাকে কুরে কুরে খায়। সেই বিষপোকাটাকে টিপে মারতে পারে না সে, উল্টে সেই বিষপোকাই শাসন করে তাকে।

গঁড়া ধাড়ী ছাগলের পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যায় চারা তেঁতুলতলায়। তারপর সেই পায়ে বাঁধা দড়ি কায়দা করে বেঁধে ঝুলিয়ে দেয় মরা ছাগলের দেহ। হাড়িসাইয়ে ছাগল কাটা হবে এই সংবাদ রটে যায় ক্রমে ক্রমে। যুগলবুড়া আসে সানকি হাতে, দু-চোখ ভর্তি খিদে, কোনমতে নিজের লোভ সামলে বলল, ভালই হল আজও পেট ভরে মান্‌সো খাওয়া যাবে।

ছাল ছাড়াতে ছাড়াতে কঠিন চোখ তুলে তাকাল গঁড়া, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, মান্‌সো আমি কারোকে মুফুৎ-এ দিব না। যার মান্‌সো খাবার মন হবে—সে পয়সা দিয়ে কিনে নেবে।

—তা বাপ, কত করে সের?

—পাঁচ টাকার কমে পারবোনি।

—পাঁচ টাকা! আকাশ থেকে পড়ল যুগলবুড়া, টনটনিয়ে উঠল হাত-পায়ের ঘা-গুলো, অবশেষে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, মরা ধার মান্‌সোর আবার পাঁচ টাকা সের। কে খাবে বাপ তোর মান্‌সো? এই সাইয়ে কার অত টাকা আছে।

যুগলবুড়ার কথাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিল গঁড়া, পাঁচ টাকা সের খুব একটা বেশী নয়। খুড়া, তোমার মাথার চুল সব পেকে গেছে। তোমাকে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না মরা হাতির লাখ টাকা দাম।

—কোথায় চাঁদ আর কোথায় কাদা, দুটা কি এক হল বাপ! চাঁদি আর সোনা কি এক দামে বিকোয়? বিকোয় না। তাই বলছি কী—দাম টাম ছাড়। ধাড়ী ছেলিটা তো তোর ঘরের নয়। পড়ে পাওয়া ধন। পড়ে পাওয়া ধন—মাগ্‌না বিলা, তাহলে ভগমান তোরে দু-হাত ধরে দেবে।

—ওসব ধম্মো কথা ছাড় তো! গঁড়া ফুঁসে উঠল রাগে, আমার বলে ঘাড়ের ছাল-চামড়া ক্ষয়ে গিয়েছে ধাড়ীটারে বইতে গিয়ে। যা ঘাম বেরিয়েছে তাতে এট্টা নয়া গেঞ্জি ভিজে গেছে। মেহনতের ফল আমি কাউরে বিনি পয়সায় দেব না, তাতে আমার যা হয় হোক।

—হবেটা আর কী, এ তো যার যার মনের কথা। তবে অঙ্গার খেলে মানুষ যে আগুন উগ্‌লায়—একথায় কোন মিছে নয়। যুগলবুড়ার ক্ষীণ কথাগুলো হৈ-হুল্লোড়ে হারিয়ে যায়। তার ঘরের সামনের তেঁতুলগাছতলায় এখন কাচ্চা-বাচ্চার ভিড়। ওদের চোখ-মুখ থেকে ঠিকরে পড়ছিল আনন্দের চিহ্নগুলো।

—মান্‌সো খাবো, মান্‌সো খাবো। বলে আধা উদোম ছেলেটা ছুটে গেল ঘরের দিকে। সে চলেছে তার মাকে সংবাদ দিতে। মায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য সে হয়ত খন্‌খনিয়ে কাঁদবে।

ছাল ছাড়ান ধাড়ী ছাগলটা কলাপাতায় নামিয়ে রেখে গঁড়া ভেজা হাতে একটা বিড়ি ধরাল; তারপর রাধিকাকে বলল, যা তো বউ, হরিয়ার ঘর থেকে সের-দাড়িটা নিয়ে আয় তো—ততক্ষণে আমি মান্‌সো-গুলো কুঁচিয়ে রাখি। বেলা বাড়লে জল কাটবে মান্‌সোয়।

হরিয়ার বউ মালতী সব শুনে নাক কুঁচকে বলল, তোর তো সাহস কম নয়, রাধী। তুই কি করে চাইতে পারলি সের-দাড়িটা! মরা ছাগলের মান্‌সো মাপবি তার জন্য আবার সের-দাড়ি চাই! ও হবে না। সের-দাড়ির জাত মারতে আমি কাউকে দেব না।

—না দিলে আমি তো জোর করে ছাড়িয়ে নেব না। রাধিকার বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল অপমানে, আমি কী আসতে চেয়েছি, সে আমাকে জোর করে পাঠাল। তারও যেমন কাজ নেই—সবাইকে আপন ভাবে!

ঠেস দেওয়া কথাগুলো গায়ে ফোসকা ফেলল মালতীর, জানিসই যখন দেব না তখন এসেছিস কেন? আমি কারোর এত ঝাল কথার ধার ধারি না।

—তোর এত তেজ থাকবে না রে মালতী। সেই যে বলে না, অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে। তোর বড্ড বাড় বেড়েছে, দেখবি তোর কী হয়।

কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে রাধিকা আর দাঁড়াল না, মাজা দুলিয়ে চলে গেল পবনদের দুয়ারে। সুভদ্রা বরাবরই মাটির মানুষ, এক কথাতেই বের করে দিল দাঁড়িপাল্লা। যাওয়ার সময় রাধিকা বলল, বৌদি গো, তোমার জন্য আমার মনটা বড় কাঁদে। এ পাড়ায় তোমার মত আর একটাও বৌ নেই যে নিজে বিষ খেয়ে অন্যারে অমৃত বিলোয়।

সুভদ্রা হাসবার চেষ্টা করেও পারল না, বুকের ভেতব থেকে ঠেলে উঠল দুঃখ-ব্যথা—যা তার পুরো মনটাকে বিষাদ মেঘে ছেয়ে দিল। রাধিকা চলে যাবার পবও সহজ হতে পারল না সে। উনুনে শুকনো খড়কুটো ঠেলে দিয়ে দাউ দাউ আগুনেব দিকে চেয়ে থাকল নির্নিমেষ।

সহদেব এল সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আশপাশ দেখে নিয়ে সে সুভদ্রার ঘাড়ের উপর হাত রাখল আলতোভাবে। প্রথমে সুভদ্রা বুঝতে পাবেনি, যখন বুঝল তখন হাতটা সরিয়ে দিল অভিমানে। শুকনো ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল ইচ্ছের বিরুদ্ধে। সহদেব উত্তেজিত হল না, মায়াময় চোখ তুলে তাকাল, এখনও রাগ ভাঙে নি তোমার। এত বাগ কী-ভাবে পুষে রেখেছ বুকে। আমাকে কি এইভাবে দূরে সরিয়ে রাখবে?

আমি তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখার কে? যে নিজে থাকতে দূবে সরে গিয়েছে তারে আমি আব কাছে ডাকব না। সুভদ্রার গলা ঝ্যানঝেনিয়ে উঠল, ধোঁয়া ঢুকে লাল হয়ে উঠল চোখ, অনববত জলেব ধারা নামল গাল বেয়ে। বাস্তবিক সুভদ্রা কাঁদছিল। তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা সহদেবের জানা নেই। ধোঁয়ায় ভরে উঠছিল হেঁসেল ঘর। সেই ধোঁয়া কামড়ে ধরল সহদেবের চোখ। চবম অস্বস্তিতে পড়ে সে বলল, যা হয়েছে সব ভুলে যাও। জীবনে এরকম অনেক কিছুই ভুলে যেতে হয়।

তুমি যা সহজে ভুলে যেতে পার আমি তা পারি না।

ঘা খুঁচিয়ে কারোরই লাভ হবে না। যে আগুন তোমার ভেতরে জ্বলছে—তা নিভিয়ে ফেল। আমি আর অশান্তি চাই না। সহদেব বোঝাতে চাইছিল সুভদ্রাকে, তখনই কলপাতায় মুড়িয়ে মাংস নিয়ে এল মেনি। তাকে দেখে কিছুটা সংযত হল সহদেব, প্রসঙ্গ বদলে বলল, কতদিন তোমাব হাতের মান্‌সো রান্না খাইনি। কাল একটা খামালু তুলেছিলাম ঘরের পেছন থেকে। মান্‌সোগুলো খামালু দিয়ে ঝোল রেঁধে দাও তো।

মেনি বড় মুখ করে বলল, বাবা গো, খামালু দিয়ে মান্‌সোর ঝোল খেতে আমারও খু-উ-ব ভাল লাগে।

এ সময় মেনির উপস্থিতি সহদেবকে বড় বিপন্ন করে তোলে। সুভদ্রাব মান ভাঙানোর জন্য একটু নির্জনতা প্রার্থনা করে সে। কিন্তু মেনির যাওয়ার কোন লক্ষণ নেই, সে পোষা বেড়ালের মত বসল সুভদ্রার পাশে। থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে সে কিছু অনুমান করার চেষ্টা করল। একটু আগে এই মুখের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছে এটা বুঝতে পেরে চুপ করে গেল সে।

সহদেব ঘরে আসার পর থেকে এবাড়ি সেবাড়ি খেয়ে বেড়াচ্ছে, তাকে মন ভরে দুটো খাওয়ানোর সুযোগ পায়নি সুভদ্রা। আজ মেঘ না চাইতে জল পাবার মত ভগবান সে-সুযোগ তাকে করে দিয়েছে।

ঘরে মাংস রাঁধার মত তেল নুন মশলাপাতি পর্যাপ্ত ছিল না, সহদেবের নির্দেশে মেনি গেল দোকানে। সুভদ্রা রান্নার কাজে মন দিতেই সহদেব তার ভেজা হাত ধরে বলল, তুমি আমার উপর রাগ করে থেকো না। তুমি রাগ করলে দু-চোখে আমি আঁধার দেখি। আর হাত ছাড়িয়ে নিতে পারল না সুভদ্রা, কেমন করুণ চোখে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে থাকল সে। তার শুষ্ক ঠোঁট দুটো ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেঁপে উঠল বারবার। সহদেব সুভদ্রার হাত ছেড়ে দিয়ে একটা চারমিনার ধরাল মৌজ করে, তারপর গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, চলো আজ দুপুরবেলায় এগরায় গিয়ে সিনেমা দেখে আসি। অনেকদিন একসাথে কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

সুভদ্রা শান্ত চোখ তুলে সহদেবের দিকে তাকাল, তারপর নির্লিপ্ত গলায় বলল, সিনেমায় যেতে হয় তুমি যাও। আমি মাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। দশ লোকে দশটা কথা বলবে। সেটা আমার শুনতে ভাল লাগবে না।

—ভাল না লাগলেও তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে। তুর্কী ঘোড়ার মত ছটফটিয়ে উঠল সহদেব। তার সেই ছটফটানী থেমে গেল মেনির পিছনে ঘাড় ঝুঁকিয়ে হেঁটে আসা রেণুকে দেখে।

রেণু দাওয়ার উপরে উঠল না, দূর থেকেই সহদেবকে বলল, মা তোমাকে ডাকছে। খপখপ যেতে বলেছে। আখড়া থেকে ভোগ এনেছে মা। তুমি গেলে সেই ভোগ আমরা একসাথে খাবো।

সহদেবের মুখে কোন কথা নেই। সুভদ্রা হেঁসেল ঘর থেকে এক ছুটে ঢুকে গেল বড় ঘরে। তার ফোঁপানীর শব্দ ডিঙিয়ে সহদেব নেমে এল পথে। মেনি শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকল সেই দিকে। দু-চোখ ভরে উঠল অযাচিত জলে।

আঠার

পাকা সড়কে উঠে এসে একবার পিছন ঘুরে তাকাল সহদেব। অমনি ভেতর থেকে ঠেলে উঠল অপ্রতিরোধ্য এক যন্ত্রণাবোধ। সুভদ্রার চোখের দিকে সে আর বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারেনি। ঐ চোখ দুটোয় আগুন না অশ্রু ছিল—তাও ভালভাবে দেখতে পায়নি সে। তবে বুকের ভেতরে গভীর ক্ষত আড়াল দিয়ে সুভদ্রা চলে গিয়েছিল বড় ঘরে। তার সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে কিছুটা ঘৃণা লুকান ছিল হয়ত বা। এসব দেখার মানসিকতা সহদেবের ছিল না, রেণুর বারংবার তাড়া তাকে বিচলিত করে তুলছিল। মরা ধাড়ীর মাংস তার আর খাওয়া হয়ে উঠল না। সে ভেবেছিল অনেকদিন পরে ছেলে-মেয়ের সঙ্গে খেতে বসবে, সেই সৌভাগ্য তার কপালে জুটল না। একটা দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল সহদেবের, বিড়ি ধরিয়ে সে সহজ হতে চাইল নিজের কাছে। রেণু তার পাশাপাশি হাঁটছিল, সহদেবের গম্ভীর মুখখানা দেখে সে সভয়ে শুধোল, তোমার কী হয়েছে, কথা বলছ না যে—

এবার হাসল সহদেব, বিড়ির ছাই ঝেড়ে স্বাভাবিক স্বরে বলল, ঘরে আজ মান্‌সো হচ্ছিল, তোদের ঘরে ভোগ খেতে এসে মান্‌সো ভাত আর খাওয়া হবে না। তোর কাকি তাই রাগ করেছে। দেখলি না কেমন মুখ ভার করে ছিল।

তোমার তাহলে আসা ঠিক হয়নি। রেণুর মুখ ফসকে বেরিয়ে এল কথাগুলো, আগে ঘর তারপর তো সব। তুমি বিকেলের দিকে এলে পারতে। বিকেলে এলে ভোগ নষ্ট হোত না। মা-ও মনে কিছু করত না।

রেণুর সপ্রতিভ মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা কোন কথা বলতে পারল না সহদেব, বিষণ্ণ অপরাধবোধ গ্রাস করল তার পুরো মুখ। দুপুরের চড়া রোদে সে কলকল করে ঘামছিল, প্রবাহিত ঘামের ধারায়

সে রোমাঞ্চিত হওয়ার বদলে শিউরে উঠছিল ক্রমশ। রেণু হাঁটতে হাঁটতে বলল, তোমার যদি মন চায় তাহলে ফিরে যেতে পার। আমি মাকে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলে দেব। মা কিছু মনে করবে না। মা তো অবুঝ নয়। মাথা চুলকে চিন্তিত সহদেব বলল, ফিরে যাওয়ার আর কোন প্রশ্নই আসে না। এত দূর এসে আবার ফিরে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। তাতে দু-কূল যাবে। আসলে কী জানিস মা, দু-নৌকোয় পা দিয়ে কোন মানুষই বুঝি সুখী হতে পারে না।

এ কথার কোন অর্থ বুঝতে পারে না রেণু, সে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, তারপর রুক্ষ প্রকৃতির মত উদাস হয়ে বলে, তুমি ঘরে থাকো না বলে কাকির মুখে কোনদিন হাসি দেখিনি। ঘরে এসেও যদি তুমি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াও তাহলে তার তো দুঃখ হবেই। তাছাড়া তুমি আমাদের ঘরে আস বলে ওরা কেউ খুশী নয়।

কী করে বুঝলি? প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে হা করে তাকিয়ে থাকে সহদেব। তার বুকের ভেতরটায় কে যেন খামচে ধরে অতর্কিতে। রেণু একফোঁটা ঘাবড়ায় না, ঠোঁটে মলিন একটা হাসি ছুঁইয়ে বলে, পবনদাব সাথে কথা বলে আমি বুঝেছি। সে-ও তোমার আসা-যাওয়া পছন্দ করে না। কাকি কম কথা বললেও হাবভাবে বুঝিয়ে দেয় সেও তোমার ব্যবহারে সুখী নয়। মেনি তো আমার সঙ্গে দেখা হলেও কথা বলে না। সবাই এখন আমাকে এড়িয়ে চলে। অথচ আমার কোন দোষ নেই। শুধু তুমি আমাদের ঘরে আসো—এই জন্যই ওরা আমার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে।

এটা তোর বোঝার ভুল। সহদেব জোর গলায় প্রতিবাদ করল, ওরা তো আমার মত খারাপ নয়, ওরা সবাই ভাল। আমি যে পথে হাঁটি ওরা সে পথে হাঁটতে ভালবাসে না। তাছাড়া ওদের সংসারেব জন্য আমি কী করেছি। আমি কিছু করিনি। আমি অতিথির মত আসি, খাই-দাই আবার চলে যাই। খাঁচাব পাখির জীবন আমার পছন্দ নয়। আমি এক জায়গায় আটকা থাকতে ভালবাসি না, তাতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। কেউ যদি আমাকে আটকে রাখে তাহলে তাতে তার কী ভাল হবে জানি না, তবে আমি যে দমবন্ধ হয়ে মারা যাবো একথা সত্যি। আব এই সত্যি কথাটা আমি কাউকে বোঝাতে পারলাম না। সবাই আমাকে ভুল বুঝল—

রেণু বিস্ময়ভরা চোখ মেলে সহদেবের মুখের দিকে তাকাল। ভরত বোষ্টমের স্মৃতি তার কাছে এখন আবছা জলছবি, সেই ছবি যত দিন যাচ্ছে ততই যেন ধূসর হয়ে যাচ্ছে স্মৃতির মণিকোঠায়। বিচিত্র বেদনাবোধ তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বাবার মুখখানা ক্রমশ অস্পষ্ট হতে থাকে মনের কোণায়। দেবতার মত দেখতে ছিল ভরত বোষ্টম, মাথা ভর্তি ঢেউখেলান চুল, ঝুঁটি বাঁধা মাথা, পরনে ঢিলেঢালা বাউলী পোষাক। মুখ ভর্তি দাড়ি, কাজল টানা মায়াময় দু' চোখ। সেই চোখ দুটোই বুঝি মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখতে পায় রেণু, তখন বেদনায় আচ্ছন্ন হয় পুরো শরীর। কিছুতেই সে ভারমুক্ত হতে পারে না। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রায়ই কথা হারিয়ে ফেলে রেণু। ভরত বোষ্টমের প্রসঙ্গ উঠলেই মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে চায় তার মা। এমন নির্বিকার, উদাস চাহুনীর অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না রেণু, শুধু সন্দেহের মেঘকণা দাপিয়ে বেড়ায় তার মনের কোণে। ভরত বোষ্টমের মৃত্যুরহস্য সময়ের পলিতে চাপা পড়ে গেলেও কিশোরী রেণু মন থেকে তা মেনে নিতে পারে না। বিরাট এক জিজ্ঞাসা তার মনের ভেতর বাড়তে থাকে। বারবার নিজেকে প্রশ্ন করে সে। কিন্তু সদুত্তর পায় না। সন্দেহের মেঘ বাড়তে থাকে, আর রেণু কোণঠাসা হয়ে পড়ে নিজের তোলা প্রশ্নে নিজে জর্জরিত হয়ে।

প্রতীক্ষায় ছিল অতসী বোষ্টমী, আগড় খোলার শব্দে সতর্ক, উৎসাহিত দৃষ্টি মেলে সে বাইরের দিকে তাকাল। সহদেবের আগে এল রেণু। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য অবাক হল সে, এই পরিচ্ছন্ন শান্ত সুন্দর হাসি এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল তার মা? ঠোঁটের এই চঞ্চলতা, অস্থিরতা

কই এতদিন তো তার নজরে পড়েনি। এক ঝলক মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ বিস্মিত হল রেণু, তার ভাল লাগল কেননা সে তার মাকে সুখী দেখতে চায়। তবে অন্যকে কাঁদিয়ে সে হাসতে চায় না, হাসির রঙ তো সোনা রোদের মতন, তাতে তো কান্না মিশে থাকে না। হঠাৎ করে কাকির মুখটা রেণুর মনের কোণে ভেসে উঠল, আজ মায়ের ঠোঁটে যে হাসি ঝুলে আছে—তেমন বিশুদ্ধ হাসি সে তো কাকির মুখে দেখতে চায়। কিন্তু কোথায় সেই হাসি, কে শুষে নিল মানুষের হৃদয়ের রঙ।

অতসী বোষ্টমীর মুখোমুখি বসেছিল সহদেব, তার উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষুযুগল চেয়ে চেয়ে দেখছিল, সেই দৃষ্টিতে পাপ নেই, শুধু দর্শনের তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণা কি কোনদিন মিটবার নেই, এই তৃষ্ণা কি শুধু জ্বালা ধরিয়ে দেবে বুকের খোদলে?

অনেকক্ষণ পরে কথা বলল অতসী বোষ্টমী, তার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন অভিমান, আমাকে ভুলে যেতে চাও ক্ষতি নেই, তবে ভুলে গিয়ে যদি সুখী হতে পার তো সুখী হও। আমি তোমাকে বাধা দেব না। আমি বাধা দেবার কে? আর আমি বাধা দিলে তুমি শুনবেই বা কেন?

সহদেব মাটির দিকে মুখ নামিয়ে চুপ করে থাকল। ফাঁকা মাঠের মত তার মন এখন হাহাকারে ভর্তি, কথা বলার ইচ্ছাও ছিল না। অতসী বোষ্টমী বিরক্ত হয়ে বলল, তোমাকে কি বোবায় ধরেছে, অমন চুপ করে আছো কেন? যদি শরীর খারাপ তো এলে কেন? ভোগটা খেয়ে নিয়ে ঘর চলে যাও। আমি বুঝতে পারছি—ঘরের জন্য তোমার মন টানছে। টানাটাই তো স্বাভাবিক। এতদিন পরে ঘরে এসেছ, বউ তোমাকে ছাড়বে কেন? তারও তো কিছু পাওয়ার আছে।

সুভদ্রা আমার সাথে কথা বলে নি, ও ওর অভিমান নিয়ে দূরে-দূরে আছে। আমি ওর মনের নাগাল এখনও পাই নি। কথাগুলো বলেই অতসী বোষ্টমীর মুখের দিকে তাকাল, নেশা ধরা চোখ দুটোয় তখন বিবশ আচ্ছন্নতা। কোনক্রমে বলল, এই সংসারে মানুষ যে কার কাছ থেকে কী চায় তা বলা মুশকিল। আমি সুভদ্রার কাছে অনেক কিছু চেয়েছি—সে আমাকে কিছু দেয় নি। অথচ ওর কাছে গেলে আমার মনে হয় ও একটা সমুদ্র, ওর তল নেই, সীমা নেই। ওর চোখের দিকে আমি তাই বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারি না। আমার ভয় করে, আমার শুধু মনে হয়—ও আমার ভেতরের মনটাকে পুরোপুরি দেখতে পায়। আমার ভেতর আর বাইরের কোন মিল নেই। এই অমিলটাই ও আমাকে নীরব থেকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ওকে ভালবাসতে গেলে আমার বাঘের মত মনটা কেন্নোর মত কুঁকড়ে যায়।

অতসী বোষ্টমীর মুখ ভার হয়ে ওঠে কথা শুনে, চাপা অম্বলের রোগীর মত মুখ করে সে উত্তর দেয়, ঘরে যার অত সুন্দর বউ—তার উচিত নয় বাইরের দিকে নজর দেওয়া।

নজর ঘর-বার বোঝে না! নজর বোঝে তার নিজের কদর।

সহদেবের কথায় মুহূর্তে জ্বলে উঠল অতসী বোষ্টমী, তাহলে নিজেকে সামলাও। খোঁটা উপড়ান গোরুর কপালে কিন্তু সুখ লেখা থাকে না। এই আমাকে দেখ, আমাকে দেখে শিক্ষা নাও। সে মানুষটা তো আমার দোষে মরল। আমার পাপই তো তোকে শ্মশানের দিকে টেনে নিয়ে গেল। সে মরল তাতে আমার কী লাভ হল? আমি তোমার মত ছন্নছাড়া আগুন নিয়ে সুখ পেতে চেয়েছিলাম। অথচ সুখ পেলাম কই। আগুনই খাক করে দিল সব। এখন বয়স বাড়ছে, যত দিন যাচ্ছে ততই যেন বুঝতে পারছি আমি ভুল করেছি। কাউকে কাঁদিয়ে সুখ পাওয়া যায় না। হয়ত শরীরের আরাম হয় কিছু সময়—কিন্তু সেই আরাম তো জীবনের সব নয়। এই সার বোধটা আমি যদি আগে বুঝতাম—তাহলে এত বড় ভুল আর হোত না।

—জীবনে ভুলও একটা অংশ, তা নিয়ে এত ভাবো কেন?

—ভাবব না, না ভাবলে আমার ভাবনাটা কে ভাববে? অতসী বোষ্টমীর ঝলসান গলা, মেয়েটা ধেই-ধেই করে বড় হচ্ছে। ওর নিষ্পাপ চোখ দুটোর দিকে তাকালে আমার বুক শুকিয়ে যায়। ওর জীবন যে কোন ঘাটে গিয়ে ঠেকবে কে জানে। আমার তো তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমার কথা বাদ দাও।

—আমি যদি বেঁচে থাকি রেণুকে নিয়ে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে।

—রেণুকে নিয়ে আমি চিন্তা করতে চাই না। তবু চিন্তা এসে যায়। চিন্তার কাছে বাউল-ফকির সবাই বুঝি হার মেনেছে।

সহদেব আবার একটা বিড়ি ধরিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, রেণু তো দেখতে-শুনতে মন্দ নয়। ওর বিয়ের জন্য পাত্র পেতে কোন অসুবিধা হবে না। টাকা পয়সা সব আমি যোগাড় করব। ও আর একটু সেয়ানা হোক—তারপর দু হাত এক করে দেব।

ভোগ খাওয়া শেষ হলে এঁটো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে বেড়ার ধারে ফেলে আসে অতসী বোষ্টমী। গনগনে রোদে তার ফর্সা মুখ লাল হয়ে ওঠে নিমেষে। পুকুরে মুখ ধোওয়ার সময় সহদেব পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখল অবিকল মৎস্যরাণীর মত দেখাচ্ছে অতসী বোষ্টমীকে। এই মাঝ বয়েসে রূপের বাঁধন একটুও ঢিলে ঢালা হয়নি, বরং পদ্মকুঁড়ির চেয়েও সতেজ। সহদেব আর এঁটো হাতে দাঁড়িয়ে না থেকে সতর্ক পায়ে নেমে এল ঘাটে। অতসী বোষ্টমীর গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, শরীরের আগুন মানুষকে বুঝি বেশী পোড়ায়।

—কেন একথা বলছো? তির্যক চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় অতসী বোষ্টমী, তার জলে ভেজা ঠোঁট দুটো অস্থির হয়ে ওঠে হাওয়া লাগা বাঁশপাতাব মত। সহদেব মুখ ধুয়ে কুলকুচি করে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর ঢেকুর তুলে বলল, এত খেলাম তবু তো খিদে গেল না। সুভদ্রাব কাছে যা পাইনে তা তো আমি তোমার কাছে চাই।

—তুমি যা চাও তা দেবার ক্ষমতা আমার আর নেই। আমার রক্তে এখন ভাটা। আমি এখন কোন-মতে দিনগুলোকে পার করে দিতে চাই।

—ভাটা তোমার রক্তে নয়, মনে। সহদেব অতর্কিতে হাত ধরল অতসী বোষ্টমীর, তারপর মিহি স্বরে বলল, জোয়ার-ভাটা নিয়েই জীবন। আমি জীবনকে অন্য চোখে দেখি। পুরো গাঁ আমাকে এখানে আসার জন্য দোষারোপ করে। তবু আমি এখানে আসি। না আসলে আমার যে মুক্তি নেই। আগুন-পোকা দেখেছো, আমি হলাম গিয়ে সেই আগুনপোকা। জানি মরব—তবু তো আগুনের সাথেই আমার যাবতীয় ছলা-কলা।

—পুড়তে তোমার ভয় করে না? গলা কেঁপে উঠল অতসী বোষ্টমীর, হয়ত প্রখর রৌদ্রতাপে ঝাঁঝিয়ে গেল চোখ, কোনমতে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলল, পাপকে আর প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। তুমি ঘর চলে যাও। তোমাকে একটু চোখে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল, তাই ছুঁতো করে ডেকে এনেছি। আমার দেখার আশ মিটে গিয়েছে—এবার তুমি ঘর যাও।

—যাব বলে তো এখানে আসি নি। এখানে আমি এসেছি—নিজেকে খুঁজে পাব বলে। আর তুমি আমাকে ডেকেছো—আমার মধ্যে নিজেকে দেখবে বলে। সত্যিটাকে গোপন করে তুমি কেন নিজেকে আড়াল করতে চাইছ। দেশ-দুনিঁয়া জানে—তুমি আমার কে, আমি তোমার কে। তুমি কার মুখে হাত চাপা দেবে? সবার মুখে তুমি হাত চাপা দিলে নিজের মনকে তুমি বোঝাবে কী ভাবে? নিজের কাছে তুমি নিজে যে হেরে বসে আছো।

দুপুরে আর ঘরে ফিরে যায় না সহদেব।

অতসী বোষ্টমীর কোলে মাথা রেখে সে চেয়ে আছে দূরের দিকে। তার ঘন কৃষ্ণকালো চুলে স্বর্ণচাঁপা আঙুলগুলো নড়ছে পরম ভালবাসায়। নীড় হারা দুটি পাখি যেন নীড়ের সন্ধান পেয়ে বিস্ময়, আনন্দ আর ভালবাসায় মৌন হয়ে আছে জাগতিক জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে।

দুপুরে খেতে বসে পবন দুঃখী সুভদ্রার মুখের দিকে আর তাকাতে পারছিল না, এ সময় কোন প্রশ্ন করা শোভন না বুঝে সেও বোবার মত খেয়ে যাচ্ছিল পাতের দিকে তাকিয়ে। মেনি ঘাস ফড়িংয়ের চেয়েও তড়বড়ে, তার মুখে কোন কথা আটকায় না, হয়ত কিছু বলার জন্য সে ছটফট করছিল মনে মনে, পবনের নীরবতায় সে ধৈর্য হারিয়ে বলল, দাদারে, খেয়ে-দেয়ে তুই একবার রেণুদের দুয়ারে যা তো। রেণু এসে বাবাকে ডেকে নিয়ে গেল। মা কত কষ্ট করে মান্‌সো রাঁধল, বাবার আর খাওয়া হল না। মেনির যত রাগ রেণুর উপরে, তার ধারণায় রেণু যদি ঐ অসময়ে তাদের দোরে না আসত ডাকতে তাহলে তার বাবা হয়ত যেত না। সুভদ্রা ছেলের পাতে দু-টুকরো মাংস তুলে দিয়ে মেনির দিকে উষ্ণ চোখে তাকাল, তরপর খুবই নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, রেণুকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ তোর বাবারও নয়, দোষ আমার ভাগ্যের। আমার কপালে ভগমান কোনদিন আর সুখ লিখল না।

পবন মায়ের ছলছলে চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার স্পর্ধা পেল না, তার বুকের ভেতরটা বুঝি পুড়ে যাচ্ছিল—এমন চোখ করে সে তাকাল। কিন্তু তার মুখে কোন ভাষা পরিস্ফুট হল না, নিগূঢ় অসহায়ত্ব ছায়া ফেলল পুরো মুখটায়। খাওয়া শেষ করে নত মুখে উঠে গেল সে। মেনিও মন খারাপ করে কথা বলা থামিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকাল। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠতেই সুভদ্রা খুবই শান্ত ভাবে বলল, যার যেখানে মন চায় সে সেখানে গিয়েছে। তার জন্য তোদের এত চিন্তা কীসের, আমি তো আছি, আমি তো আর মরিনি। মেনি পুকুরঘাটে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে, মায়ের কথা কানে যেতেই পিছন ফিরে তাকাল। দু-চোখ ভরে উঠল জলে, ঠোঁট দুটো অস্থির হয়ে উঠল পলকে, কান্নার আবেগকে সংযত করে সে বলল, কতদিন পরে বাবা ঘরে এসেছে, আমাদেরও তো মন করে তার সাথে বসে খেতে।

—খাবি। খাওয়ার দিন কি পালিয়ে যাচ্ছে? সুভদ্রার কথাগুলো মনঃপূত হল না মেনির। উঠোনে দাঁড়িয়ে চড়া সুরে সে বলল, মা, তুমি যেমন দুঃখ সইতে পার আমরা তেমন পারি না।

—পারতে হবে, মেয়ে হয়ে জন্মেছিস যখন তখন সব কিছু পারতে হবে তোকে। না পারলে কাঁদবি। তখন চোখের জল মুছিয়ে দেবার কেউ থাকবে না। সুভদ্রার নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বর কানে যেতেই মেনি ব্যথাহত চোখে তাকাল। বুঝতে পারল তিতিবিরক্ত মাকে কথার বাণে বিদ্ধ করে আর লাভ নেই। দুঃখ-আঘাত তার মাকে পাষাণ করেছে, শুষে নিয়েছে হৃদয়ের সুপ্ত আশা-আকাঙ্খা। এখন কিছু বলার অর্থ মাকে আঘাত করা। মাকে সে কোনভাবেই দুঃখ দিতে চায় না। মা তার কাছে সুনীল আকাশ, সর্বংসহা ধরিত্রী।

বিকেল ফুরিয়ে যায়, তবু সুভদ্রার মুখে দানা ওঠে না, সে পথের দিকে হা-পিত্তেশ করে চেয়ে থাকে, ভাবে—এই বুঝি ঘরের মানুষটা ফিরে এল। সন্ধ্যার পরও ফিরে এল না সহদেব। সুভদ্রাকে শুকনো মুখে ঘোরাফেরা করতে দেখে হৈমবুড়ি শুধোল, তোর কী হয়েছে বউ, কার জন্যি পথ চেয়ে আছিস? সে যখন অসময়ে গিয়েছে তখন সময়মত ফিরবে না। তুই কেন মিছিমিছি তার জন্যি কষ্ট করবি। যা বউ তুই খেয়ে নে।

সুভদ্রা চমকে ওঠে হৈমবুড়ির কথায়। পারোতপক্ষে সে চায়নি এসব কথা হৈমবুড়ি জেনে যাক। তবে তার কান অব্দি এসব কথা কে পৌঁছে দিল? পবন তো খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু গড়িয়ে নিয়ে হাটখোলায় চলে গিয়েছে, মেনি গিয়েছে পাতা ঝাঁট দিতে বাঁশতলায়—তাহলে কীভাবে এসব জেনে গেল বুড়িটা? সে যা চায়নি তাই হল শেষে। হৈমবুড়ি সুভদ্রার কাছে সরে এসে নীচু গলায় বলল,

তার জন্যি দুঃখ করিস নে বউ। সে আমার ছেলে, তাকে আমি চিনি। তরলা বাঁশঝাড়ে কী ভাবে যে কাঁটাবাঁশ জন্মাল—আমার সেটাই চিন্তা।

সন্ধ্যা উতরে যাওয়ার পরেও ঘরে আসে না সহদেব। বাইরের চুলায় পাতার জ্বালে ভাত ফুটাচ্ছিল সুভদ্রা, ধোঁয়ায় চোখ-মুখ লাল, উড়ো ছাই ঘামে মিশে মুখটা তার কেমন কালো হয়ে উঠেছে। সেই চ্যাটচেটে অস্বস্তিকর ভাবটা কাটিয়ে উঠে সুভদ্রা অন্ধকারে একবার দূরের দিকে তাকাল, অমনি ভয়ে বুক ভেঙে গেল তার, অধিকার হারানোর মর্মজ্বালায় দগ্ধ হতে থাকল সে। অতসী বোষ্টমীর কাছে সে কি হেরে যাবে, এমন সহজে হার স্বীকার বিধাতা তার কুষ্টিতে লেখেনি। তাহলে কেন সে হেরে যাবে, কেন ভাসিয়ে দেবে এতদিনের আঁকড়ে ধরা সংসার? অশুভ শক্তির কাছে তার এই পরাজয় কিছুতেই সে মেনে নেবে না।

নিঃঝুম রাত হাড়িসাইয়ের পুরো শরীরে চাপিয়ে দেয় অন্ধকারের কালো ওড়না। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে হৈমবুড়ি শুতে গিয়েছে অনেকক্ষণ হল। মেনি তার বিছানায় শোয়। সারা দিন খাটাখাটনী করে পবনও বেশী রাত অব্দি জাগতে পারে না, তার ভোরে ওঠার তাড়া আছে—তাই সেও বিছানা আঁকড়ে ধরেছে ক্লান্তিতে। সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেও সুভদ্রার চোখ থেকে ঘুম উধাও। কে যেন জাগিয়ে রেখেছে তাকে, অশান্ত মনটাকে উস্‌কে দিয়ে বলছে, এভাবে হেরে যাওয়া ঠিক নয়, ঠিক নয়। অধিকার মানুষকে ছিনিয়ে নিতে হয়। অধিকার হারান সহজ, তাকে রক্ষা করাই কঠিন।

কাল বিলম্ব না করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুভদ্রা। সারাদিনের ক্লান্তি অবসাদে গা-হাত-পা টলছিল তার, অন্ধকার পথে বার দুই হোঁচট খেতেই সতর্ক হল সে। এই নিকষ কালো পথ ধরে কোথায় চলেছে সে, কে তাকে এমন হিড়হিড়িয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মাঠের মাঝখানে। এ গাঁয়ের বউ হয়ে আসার পব থেকে ঘবের বাইরে সে তেমন একটা বেরয়নি, বেরনোর প্রয়োজনও হয়নি। হৈমবুড়ি তাকে মানকচু গাছের পাতার নিচে সবুজ ছত্রাকের মত আগলে রেখেছে, ঝড়-ঝঞ্ঝা কোনকিছু গায়ে লাগতে দেয়নি। আজ হৈমবুড়িকে না বলেই সে বেরিয়ে এসেছে পথে। সে নিরুপায়, তার কিছু যে করার নেই। ঘরে আগুন লাগলে জল ঢেলে তা নেভান যায়, কিন্তু মনের আগুন সে নেভাবে কেমনভাবে? এত শক্তি সে কোথায় পাবে? মাঠের মাঝখানের ঘরখানা ভূতুড়ে বাড়ির মত দেখায়। সুভদ্রা হাঁপু ধরা বুকে আগড় সরিয়ে ঢুকে আসে আঙ্গিনায়। শুয়ে থাকা কুকুরটা পায়ের শব্দে ডেকে ওঠে ঘেউ-ঘেউ। ক্রমাগত ডাকতে থাকে কুকুর। রাতের নৈশব্দতা খান খান হয় সেই বিশৃঙ্খল চিৎকারে। অতসী বোষ্টমী লণ্ঠন হাতে বাইরে এসে সুভদ্রাকে দেখে চমকে ওঠে, বাতি উসকে শুধোয়, কে, কে তুমি?

—আমি সুভদ্রা। মেনির মা।

—এত রাতে, কী ব্যাপার? অতসী বোষ্টমীর গলা কেঁপে ওঠে। আস, ঘরে আস।

—আমি তার খোঁজে এসেছি, সে-মানুষটা কোথায়?

—তুমি যার খোঁজে এসেছো সে যে এখন কোথায় তা আমি নিজেও জানি না।

—ভণিতা না করে সহজ কথাটা সহজভাবে বলে দাও।

—জানলে তো বলব। অন্ধকারে মুখ হা-করে অতসী বোষ্টমী উপরের দিকে তাকাল, তার অক্ষমতা সুভদ্রা বুঝতে পারল কি না এ নিয়ে সে যথেষ্ট সন্দিহান। নিজের স্বপক্ষে সে আবার বলল, সাঁঝ লাগার পর থেকে সে উশখুশ করছিল ঘর ফেরার জন্য। আমি তাকে বাঁধা দিই নি। তার স্বভাব তো আমি জানি। বাঁধা দিয়েও কোন লাভ হোত না। সে চলে গিয়েছে।

কথাগুলো গায়ে মাখল না সুভদ্রা, অন্ধকারে যেমন এসেছিল তেমন ভঙ্গিমায় নেমে এল পথে। মেঠো পথে ওড়াওড়ি খেলায় মেতে ছিল জোনাকিরা। নক্ষত্র সমাবেশের ক্ষীণ দীপ্তি আলোর অণু-কণিকা হয়ে গড়িয়ে পড়ছিল ফাঁকা মাঠে। পথ অপরিচিত হলেও পথ চলতে অসুবিধা হচ্ছিল না সুভদ্রার।

সে শুধু ভাবছিল, মানুষটা গেল কোথায়। যাওয়ার মত জায়গা তার তো আর কোথাও নেই। তবে কি কোন বিপদ-আপদ হল? অতসী বোষ্টমীর মুখ দেখে সুভদ্রা অনুমান করে নিয়েছিল সহদেব তার ঘরে নেই। যদি থাকত তাহলে কথাবার্তায় সে ঠিক বুঝতে পারত। পাপীর গলার কাঁপন অন্ধ মানুষও বুঝতে পারে।

মাঠ পেরিয়ে এলেই পাকা সড়ক। এখন শুনশান। ঝিঁঝিপোকার ডাক ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন শব্দ নেই এখন। ফাঁকা পথে সুভদ্রার কেমন ভয় ভয় করে, তার একটাই ভয় যদি চেনা জানা কোন লোকের সাথে এই অসময়ে দেখা হয়ে যায়। একটা অজুহাত মনেমনে খাড়া করার চেষ্টা করছিল সে, যাতে তাকে অপ্রস্তুত না হতে হয়। বেশ কিছুটা হেঁটে এলেই হাড়িসাইয়ে ঢোকার পথ। সুভদ্রা দূর থেকে দেখতে পেল যুগলবুড়ার ঘরে ডিবরি জ্বলছে। তাহলে কি সারারাত অসুস্থ মানুষটা ভয়ের জন্য ডিবরি জ্বালিয়ে ঘুমায়? প্রশ্নটা নিজের কানে খটকা লাগে তার। যার তেল কেনার পয়সা নেই, সে কেন সারারাত ডিবরি জ্বেলে রাখবে? এই শুকনো বিলাসিতা অর্থহীন। তবে কি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বুড়োটার? সুভদ্রা পথ পরিবর্তন করে ঢুকে এল গলিপথে। কলাঝাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে সে শুনল যুগলবুড়া বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। দূর থেকে মুখ দেখা যায় না, উদ্ধার করা যায় না কী বলছে বুড়োটা। অনুসন্ধিৎসু মনে আরো ক' পা এগিয়ে গেল সুভদ্রা। ডিবরির আলোয় সে দেখতে পেল যুগলবুড়া মুখ ঝুঁকিয়ে বসে আছে, তার সামনে প্রায় মূর্ছিত অবস্থায় শুয়ে আছে কে যেন। বুড়োর ভগ্ন ছায়া পড়েছে সেই মূর্ছিত শরীরে। যুগলবুড়া আনমনে বলে চলেছে, বাপরে, তোর অমন অধঃপতন আমি সপনেও ভাবি নি। ঘরে বউ ফেলে কেউ কি বাইরের মেয়েছেলের কাছে যায় রে। জানি না বাপ এ তোর কেমন রুচি। এ যুগে কেউ যে সোনা ছেড়ে পেতল আঁকড়ে ধরে এ কথাও আমি শুনিনি।

শুয়ে থাকা মূর্ছিত শরীরের কোন সাড় নেই। বুড়োটা তবু আপন খেয়ালে বকে চলেছে। কাল বিলম্ব না করে সুভদ্রা সরাসরি ঢুকে পড়ে উঠোনে। দূরে দাঁড়িয়ে শুধোয়, কাকা গো, মেনির বাবা কি তোমার এখানে এসেছে? কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে যুগলবুড়া ডিবরি হাতে উঠে দাঁড়ায়, তারপর কাশতে কাশতে বলে, হ্যাঁ, সহদেব আমার এখানে এসেছে। তবে সে আসতে চায় নি, আমি তারে জোর করে পথ থেকে তুলে এনেছি। নেশা করে তার কোন হুঁশ ছিল না। দেখতে পেয়ে আমি তারে তুলে আনলাম। সেই থেকে চেষ্টা করছি জ্ঞান ফিরোবার। তার জ্ঞান ফিরেছে, তবে এখনও সে মাতাল।

সুভদ্রা ঝড়ের বেগে ছুটে গেল সেই মূর্ছিত শবীরের দিকে, তার চোখ ভর্তি জল টলটল করছিল যে কোন মুহূর্তে ঝরে পড়ার জন্য।

উনিশ

তারায় ভরা রাত, মেঘহীন স্বচ্ছ। এলোমেলো হাওয়া নেই এখন, তবু মুখের উপর আছাড় খেয়ে পড়েছে খোপা ভাঙা চুল সুভদ্রার। সারাদিনের ধকলে ক্লান্ত চাহুনী, একভাবে বসে থেকে ঝিমুনী আসছিল তার। হাড়িসাই এখন ঘুমে কাদা। শুধু বাঁশে বাঁশে ঠোকাঠুকি লেগে মাঝে মাঝে খটখটাস শব্দ উঠছিল বাতাসে। সেই শব্দ কানে যেতেই সতর্ক কুকুর ডেকে উঠছিল ঘেউ ঘেউ শব্দে। পাড়া জেগে উঠছিল তাতে। কেটে যাচ্ছিল সুভদ্রার ঝিমুনী। এত রাতে কেউ জেগে নেই এখন। গাছপালাও ঘুমোয় মানুষের মত। শুধু ঘুমাতে পারছে না সুভদ্রা। বুকের ভেতর থেকে ভয় উঠে এসে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে তাকে।

এইভাবে কেটে যায় সময়। অধৈর্য যুগলবুড়া জ্ঞান দেবার ভঙ্গিমায় বলল, এখানে আর বসে থেকো না বউমা, ঘর যাও। আমারও শরীর বিশেষ ভাল নেই। রাত উজাগারা হলে এই শরীর নিয়ে আমি আর ভিখ্ মাঙতে যেতে পারি না।

ব্রজবুড়া গত হবার পর থেকে যুগলবুড়াই হলো হাড়িসাইয়ের মুরুব্বি মানুষ। তার কথা এখনও মান্য করে চলে অনেকে। আপদে-বিপদে পড়লে এখনও শলা পরামর্শ করার জন্য ছুটে আসে এ-পাড়ার অনেকে। সহদেবের উপর যুগলবুড়ার দুর্বলতা অনেক দিনের। যাকে সে ছেলের মত ভালবাসে, স্নেহ করে-তার জন্য বুকের ভেতরটা কঁকিয়ে উঠতে বাধ্য। তবু এই নিষ্ঠুর কথাগুলো তার না বলে উপায় ছিল না। যে জেগে ঘুমায়, তার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া মানুষের কর্তব্য। যুগলবুড়া আবার সেই একই গলায় বলল, যাও বৌমা, সহদেবকে সাথে নিয়ে চলে যাও। তুমি না আসা পর্যন্ত তাকে আমি দেখভাল করছি। আর রাত বাড়িও না, এবার আমি একটু ঘুমাব। দিনভর ভিখ না মাঙলে আমার হাঁড়ি চড়বে না।

সুভদ্রা মনে মনে বিরক্ত হলেও নিজেকে বাঁধন দেয় শক্তভাবে। সহদেবকে নিয়ে তার যে আর কত দুঃখ-কষ্ট আছে তা সে নিজেও জানে না। তবে বিয়ের পর থেকে সে কাঁদছে গভীর গোপনে। তার চোখের জল মুছিয়ে দেবার কেউ নেই। বুড়ি শাশুড়ির সান্ত্বনা বাক্য এখন তার মনে কোন দাগ কাটে না। যার ঘর পুড়ে গেছে তার কাছে ছাইয়ের মূল্য আর কতটুকু? ভাঙা মন জোড়া লাগে না সহজে। তবু বোঝাতে হয় মনকে। তালে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। একটু এদিক-ওদিক হলেই সামাজিক অনুশাসন বিক্ষিপ্ত করে তুলবে মনকে।

সহদেব ঘরছাড়া হবার পর থেকে সুভদ্রার মনের শান্তি বিঘ্নিত। পলকা বাঁশকোড়ার মত ভেঙে গেছে তার মন। ভাঙা মন নিয়ে সে আর কতদূর হাঁটবে একা-একা। সহদেব সংসারে থেকেও নেই। তার চাল-চলন একটুও শুধরায়নি। এতদিন পরে ঘরে ফিরে এসেও মন তার বাইরে পড়ে আছে। অবহেলা-অনাদরে সুভদ্রার বুকের ভেতরটা গুমরে ওঠে। ছলছলিয়ে ওঠে চোখ। কোনমতে সে ছুঁযে দেয় সহদেবের শরীর; অস্ফুটে বলে, ওঠো, ঘর চলো।

আড়মোড়া ভেঙে সহদেব ধূর্ত চোখে তাকাল, ঘর? আমার তো ঘর নেই! তুমি যাও, আমি এখানেই রাতভর ঘুমাব। ঘর তো আমার জন্য নয়, ঘর তোমাদের জন্য।

এবার কান্না ঠেলে উঠল সুভদ্রার গলায়, রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে খাঁ-খাঁ করে উঠল তার বুক, চোখ মুছে নিয়ে সে বলল, ঘরে চলো। ঘরে গিয়ে যা খুশি বলো আমাকে। আমি সব সইব।

সুভদ্রা এত জোরের সঙ্গে কথাগুলো বলল যা শুনে চমকে উঠল সহদেব। টানা টানা গলায় বলল, মানুষকে বিশ্বাস করে আমি ঠকেছি। তবু আমি মানুষকে বিশ্বাস করব, ভালবাসব। কেউ আমাকে এ পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারবে না। অসংলগ্ন কথার ভিড়ে সহদেব বুঝি তার মনের কথাটা আবিষ্কার করে ফেলেছে।

সুভদ্রা হাত ধরে উঠাতে চাইল সহদেবকে, কিন্তু এতবড় পুরুষ মানুষকে সে কী ভাবে টেনে তুলবে? একবার ভাবল ঘরে গিয়ে ডেকে আনবে পবনকে। নয়ত চিৎকার করে মাথায় তুলবে পাড়া।

শেষ পর্যন্ত সুভদ্রাকে কোনো কিছুই করতে হল না, যুগলবুড়া উঠে গিয়ে ভাঙা বালতিতে জল নিয়ে এল পুকুর থেকে। এক বালতি জল সে উবুড় করে ঢেলে দিল সহদেবের মাথায়, তারপর তিরস্কার করে বলল, আমি জানি, তোর নেশা সহজে ছুটবে না। মদের নেশা হলে কখন ছুটে যেত, তোর যে অন্য নেশা বাবা! ও নেশা তো সারা জীবন রক্তে থাকে, শ্মশানে গিয়ে শেষ হয়।

কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল সুভদ্রার, স্বামীর নিন্দে কানে শোনাও পাপ। যুগলবুড়া বরাবরের ঠোঁটকাটা। কে তার মুখে হাত চাপা দেবে? সুভদ্রা জোর করে হাত ধরে উঠাতে চাইল সহদেবকে। কিন্তু কাটা গাছের গুঁড়ির মত সে নড়াতে পারল না সহদেবকে। জলে ভেজা শরীর নিয়ে সহদেব পড়ে থাকল নেশার ঘোরে।

হরিহরের চুল্লু ভাটিতে গলা অব্দি চোলাই খেয়েছে সহদেব। অতসী বোষ্টমীর কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটে দেওয়া কথাগুলো সে কিছুতেই হজম করতে পারেনি। অতসী বোষ্টমী বলেছিল, তোমার জন্য আজ আমার এই দশা। রেণুরও মাথার উপর ছায়া নেই। অথচ তুমি বলেছিলে, রেণুকে মেয়ের মত আগলে রাখবে। কোথায় গেল তোমার সেই গালভরা কথা। আমি এখন কার মুখ চেয়ে বাঁচব, আমার মেয়েটাকেই বা কে দেখবে?

—আমি তো মরে যাই নি। সহদেব জবাব দিয়েছিল উষ্মা ভরা গলায়, আমি যতদিন বেঁচে আছি, তোমাদের কোনদিন অসুবিধা হতে দেব না।

—তুমি উড়ো পাখি, চোরাবালি। তোমার ভরসায় থাকা না থাকা সমান। আমি ঢের ঠকেছি, আর ঠকতে চাই না। অতসী বোষ্টমীর গলা থেকে বিষ ঝরে পড়ল, তোমার মত দায়-দায়িত্বহীন মানুষ আমি আর জীবনে দুটি দেখিনি। যাত্রা করো বলেই কি তুমি সবার কাছে বাড়তি সুবিধা নেবে?

—ভালোবাসা ছাড়া আমি আর তোমার কাছে কিছু চাই না। গমগমিয়ে ওঠে সহদেবের গলা, তুমি যদি না চাও, আমি এখানে আর আসব না। আমি ভালোবাসার কাঙাল, তা বলে ভেবো না আমার কোনো মান-সম্মান জ্ঞান নেই। যদি তাড়িয়ে দাও তাহলে যাচ্ছি—

—হ্যাঁ- হ্যাঁ, তা তো যাবেই! এখন তোমার মুখে অনেক বুলি ফুটেছে: পাখি উড়তে শিখলে তাকে কি আর বাসায় ধরে রাখা যায় গো? তুমি চলে যাবে আমি জানি। তোমার বৌ-ছেলে-মেয়ে, ঘর-সংসার সব আছে। আমারও একদিন সব ছিল, কিন্তু তোমার জন্য আজ আমি সব হারিয়েছি। আমি ভুল করেছি যার কোন ক্ষমা নেই। কান্নায় বুঁজে এসেছিল অতসী বোষ্টমীর গলা, দোহাই তোমাকে, তুমি চলে যা[illegible] [illegible]র এখানে এসো না। আমার ভাঙা ঘরে যেটুকু সুখ আছে তা তুমি নষ্ট করে দিও না। যা হাবিয়েছি আমি তা আর এ-জীবনে ফেরৎ পাব না। যা আছে তাই নিয়ে আমাকে থাকতে দাও।

সহদেব হাত ধরতে চেয়েছিল অতসী বোষ্টমীর, কিন্তু এই সামান্য সুযোগটুকু সে পেল না। অতসী বোষ্টমীর চোখের জল ছ্যাঁকা দিল তার বুকে। অপমানবোধে ঝুঁকে গিয়েছিল মাথা। চোখের তারায় অস্থির কাঁপুনী। পায়ের নিচ থেকে সরে যাচ্ছিল মাটি। যা সে শুনল নিজের কানে—এসব কি অতসী বোষ্টমীর মনগড়া, নাকি অভিমানভরা শীতল উচ্ছ্বাস?

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘরে ফেরার ইচ্ছা করেনি সহদেবের, হরিহরের চুল্লু ভাটি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। রাত জাগা হলে সে দেশী মদ খেত গ্রীনরুমে বসে। তা-ও প্রতিদিন নয়, যেদিন মন চাইত সেদিন।

টালমাটাল পায়ে ঘরে ফেরার সময় বেড়ার ধারে হুমড়ে পড়ে গেল সহদেব। চলকে উঠল পেটের ভেতর তরল পানীয়। গা বমি দিয়ে উঠেছিল নিমেষে। উঠে দাঁড়াবার এক ফোঁটা শক্তি ছিল না শরীরে। যুগলবুড়া তাকে বেড়ার ধার থেকে তুলে নিয়ে আসে ঘরে।

যুগলবুড়া যা পেরেছে অনায়াসে সুভদ্রা তা পারে না শত চেষ্টা করেও। সে অসহায়ভরা চোখ দুটি মেলে তাকাল যুগলবুড়ার দিকে। বুড়োটা বাতি উসকে বলল, চলো, ওরে আমি দিয়ে আসি। আজ রাতটা আমার মাটি হলো। বুড়া মানুষ, টুকে না শুলে দিনভর ঘোরাঘুরি করতে পারিনে। আজ ভগবান আমার চোখে ঘুম লেখে নি।

কথাগুলো শুনে ফিকে হয়ে যাওয়া নেশায় কোনমতে উঠে দাঁড়াল সহদেব, তারপর সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলল, আমি মরব না, তুমি তো জানো তবু তুমি কেন এলে? যাও, ঘর চলে যাও। আমার মুখে আর চুনকালি লেপে দিও না।

সুভদ্রা ঠোঁটে ঠোঁট টিপে দাঁড়িয়ে থাকল তবু। সহদেব বলল, আজ আমার এই অবস্থার জন্য তুমি দায়ী। তুমি যদি আমাকে শাসনে রাখতে—তাহলে কি আমি বেপথে যেতাম।

—চুপ কর পাপী, তোর মুখে ও কথা মানায় না। যুগলবুড়া গরগরিয়ে উঠল রাগে, তার চোখের নিচের মাংসগুলো থরথর করে কাঁপছিল, তবু সে গলা চড়িয়ে বলল, সুভদ্রার মত মেয়েমানুষ হয় না। এ পাড়ায় ও বড় বেমানান। তোর অনেক ভাগ্য যে সুভদ্রার মত বউ পেয়েছিলিস।

সহদেব কোন উত্তর না দিয়ে সোজা হেঁটে এল বেড়া অব্দি। তার চোখে ঘুম জড়ানো। রাতের হাওয়ায় মিশেছিল স্নেহের পরশ। তারা ফোটা আকাশের তলায় গাছগুলো কত শান্ত। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে রাতের বয়স বাড়ছে বোঝা যায়। চারদিক শুনশান হলেও দু-একটা কুকুর সহদেবকে লক্ষ্য করে ডাকছে। ওদের ডাকে পেছন-পেছন আসা সুভদ্রার বুকের ভেতরে ভয়ের ঢেউটা আছড়ে পড়ল সহসা। সে ছুটে গিয়ে হাত ধরল সহদেবের, নিস্তেজ কণ্ঠে বলল, তোমার ভয় নেই, আমার হাত ধরে চলো। কথাগুলো বলতে গিয়ে কোথায় যেন বাঁধো বাঁধো ঠেকল সুভদ্রার। তবু সহদেবের হাত সে ধরেই থাকল, আর সমস্ত শরীরে মেখে নিল ভিন্ন শরীরের উত্তাপ। এই উত্তাপের স্পর্শ কতদিন সে পায়নি। তার বুকের ভেতরটা উত্ত'ল হয়ে উঠল নিমেষে। গায়ে গা লাগিয়ে হাঁটছিল সে। জীবনে অনেকবার সে হেরেছে, আর হারবে না। অতসী বোষ্টমীর গর্বিত মুখখানায় সে ঝামা ঘষে দেবে। নিজের অধিকার থেকে সে এক চুলও সরবে না। সেদিন হাটখোলায় দেখা হয়েছিল অতসী বোষ্টমীর সঙ্গে। দূর থেকে সুভদ্রা তাকে দেখছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এই মাঝ বয়সে শরীরের বাঁধন অটুট রেখেছে বোষ্টমী। কার জন্য, কিসের জন্য সুভদ্রা তা ভালভাবে জানে। অতসী বোষ্টমীর ফর্সা শরীরটা একটা অগ্নিকুণ্ডের সমান। সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার দিকে আগুনপাখির মত ধাবমান সহদেবের গৃহচ্যুত মন। সুভদ্রা সেদিন থেকেই অপেক্ষায় আছে—সহদেবকে বুঝিয়ে দেবে সে-ও ডালভাত খেয়ে প্রস্তুত আছে যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে। মেয়েরা সব দেয় কিন্তু স্বামীর ভাগ কাউকে দেয় না। সেও দেবে না। হাঁটতে হাঁটতে সুভদ্রা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সহদেবের হাত। নেশার ঘোরে সহদেব বুঝতে পারে না বিপরীত উষ্ণতায় পুড়ে যাওয়া হাতের ভাষা। দু-চোখে ঘুম নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে এল সহদেব। পেতে রাখা বিছানায় গা এগিয়ে দিল সে। চোখ বুঁজে এল ঘুমে। সুভদ্রা তার নরম হাতটা ক্রমাগত বোলাতে থাকল সহদেবের কপালে, একসময় সে নিজেও শিকার হল ঘুমের। অনেকদিন পরে সে একটু শান্তিতে ঘুমাল।

চাঁদ ডুবে যাওয়া রাতে খড়ের ঘর ঝিমধরা বুড়ির চেহারায় ঝিমোয়। বাঁশঝাড়ে কৃপণ জ্যোৎস্না লুকোচুরি খেলে বেড়ায়। খেজুরের কাঁটাবাহার পাতায় জোনাকিরা ঢুকে পড়ে হুটোপুটি খেলে। বাঁশেব পাতার কাঁপুনীর শব্দ কানে বাজে সহদেবের। নেশার ঘোর কেটে যাওয়ার পর থেকে বিছানায় সে অচঞ্চল। সুভদ্রাকে পাশে শুয়ে থাকতে দেখে তার মনে মায়ার সৃষ্টি হয়। বড় অবিচাব করেছে সে বউটার উপর। বিয়ের পর থেকে দুটি সন্তান ছাড়া সে তাকে কিছু দিতে পারেনি। যাত্রা নিয়ে তার সময় কেটে গেছে। ঘরে ফিরলেও সে একটা তড়বড়ে লাট্টু, এক জায়গায় কোনো দিনও স্থিত হতে শিখল না। আজ অনেকদিন পরে সহদেব সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল। সংসাবের ঘানিটানা বিপর্যস্ত মুখ, তবু পাঁকে ফোটা পদ্মফুলের চেয়েও উজ্জ্বল। ঘুমের প্রশান্তিতে ডুবে আছে সুভদ্রা, ওর বোঁজা চোখ কুঁড়িপাতার চেয়েও টান টান, নিভাঁজ সুন্দর। কেমন সঙ্কুচিত শরীরে শুয়ে আছে সুভদ্রা, দেখে মায়া জন্মায় সহদেবের। বিয়ের রাতে কানুবুড়ো তার হাত ধরে বলেছিল, মেয়েটাবে তুমার হাতে তুলে দেলাম বাপ, ওরে তুমি আজীবন আগলে রেখো। শুভ আমার চোখের মণি, ওরে ছেড়ে থাকতে আমার কষ্ট হবে।

কানুবুড়োকে জড়িয়ে ধরে ঘর ছাড়ার সময় অঝোর ধারায় কাঁদছিল সুভদ্রা। সে তখনো জানতে পারেনি, কার হাতে গিয়ে সে পড়ল। মানুষের ভাগ্য বুঝি বিধাতা আগেভাগে লিখে রাখে, নাহলে সুখের বদলে এত দুঃখ কেন তার বুকের বাগানের মাটি চযে ফেলবে? আজ ফেলে আসা দিনগুলোর কথা ভেবে মনেমনে সহদেব অনুতপ্ত হলেও তার ভেতরের অসুর শক্তিটা তাকে আরো কাবু করে দেয়।

অতসী বোষ্টমীকে ভালোবাসার মুহূর্তে সুভদ্রার কথা তার মনে পড়বেই। একজনকে বঞ্চিত করে সে অন্যজনকে সুখ বিতরণ করবে—এটাও তার মন মেনে নিতে পারে না। ফাটা বাঁশে আটকে যাওয়া ইঁদুরের মত অসহায় তার দৃষ্টি। অতসী বোষ্টমী চোখের যাদু-টোনায় কাবু করে দেয় সহদেবকে। যৌন আবেদনে সে ক্রমশ পীড়িত করে তোলে তাকে। তার শরীর যেন পেতে রাখা ফাঁদ। সেই ফাঁদে ধরা পড়তে বাধ্য হয় সহদেব। তার দুর্বলতম মুহূর্তে অতসী বোষ্টমী বলেছিল, এক আকাশে দুটো চাঁদ থাকে না গো। ভরত বোষ্টম কোনো দোষ করেনি, তবু তাকে চলে যেতে হল। তাকে কে খুন করেছিল সে-ও আমি জানি। বলেই রহস্যময় চোখে তাকিয়েছিল সহদেবের দিকে, আমি চাই পথের কাঁটা সরে যাক। চিরদিন ঝগড়া অশান্তি কি ভালো লাগে? কারোর দীর্ঘশ্বাস গায়ে লাগলে আমারও তো ক্ষতি হতে পারে। তুমি ভেবে নাও—কোনদিকে যাবে? আমি না সুভদ্রা—কাকে তুমি মনের মানুষ করবে। সে সব কিছুই তোমার উপরে নির্ভর করবে। তবে যদি আমার কাছে আসো, তাহলে পিছুটান রেখে এসো না। যার পিছুটান থাকে সে কোনদিন সামনে এগোতে পারে না। অতসী বোষ্টমীর কথাগুলো রহস্যে মোড়া। তার নিগূঢ় অর্থ বুঝতে কোনো কষ্ট হল না সহদেবের। সেই থেকে মনের ভিতরে তুমুল আলোড়ন, ভাঙাচোরা, নিজের সাথে নিজের যুদ্ধ। কোন অবস্থাতেই সুভদ্রাকে সে পৃথিবীর আলো থেকে সরিয়ে দিতে পারবে না। বটগাছের ছায়ার মত তার স্নেহ-ভালবাসা সংসারের উপর। পবন-মেনি সেই গাছের দুটো ঝুরি। গাছ মরে গেলে ঝুরি কি বাঁচে?

সহদেবের চোখ চলে যায় আবার ঘুমন্ত সুভদ্রার মুখের উপর। এলোচুলে ভরা মাথা, খোঁপা ভেঙে লুটিয়ে রয়েছে শক্ত বালিশে। সুযোগ বুঝে মশা চুষে খাচ্ছে তার রক্ত। একদৃষ্টিতে সহদেব দেখছে ঘুমন্ত সুভদ্রাকে। অতসী বোষ্টমীর কথাগুলো চার খেতে আসা ট্যাংরামাছের মত ঠোকা মারছে মনের কোণে। বউটার কত জ্বালা, সব জ্বালা সে বুকে পুরে নিয়ে শুয়ে আছে নিশ্চিন্তে। ওর ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া দরকার। ভোর হতে আর বেশি দেরী নেই, পাখপাখালির ডাকে একটু পরেই মুখরিত হয়ে উঠবে ভোরের বাতাস। শিরা ছেঁড়া রক্তের মত ফিনকি দিয়ে গড়িয়ে পড়বে আলো। দিনের আলোয় সে কী ভাবে মুখ দেখাবে সুভদ্রার কাছে? হেরে যেতে তার বড় লাজ। সহদেবের চোখ কঠিন হয়ে উঠল চোখের পলকে। একটা বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সে, ভাসমান ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে সে ডুবে যেতে চাইল অন্য চিন্তায়। কিন্তু পারল না। অতসী বোষ্টমী অদৃশ্যে থেকে শাসন করল তাকে। বারবার করে নির্দেশ ভেসে এল অঘটন ঘটিয়ে ফেলার জন্য। মুহূর্তের জন্য হাত-পা এমন কী চোখের দৃষ্টি শক্ত হয়ে উঠল সহদেবের। একটা পশুশক্তি বারবার করে তাকে উৎসাহিত করল, এই সুযোগ। এ সুযোগ তুমি হাতছাড়া করো না। দু-নৌকোয় পা দিয়ে কোনো মানুষ বাঁচে না। তুমি যদি .।চতে চাও তাহলে এমন সুযোগ হাতছাড়া করার জন্য তোমার আফশোষ হবে।

সহদেব ঘাম শরীর নিয়ে ঝুঁকে পড়ল সুভদ্রার মুখের উপর। গরম নিঃশ্বাসে ভরে যাচ্ছিল বাতাস। রাতচরা পাখি ক্লান্ত স্বরে ডাকতে-ডাকতে উড়ে যাচ্ছিল দূরের দিকে।

সহদেব ভাঙা-ভাঙা গলায় ডাকল, সুভদ্রা, সুভদ্রা...

সাড়া এল না। বউটা অকাতরে ঘুমাচ্ছিল। সহদেবের হাত দুটো সাঁড়াশি হয়ে গেল তখন। পথের কাঁটা সে সরিয়ে দেবে। ভোরের আলো ফোটার আগে সে-ও চলে যাবে অন্যত্র। সুভদ্রার মৃত্যুর জন্য কেউ তাকে দোষ দিতে পারবে না। অতসী বোষ্টমীকে নিয়ে সে আবার সুখের সংসার পাতবে। রূপের আকর্ষণে আগুনপোকার মত তাকে আর বারবার ছুটে যেতে হবে না মাঠের ঘরে।

দু-হাত পাথর হয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসে সুভদ্রার গলা.। জোরে চাপ দিতে গেলেই ঘড়ঘড়িয়ে ওঠে বউটার গলা। হাত-পা ছুঁড়ে সে চিৎকার করে ওঠে বাঁচার তাগিদে। দুঃস্বপ্ন দেখা মানুষের মত সে গোঙাতে থাকে শুধু। ঘুম ছুটে যাওয়া দু-চোখে বাঁচার জন্য তীব্র আকুতি। কিন্তু এ কী দেখছে

সে? যাকে সে পতিজ্ঞানে সেবা করে এসেছে এতদিন—সে-ই তার ঘাতক। সুভদ্রা মৃত্যুভয়ে হিম না হয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল ভোরের পাখির মত। হতচকিত সহদেবের হাত শিথিল হয়ে আসে অক্ষমতা জনিত কারণে। আর তখনই সুভদ্রার গলা থেকে নগ্ন তীরের চেয়েও দ্রুত গতিতে পিছলে আসে, বাঁচাও, বাঁচাও।

সেই আকুতি ভরা ধ্বনি ঘরের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে করে তোলে বেদনাবহ। পবন ঘুম চোখে ছুটে আসে ঘরের ভেতর। কিছু বোঝার আগেই সে সহদেবকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দেয় সুভদ্রার বুকের উপর থেকে। গোড়া কাটা গাছের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সহদেব। তার লৌহকঠিন হাত দুটো ববফের মত ঘামছিল। উদভ্রান্ত, সম্পূর্ণ পরাজিত চোখ মেলে সে পবনকে বলল, তুই আমাকে মেরে ফেল, আমি বাঁচতে চাই না। আমি পাপী, একমাত্র মৃত্যুই পারে আমাকে শান্তি দিতে।

পবন জড়বৎ দাঁড়িয়ে থাকল ফাটা দেওয়ালে পিঠ দিয়ে। একটা টিকটিকি ভয় পেয়ে তারস্বরে ডাকছে। সেই ভী ণ শব্দ ছাপিয়ে সহদেব কান্না জড়ানো গলায় বলে উঠল, আমি অমানুষ হয়ে গেছি পবন। আমার আর বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই এই পৃথিবীতে। তোর হাতে মৃত্যু হলে জীবনটা আমার জুড়োবে। আয়, আমাকে শেষ করে দে। আমি তোব মাকে মারতে গিয়েছিলাম। তুই তাব বদলা নে।

হৈমবুড়ি ধাপানো মাজা নিয়ে ঘরে ঢুকে থ। এ সংসারে এমন নাটক এই প্রথম। ব্রজবুড়ো বেঁচে থাকতে এসব ভাবাই ছিল দুঃস্বপ্ন। এ কী অধঃপতন সহদেবের? এই ছেলে সে পেটে ধরেছিল খেয়ে না খেয়ে? এই রাক্ষসের চোখে সে আলো দিয়েছে, মুখে ভাষা? এ ছেলে পুরো হাড়িসাইয়েব কলঙ্ক। এ-কে সে লুকাবে কোথায়? কী ভাবে সংশোধন করবে ওর ক্ষয় ধরা জীবনের মূল্যবোধ। হৈমবুড়ি আর ভাবতে পারছিল না, কুঁচকানো কপালের শিরাগুলো সব ছিঁড়ে যাবে হঠাৎ। সুভদ্রার মুখের দিকে সে তাকিয়ে থাকতে পারে না, ছোট হয়ে আসে দৃষ্টি। নিজেকেই মনে হয় তার চরম অপরাধী। এই হীন, নীচ অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। সুভদ্রাকে সে কী বলে সান্ত্বনা দেবে এখন? হৈমবুড়ির দুর্বল গলা কেঁপে ওঠে, সহদেবরে, এ তুই কী করলি বাপ? যে তোর ঘবের লক্ষ্মী তাকে তুই ভাসিযে দিতে চাইলি অকালে বানের জলে? এটা কি মানুষের কাজ হলো? তুই এত নীচে নেমে যাবি বাপ, আমি যে সপনেও ভাবিনি। —কথা শেষ হল না, ডুকরে উঠল হৈমবুড়ি। কপালে হাতের বাড়ি মেরে সে ভেঙে পড়ল অবুঝ কান্নায়।

সুভদ্রা নিঃসাড় পড়েছিল বিছানায়। ঘটনার আকস্মিকতায় সে ভীত, বিহ্বল। কোনমতে দু-হাতে ভর দিয়ে উঠে বসল বিছানায়। গলার নরম চামড়ায় আঙুলের দাগগুলো পরিষ্কার ফুটে ওঠেনি তখনও। তবু ব্যথা-ব্যথা করছিল সরু গলার নিম্নাংশ। ঢোক গিলতে গিয়ে কষ্ট হল তার। কথা বলতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল তার অক্ষমতা, দু-হাতে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে উঠল স্বরভঙ্গ কোকিলের মত।

এসব আর সহ্য হল না সহদেবের। সে এক জামা-কাপড়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কোথায় যাবে গন্তব্য জানে না।

সুভদ্রা ভয় পেয়ে কঁকিয়ে ওঠে, যা পবন, তোর বাবাকে ফেরা। মানুষটা এমনিতেই মরে আছে, ওকে আর মারিস নে।

পবন গেল না, ঠোঁট কামড়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। তার পিঠের ঘামে ভিজে গেল মাটি। সুভদ্রা আবার সেই একই গলায় বলল, যা পবন, তোর বাবাকে ফেরা।

হৈমবুড়িব চোখ থেকে ছিটকে এল আগুন, ধুঁকতে ধুঁকতে সে বলল, পবন কোথাও যাবে না। যে যায়, তাকে যেতে দেওয়া ভাল। এ সংসারে কোন কাজ কারোর জন্য আটকে থাকে না।

ভোরের আলোয় পথ বড় মায়াময়। পথের হাতছানি সহদেবকে টেনে নিয়ে যায় এক পথ থেকে আরেক পথে। উদ্‌ভ্রান্ত তার চলা । কূল খুঁজে না পাওয়া নৌকোর মত তার জীবন। শুধু ঢেউয়ে-ঢেউয়ে বিপর্যস্ত। ঢেউ-ই জানে কোথায় গিয়ে আছড়ে দেবে জীবনের নৌকো। নৌকো জানে না। ঢেউ কোথা থেকে আসে, কেন ভাসিয়ে নিয়ে যায় জীবন। জীবন শুধু প্রবাহিত নদীর মত।

কুড়ি

এক পশলা বৃষ্টির পরে পুরে হাড়িসাই যেন স্নান সেরে আসা মেনির মুখের মত। তখনও চাল বেয়ে জল ঝরছিল টুপ্‌টুপিয়ে। বাঁশের পাতায় জলের সোহাগ চিহ্ন ছড়িয়ে। শুকনো পাতাগুলো জল পেয়ে চকচকে হয়ে উঠেছে হারানো জীবন ফিরে পেয়ে। বাস থেকে নেমেই পবনের চোখে পড়ল ঢ্যাঙ্গা তালগাছটা। এই গাছটা নিযে পাড়ায় অশান্তির আর শেষ নেই। হরিয়া আর গঁড়ার মধ্যে কাজিয়া লেগে আছে অষ্টপ্রহর। ওদের বউগুলোর মুখের ভাষায় বিষ মেশানো। সেসব কথা কানে ঢুকলে, কানের হাওয়াও গরম হয়ে ওঠে।

পবন বাস রাস্তা ছাড়িয়ে নেমে এল কাঁচা পথে। ক'দিন আগে পঞ্চায়েত থেকে মাটি ফেলেছেন বাবুরা। এখন নরম মাটির বুকে জল জমেছে বুকে জল জমার মত। দু-ধারের ঘরবাড়িগুলো ভিজে একসা। নিরীহ তাদের চেহারা। অসময়েব বৃষ্টিতে নাজেহাল অবস্থা। ঘাস-লতাপাতার ধুলো মুখ ধুয়ে এখন সতেজ তরতাজা।

মেদিনীপুর থেকে সেই কখন বাস ধরেছিল পবন। জ্যাঠা তাকে বাসে তুলে দিয়ে ফিরে গেল। বাস ছাড়ার পর থেকে পবনের ভেতরে হুমড়ে পড়েছিল চিন্তা।

সহদেব মেদিনীপুরেও আসেনি। আসবে না যেন আগাম জানত পবন। তবু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে না বলতে পারেনি। সহদেব চলে যাবার পব থেকে সুভদ্রার চোখে ঘুম নেই। সে শুধু কাঁদে আড়ালে আবডালে। খবর পেয়ে বৈকুণ্ঠ এসেছিল নিতে। সুভদ্রা তাকে ফিরিয়ে দিল সবিনয়ে। বলল, আমি যাব না দাদা। শ্বশুরটিপা ছেড়ে আমি কোথাও গিয়ে কি শান্তি পাবো। যদি মরতে হয় তো এখানেই মরব। এটা যে আমার নিজের ঘর।

হৈমবুড়ি বারবার করে বলেছিল, যা না বউ, ক'দিন ঘুরে আয়। তবু ভদ্রা কিছুতেই গেল না। বৈকুণ্ঠ নিরাশ হয়ে ফিরে যাবার পরই সুভদ্রা পবনকে বলেছিল মেদিনীপুর যেতে। পবন সরাসরি না বলতে পারেনি। সে জানে ব্যবসার ক্ষতি হবে তবু তাব মুখ দিয়ে না শব্দটা কিছুতেই বেরল না। আসলে মাকে সুখী দেখতে চায় সে। মায়ের মনে ব্যথা দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। মেনিও বলল, যা দাদা, ঘুরে আয়। তুই না গেলে মা খুব আঘাত পাবে।

শুধু যাওয়াই সার। কাজের কাজ কিছু হল না।

নকুল সব শুনে গোঁফে তা দিয়ে বলল, তোর বাপের আর আক্কেলজ্ঞান হবে না। বুড়ো বয়সে তার ভীমরতি ধরেছে। তারপর মাথা চুলকে নকুল যা বলেছিল, তা শুনে পবনের মাথায় কেউ বুঝি হাতুড়ির বাড়ি মারল। নকুল হাসতে-হাসতে বলল, অতসী বোষ্টমীকে খতম করে দে। ও যতদিন বাঁচবে ততদিন তোদের ঘরে শান্তি ফিরবে না। তোর মায়েরও চোখের জল শুকাবে না।

মানদা পাশেই ছিল, পৃথুলা শরীর নিয়ে সে এমনিতেই ব্যতিব্যস্ত তবু খোঁচা মারতে ছাড়ল না, তোর বাবার মরলেও জ্ঞান হবে না। অমন জ্ঞানপাপী আমি বাপু জীবনেও দেখিনি। বউটাকে জ্বালিয়ে মারল। আমি হলে অমন সোয়ামীর মুখে ঝাঁটা গুঁজে দিয়ে বাপের ঘর চলে যেতাম।

কচাগাছের বেড়া দু-ধারে, মাঝখান দিয়ে সরু পথ। কিছুটা হেঁটে এলেই নজরে পড়বে বাঁশঝাড়। এখন মরা দুপুর, বিকেলের আলো নিষ্প্রভ। মেঘ ভরে আছে বাতাসে। কালো ছায়ায় ঢাকা পড়েছে হাড়িসাই। গঁড়ার ঘরের ধাড়ী শুয়োরটা কচুগাছের দফা-রফা করে দিয়েছে হরিয়াদের। এই নিয়ে তুমুল বচসা এখন। গঁড়ার বউ কোমরে কাপড় গুঁজে গাল পাড়ছে মনের সুখে। হরিয়ার বউ মালতীও কম নয়। সে-ও এক কাঠি উপরে। হাতে তালি মেরে নাচের মুদ্রায় কোমর বেঁকিয়ে সে বোম ফাটাল দশজনের সামনে, আর বড় মুখ করিসনে রে রাধী। তোর ভাতারের গুণকীর্তি সবাই জানে। চোরুয়ার বউ আর কত ভাল হবে।

—খবরদার, ও কথা বলবি তো তোর জিভ ছিঁড়ে নেব। আমার ভাতার চোর হলে তোর ভাতার হলো ডাকাত। রাধিকা হারবার মেয়ে নয়, তার সম্মান জ্ঞান টনটনে। মালতীকে সে যদি কাছে পায় তাহলে ছিঁড়ে ফেলবে এমন আগুনঝরা চোখ মেলে তাকাল।

পবন বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল চুপ করে। হাত-পা অসাড় হয়ে গেল তার। ক্লান্ত দু-চোখ দিয়ে সে তার মাকে খুঁজছিল ভিড়ের মাঝখানে। না দেখতে পেয়ে স্বস্তিবোধ হল পবনের। মায়ের সম্মুখে সে কীভাবে বলবে কথাগুলো। সহদেবের খোঁজ পায়নি মেদিনীপুরেও। তাহলে কোথায় গেল মানুষটা? এত বড় পৃথিবীতে সহদেবের যাওয়ার জায়গাই বা আছে কোথায়? যাত্রাদলের ম্যানেজার গদাধরবাবু সেদিন ঘরে এসেছিলেন। দুঃখ করে বললেন, সহদেবটা আর মানুষ হল না! ওর স্বভাব চরে খাওয়া ষাঁড়ের মত। স্বভাব না বদলালে তার কপালে কষ্ট আছে।

যাত্রাদলেও ফিরে যায়নি সহদেব, তাহলে মানুষটা গেল কোথায়? সুভদ্রা এই ভাবনা থেকে একদিনও মুক্ত নয়। সে মেনিকে পাঠিয়েছিল রেণুদের বাড়ি। অতসী বোষ্টমী সাফ-সাফ জানিয়ে দিয়েছে, সে কোন খোঁজ জানে না। মেনি মুখ কালো করে ফিরে এসেছে ঘরে। সুভদ্রা তার মুখ দেখে কোনো প্রশ্ন করেনি, যা বোঝার বুঝে নিয়েছে মনে মনে। হৈমবুড়ি তার ব্যথাতুর মুখে কালো ছায়া দেখে তিরস্কার করে বলেছে, বউরে, তার জন্যি আর ভাবিস্ নে। সে যদি মানুষ হোত তাহলে সবাইকে কাঁদিয়ে অমন ধারা চলে যেত না। তারে আমি গভ্ভে ধরেছিলাম--এই আমার অপরাধ। আগে জানলে আঁতুড়ঘরে তারে আমি নুন খাইয়ে মেরে ফেলতাম। অমন ছেলে যে থাকার চাইতে না থাকাই ভাল।

ঝগড়ার গতি চরমে উঠেছে এখন। রাধী আর মালতীর মধ্যে এখন শুধু হাতাহাতি হতে বাকি। অশ্রাব্য গালিগালাজের ভাণ্ডার সব খতম। এবার বাকি শুধু চুলোচুলি, আর কান্না পর্ব।

ভিখ মেঙ্গে পাড়ায় ফিরে এসেছে যুগলবুড়া। তার হাতে-পায়ে ধুলো-বালি-কাদা। ন্যাকড়ায় জড়ানো আঙুলগুলোয় রক্ত-পুঁজের চিহ্ন। তবু সে অকর্মণ্য শরীর নিয়ে এগিয়ে এল ঝগড়া মেটাতে। দুই বউ বুড়োর কথাও শুনছে না। যুগলবুড়া ব্যর্থ হয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে ফিরে যাচ্ছে ঘরে। তার মুখে শুধু একটাই কথা, কী যুগ এলো রে বাপ। এ যে দেখছি—আগুন ধরান তুবড়ি। জ্বলে-পুড়ে খাক না হলে কারোরই জ্বালা জুড়াবে না।

হরিয়া বা গঁড়া কেউ-ই ঘরে ছিল না। ওরা এসময় ঘরেও থাকে না। পেটের দায়ে ঘুরতে হয় এদিক-সেদিক। গঁড়া গিয়েছে—ইঁদুর গর্ত থেকে ধান বের করতে। যাওয়ার সময় সে রাধীকে বলে গিয়েছে, সাঁঝ লাগার আগে ফিরব। যদি না ফিরি তাহলে ভাববি জাত সাপে কেটেছে আমাকে। ইঁদুর গর্তে যে বিষধর সাপ থাকে।

রাধীর বুক শুকিয়ে গিয়েছিল ভয়ে। কোনমতে ঢোক গিলে সে বলেছিল, জীবন বাজি ধরে পেট ভরিয়ে লাভ নেই। জীবন বাঁচলে ভাতের অভাব হবে না। যার হাত-পা সচল আছে তার আবার চিন্তা কিসের।

ইঁদুরের গর্ত থেকে ফি-বছরই ধান কেড়ে আনে গঁড়া। এ কাজে তার সমান দক্ষ এ-পাড়ায় আর কেউ নেই। প্রতিবছর ধান কাটা শেষ হলে গঁড়ার কাজ বেড়ে যায়। সে তখন কোদাল-ঝুড়ি আর ঝাঁটা নিয়ে চলে যায় মাঠে। হাতে থাকে লাঠি। ইঁদুরের গর্তে প্রথমে লাঠি ঢুকিয়ে সে বোঝে সাপ আছে কিনা। তারপর মাটি শোঁকে। সাপ যে গর্তে লুকায়, সে-মাটির ঘ্রাণই আলাদা। একমাত্র গঁড়া ছাড়া কেউই সেই গন্ধের তাৎপর্য বুঝতে পারে না। তার চোখ গর্ত দেখেই বলে দেবে ধান আছে কিনা, আর থাকলেও তার পরিমাণ কতটা। এত যার বিষয়বুদ্ধি তার দু-বেলা ভাত জোটে না। ছেলে-মেয়ে-বউ নিয়ে সে পেটের জ্বালায় জ্বলছে।

রাধী ঝগড়া করতে করতে বেড়া ধরে বসল কোমর জুড়াতে। হৈমবুড়ি কোথায় ছিল কে জানে। কানে অসহ্য লাগতে সে ছুটে এল রাধীর কাছে। বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলল, এবার চুপ কর রে। তোদের কাজিয়া শুনে লোক হাসছে। আর কত লোক হাসাবি তোরা। উপরপানে ছেপ ফেললে যে নিজের গায়ে লাগে। হৈমবুড়ির মুখের উপর রাধী কোন কথা বলল না, সে বেড়া ধরে হা করে তাকাল বুড়ির মুখের দিকে। তারপর আঁচলে মুখ-পিঠ আর বুকের ঘাম মুছে সে বলল, তুমি জান না খুড়ী, মালতীর কত তেজ বেড়েছে। ও বলে কি না আমার বর চোরুয়া। আমার বংশশুদ্ধু চোর...

—থাম আর কথা বাড়াস নে। কথা হল খড়গাদার আগুন। যত বাড়াবি তত বাড়বে। এক সময় পুড়ে খাক হয়ে যাবে সব। —হৈমবুড়ির কথায় ভয় পেল রাধী। সে চুপ করে যাওয়ার আগে বিস্ফারিত চোখ মেলে দেখল, গাঁয়ে পুলিশ ঢুকছে। সবার আগে চৌকিদার ভজনলাল। হাতে লাঠি, পরনে মালকোঁচা করে ধুতি পরা। দেখা মাত্রই চোখ ছোট হয়ে গেল রাধীর, ধড়াস করে উঠল বুক। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল রক্ত। বুকের ভেতর থেকে উঠে আসে ঢেঁকির পাড় দেওয়া শব্দ। রাধী কাঁপতে-কাঁপতে ছুটে গেল তার ঘরে। ভয়ে পা কাঁপছিল। গলা শুকিয়ে আমড়ার আঁটি। ভজনলাল লাঠির আওয়াজ তুলে রাধীর ঘরের দিকে গলা বাড়িয়ে শুধোল, গঁড়া কুথায়?

রাধী আগড়ের সামনে এসে দাঁড়াল, হাতের ঘামে ভিজে যাচ্ছিল বাঁশের বাতা, কোনক্রমে বলল, সে তো ঘরে নেই বাবু।

—কুথায় গিয়েচে?

—ধান মাঠে গিয়েছে ইঁদুরের গাত খুঁড়তে। রাধীর গলা বুজে এল ভয়ে, বুকের ঢিসঢিসানী বেড়ে গেল হাজার গুণ। পুলিশগুলো নিজেদের মধ্যে কী সব আলোচনা করল অনেকক্ষণ, তারপর রাধীর দিকে বাঘের চোখে তাকিয়ে ফিরে গেল মাঠের দিকে।

মালতী 'চোরুয়া' বললেও গাঁয়ে পুলিশ আসুক এটা চায়নি মন থেকে। সে-ও ঘাবড়ে গিয়েছে বেদম। প্রথমে সে ভেবেছিল—পুলিশ বুঝি ঝগড়া মেটাতে এসেছে। তার ভুল যখন ভাঙল তখন গলা শুকিয়ে বাঁশপাতা। ঝগড়া ভুলে সে এগিয়ে এল ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া রাধীর কাছে, তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, রতনটারে মাঠে পাঠিয়ে দে। গঁড়াদা যেন পালিয়ে যায়। যদি ধরা পড়ে তাহলে ওকে আর বাঁচাবে না।

রতন মায়ের নির্দেশে বিল ইঁদুরের মত ছুটে গেল মাঠের দিকে। সে যাওয়ার আগেই ভজনলালের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছে গঁড়া। কাচুমাচু মুখে বলছে, বাবু, ছেড়ে দাও গো। আমি চোর নই। আমি তো এখন ইঁদুর গাতের ধান বের করে বেঁচে আছি। রাতভর আমি ঘরে থাকি। বিশ্বাস না হয়—ভজনলালকে শুধোও।

ভজনলাল শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধেছে গঁড়ার হাত। ছোট দারোগার হাতে মোটা রুল। পুলিশ দুটো ঘিরে আছে গোল হয়ে।

গঁড়া ধরা পড়েছে একথা গ্রামে বয়ে আনে তার ছেলে রতন। দু-চোখে জল নিয়ে সে রাধীকে বলল, মা, বাবাকে ওরা গোরু বাঁধা রশা দিয়ে বেঁধেছে। কী হবে গো মা, ওরা যদি বাবাকে মেরে ফেলে?

—চুপ কর। ধমক দিয়ে ওঠে রাধী। ছেলেকে ধমক দিলেও তার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে জলে। সে-ও হাওয়ার বেগে ছুটতে থাকে মাঠের দিকে। কান্না ভাসায় বাতাসে। চিৎকার করে বলে, কে কোথায় আছো গো, আমার ঘরের মানুষটারে বাঁচাও। বাঘে আর পুলিশে ছুঁলে মানুষের বাঁচা বড় দায়। ওগো, কে কোথায় আছো—তোমরা রতনের বাপকে বাঁচাও। পিলপিল করে ছুটে যাচ্ছে মানুষ। গাঁ ভেঙে ছুটে যাচ্ছে মানুষ। ধানমাঠে মেলার আমেজ। ভজনলাল ভিড় হঠাতে ব্যস্ত। ছোট দারোগা চারা জামগাছে গঁড়াকে ঝুলিয়ে দিয়েছে মাথা নীচু করে। পা দুটো বাঁধা জামগাছের ডালে। হাত দুটো পিঠের সাথে জড়ানো দড়ি দিয়ে। ছোট দারোগা ছুটে গিয়ে রুলের বাড়ি কষিয়ে দিল গঁড়ার পিঠ, কাঁধ আর মাথায়। পুরো শরীরটা ঘুরিয়ে দিল লাট্টুর মত। তারপর হুঙ্কার ছেড়ে বলল, মাইতিদেব কাঁসা-পেতলের বস্তা দুটো কোথায় রেখেছিস বল। না বললে মেরে তোর চামড়া ফাটিয়ে নুন ঘষে দেব। বল, কোথায় রেখেছিস বল?

গঁড়া তবু নিরুত্তর। মাঝে মাঝে মিনমিনে স্বরে বলছে, আমি কিছু জানিনে বাবু। মায়ের দিব্যি, মা শীতলার দিব্যি—আমি কিছু জানিনে। ক'দিন থেকে বাতের ব্যথায় আমি নড়তে পারিনি। তাছাড়া সিঁদকাটি আমি ফেলে দিয়েছি বড় পুকুরের জলে।

—সাধু সেজেছিস তাই তো? ছোট দারোগা সজোরে ফুটবল খেলার মতো লাথি মারল, চিৎকার করে বলল, বাঁচতে চাস তো বলে ফেল। নাহলে তোর চোখে আমি গবম শিক ঢুকিয়ে দেব। কথা শেষ হল না, আবার লাথি ছুঁড়ে দিল সে।

গঁড়ার শরীর ফেটে রক্ত ঝরছিল অনবরত। তবু তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সে কষ্ট হজম করতে ওস্তাদ। ছোট দারোগা এবার ভজনলালকে বলল, মারো শালাকে। যতক্ষণ না ও কবুল কবে ততক্ষণ ওকে মারো। মরে গেলে তোমার ভয় নেই, আমি তো আছি।

ভজনলালের লাঠিটা পাকা বাঁশের, উচ্চতায় পাঁচফুটের অধিক। সে তার বেঁটে খাটো শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সপাটে ঘুরিয়ে মারল লাঠি গঁড়ার মাথায়। এতক্ষণ যা হয়নি, এবার তাই হল। রক্ত ঝরল মুষলধারে বৃষ্টি পড়ার মত। গঁড়া ছটফটিয়ে উঠল কাটা পাঁঠার মত। সারা শরীর ছয়লাপ হল রক্তে। ভিড়ের মধ্যে থেকে এলোমেলো গতর নিয়ে ছুটে এল রাধী, গলা ফাড়িয়ে কেঁদে উঠল সে, তোমাদের পায়ে ধরি গো, ওরে আর মেরো না। ওর হাতে-পায়ের বাঁধন খুলে দাও। ও যদি মারা যায় তাহলে ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমি যে পথে বসব। কান্না থামল না রাধীর, সে গঁড়ার দিকে ছুটে গেল ঝড়ের বেগে, তারপর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝাল গলায় বলল, পড়ে পড়ে মার খেতে কি তোমার ভাল লাগছে। তার চেয়ে বলে দাও না—কোথায় রেখেছো মাইতিদের বাসনগুলো।

গঁড়া কোনমতে চোখ মেলে তাকাল রাধীর দিকে; তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চরম ঘেন্নায় উগলে দিল কথা, আমি জানি নে, বলছি তো আমি জানিনে।

রতন কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে এল তার বাবার সামনে, কাতর হয়ে সে শুধোল, ও বাবা, বাবা গো... বলে দাও না কোথায় রেখেছো বাসনগুলো।

গঁড়া তার ছেলের মুখের দিকে তাকাল, রক্তে জড়িয়ে যাচ্ছিল চোখ, মাছি উড়ে আসছিল ভনভনিয়ে, কোনমতে জিভটা বের করে রক্তে ভেজা ঠোঁট দুটো চাটল সে, তারপর ছোট দারোগাকে বলল, আমার বাঁধনগুলো খুলে দাও। গলা শুকিয়ে গিয়েছে বড্ড। টুকে জল দাও। জল খেয়ে আমি সব বলব।

চৌকিদার গামছা ভিজিয়ে জল নিয়ে এল মাঠপুকুর থেকে। তারপর গঁড়ার মুখের কাছে নিংড়ে দিল গামছা। গলা ভিজিয়ে গঁড়া বড় শ্বাস ছেড়ে বলল, হাড়িসাইয়ের তালপুকুরে লুকিয়ে রেখেছি বস্তা দুটো। চলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

আবার একটা জোড়া পায়ের লাথি খেয়ে কঁকিয়ে উঠল গঁড়া। পুলিশ দুটো ওর কোমরে পরিয়েছে মোটা রশা। গঁড়া বাবুদের বাড়ির পোষা জন্তুর মত হাঁটছে আগে আগে। তার পিছনে দু-জন পুলিশ একজন দারোগা।

তালপুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে গঁড়া কাচুমাচু মুখে বলল, বাবু, বশা খুলে দাও। আমি ডুব দিয়ে বস্তা দুটা তুলে আনছি।

গঁড়ার কোমরের দড়ি খুলে দিল পুলিশ। আর সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিল সে। ঘোলা জলে গঁড়া ডুব দিচ্ছে ঘনঘন, সে তখন একটা ক্ষুধার্ত পানকৌড়ি পাখি।

তিনখানা কাঁসার থালা, দুটো গহীরা বাটি আর গলার রূপোর হারছড়াটা বিক্রি করে কাঁথি কোর্ট থেকে গঁড়াকে ছাড়িয়ে আনল রাধী। কালো কোট পরা উকিল বলেছিলেন, যাও, এ যাত্রায় বেঁচে গেলে। আমি না থাকলে হাজত ঘরে পচতে হোত তোমাকে।

গঁড়ার গাট্টাগোট্টা শরীরে ধকলের চিহ্ন, ক'দিনেই চোখ বসে কালি পড়েছে চোখের নীচে। প্রহারের চিহ্নগুলো এখনও মেলায়নি শরীর থেকে, শিরদাঁড়ার বাঁ দিকে উঁচু হয়ে ফুলে আছে মাংস, অবিকল কাঁচা পুঁইডাঁটার মতো, টিপলে আঙুল ডেবে যায়, হু-হু যন্ত্রণায় সচকিত হয়ে ওঠে শিরদাঁড়ার চারপাশ। গায়ে হলুদ হয়ে যাওয়া গেঞ্জি, পরনের ধুতিটায় ঝুলকালি তেলচিটে ময়লা, শরীরের অনাবৃত অংশে ছোপ ছোপ কালি, গঁড়া যে উদভ্রান্ত দিশেহারা সেটা তার চোখ-মুখ দেখলে অনুমান করা যায়। দুপুরের রোদে বিছের কামড়ের জ্বলন ছিল না, ছিল ঘাম ফোটানর শক্তি। গঁড়ার দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে হু-হু করে উঠল রাধীর অবুঝ মনটা। ঘরের মানুষটাকে শত বুঝিয়েও বাগে আনতে পারেনি সে, পুরুষ মন বুঝি নিরেট পাথর, নরম কথার আঁচড়ে সেখানে কোনো দাগ ফোটে না। অথচ পুরো পাড়ার লোকে দোষ দেয় রাধীকে, সন্দেহের তর্জনী তুলে বলে, যেমন পচা পুকুর, তেমনি পচা পাঁক। এরা দু-জনে মিলে পুরো গ্রামের বদনাম করে ছাড়বে। কথাটা কানে গেলে মরমে মরে যায় রাধী। গঁড়ার এই চৌর্যবৃত্তির দায় সে কেন বইতে যাবে? হাজার বুঝিয়ে যে মানুষটা সহজ পথে চলবে না, তাকে পৃথিবীর কোন শক্তি আছে ফিরিয়ে আনবে সঠিক পথে? রাধীর মনে তাই শান্তি নেই, লোকলজ্জার ভয়ে সে মরে আছে ক'দিন থেকে।

কোর্ট চত্বরে রাধীর দুঃখ বোঝার কেউ নেই। পবন কোর্ট অব্দি আসতে চেয়েছিল কিন্তু রাধী তাকে বাসভাড়া দিয়ে আনতে পারেনি। কোলেরটাকে নিয়ে সে একা চলে এসেছে ভোরের বাস ধরে। দারুয়াতে তার বাপের ঘর। অবনী দারুয়া হাসপাতালের জমাদার। বালিয়াড়ির উপর ঘর বেঁধে আছে ত্রিশ বছর হল। অবনীর ছেলে ভূষণ মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদার। ভোর হওয়ার আগে সে প্রতিদিন শহর ঝাঁটাতে বেরিয়ে যায়। তাই অত সকালে গিয়েও ভূষণের সাথে দেখা হয়নি রাধীর। বুড়া বাপের পায়ের কাছে মুখ নীচু করে বসেছিল সে।

অবনীবুড়া কম কথার মানুষ, সব শুনে বেজার মুখে বলেছিল, জামাই আমার নাক-কান কেটে দিলো। তোর কপাল খারাপ মা, আমি আর কী বলব। ওর বাপ ছিল মাটির মানুষ। বংশও খারাপ নয়। আমি সব দেখে-শুনেই বিয়ে দিয়েছিলাম। তখন কি জানতাম মাকাল ফলের ভিতরে পোকাও লুকিয়ে থাকে। অবনীবুড়ার দীর্ঘশ্বাস বিচলিত করে তুলেছিল রাধীকে। সে তার অপমানে কুঁকড়ে যাওয়া চোখ দুটো তুলতে পারছিল না কিছুতে। ভোরের বাতাসে সবেদাগাছের পাতাগুলো কাঁপছিল, শিশিরে ভিজেছিল পুরু পাতা, সেদিকে তাকিয়ে টনটনিয়ে উঠেছিল রাধীর চোখ দুটো। কত ছোট গাছটা এখন

ডালপালা ছড়িয়ে কত বড়। ঐ গাছের ছায়ায় রাধীর বাল্যকাল কেটেছে, কৈশোরের অনেকটা জমি জুড়ে আছে ঐ সবেদাগাছ। অবনীবুড়া মেয়েকে ভরসা দিয়ে বলেছিল, তোর কোনো চিন্তা নেই। জামাইয়ের কিছু হলে আমরা তোকে পথে ফেলে দেব না। আমারও যদি দু-মুঠো ডাল-ভাত জোটে তাহলে তোরও জুটবে। তোর দাদা ঘর আসুক। সে আসলে আমি তারে কোর্টে পাঠাব। তার অনেক জানা-শুনা আছে। সে ঠিক একটা রাস্তা বের করবেই।

বাবার কথায় রাধীর বুকে ভয়ের ঘোড়া লাফানো কমেছিল। অতবড় পাড়ায় বিপদের দিনে কেউ তার পাশে দাঁড়াল না। চোরের বউ বলে অনেকেই মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। চোখ ফেটে জল এসেছিল রাধীর তবু সে নিরুত্তর।

হরিয়ার ঘরের চালে ডগ-বগানো লাউগাছ, ছাগলের নাদি আর গোবরসার খেয়ে গাছটার বাড়বাড়ন্ত দশা। ফুল এসেছে চাল জুড়ে, কচি লাউও ফলেছিল একটা। একটু চোখে লাগার মত হতেই লাউটা কেউ ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছে চাল থেকে, ভোর হতেই হরিয়ার বউ মালতী গাল পাড়ছিল রাধীর ঘরের দিকে মুখ করে। মালতীর মুখের মাপে জবাব দিতে পারত রাধী, কিন্তু মনে সুখ না থাকলে সে আর কতজনের সঙ্গে একা-একা লড়বে। পাড়ায় সবাই এখন তার শত্রু। হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে গঁড়া। বারবার বলেও কোন কাজ হয়নি। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। রাধী বলেছিল, খাবো না, শুকিয়ে থাকব সে-ও ভালো—তবু আর পরের জিনিসের দিকে নজর দিও না। দশ লোকে দশ কথা বলে, আমার শুনতে ভালো লাগে না। আমিও তো মানুষ, চিমটি কাটলে আমারও যে গায়ে লাগে।

গঁড়া চুপচাপ শুনেছিল তার কথাগুলো, রাধী বলেছিল, গায়ে খেটে সংসার ঠিক চলে যাবে। এ পাড়ায় তোমার মত শরীর-স্বাস্থ্য আর কার আছে? কেন মিছিমিছি তুমি শুক্‌নো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে? আমার কথা ছাড়ো, ছেলে-মেয়েরা বড় হলে ওরাই বা মুখ দেখাবে কী করে?

গঁড়া বিড়ি নিভিয়ে সক্রোধে ছুটে গিয়েছিল রাধীর দিকে, তারপর চুলের মুঠি ধরে আছাড় দিয়ে ফেলে দিয়েছিল তাকে, ঘা-কতক বসিয়ে দিয়ে বলেছিল, চুপ কর। মাস্টারের মত কথা বললে তোর মুখে আমি ঝামা ঘষে দেব। আমি কারোর চালে চাল লাগিয়ে বাস করি না। কেউ আমার নামে কু'কথা বললে আমি তার মুখ ভেঙে দিব। চেনে না তো আমাকে...

গঁড়াকে এখন চিনতে কারোর বাকি নেই, চৌকিদার ভজনলাল রোজ রাতে এসে তার খোঁজ খবর নিয়ে যায়, বিড়ি খায় দাওয়ায় বসে, চলে যাওয়ার আগে একটা কথাই বলে, নিজেরে শুধরা গঁড়া। এখন থানায় যে বড়বাবু এসেছে—তার রাগ ক্ষরিস সাপের চেয়েও মারাত্মক। সে আসার পর থেকে গর্ত থেকে টেনে টেনে বের করছে ঢ্যামনা-চিতে-কেউটে। কাউকে ছাড়ছে না, আছড়ে-পাছড়ে মারছে। তার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালে ধুতি ভিজে যাবে ভয়ে। তখন কিন্তু আমারে দোষ দিবিনে, আমি তোর ভালো চাই বলে আগাম সাবধান করে গেলাম। তুই আমার দেশের ছেলে, তোর কোমরে দড়ি বাঁধতে আমি চাইনে।

নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টায় ছিল গঁড়া, কিন্তু রাত ঘনালেই তার ভেতরের পশুটা জেগে উঠত সহসা। তাকে কিছুতেই শাসন করতে পারত না সে। গায়ে জবজবে তেল মেখে, মা-কালীকে দণ্ডবৎ করে সে বেরিয়ে যেত সিঁদকাঠি হাতে নিয়ে। সে যে কখন বেরত, কখন আসত কিছুই টের পেত না রাধী। গভীর ঘুমে কাদা হয়ে লেপটে থাকত বিছানায়। ভোরবেলায় যখন চেতন হোত তখন দেখত গঁড়া তাকে হাতের বেড়ে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে যেমন শিমলতা রাতভর কঞ্চিকে জড়িয়ে ঘুমোয়—ঠিক তেমন। রাধীর সন্দেহ হোত না বিন্দুমাত্র। ঘরের মানুষটাকে কেউ চোর অপবাদ দিলে গায়ে তার বড় বিঁধত। কোমরে আঁচল গুঁজে সে মুখ লড়াত সবার সঙ্গে। গালিগালাজে আঁধার করে দিত গ্রামের বাতাস। লোকে ঠাট্টা করে বলত, চোরের বউয়ের বড় গলা। আজ নিজের বাবার কাছে মুখ দেখাবার

উপায় নেই রাধীর, চোখ ফেটে জল আসছে তার, গোপনে চোখের জল মুছে নিয়ে সে চেষ্টা করছে স্বাভাবিক হতে। কিন্তু পারছে কই, বারবার করে বুকের ভেতর থেকে উঠে আসছে অস্থির ঢেউ। কেউ কিছু বললেই সে সশব্দে কেঁদে উঠবে এমন পলকা তার মনের জোর।

অবনীবুড়া গালে হাত দিয়ে বসেছিল কাঠের চেয়ারে, মুখে দু-তিন দিনের না-কাটা দাড়ি, জামাইয়ের চিন্তায় তার মনও ঘোলাটে হয়ে আছে সেই সকাল থেকেই। ঘরের সমানে তার ইট-খোয়া আর বালির ছড়াছড়ি। অনেক দিনের ইচ্ছে একটা পাকা দালান তুলবে এই বালিয়াড়িতে। সেই ইচ্ছেকে বাস্তবে রূপ দিতে সে বেচে এসেছে তার গ্রামের ভিটেবাড়ি, জমিজমা। ভূষণ এবং তার পরিবার গ্রামে ফিরতে চায় না, কাঁথি শহরের আবহাওয়া তাদের বুকের ভেতরে ঢুকে গেছে খুব সহজভাবে। বাসন্তী-পুজোয় ক'দিনের জন্য গ্রামে গেলে হাঁপিয়ে ওঠে তারা, চোখে-মুখে সর্বদা পালাই পালাই ভাব। কাঁথি শহরে ভূষণের অবাধ যাতায়াত। মদের দোকান থেকে শুরু কবে ভাটিখানা সবই তার চেনা। চাকরি পাওয়ার আগে সে আইসক্রীম ফেরি করত পাড়ায় পাড়ায়, হাইইস্কুলের মেন গেটের সামনে। চাকরি পাওয়ার পরে তার মদ খাওয়ার নেশাটা আরো বেড়েছে, সে বেওয়ারিশ লাশেব কঙ্কাল বানায় বালিয়াড়িতে পচিয়ে, তারপর সেই কঙ্কাল চালান দেয় কলকাতায়। তাব এই অবৈধ কারবার অনেকেই জানে না, যদি জানত তাহলে ভূষণকেও ঘুরে আসতে হোত শ্রীঘব দর্শন করে। অবনীবুড়া কত তাকে বুঝিয়েছে, কিন্তু ভূষণ একরোখা। সে বলে, টাকার জন্য ঘর ছেড়ে, মাটির মায়া ত্যাগ করে বালিয়াড়িতে পড়ে আছি। সুযোগ যখন আছে দু-হাত ভরে কামাব। লক্ষ্মী চঞ্চলা। তাকে ধরে রাখতে হবে বুদ্ধি দিয়ে শক্তি দিয়ে---

ভূষণের বউ কমলা রাধীকে চা দিয়ে গেল অত্যন্ত ঘৃণাভরে, রাধীর উপস্থিতি তাকে যে সুখী করেনি হাবভাবে এটা সে বুঝিয়ে দিল, ছিঃ ছিঃ, এ কী নাক-কান কাটা কাজ করল ননদাই! মুখ দেখে তো বোঝা যায় না সে এমন পাকা চোর। তোমার ভাগ্যটাই খারাপ, কী আর করবে বলো। এ তো কানের দুল বা হাতের চুড়ি নয়—যে মন করলেই পাল্টে নেবে।

কমলার রুগ্ন চেহারা, কিন্তু কথা বলে সে দারোগার মত। মুখে ক্ষুরের ধার, কাকে কী বলতে হয় সে নিজেও জানে না। আর্থিক স্বচ্ছলতা তার মাথাটাকে বিগড়ে দিয়েছে, তার উগ্র চাল-চলনই সে ছবি রাধীর চোখে এঁকে দেয়। কিল খেয়ে হজম না করলে এ সংসারে বিপদ অনেক। চায়ের ফাটা কাপে চুমুক দিয়ে রাধী ভাবছিল তার পোকায় কাটা জীবনের কথা। কী ঘরের মেয়ে, কোথায় গিয়ে পড়েছে—এই ভাবনায় ক্ষয়ে যাচ্ছিল তার জীবন।

কমলা মুখোমুখি বসল রাধীর। অবনীবুড়ার সৌজন্যে সে ঘোমটা তুলেছে মাথায়, অথচ চোখেমুখে লাজ নেই, কেবলই বেহায়াপনা, আঁচলে মুখ রগড়ে নিয়ে সে বলল, ক'দিন থাকবা এখানে? ওদিকে তো তোমার ঘরদোর ফাঁকা পড়ে আছে। ছেলে মেয়েগুলোকে কোথায় রেখে এলে?

রাধী অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল, সে যে এখানে থাকতে আসেনি—এটা সে বোঝাবে কেমন করে? ঘরে আগুন লাগলে কেউ কি বসে বসে পাখার হাওয়া খায়? রাধীর চোখ ভিজে উঠল জলে, কোনমতে সে বলল, দাদার সাথে দেখা হলে তারে নিয়ে যেতাম। আমি একা মেয়েমানুষ, কাউকে চিনি না জানি না।

—আঁচলে টাকা থাকলে কাউকে চেনা-জানার দরকার নেই। কমলার নিষ্ঠুর গলা ঝ্যানঝেনিয়ে উঠল রাধীর কানে, তোমার দাদা কি যেতে পারবে গো, তার তো মেলা কাজ। আজ আবার সাঁঝবেলায় ট্রাকে-মাল যাবে কলকাতায়। আমাকে বলে গিয়েছে—ডিউটি সেরে সে চটপট ঘরে আসবে। বসতে হয় তো বসো, তোমার সাথে দেখা হলেও হয়ে যেতে পারে। তবে সঙ্গে যেতে পারবে কিনা বলতে পারছি না। যা ঝামেলায় থাকে, ওর একদম সময়ই হয় না।

হেলে পড়া কাজুবাদামগাছের ডালে একটা কাক এসে বসেছে সেই কখন থেকে, কাকটা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে রাধীর দিকে। অশুভ কোনো ইংগিত কাকটা কি বয়ে এসেছে তার জন্য—রাধী ভাবতে ভাবতে ঘেমে উঠল। গলা শুকিয়ে গেল তার, ঢোক গিলে বলল, বৌদি, এক গেলাস জল দাও না।

—এই সাত সকালে গলা শুকিয়ে গেল? কমলার গলায় সহানুভূতির বদলে ঠাট্টা, বসো, জল এনে দিচ্ছি। গলা তা শুকোবে ঠাকুরঝি। তোমার আর দোষ কোথায়? সে খাটবে জেল, তুমি বাপের দুয়ারে এসে আরামে শ্বাস নেবে তা তো হতে পারে না! আমি হলে কি পারতাম?

ভূষণ যখন এলো তখন রোদের রঙ কাজুবাদামগাছের বুড়ো পাতার মতো। ভূষণকে এতদিন পরে দেখে রাধীর অপরিচিত বলে মনে হয়। চেহারায় এক ফোঁটা লালিত্য নেই, দয়া-মায়াহীন অসার মুখমণ্ডল। যৌবন হারিয়ে গেলে মানুষের যে দশা হয় ভূষণেরও সেই দশা। চোয়াল জাগান মুখ, কপালে বিন্দুমাত্র মসৃণতা নেই, চাকু দিয়ে চিরে দেওয়ার মত এলোমেলো দাগ। সরু গোঁফজোড়া মুখের অনেক নীচে নামানো, তার সাথে খাপ খায় না ঘাড় ছাপান বাবরি চুলগুলোর। ভূষণ রাধীকে দেখে হাসল না, অবাক হল সামান্য। সে কিছু শুধোবার আগেই কমলা বাহাদুরি দেখিয়ে বলল, জানো গো, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। ঠাকুরজামাইকে চুরি কেসে পুলিশ মেরে ধবে হাজতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঠাকুরঝি সেই সকাল থেকে বসে আছে তোমার জন্য।

গরম তেলে জল পড়ার মতো চিড়বিড়িয়ে উঠল ভূষণ, আমি কী কবব? যেমন কর্ম, তেমন তো ফল পেতেই হবে। গঁড়া তো কারোর কথা শোনে না। গায়ে মাংস আছে বলে সে ভাবে তাব মত দুনিয়ায় আর কেউ নেই। ভূষণ চারমিনার ধরিয়ে ডুবে গেল তার নিজের কাজে। রাধী অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, দাদা, আমার খুব বিপদ, তোকে আমার সাথে যেতে হবে। রাধীব গলা বুজে এল কান্নায়, আমি অনেক আশা করে তোর কাছে ছুটে এসেছি। তুই আমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচা।

ভূষণ কোর্ট অব্দি আসত না যদি অবনীবুড়া বকাঝকা করত তাকে। রাধীর কাকুতি-মিনতি তাব মনে কোন দাগ কাটেনি। একমাত্র বোনের সাথে তার যে কোন টান নেই হাবভাবে সে বুঝিয়ে দিল। ভূষণের চোখে-মুখে কথা, প্রতি কথায় সে ছোট করতে চাইছিল গঁড়াকে। গঁড়া মানুষ নয়, হীন পশুব চেয়েও অধম—এমন মানসিকতা নিয়ে কোর্ট চত্বরে ঘোরাফেরা করছিল ভূষণ। রাধী তবু তার পেছন ছাড়েনি, ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে যেমন বেঁচে উঠার চেষ্টা করে রাধীব চোখে মুখে তেমন অসহায় আর্তি।

উকিল ঠিক করে আর সময় ব্যয় করেনি ভূষণ, তার ভীষণ কাজের তাড়া। সময় তার কাছে অতি মূল্যবান। আজ হাড়ের মহাজন আসবে তার কাছে দুপুরের পরে। বস্তাবন্দী মাল যাবে কলকাতায়। এ খেপের মালটা যদি ঠিক ঠাক পৌঁছায় তাহলে তাকে আর পায় কে! রাধী কেন, এসব কথা কমলার কাছেও বলা যায় না। মেয়েমানুষের পেট পাতলা। দু-কান হলেই দশ কান হবে। তখন ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি হবার যোগাড়।

হাজত থেকে ছাড়া পেয়ে গঁড়া আর দারুয়া যেতে চাইল না, একমাত্র অবনীবুড়া ছাড়া ঐ অঞ্চলের আর কেউ তার সাথে কথা বলে না। রাধী তবু জোর করল, চলো, না গেলে খারাপ ভাববে ওরা। আমি আর কারোর কথা শুনতে চাই না।

গঁড়া বিরক্ত হল না রাধীর কথায়, শুধু অনুশোচনায় দগ্ধে যাওয়া চোখ মেলে তাকাল, যাওয়ার মত মুখ আমার আর নেই। তুমি বরং যাও, আমি বাস স্ট্যাণ্ডে থাকছি।

—গেলে দু-জনেই যাব, না হলে যাব না। রাধী জেদ ধরল।

গঁড়া কোন উত্তর না দিয়ে হাঁটতে লাগল বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে। রাধী দৌড়ে এল ভয় পেয়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমাকে ছেড়ে যেও না, আমি তোমার সাথে যাব।

চিল ওড়া দুপুরে কোথাও একটু দাঁড়াবার মত ছায়া ছিল না। রাধী গঁড়ার ছায়ায় দাঁড়াল। সারা দিনের ধকলে কথা বলার ক্ষমতা ছিল না তার। দরদরান ঘাম শাড়ির আঁচলে মুছে নিয়ে সে বলল, তুমি এবার ভালো হয়ে ওঠো। আমার আর ছোট হতে ভাল লাগে না।

বাস এসে দাঁড়াল হঠাৎ, বাসের শব্দে হারিয়ে গেল রাধীর কথাগুলো। নির্দয় রোদের মত গঁড়া চেয়ে থাকল ভ্রুক্ষেপহীন।

একুশ

ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে পথঘাট পেছল পাঁকালমাছ, পা দিলেই হড়কে পড়ার দারুণ ঝুঁকি। এমন মন খারাপ করা বৃষ্টিতে রাধীর আরও মন খারাপ। দারুয়া থেকে খবর এসেছে ভূষণ ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। ট্রাকে মাল যাচ্ছিল কলকাতায়। মাঝপথে পুলিশ ট্রাক থামিয়ে টেনে হিঁচড়ে বের করেছে হাড়ের বস্তা। এত হাড় কোথা থেকে এল তার হিসাব ট্রাকের ড্রাইভার দিতে পাবেনি। ওখানে মারধোর খেয়ে ট্রাকের ড্রাইভার ফিরে এসেছে কাঁথিতে। ভূষণকে ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। সাত দিন হল সে ছাড়া পায়নি। এমন কী পুলিশের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারেনি। বেওয়ারিশ লাশের সৎকার করার দায়-দায়িত্ব অবনীবুড়ার। হিসাবমত সেগুলো পুঁতে দেওয়ার কথা। ভূষণ সেইসব লাশের মাংস ঝরে গেলে হাড়গোড় চালান দেয় কলকাতায়। এ কাজে সে একা নেই, পাড়ার আরও অনেকে আছে। কিন্তু ভাগ্য খারাপ হলে চুনোপুঁটি না ধরে বোয়াল ধরে আগে। ভূষণ ডাঙ্গায় তোলা বোয়ালমাছের মত খাবি খাচ্ছে হাজতে। জামিন পায়নি, পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটকে রেখেছে তাকে। অবনীবুড়া কেঁদে শুকিয়ে ফেলেছে চোখের জল, তাই নিরুপায় হয়ে খবর পাঠিয়েছে গঁড়াকে। গঁড়া কিছুতেই যাবে না। সে তামাকে আগুন ঠুসে কলকেয় টান দিচ্ছিল ঘনঘন। খবরটা কানে যেতেই বিকৃত আনন্দবোধে ভিতরটা তার টগবগিয়ে উঠল। রাধীর মনমরা শুকনো দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, আগুন খেলে ছাই তো বমি হবেই। আমি যখন ধরা পড়লাম তখন তোমার দাদার কথাগুলো আমাকে সুখ দেয় নি মনে। সে ভেবেছিল তার মত সাধু পুরুষ আর দেশ দুনিয়ায় কেউ নেই। এখন আমার কাছে খবর পাঠিয়ে কী হবে, মরে গেলেও আমি ওখানে আর যাব না। তোমার দাদাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। মানুষের হাড়, কঙ্কাল নিয়ে তার কারবার। ভেবেছিল—কাঁচা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে পুলিশের মুখ বন্ধ করে রাখবে চিরদিন। ভেবেছিল—তার মত চালাক মানুষ আর কেউ নেই। এখন ধরা পড়তেই আম শুকিয়ে আমসী। আমাকে খবর পাঠিয়েছে যাওয়ার জন্য। আমি যাবো না। যেতে হলে তুই যা। গঁড়ার চোখ-মুখ শ্রাবণের আকাশ। হুঁকো খাওয়া থামিয়ে সে আড়মোড়া ভাঙল, তারপর উঠে দাঁড়াল হাটখোলায় যাবার জন্য। রাধীর শরীর আর চলছিল না, তবু কোনমতে সে গঁড়ার সামনে এসে দাঁড়াল, গলায় অনুনয় বিনয় ফুটিয়ে বলল, যা হবার তা তো হয়েছে, ওসব কথা তুমি ভুলে যাও।

—তুই ভুললেও আমি ভুলব না। ফুঁসে উঠল গঁড়া, গলা সপ্তমে চড়িয়ে সে বলল, তোর দাদা একটা খুনী। সে ভেবেছে—কেউ তার চোরা ব্যবসার কথা জানতে পারবে না। তার ধারণা সব মানুষ ঘাসে মুখ দিয়ে চলে। সবাই বোকা, চালাক শুধু সে একা।

—যাবে না যখন তখন অত কথা বলে লাভ নেই। মুখ ঘুরিয়ে নেয় রাধী, ছলছলিয়ে ওঠে তার চোখ, নিয়ন্ত্রণহীন ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে বারবার। কপাল মন্দ না হলে কেউ কি অমন চণ্ডাল স্বামীর খপ্পরে পড়ে। চোখের জল আঁচলে মুছে নিয়ে রাধী পথ ছেড়ে দিল গঁড়ার। ঘরে একটা ভাঙা ছাতা ছিল, ওটা নিয়ে গঁড়া আর দাঁড়াল না। আজ আনন্দের তার শেষ নেই। হাটখোলায় গিয়ে আজ ভরপেট

মদ খাবে সে। কতদিন মনের সুখে মদ খায়নি সে। পুলিশের রুলের বাড়ি এখন আর পিঠে লেগে নেই, এখন সে যা ইচ্ছে খুশি করতে পারবে। হাজত খেটে ফিরে আসার পর গঁড়ার মনোবল ভাঙেনি, মুচকে যাওয়া কঞ্চির মত সে এখনও তার অস্তিত্বকে জিইয়ে রেখেছে টানটান। ঘরে বসে দু-দিন আরাম করে সে এখন নতুন ধান্দায় মেতেছে। বাঁক নিয়ে সে যায় বাঁশগাছের গোড়া তুলতে। একটা ভারী কুড়ুল ধারে কিনেছে সে। পেয়ারাগাছের ডাল কেটে কুড়ুলের হাতল বানিয়েছে নিজের হাতে। তার ব্যাপার-সেপার দেখে রাধী মনে মনে ভেবেছে—এবার বুঝি তার সুদিন ফিরে এল। কিন্তু অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়। পবন ঠাট্টা করে বলেছিল, কাকী গো, এবার তোমাকে আর কারোর দোরে চাল উধার চাইতে যেতে হবে না। গঁড়াকাকা যদি মন লাগিয়ে খাটে তাহলে তাকে আর কারোর কাছে হাত পাততে হবে না। গঁড়াকাকা একাই একশো।

পবনের কথা শুনে মোটেও মনের বল ফিরে পায়নি রাধী, সেও গায়ে পোকা ঝেড়ে দেওয়ার মত সহজ ভঙ্গিতে বলেছিল, বাবুর মতিগতি ক'দিন ঠিক থাকে সেটাই দেখতে হবে। এর আগে তোর কাকা একশ রকমের ধান্দা করে ছেড়ে দিয়েছে হুট করে। ওর মন না তো তড়বড়ে লাটিম, এক জায়গায় দাঁড়াতে জানে না। বিয়ের পর থেকে তো মানুষটাকে দেখছি। হঠাৎ হঠাৎ ওর যে কী হয় বোঝা দায়। আমি তখন ছেলে-মেয়ে নিয়ে বিপদে পড়ি। কতদিন আর লোকের কাছে হাত পাতবো।

পবন চুপ করে থাকলেও রাধীর কথার সত্যতা তাকে স্পর্শ করে। সংসারে এমন অনেক মানুষ আছে যাদের পথ চলার কোন নির্দিষ্ট দিক থাকে না। সহদেবও তো গঁড়ার মত ছন্নছাড়া। এদেরকে কোন নির্দিষ্ট ছাঁচে বাঁধা যায় না, এরা নিজেরাই নিজেদের পথ বদলে নিয়ে বেঁচে থাকতে ভালবাসে। এক ঘাটে বাঁধা থাকে না এদের জীবনের নৌকো, এরা নৌকো ডুবিয়ে কখনও বা ডিঙায় চেপে সমুদ্রের দিকে চলে যেতে ভালবাসে।

গঁড়া চলে যাবার পর বৃষ্টির মাত্রা আরো বাড়ল, খড়ের চাল ভেদ করে বৃষ্টির ফোঁটা চুম্বন এঁকে দিতে চাইল মেঝের বুকে। টপটপান জলের ধারায় ভিজে যাচ্ছিল মেঝে। স্যাঁতসেতে মাটিতে বিছানা পাতা ঝামেলার কাজ। রাধী তড়িঘড়ি উঠে গিয়ে মাটির হাঁড়ি নিয়ে এল জল ধরতে। ফি-বর্ষায় মাটির হাঁড়িগুলো চুয়ান জল ধরতে কাজে লাগে। পুরনো হাঁড়িতে জল পড়ছে সশব্দে। একভাবে সেদিকে চেয়ে আছে রাধী। বারবার করে মনে পড়ছে দাদার কথা। সময় মানুষকে কত বদলে দেয় দ্রুত। এবার ভূষণের ব্যবহার তার আদৌ ভাল লাগেনি। দুটো টাকা করেছে বলে সে সম্পর্কের উপর লেপে দিতে চায় সিমেণ্ট মাটি। রাধীও চায় না জোর করে সম্পর্ক ধরে রাখতে। জোর করা সম্পর্ক বেশিদিন বাঁচে না। কমলার মুখ ভার করা কথাগুলো রাধীর গায়ে ফোস্‌কা ফেলেছে, এতদিনেও সেই কথার টনটনানী রাধীর মন থেকে মোছেনি। সময় আসলে সুদে-আসলে সব ফিরিয়ে দেবে রাধী। সে গরীব ঠিকই কিন্তু তাবলে মান-সম্মানবোধহীন এমন তো নয়। ঘরের কাজে ডুবে গেলেও মনটা বারবার করে চলে যায় দারুয়ায়। বুড়ো বাপটার জন্য তার মন কাঁদে। মন করে ছুটে চলে যেতে। কিন্তু সময় মত ভাত না দিলেও গঁড়া শাসন করতে ছাড়ে না। ওর নজর চিলের চিয়েও তীক্ষ্ণ, একটু বেসামাল দেখলেই গায়ে হাত তুলে দেয় অনায়াসে। মাতাল মানুষের মান-সম্মানবোধ ঠুনকো কাচের মত, যে কোন সময় তা ভেঙে পড়ে। হাজত থেকে ছাড়া পাবার পর গঁড়ার গাঁয়ে ঢুকতে সঙ্কোচবোধ হচ্ছিল, ক'দিন সে ঘর থেকে বেরল না, শুয়ে থাকল ঘরের ভেতর। মাটির ঘরে ছোট্ট একটা জানলা, সেখান দিয়ে যেটুকু আলো আসে, সেই আলোটুকুই ছিল তার সম্বল। রাধী খোঁচা মেরে বলেছিল, তুমি কি নতুন বউ নাকি যে ঘরের কোণে বসে থাকবে মুখ গুঁজে? হাটখোলা থেকে ঘুরে আঁসো, তাহলে মনটাও ভাল থাকবে। ঘরকুনো ব্যাঙের স্বভাব মানুষকে যে মানায় না।

রাধীর কথাগুলোয় গঁড়া নড়ে-চড়ে বসলেও তার মনটা ডুবে থাকে চিন্তায়। এ পাড়ায় মাথা উঁচু করে চলত সে, কেউ কিছু বললেই লেজে পা দেওয়া সাপের মত ফুঁসে উঠত রাগে। সেই মাত্রাতিরিক্ত রাগ—জুড়িয়ে হিমপাথর। গ্রামের মানুষগুলোর কাছে সে মুখ দেখাবে কী করে—এই চিন্তা সর্বদা কুরে কুরে খায় তাকে। রাধী হারবার মেয়ে নয়, মাথা ঠাণ্ডা করে সে বলল, পরের উপর রাগ করে নিজের সংসারটাকে খুন করবা তা তো হয় না। পুরুষ মানুষ তুমি, তোমার এত ভাবলে চলবে না। কাল থেকে কাজে চলে যাও। আমি আর চেয়ে-চিন্তে সংসার চালাতে পারছি না। সবাই আমাকে খারাপ চোখে দেখে। তুমি এতদিন ছিলে না, আমি যে কী ভাবে ছেলে-মেয়ের মুখে দানা জুগিয়েছি তা আমি নিজেই জানি।

গঁড়াকে কিছু বলা আর পাথরকে বলা একই কথা। বলে বলে হার মেনেছে রাধী। শাক খুঁটতে গিয়ে সেদিন জোঁক তার দাপনায় বসে রক্ত চুষে খেল। দাপনার কাছে ঘা-টা এখনও শুকায়নি। রাতে গঁড়া তাকে শুধিয়েছিল, তোর এখানে কী হয়েছে রে!

লজ্জায় কোন উত্তর দিতে পারেনি রাধী, চোখের দু-কোণ ছাপিয়ে গিয়েছিল জলে। কোনমতে ক্ষতস্থানে হাত চাপা দিয়ে সে চেষ্টা করেছিল স্বাভাবিক হতে। সে-রাতে গঁড়ার ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ, রাধীকে ঠেলা মেরে কী যেন শুধোতে যায় সে। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয় সে। ছেলে-মেয়েগুলো শুয়েছিল রাধীর গায়ে গা লাগিয়ে, যেমন শেকড়ের গায়ে শেকড় লেগে থাকে তেমন। রাধীর কথা গঁড়াকে জেদী করে তুলেছে। সংসার চালাতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। জল ছাড়া যেমন হাঁস সাঁতার কাটতে পারে না, সুখী ঢেকুর তুলতে পারে না—তেমন টাকা-পয়সা ছাড়া গঁড়া বাঁচবে কী ভাবে? চুরি বিদ্যা ছাড়া সে আর কোনো বিদ্যায় পারঙ্গম নয়। গায়ে কালি লাগলে তা ঘষে তোলা যায়, কিন্তু কলার কষ তুলবে তেমন কোন যাদু-শক্তি তার জানা নেই। গ্রামের মানুষ তাকে এখন আর বিশ্বাসী চোখে দেখে না। চোরকে বিশ্বাস করবে এমন ছাতিওলা মানুষ এ গ্রামে খুব কমই আছে। কেউ যে তাকে কাজ দেবে না এ বিষয়ে গঁড়ার আর কোনো সন্দেহ নেই। সে আর কারোর দয়া নিয়ে বাঁচতে চায় না। একবার যখন গায়ে দাগ লেগেছে অপবাদের, তখন সেই দাগকে আঁকড়ে ধরে সে তার বাকি জীবন কাটিয়ে দেবে। সৎপথে বাঁচা বড় কঠিন। গঁড়া আর সময় ব্যয় না করে খড়ের চালে লুকিয়ে রাখা সিঁদকাঠিটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে । রাতের অন্ধকারে তার চলাফেরা একটা ধূর্ত শেয়ালের মত, চেনা পথে হাঁটতে তার কোনো কষ্ট হয় না, বরং স্বাচ্ছন্দবোধ করে, স্বমূর্তিতে ফিরে আসার আনন্দ তাকে ভেতরে-ভেতরে উজ্জীবীত করে তোলে। ভোরের আলো ফোটার আগেই গঁড়া ফিরে এসেছিল তার ঘরে। সারারাত পণ্ডশ্রম হয়েছে শুধু। কার ঘরে সে সিঁদ কাটবে? ধরা পড়ে যাবার ভয়টা নখ দিয়ে চিরে ফালা ফালা করে দেয় বুকের ভেতর। গা-হাত-পা হাওয়া লাগা বাঁশপাতার মতো কাঁপে। বারবার বেঁকে যায় চোখের দৃষ্টি। গাঁ শুদ্ধ লোকের সামনে পুলিশ তাকে জামগাছে ঝুলিয়ে মারছে এই নৃশংস দৃশ্য তার চোখের মধ্যে চলকে ওঠে। আর ওপথে পা বাড়ান নয়, বাপের দেওয়া প্রাণটা সে আর বেঘোরে হারাতে চায় না। চুপচাপ পুকুর ঘাটে পা ধুয়ে এসে সে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে ঘুমের ভান করে। রাধী ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে না এই গোপন নৈশ অভিযানের কীর্তিকলাপ।

শুধু এক রাত নয়, পরপর বেশ কয়েক রাত ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে গঁড়া। কোন রাতের অভিজ্ঞতা সুখপ্রদ হয়নি। হেরো মানুষের গলার জোর অত্যন্ত ক্ষীণ। রাতটা গঁড়ার হলে দিনটা রাধীর। সে শাসনে রাখতে চায় ঘরের মানুষটাকে। বুনো নদীকে শাসনে রাখা গেলেও গঁড়াকে বুঝি শাসনে রাখা যায় না। সে ছিলা পিছলান তীরের মত ছুটতে ভালবাসে। বৃষ্টির মত আগড় সরিয়ে গঁড়া উঠে আসে কাঁচা রাস্তায়। রাধীর সমস্যায় ভরা মুখশ্রী তাকে এখন আর কোন শান্তি দেয় না, এমন কী ঘরও তার কাছে অসহ্য। তার আদৌ ইচ্ছে করে না ঘরে ফিরতে। ঘরের চাইতে বাইরের এই খোলামেলা পরিবেশ তার ভাল লাগে, সে প্রাণভরে শ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারে।

কচাগাছের পাতা চুঁইয়ে জল ঝরছিল টুপটাপ। প্রতিদিনের দেখা গাছগুলো গঁড়ার চোখে নতুন ঠেকে। এই অসময়ের বৃষ্টিকে সে যেন ভালবেসে ফেলেছে—এমন প্রেমকাতুরে দৃষ্টি মেলে আকাশের দিকে তাকাল। মন ভরে গেল ধোয়া মেঘের রূপ দেখে। এই মেঘের সাথে একজনেরই তুলনা চলে এ গ্রামের। কামিনীর চাঁদ মুখখানা ধোয়া মেঘের চেয়েও ভাসাভাসা, ওর দৃষ্টিতে ঢল নামে আন্তরিকতার। তাকে দেখলেই কথা হারিয়ে ফেলে গঁড়া, বুকের ভেতর ঘড়ঘড় করে সাত ঘোড়ার মেসিন। যতই দেখে ততই যেন চিটে গুড়ের পিঁপড়ের মত জড়িয়ে পড়ে সে। কামিনী কম কথার মেয়ে। গঁড়া তাকে জ্বালাতন করলে সে ভয়হীন গলায় বলে দেয়, আমাকে জ্বালিয়ে তোমার কী লাভ হবে? তার চেয়ে ঘরে ফিরে যাও, ঘরে তোমার বউ-বাচ্চা আছে। তাদের ঠকিও না।

কামিনীর কথাগুলো গঁড়াকে ঝিমিয়ে দিলেও সে উদ্যম হারায় না। চাতক যেমন জলের আশায় বুক ফাটায়, আর্ত চিৎকার ভাসিয়ে দেয় খরার বাতাসে তেমনি গঁড়াও তার সুপ্ত মনের ভাষাকে বাইরের আলোয় ফোটা ফুলের মত ছড়িয়ে দেয় কামিনীর হৃদয়ে। কামিনীর নিরুত্তর চোখের দৃষ্টিতে তখন শীতে ভেজা পায়রার কাঁপুনী, গঁড়ার কথার ফাঁদে লটকে যায় তার মনপাখি, চোখে-মুখে খেলা করে অপার বিস্ময়বোধ—যা একমাত্র আকাশের পক্ষেই সম্ভব। স্বামী খেদান মেয়ে সে, কতই বা বয়স হবে, বড়জোর কুড়ি ছাড়িয়ে একুশ—তার চোখে তাই এখনও ভাব ভালবাসার সময় শ্যাপলা ফুল ফুটে ওঠে। নারীর যা ধর্ম সেই ধর্ম তার রক্তে নদী হয়ে বয়ে যায়। গঁড়া কামিনীর ছায়ায় নিজেকে জুড়োতে চায়, শীতল করতে চায় জ্বলাপোড়া দেহমন। এ গাঁয়ে সবাই তাকে চোর ভেবে এড়িয়ে গেলেও কামিনীর কাছে সে এখনও একটা পুরুষগাছ—যে গাছের ফুলে সুগন্ধ ফলে জীবনদায়ী অমৃত। সবার নজরে সে ছোট হয়ে গেলেও কামিনীর নজরে সে এখনও মানুষ হয়ে বেঁচে আছে। তাকে কোন অবস্থাতেই অবজ্ঞা করবে না মেয়েটা, সে ভালভাবেই জানে তার ভালবাসার ঘনত্ব কতখানি, তা যে একদম বানানো নয়, একথা সে জেনেছে অন্তর দিয়ে। কামিনীর বাবা রমণীর চুল্লু ভাটি গাঁয়ের শেষ প্রান্তে, ওদের মাটির ঘরখানার পরেই শুরু হয়েছে বিস্তৃত ধানক্ষেত, ধানক্ষেত ছাড়িয়ে গেলে নোনাখাল, ঢ্যাঙ্গা বাঁধ আর কাঠের সাঁকো। রাতের অন্ধকারে কামিনীর সঙ্গে কাঠের পোলটার কাছে কতবার দেখা হয়েছে গঁড়ার, যতবারই দেখা হয়েছে মেয়েটা চোখে লজ্জাফুল ফুটিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে, রাস্তা করে দিয়েছে যাওয়ার। গঁড়া তবু যেতে পারেনি, তার এবঁড়ো-খেবড়ো মনটা ডাহুক-ফাঁসে লটকে যাওয়ার মত লটকে গিয়েছে অসহায়ভাবে, সে কিছুতেই অদৃশ্য ফাঁস ছিড়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি। কাঠপোলের মাত্র দশ হাত নীচে গেরুয়া রঙের জল, জোয়ারের সময় থাকলে সেখানে হেসে ওঠে হাজার কামিনী, সেই হাসি ভুলে কীভাবে পথ ভাঙবে গঁড়া। যে পারে পারুক, তার দ্বারা ঐ কঠিন কাজ কোনভাবে, কোনমতে হবে না। সে মরে যাবে সে-ও ভালো তবু কামিনীকে অবজ্ঞা অবেহেলা করার দুঃসাহস তার এই ক্ষুদ্র জীবনে হবে না। এক একজন থাকে যাকে কোনভাবে কোন অবস্থাতে ভুলে থাকা সম্ভব নয়। খালের উপর থেকে উঠে আসে শীতল হাওয়া, জোনাকিরা মাথার উপর উড়ে যায়, রাতচরা পাখি ডাকতে ডাকতে খাদ্যের সন্ধানে চলে যায়, তবু কাঠপোল ছাড়িয়ে গঁড়া এক পা-ও সরতে পারে না। কামিনীর কাতর দৃষ্টি যে জলছবি এঁকে দেয় মনের ভেতর—সেই ছবি দিনরাত জাবর কাটে গঁড়া। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে গেলে রাধীর কাছে বকুনী খায়, গায়ে বিষ পিঁপড়ে ছেড়ে দেওয়ার জ্বলন হলেও মুখে কুলুপ এঁটে থাকে সে। ভালবাসার জন্য মানুষের বোবা হতে ক্ষতি কি। রাধী তার এই মৌনতার সারমর্ম বুঝতে পারে না, শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকায় আর ভাবে—তার ঘরের মানুষটা বুঝি মারধোর খাওয়ার পর অনুশোচনায় দগ্ধে মরছে, চেষ্টা করছে ঐ কুটিল জাল ভেদ করে দিনের প্রথম সূর্যের আলোর মত শুদ্ধ হতে। গঁড়া বিড়ি খায় আর হাসে, তার বুকের খোদলে ঘাই দিয়ে ওঠে কামিনীর প্রেমকাতর চাহুনী।

বৃষ্টিতে ভিজে গেছে পথঘাট, মাটির দেহতনু নরম অনেকটা মাখা ময়দার মতো—এই সুখের সময় মনটায় শিঙ্গি মাছের কাঁটা মারে কামিনীর অদৃশ্য হাতছানি। সেই হাতছানিকে সে কী ভাবে অবজ্ঞা করবে, তার অতো ক্ষমতা নেই। কামিনী যেন এই বৃষ্টিস্নাত বিকেলে ভরিয়ে দিয়েছে কামিনী ফুলের সুবাস, পুরো দুনিয়া মাতোয়ারা সেই গন্ধে—একটা অতৃপ্ত ভ্রমর সেই প্রস্ফুটিত ফুলের দিকে পাগল চেহারায় ধাবমান। কেউ তার গতিপথ রুদ্ধ করে দিতে পারবে না কোনো অবস্থায়, ঝড়-বাতাস-জল, মেঘ-বজ্র-ধূমকেতু কোনভাবে রুখে দিতে পারবে না তার পথ চলা। গঁড়া যে করেই হোক যাবে। কামিনী খবর পাঠিয়েছে দেখা করার জন্য, অতএব গঁড়াকে যে করেই হোক যেতে হবে।

হাড়িসাই ছাড়ালেই পিছনে পড়ে থাকবে মাটির নরম পথ, কচার বেড়া, বাঁশঝাড় আর ধুমসা খড়ের গাদা। হাটখোলা পেরিয়ে গেলেই শুরু হবে বাবু-ভদ্রলোকদের গ্রাম, যেখানে গঁড়া শুধু ঢোকে রাতের বেলায় চুরি ধান্দায়। দিনের আলোয় সে আসলেও তার ধূর্ত, সুযোগসন্ধানী চোখ শুধু খুঁজতে থাকে মানুষের লুকিয়ে রাখা ঐশ্বর্য, যা সে রাতের অন্ধকারে আত্মসাৎ করে নিতে পারবে নিজের সুবিধা মত। আজ গঁড়ার সেসব দিকে লক্ষ্য নেই, আজ তার লক্ষ্য শুধু রমণীর চুল্লুভাটি, যেখানে সে গলা ভিজাবে মনের সুখে, দরকার হলে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করবে খড়ের চালার নীচে। কামিনীর সাথে দেখা হলে সে চাঁদ ছুঁয়ে আসার আনন্দ পাবে। যদি তার সাথে দেখা না হয় তাহলে গঁড়া আর কোথায় যাবে, শুধু কাঁচা মদ গিলে—ফিরে আসবে হাটখোলায়, সেখানে সে তাসপালি খেলবে না, বরং এলোমেলো ঘুরে ছন্নছাড়া চেহারা নিয়ে ঘরে ফিরে আসবে, তারপর রাধীকে খিস্তি-খেউড় করে আঁকড়ে ধরবে পুরনো বিছানা। কামিনীর সাথে দেখা না হলে আর কী-কী করবে সে—এসব ভাবতে ভাবতে মাথার ভেতরটা তার জট পাকিয়ে গেল, কপালের শিরাগুলো লাফিয়ে উঠতে চাইল উত্তেজনায়। তবু সে ভেঙে পড়ল না—মুখ নীচু করে ময়রা দোকান পেরিয়ে, বটগাছের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে এল গ্রামে ঢোকার রাস্তায়। আর ঠিক তখনই পিছন থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল পবন, কাকা, টুকে দাঁড়িয়ে যাও—কথা আছে।

কী কথা থাকতে পারে, গঁড়া ভাবল কিছু সময়, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকাল। পবন ততক্ষণে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল, ওর পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা তেলঘামে কটকটান ময়লা গেঞ্জি। কুচকুচে কালো চুলে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির রেণু, গঁড়াকে তীক্ষ্ণ চোখে এক ঝলক দেখে নিয়ে সে বলল, ভজা চৌকিদার গাঁয়ে এসেছিল, সে তোমাকে খুঁজছিল। বলে গিয়েছে—থানায় দেখা করতে। পবন কথা শেষ করে হাতের তালু দিয়ে চুলের জল মুছল, তারপর স্বস্তির শ্বাস [illegible] সে বলল, কোথায় চললে কাকা? কাকি বলছিল, তুমি নাকি ঘরের বাইরে বেরচ্ছো না লজ্জায়।

অন্য সময় হলে গঁড়া জ্বলে উঠত রাগে, এখন সে সরপড়া ঠাণ্ডা দুধের মত, যথা সম্ভব নরম গলা করে বলল, কতদিন আর ঘরে বসে থাকব, তাই এট্টু বেরিয়েছি গাঁ ঘুরতে। দেখি কোথাও যদি কোনো কাজের খোঁজ পাওয়া যায়।

পঞ্চায়েতের মাটি কাটবা? বাবু বলেছিল লোকের দরকার।

মাটি কাটার কাজে মেহনত বেশী। তা কত করে দেবে?

যেমন মাটি কাটবা তেমন। ফুট মাপে কাজ। ফুট মাপে যদি না পোষায় তাহলে ঝুড়ি মাপে। পবন বোঝাতে চাইল, ঘরে বসে না থেকে কোন না কোন কাজে লেগে যাওয়াই ভাল। আমাদের পাড়ার অনেকেই যাচ্ছে। কী করবে, এখন তো মাঠেও কোন কাজ নেই।

গঁড়া আকাশপানে তাকাল, রঙ ধরা আকাশের কোণে ক[illegible] কালো মেঘের আনাগোনা। যা গোমড়া মুখ আকাশের তাতে আবার বজ্র ধমকালে কাঁদবে যখন তখন। চারদিকে মন খারাপ করা নৈঃশব্দতা। পথের পাশের কাঁটা শিমুলগাছটার গাঢ় সবুজ পাতা নড়ছে হাতছানি দিয়ে প্রিয়জনকে ডাকার মত, ওদের গায়ে বিকেলের শেষ আলো শয্যা পেতেছে গভীর ঘুমের। হাওয়ায় জড়িয়ে আছে শীতের অণু-কণিকা।

গঁড়া কেঁপে উঠল শীত হাওয়ায়, কামিনীর মুখখানা যেন গরম চুলা—তাকে তাপ পোহাবার জন্য ডাকছে। তাই যত তাড়াতাড়ি পবনকে বিদায় করা যায় ততই মঙ্গল। পবন ছিনে জোঁকের মত সেঁটে আছে গায়ে, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লের ভঙ্গিতে বলল, ভেবে দেখো কাল থেকে কাজে যাবা কিনা। যদি যাও তো বাবুর ঘরে গিয়ে নাম লিখিয়ে এসো। বাবু তোমাকে সব বুঝিয়ে বলে দেবে। পবন ফিরতে চাইছিল হাটখোলায়, ব্যস্ততা ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে, আমি যাই। কাল আবার দীঘায় যাব বালিগড় আনতে। এখন গরমটা কমেছে। এসময় বালিগড় লোকে খাবে ভাল। দুটো মাল যদি পেয়ে যাই ভাগ্যের জোরে তাহলে পরপর তিন দিন কাজে না গেলেও চলবে। পবন এগিয়ে গেল ক'পা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, চৌকিদারের কথাটা মনে রেখো। কাল সকালে তোমাকে থানায় দেখা করতে বলেছে।

পুলিশ চাম এঁটুলির মত গায়ে বসেছে গঁড়ার, চৌকিদার ইন্ধন জোগায় ওদের। ও ব্যাটাকে একটু টাইট না দিলে গঁড়ার জীবনটাই খাঁ-খাঁ মরুভূমি হয়ে যাবে। রাত-বেরাতে ঘরে শুয়েও শান্তি নেই, ও ঠিক আসবেই, নাম ধরে ডাকবে, সাড়া না পেলে লাঠির বাড়ি মারবে দরজায়। সাড়া পেলে আবার ফিরে যাবে গ্রামের ভেতরে। এ এক আজব কাজ। অথচ গঁড়া তটস্থ থাকে সব সময়।

ভয়ের স্বভাব কালিয়া কাঁকড়ার মতো, পবন মনের ভেতর ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার যাওয়ার পথের দিকে শূন্য চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল গঁড়া, মন থেকে ঝেড়ে-মুছে ফেলতে চাইল ভয়, কিন্তু কিছুতেই সে পারল না। পায়ে পায়ে উঠে এল ভয়। মেঘলা আকাশেব মত গঁড়ার মনটা ক' পলকের জন্য সিঁটিয়ে গেল থানা-পুলিশের কথা ভেবে। চৌকিদারের সাথে রফা না করলে তার জীবন আর সহজ নদীর মত বইবে না, মুখ থুবড়ে পড়বে খাড়া পাথরে। এলোমেলো হাওয়া মাঠ ডিঙ্গিয়ে আছড়ে পড়ল গঁড়ার মুখে, কালো মেঘগুলো উড়ে এসে থমকে দাঁড়াল মাথার উপব। পথের দু-পাশে অজস্র ছড়ানো-ছিটান গাছপালা, প্রতিটি গাছেব পাতায এখন বাতাসের আদর। গঁড়া দ্রুত পায়ে পেরিয়ে আসল পথের বাঁক, দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে দাওয়ায় বসে থাকা বুড়োটা কান গরম করা মন্তব্য ছুঁড়ে দিল, হা দেখ, চোর যাচ্ছে। দু'কান কাটার লাজ নেই রে। লাজ থাকলে কি দিনেব বেলায় বেরয়। গঁড়া শুনেও না শোনার ভান করে দ্রুত হেঁটে এল পুকুরপাড়ে। কলাঝাড়ের আড়াল থেকে সে লক্ষ্য করল বুড়োটাকে। মনে মনে সে বেশ উত্তেজিত কিন্তু মুখ ফুটিয়ে তাব বলারও কিছু নেই। চোরকে চোর, ডাকাতকে তো ডাকাত বলে মানুষ। নিজের নামের পাশে এই দু-অক্ষরের শব্দটা গঁড়াকে শান্তি দেয় না কিছুতেই, বরং মনে মনে তাকে আরো জেদী করে তোলে ঐ বক্রোক্তি। ভাল সে আর জীবনে হতে পারবে না, আর ভাল হলেও তাকে এরা ভাল থাকতে দেবে না। কলাঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই প্রথম তার মনে হল, অপবাদের কালি একবার গায়ে লাগলে সহজে তা আর উঠতে চায় না। মেঘ কালো করা আকাশেব ছায়া পড়েছে গঁড়ার চোখে-মুখে, কেঁপে উঠছে পায়ের তলার মাটি—সেই সঙ্গে ভয়ে টিসটিসিয়ে ওঠে বুক। রাতের পেঁচা দিনের আলোয় এলে তাড়া খায় কাক-চিল-শালিকের। আত্মরক্ষার জন্য তাকে গোপনে চলাফেরা করতে হয়। গঁড়া কলাঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল সামনের ফাঁকা রাস্তায়। মনে মনে সে চাইল বৃষ্টি ঝরুক আকাশ ভেঙে, পথে লাফিয়ে পড়ুক আঁধার, সে তাহলে নিশাচর পাখিব মত কামিনীর কাছে পৌঁছে যেতে পারবে বিনা বাধায়। কালো ধুমসা মেঘটার ছায়া দেখা যায় না আকাশে, মেঘ সরে গিয়ে আকাশ এখন নিকোনো তকতকে উঠোন। এ সময় গ্রামের মানুষদের ঘরে ফেরার সময়। কারোর সাথে মুখোমুখি হয়ে গেলে দশটা কথার জবাব দিতে হবে তাকে, কেউ বা ঘৃণায় ঘুরিয়ে নেবে চোখ, কেউ বা দু-চোখে সন্দেহের জাল বুনে টেঁরিয়ে-বেঁকিয়ে দেখবে তাকে। কারোর কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারবে না সে, রাতচরা পাখির মত সে-ও এবার থেকে চলাফেরা করবে মানুষের ধূর্ত চোখকে ফাঁকি দিয়ে।

বাঁশঝাড়ের সীমানা যেখানে শেষ সেখান থেকেই শুরু হয়েছে ধানমাঠের সীমানা। ফসল শূন্য মাঠে জেগে আছে ধানের ন্যাড়া, আকাটা পাকা দাড়ির মত খোঁচা খোঁচা। তরল অন্ধকারে ভৌতিক লাগে

বাঁশবন, হাওয়ায় কটকট শব্দ তোলে বিচিত্র। এ সময় কামিনী কোথায় থাকে গঁড়ার সব বুঝি নখদর্পণে, সে রমণীবুড়ার চুল্লু ভাটিতে না গিয়ে ঘরের পিছনের পুকুর পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল। আতিপাতি করে খুঁজতে লাগল কামিনীকে, চিকনিশাক তুলে পুকুরে গা ধুয়ে কামিনী ঘরে ফেরে রোজ। শূন্য পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে মন ভেঙে গেল গঁড়ার, কামিনীকে সে কোথাও খুঁজে পেল না। বিকেল থেকে আকাশ মেঘলা বলেই কামিনী হয়ত চিকনিশাক খুঁটতে যায়নি মাঠে। জলে ভিজে শাক তোলায় ঝুঁকি আছে, জ্বর-জ্বালা হলে কে তাকে দেখবে। রমণীবুড়া ভাটি নিয়ে হিমসিম খায় সারাদিন, তার সময় কোথায় মেয়ের সেবা-যত্ন করার। হতাশ না হয়ে গঁড়া ফিরে এল ভাটিখানায়, কাঠের তক্তাপাতা উঁচু জায়গাটায় বসে পড়ল শরীর এলিয়ে। মাথা ভার হয়ে আছে সেই কখন থেকে। বুড়োটার কথাগুলো এখনও ভুলতে পারেনি সে। বুকের ধুকপুকানী না কমলে নেশা করে মজা পাওয়া যাবে না। তক্তার উপর বসে পা দোলাচ্ছিল গঁড়া, রমণীবুড়ার তার দিকে কোন খেয়াল নেই, সে অন্য খদ্দের সামলাতে ব্যস্ত। মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বার দুই কাশল গঁড়া, খদ্দেরের হাতে গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে রমণীবুড়া চোখ তুলে তাকাল। মুখে হাসি ফুটিয়ে গঁড়াও চেয়ে থাকল তার দিকে, আঁচ করার চেষ্টা করল বুড়োটার হাবভাব। রমনীবুড়া খুশি হয়নি গঁড়ার উপস্থিতিতে, চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সে আবার চলে গেল ক্যাশ বাক্সটার দিকে। এমন কিছু যে ঘটবে মনে মনে আশা করেছিল গঁড়া। আজ যদি রমণীবুড়া তাকে জুতো মেরে তাড়িয়ে দেয় তাহলেও সে এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। কামিনীর সাথে একবার দেখা না করে সে কোনমতেই ঘরে ফিরবে না। এত কষ্ট করে আসা, না দেখা করে ফিরে গেলে বুকের ভিতরে যে খেদ হবে তা সে পূরণ করবে কী দিয়ে। রাধা নরম মাটির তাল, তাকে নেড়ে ঘেঁটে সুখ নেই। কামিনী ভরা নদী, সাঁতার কাটলে সুখ কত। ওর ডাগর চোখ দুটোয় হাজার স্বপ্ন আঁকা আছে। রাতচরা পাখির মত সেও তো রহস্যময়ী। ওর স্বামী পালান ওকে ভাত দিল না। উল্টে মেরে ধরে ঠেলে পাঠাল বাপের ঘরে। কামিনী সেখানে থাকলে মারা পড়ত। পালানের বন্ধুরা ছিঁড়ে খেত তাকে। কামিনীর কোনো দোষ নেই, যত দোষ ঐ পালানের। শহরের ডাক্তার বলেছিল, কামিনীর সন্তান হবে না। পালানের শরীরে সন্তানের বীজ নেই। পালান গায়ের জোরে ডাক্তারের কথাকে ঘুরিয়ে দিল। গাঁয়ে এসে রটিয়ে দিল কামিনী বাঁজা। বাঁজা গাছে ফুল আসবে না কোনদিনও। যে গাছ ফুল-ফল দেবে না, তার গোড়া কেটে ফেলাই ভালো। সেইমত ফন্দি এঁটেছিল পালান। ফাঁদ পেতেছিল যত্নে। কামিনী যে ফাঁদ ছিঁড়ে বেবিয়ে আসবে—এটা সে নিজেও জানত না। মা শীতলার দয়া না থাকলে তার এই জীবন বাঁচত না।

পালান পালিয়ে বাঁচতে চায়, একটা বিল ইঁদুরের যা সাহস তা বুঝি ঐ মানুষটার নেই। কামিনী মরবে তবু ওর খপ্পরে আর পড়বে না। সে তার ছাতায় ধরা জীবনটাকে ধৈর্য আর সংযমের বেড়া দিয়ে বাঁধবে। তাকে কেউ আর বিপথগামী করতে পারবে না। অন্ধকার নেমে এসেছে চালাঘরে, ক্লান্তিতে বুজে এসেছে পৃথিবীর চোখ। হ্যারিকেনের আলোয় রমণীবুড়া খদ্দের সামলাতে ব্যস্ত। সন্ধ্যের পরে মদের ঠেক জমে ওঠে। দিনভর খেটে-খুটে আসা মানুষগুলো এখানে এসে দম নেয়। ঘোলা পানীয়র এত তেজ, তারা চাঙ্গা হয়ে ওঠে এখানে। হ্যারিকেনের আলো ডেকে এনেছে পোকা। আত্মক্ষতির দুঃখ নয়, ওরা ডানায় শব্দ তুলে উড়ছে আনন্দে। রমণীবুড়া চালাঘরের মাঝখানে জ্বালিয়ে দিয়েছে কৌটোয় বানান ডিবরি, চারদিক খোলা চালাঘরের মাঝখানে হাওয়া নেচে যায় বাঁধনহারা খুশিতে। আলোর শিখা কেঁপে যাচ্ছে বারবার। হাঁড়ির আড়ালে ডিবরিটা রেখে খাটো ধুতিতে গিঁট দিয়ে ভাল করে পরে নিল রমণীবুড়া। সে সবাইকে মদ খাওয়ায়, নিজে কোনদিন মদ ছুঁয়ে দেখেনি। কেউ তাকে নেশা করার কথা বললে, চার আঙুল জিভ বের করে অদ্ভুত "না" সূচক শব্দ তোলে মুখে। পাঁকে থেকেও সে হলো পাঁকাল মাছ, কাদা লাগায় না গায়ে। কেউ জোর করলে রমনীবুড়া বলে, ওটি হবে না বাপ, আমার নাম রমণী মোহন দাস। আমি ঘাস কাটব সেও ভাল তবু গোরু হবো না। খেতে হয় তোমরা খাও, না হলে চলে

যাও। আমি কাউকে ঘর থেকে ডেকে আনব না। আমার বাপ বলত, মদ জুয়া তাস, এই তিনে সর্বনাশ। আমি মানুষ হয়ে কী করে মানুষের সর্বনাশ করি।

—তাহলে যে মদ বেচো? প্রশ্ন ভেসে এলে মোটেও ঘাবড়ায় না রমণীবুড়া, ফোঁকলা দন্তহীন মাড়িতে জিভের ডগা ঘষে বলে, এটা আমার জাত ব্যবসা। আমি চাষ করে খেতে পারতাম কিন্তু খাবো না। কেন খাবো? ওতে কি শান্তি পেতাম? সেয়ানা মানুষ রমণীবুড়া, তার চোখে-মুখে কথা। চর্বিবহুল দেহটা গুমোট গরমে ঘেমে-নেয়ে একসা। কারবারে হাজার জানা-শোনা থাকলেও সে কাউকে ধার দেবে না। ধারের প্রস্তাব শুনলে তার মাথায় বিছে কামড়ে দেয়। জোড়হাত করে বলবে, মাফ করো গো। যা বলেছ, ওটি আর বলো না। ধার দেওয়া মানে বিঁচুটির ঝোপে ঝাঁপিয়ে পড়া। জেনে-শুনে ও ভুল আমার দ্বারা হবে না।

এই যার চরিত্র তাকে বাগে আনতে গিয়ে গঁড়াকে মাথা ঘামাতে হয় অনেক। পকেটে যা টাকা ছিল তা দিয়ে দু-গেলাস পেটে ঢুকিয়ে গঁড়ার ঝিমুনী আসা ভাব। আর এক গেলাস ধারে পেলে খেত, কিন্তু বুড়ার সামনে ধার চাইতে গলার ভেতর জড়িয়ে গেল কথা। ভিজান ছোলা শুধু মুখে খাচ্ছিল সে। চোখ দুটো সর্বদা চালাঘরের বাইরে। কী খোঁজে, কারে খোঁজে সে তো গঁড়া ছাড়া আর কেউ জানে না। কামিনীহীন চালাঘরটা জল শুকিয়ে যাওয়া জলাশয়ের মত। প্রায় ঘণ্টাখানিক পার হয়ে যায়, তবু কামিনীর দেখা পায় না সে। রমণীবুড়ার তীব্র বারণ, খদ্দের এলে সে যেন এখানে না আসে। নেশাখোর মানুষের মতিগতি বোঝা দায়। প্রায় সব পুরুষের চোখেই মেয়েমানুষেব নেশা। নেশায় জগত কাঁপে, হৃদয় কাঁপে। গঁড়া কীভাবে শুধোবে তার মনের কথা। বুড়োটার মেজাজ ভাল নেই প্রথম থেকে। কী বলতে কী বলবে—তারও কোন ঠিকানা নেই। দিনভর আগুনের সামনে বসে কারবার। ফোঁটা ফোঁটা রস শিশিতে ভরে হয় এক বোতল। এরকম কত বোতল যে দিনভর বিকোয় তাব কোন গোনাগুনতি নেই। আড়মোড়া ভেঙে গঁড়ার পাশে এগিয়ে আসে রমণীবুড়া, চোখে অসন্তোষ, গলায় ঝাঁঝ, আর কত খাবে? যাও, ঘরে ফিরে যাও। তোমার নামে সারা গাঁয়ে বদনাম। পুলিশ বাব দুয়েক ঘুরে গিয়েছে এখান থেকে। ওরাও জেনে গিয়েছে তুমি এখানে গলা ভেজাতে আসো। আমিও বলেছি, চোর-ছ্যাঁচোড় নিয়ে আমার কারবার। কার কথা আমি আলাদা করে বলব? গাঁয়ে যারা মদ খায়, তাদের বেশির ভাগই ভদ্রলোক নায়। প্রায় সকলের পিঠেই ছাপ আছে।

পুলিশও গলা ভিজিয়ে পকেট গরম করে চলে গেল। সেই থেকে রমণীবুড়ার যত রাগ গঁড়ার উপর। তার যদি শক্তি থাকত তাহলে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিত চোরটাকে। চোখ রাঙিয়ে বলত, আর এসো না। তুমি এলে আমার কারবাব মার খায়। দশ লোকে দশ কথা বলে। আমি কাব মুখে চাপা দেব।

মনের ক্ষোভ মনের ভিতরে চেপে রাখে রমণীবুড়া। এসব কারবারে ক্ষরিস সাপেব তেজ দেখালে চলবে না, ধান্দা বাঁচিয়ে বাখতে গেলে ঢোঁড়া সাপ হওয়া দরকার। প্রয়োজন হলে চুমু দিতে হবে সাপ আর ব্যাঙের গালে। কাউকে আলদা চোখে দেখা অন্যায়। খদ্দের সবাই লক্ষ্মী।

গঁড়া তবু আলাদা খাতির চায় বুড়ার কাছ থেকে। গলা খেঁকারি দিয়ে সে বুড়ার চোখের দিকে তাকায়, ঢোক গিলে বলে, আজকের চাখনাটা ফাস কেলাস হয়েছে! কে বানিয়েছে গো অত সুন্দর চাখনা? —উত্তরের আশায় হা করে তাকিয়ে থাকে গঁড়া, চুলবুল করে চোখ। একটা মাঠঘুঘরো আলোর চারদিকে মাতাল হয়ে ঘুরছে। ও নির্ঘাৎ মরবে আলোতে ঝাঁপ দিয়ে। গঁড়া বুড়ো আঙুলের টোকা দিয়ে সরিয়ে দিল পোকাটাকে। রমণীবুড়া তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, নেশা তোমাব ব্রহ্মতালুতে ঠেকেছে। এবার ঘর যাও। নাহলে পথেই তোমার রাত কেটে যাবে। পা হড়কে পুকুরেও পড়তে পারো। তখন আমি খুনের দায়ে ফাঁসব। তোমার বউ আমাকে ছাড়বে না। ওর অভিশাপ আমার গায়ে লাগবে।

রাত বেড়ে যায় কথায় কথায়। আকাশের বুকে ফুটে ওঠে তারা-নক্ষত্রের ছড়ান-ছিটান সংসার। হাওয়া ফিসফিসিয়ে চলে যায় ধানমাঠ পেরিয়ে আরো দূরে। চালাঘরের মাথায় টুপটুপিয়ে ঝরে পড়ে শিশির। বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে আসে পাশের ঝোপ থেকে। গঁড়া নাক টেনে সেই সুগন্ধ পুরে নেয় বুকে। নেশায় কুঁচকে যায় চোখ। মাথার ভেতর জড়ো হতে থাকে হাজার কথা। ক্লান্তি-অবসাদে স্থিতু হতে চায় শরীর। রমণীবুড়া গঁড়ার মতিগতি ভালই বোঝে, বিরক্তি ধরা পড়ে গলায়, যাও বাপ, আর আমাকে জ্বালিও না। সারাদিন আমারও কম ধকল যায়নি। এবার আমিও হাত ধুয়ে, খেয়ে দেয়ে একটু জিরোণ নেব। একে একে তো সবাই চলে গেল। তুমি আর কতক্ষণ এখানে বসে বসে মাছি তাড়াবে।

গঁড়ার ঘোলাটে চোখে কামিনীর মুখখানা ঘোরাফেরা করে, স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে সে, কিন্তু পারে না। এক সময় হাল ছেড়ে দেয় রমণীবুড়া। হাঁড়িকুড়ি, শিশিবোতল গুছিয়ে সে জল দেয় ভাঁটায়, তারপর গঁড়ার দিকে রুষ্ট চোখে তাকায়, কী তোমার মতলব আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে। ঘর থেকে কি ঝগড়া করে পালিয়ে এসেছ নাকি?

গঁড়া হ্যাঁ-না কিছু বলে না। শুধু ডানে-বাঁয়ে মাথা ঝুঁকায়। আর বিড়বিড় করে কী সব আউড়ে যায় আপন খেয়ালে। ভার মাথাটাকে সে আর ধরে রাখতে পারে না, বারবার ভাদুরে কুমড়োর মত মাটি নিতে চায় মাথাটা।

রমণীবুড়া চলে যাবার পর গঁড়া চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়ল কাঠের তক্তায়। হাত-পা ছড়িয়ে দিল বর্ষার গাছের মত। ডিবরির আলো চোখে এসে পড়ছিল। ডান হাতটা চোখে চেপে সে পড়ে থাকল একলা চালাঘরে।

অনেক রাতে হিম ঝরে পড়ে খড়ের চালে, লাউগাছের পাতা চুঁইয়ে নামে শিশির কণা। ফাঁকা মাঠের দীর্ঘশ্বাস বুকে বাজে। ঘণধরা বাঁশের খুঁটিতে যন্ত্রণার শব্দ ওঠে।

ভোরের দিকে কামিনী বাইরে এসে গঁড়াকে দেখে চমকে ওঠে। রাগে থরথর করে কাঁপে গা-হাত-পা। ঐ চোর মানুষটার সাথে সে আর কোনো সম্পর্কই রাখবে না। ক'দিন থেকে তার শরীরে ধূম জ্বর, ঘরের কাজও করতে পারে না। কোনমতে নিজে গিয়ে ওষুধ এনেছে কানাই ডাক্তারের কাছ থেকে। অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজে পুরো শরীর জড়বৎ, কিছু খেতে ইচ্ছে নেই। তারও তো সেই একই চিন্তা মানুষটার কী হলো? ধানমাঠে সেও তো ছুটে গিয়েছিল চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে। তখনও সে জানত না গঁড়া চোর। গ্রাম সমাজে তার মূল্য একটা ফুটো কড়িও নয়। টাটিয়ে উঠেছিল মন। পালান খেদিয়ে দেবার পর থেকে তার চোখ দুটোয় আঁধার ছাড়া আর কিছু নেই। কাকে জড়িয়ে ধরবে সে, কে দেবে তাকে সান্ত্বনা? ঐ গঁড়াই তো আসত তার কাছে। হাটখোলায় দেখা হলে কথা বলত যেচে-যেচে। মানুষটার চোখে যে কোন পাপ নেই—এটা বুঝতে পারত কামিনী। শুধু একটু ভালবাসা চাইত সে, আমাকে ফিরিয়ে দিও না, আমি যে তোমার জন্য ভেবে মরি। বিয়ে-থাওয়া করলে কি মানুষের সব ভালবাসা শুকিয়ে যায়?

—আমি জানি সে, তুমি চলে যাও।

—যেখানে যাব, সেখানেই তো তোমার মুখ। গঁড়ার ব্যাকুল দৃষ্টিতে হার না মানার কথা, আমাকে পাগল করে তুমি কি সুখ পাবে? তারচেয়ে একটা চাকু দিয়ে আমার বুকটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দাও। কেউ জানবে না—তুমি আমাকে মেরেছ। সবাই জানবে আমি নিজেই নিজেকে খুন করেছি।

যার এত জেদ, তাকে কী ভাবে ফেরাবে কামিনী? গাছের কাছে তো সবার আসার অধিকার আছে। পালানকে সে দেখিয়ে দেবে—সুখ কেবল তার একার নয়। সুখ সবার জীবনে ঘুরে-ফিরে আসে। আর ভালবাসা কর্পূর নয় যে উবে যায়। ভালবাসা হল সমুদ্রের নীল জল, যেখানে গরল আছে, অমৃত আছে।

ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে কামিনী অনেকক্ষণ যুদ্ধ করল নিজের সাথে। বারবার হেরে গেল সে। গ্রাম যখন তলিয়ে গিয়েছে গভীর ঘুমে, তখন সে কেন উঠে এল বাইরে। তার তো শরীর জুড়ে জ্বর। কত দিন হল ভাত খায়নি। হাঁটা-চলাও করতে পারে না ভালমতন। এ অবস্থায় গঁড়ার সাথে তার দেখা হতে পারে স্বপ্নেও ভাবেনি।

রমণীবুড়ার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পায় কামিনী। ঝিঁঝি পোকার ডাকের চেয়েও তীক্ষ্ণ সেই ডাক। একতাল কাদার মতো পড়ে আছে মানুষটা। সকালের আলো না ফুটলে তার ঘুম ভাঙবে না কিছুতেই।

কামিনীর সাহসটা লকলকিয়ে বাড়ছে, আজ গঁড়ার সাথে তার চরম কিছু হওয়ার দরকার। কী করে এত সাহস হল মানুষটার ঘরে আসার! কি ভেবেছে ও? কামিনী কি সস্তা টগরফুল?

ঠেলা মেরে সে জাগিয়ে দেয় গঁড়াকে। চাপা গলায় শুধোয়, কেন এসেছ এখানে? যাও, এক্ষুণি চলে যাও। আমি তোমার ঐ পোড়ামুখ দেখতে চাই না।

চোখ ডলে নিয়ে তখনও অপ্রকৃতিস্থ গঁড়া। চোখে-মুখে ছড়িয়ে আছে ঘুমের যাদুঘোর। ডিবরির আলোয় কামিনীকে দেখে তার মুখ থেকে কোন কথা সরে না। শুধু দেখতেই থাকে দু-চোখ ভরে।

মুখ ঘুরিয়ে নিল কামিনী, শরীরে ঢেউ তুলল অবহেলার, আমি ঠাকুর নই যে আমাকে দেখবে। ভাল চাও তো চলে যাও। না হলে চিল্লিয়ে লোক ডাকব। এমনিতে তোমার গাঁ জুড়ে বদনাম। আমি যদি কলঙ্কের বোঝাটা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিই, তাহলে তুমি আর বাঁচতে পারবে না। গাঁয়ের মানুষ তোমাকে ছিঁড়ে দশ টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

—হাজার টুকরো করলেও আমি তোমাকে দেখব। ভাবাবেগে গঁড়ার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, তোমাকে দেখব বলেই বৃষ্টি মাথায় ছুটে এসেছি। খেদিয়ে দিলে চলে যাব। কিন্তু চলে যাওয়ার আগে তোমাকে দু-চোখ ভরে দেখব। আমার অনেক জ্বালা। তোমাকে দেখলে আমাব আব কোনো কষ্ট থাকে না।

কামিনী ঠোঁট কামড়ে নিজেকে আরো কঠিন থেকে কঠিনতর করার চেষ্টা কবে, পারে না। হেরে যাওয়ারও আনন্দ থাকে, সেই আনন্দে ছলছলিয়ে ওঠে তার চোখ, আমাকে কি এ গ্রামে থাকতে দেবে না তুমি, আমার মরণ কি তুমি নিজের চোখে দেখতে চাও? ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে কামিনী, স্বামী খেদান মেয়েমানুষ আমি। আমাকে একা থাকতে দিলে এ সমাজেরই মঙ্গল। আমি একাই থাকতে চাই। তুমি চলে যাও। বাবার ঘুম ভেঙে গেল সেও আমাকে ভুল বুঝবে। তার ভাতও তখন আমার কাছে নিমতিতা হয়ে যাবে। এমনিতে শ্বশুরঘর ছেড়ে এসেছি বলে—সে আমাকে কথা শোনায। আমি আর কাবোর কথা শুনতে পারব না। এবার আমি মরব, ঠিক মরব।

গঁড়ার সারা শরীরে ভয়ের বিদ্যুৎ খেলে গেল, টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে হাত ধরল কামিনীর, তুমি কেন মরবে? মরার জন্য কি দুনিয়ার আলো দেখেছ?

হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে না কামিনী, গঁড়ার মধ্যে সে দেখতে পায় পালানের ছবি। সংসারে সব মানুষ একই রকম হয় না, হতে পারে না। কামিনীর গলা কেঁপে ওঠে, তোমাকে যেদিন ওরা ধরে নিয়ে গেল মারতে-মারতে, সে রাত থেকে আমার গায়ে ভীষণ জ্বর। মার তো তুমি খাওনি, আমিই খেয়েছি। এই দেখ, আমার শরীরে কত বেদনা। চোর শুধু তুমি একা নও, আমিও। আমি তোমার মন চুরি করেছি। না হলে তুমি কেন এমন পাগল হলে? এখন আমাকে যা শাস্তি দেবার দাও। আমি মাথা পেতে নেব। তেষ্টায় বুক ফেটে যায় চাতকপাখির তবু সে আকাশের কাছে জল চায়। তুমি আমার আকাশ, আমার তেষ্টা মেটাও।

ডিবরির কালো শিস হাওয়ায় কাঁপে বিষধর সাপের ছায়ের মত। জলজ শ্যাওলার গন্ধ উড়ে আসে পুকুরের বুক থেকে। চরাচরে চাঁদ ডুবে যাওয়ার নির্জনতা। গঁড়ার সবল বাহুর মধ্যে বরফের মত গলতে থাকে কামিনী। ধুয়ে-মুছে যায় পাপ-পূণ্যবোধ। একটা শরীরের তাপ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে অন্য শরীরে। খোঁপা ভাঙা রেশমী চুল ঢেঁকির পাড় দেয় পিঠের উপর। কামিনীর শরীর ছুঁয়ে গঁড়ার মনে হয় সে যেন ছুঁয়ে দিয়েছে আকাশ। তারার মতো চিকচিকিয়ে উঠছে কামিনীর দু-চোখ। নিটোল মুখে অন্ধকার নয়, ফুটে উঠেছে গোলাপী আভা। মসৃণ, পেলব, মখমল শরীরে ধীরে ধীরে জমা হতে থাকে শিশিরকণা। ভিজতে থাকে গঁড়া। ডাগর, শাপলাভাসা চোখের দিকে তাকিয়ে উদভ্রান্ত দিশেহারা গঁড়া খুঁজতে থাকে হৃদয়ের ধন—ভালবাসা।

বাইশ

বেলদার যাত্রাপার্টি নামকরা।

পবন দীঘায় না গিয়ে সোজা চলে গিয়েছিল বেলদায়। সুভদ্রাকে সে আগাম কিছু বলেনি। ভোররাতে সে স্বপ্ন দেখেছিল সহদেবের। খুব অসুখে পড়েছে মানুষটা, তাকে দেখার কেউ নেই। মদ-গাঁজা খেয়ে বুকটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে গত চারবছরে। বাঁশিতে ফুঃ দিলেই নাক-মুখ দিয়ে গড়িয়ে নামে রক্তধারা। সেই সঙ্গে কান কাঁপান কাশি। দু-হাতে বুক চেপে ধরলেও কাশির বেগ কমে না। ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় চোখ। জলে ভিজে ওঠে চোখের পাতা এবং জমি। মানুষটা অনুশোচনায় পুড়ছে। যাত্রাদলে তাকে দেখার কেউ নেই। মালিক অন্য লোক রেখেছে সহদেবের বদলে। আসরে সে-ই এখন বাঁশি বাজায়। সহদেব মুখে উড়নী চেপে রক্ত মোছে আড়ালে। ঘরে ফিরে আসার মুখ নেই। কী জবাব দেবে সুভদ্রার কাছে? অতসী বোষ্টমীর কাছেই বা সে কোন মুখ নিয়ে ফিরে যাবে। চারটা বছর ভাঙা জীবনের কাছে মূল্যবান অথচ হেলায় চারটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে সে। এখন এই অসুস্থ শরীর নিয়ে সে কোনখানে গিয়ে দাঁড়াবে? হাত-পায়ে অদ্ভুত একটা ঝিনঝিনানী। একটু মেঘলা করলেই শরীর ফুঁড়ে ফুঁড়ে তাপ বেরয়। সারারাত জ্বরের ঘোরে কাঁপতে থাকে সে। মুখ দিয়ে ছিটকে আসে দুর্গন্ধ। বিড়বিড়িয়ে ওঠে ঠোঁট, আমাকে ক্ষমা করে দাও সুভদ্রা। এ জীবনে আমি তোমাকে সুখ দিতে পারলাম না। পরের জীবনে যদি দেখা হয় তখন আমি আর কারোর কাছে যাব না। আমি শুধু তোমার কাছে থাকব। আমি পবন আর মেনির বাপ হয়ে বাঁচব। এ জীবনে যা হল না, তা যেন ফিরে জন্মে পাই। সহদেবের চোখছাপান জলে কোনরকম ভনিতা ছিল না। সে হাত উঁচিয়ে ডাকছে, পবনরে, তুই আয়। আমাকে নিয়ে যা। আমি একা যেতে পারব না। একা যাওয়ার মুখ আমার নেই। তোর মায়ের কাছে এই পোড়ামুখ আমি কোনদিন আর দেখাতে পারব না। অথচ আমার ইচ্ছা করে গ্রামের মাটিতে মরতে। ইচ্ছে করে—তুই আমার মুখে আগুন দে। আমি তোদের ছোঁয়া নিয়ে মরতে চাই।

ক'দিন থেকে বাবার কথা খুব মনে পড়ছিল পবনের। বালিগড় কাটতে গিয়ে হাত কেটে ফেলেছে অন্যমনস্কতায়। ব্যবসা এখন বন্ধ। হাত না শুকালে এ সব জল ঘাঁটার কারবার হবে না। পরকে দিয়েও পচা ব্যবসা হবে না।

আষাঢ় চলে গিয়ে শ্রাবণ বসেছে জাঁকিয়ে। ক'দিন ধরে টানা বরষা। পুরো পাড়া জলে ডুবে স্যাঁতসেতে। গোরুগুলো গোয়ালঘরে ডাক পাড়ে, ক্ষিদের জ্বালায় শুকনো খড় চেবায়। ডোবা ঘাস খেলে পেট ফুলবে ওদের। তখন শুরু হবে ছ্যারানী ব্যামো। ধড়াধড় মরবে। পবন আর জাত ব্যবসায় ফিরে যাবে না। ব্রজবুড়া গত হবার পর থেকে তারও মাথার কোন ঠিক নেই। মরা গোরু ভাগাড়ে দেখলেই কুঁকড়ে যায় হাত। তাকাতে ইচ্ছা করে না। ব্রজবুড়া বেঁচে থাকলে এমন হোত না কোনদিন। পুরো পাড়া জমে থাকত তার গলার আওয়াজে। লোক ভয় পেত সেই বাজখেয়ী কণ্ঠস্বরে। এখন রামও নেই, রাজত্বও নেই। ভাগাড়ের চাম কেটে নেয় অন্য লোকে। কে যে কাটে তা-ও সঠিক জানে না পবন। সে দাওয়ায় বসে পিঠ চুলকায় বাঁশের খুঁটিতে। সুভদ্রা খুব কম কথা বলে এখন। মাথার উপর ধেই ধেই করে বাড়ছে মেনি। আর বছর খানিকের মধ্যে তাকে পাত্রস্থ করার দরকার। নাহলে বিপথগামী হবার সম্ভাবনা। বয়সের যা ধর্ম, তাকে রুখবে কোন মহাপুরুষে।

সুভদ্রার বাদলছায়া চিন্তা ভরা মুখ, পবন, আর একটা চিঠি লেখ না তোর বাবাকে। লোকটা ঘরে ফিরে আসুক, আমি এর বেশী আর কিছু চাই না। তারও তো বয়স হয়েছে। তার এখন সেবা যত্নের দরকার। সে ফিরে এলে আমি আরামে মরতে পারি। তার সংসার তাকে না দিয়ে আমি যে স্বর্গে গিয়েও সুখ পাব না।

সুভদ্রার কথায় জাবর কাটার শব্দ। হাজার হোক মেয়েমানুষ, তার আর মাথায় বুদ্ধি কত। সে সুখের সময় হাসে, দুঃখের সময় কাঁদে। তার চোখের জল মুছিয়ে দেবার এ পাড়ায় আর কেউ নেই। বুকে ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেলে সে তখন ভাবতে বসে সহদেবের কথা। ভাত পুড়ে যায়, নুনকাটা হয়ে যায় সখের মাছ তরকারি। পবন মাস দুয়েক থেকে লক্ষ্য করছে এই ঘটনাটা। মায়ের মুখের উপর সে কিছু বলতে পারে না। বললেই চোখ ভাসিয়ে কাঁদবে সুভদ্রা। কারোর কাছে কিছু বলবে না। বুকে চাপা দিয়ে বাখবে পাথর।

পাড়ায় ডাক পিওন এলে সুভদ্রার চোখ চলে যাবে সেদিকে। এক সময় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়ে ছুটে যাবে পিওনের কাছে, রামদা, আমার নামে কোন চিঠি নেই?

—চিঠি। না বোন, তোমার নামে কোন চিঠি নেই।

—তার তো টাকা পাঠানোর কথা ছিল। কেন যে পাঠাচ্ছে না বুঝতে পাবছি না। বড় ভুলো মন তোমার দাদার। ঘর থেকে বেরলেই ভুলে থাকে ঘরের কথা। —প্রসঙ্গ বদলে অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে চায় সুভদ্রা।

রামকাকা পবনকে হাটখোলায় ডেকে সব বলল, যা না পবন, তোর বাবার একবার খোঁজ করে আয়। জলজ্যান্ত মানুষ কোথায় হারিয়ে যাবে এ সংসারে। পৃথিবী গোল। তুই খুঁজলে ঠিক তার হদিস পেয়ে যাবি। রামকাকার গলা নেমে যায় খাদে, তোর মা রোজ চিঠি এসেছে কি না শুধায়। ওটা ওর দোষ নয়। ওটা ওর নেশা। প্রতিদিন 'না' বলতে আমার খুব বাধো বাধো ঠেকে। আমিও তো মানুষ। মানুষ হয়ে মানুষের কষ্টটা বুঝব না।

শাঁখায় জমেছে ময়লা, ফেটে গিয়েছে প্লাস্টিকের শাঁখা। সোডা জলে সাফ-সুতরো করেছে সুভদ্রা। চুল উঠে যাওয়া সিঁথিতে সিঁদুর পরে ঘটা করে। কপালে সিঁদুরের গোল টিপ আঁকে যত্নে। হৈমবুড়ি বাধা দিলে সুভদ্রার মুখ ভার হয়, এ তুমি কী বলছ মা। সে এখনও মাথার উপরে আছে। কোন দুঃখে আমি সিঁদুর মুছে ফেলব বলো। শাঁখা ভেঙে আমি কেন থান পরব বলো। আমার মন বলছে— সে আসবে। যেমন হঠাৎ করে গিয়েছে, তেমনি হঠাৎ করে আসবে।

সব শোনে পবন। শুনে শুনে সে-ও নিরেট পাথর।

অতসী বোষ্টমীর ঘরে গিয়েছিল সেদিন। সোনা পুড়ে যাবার রঙ দেখেছে তার শরীরে। চোখের কোণে কালি। রূপাপাটিয়া মাছের মত যৌবন ঝলসান শরীর—এখন শুকিয়ে লহরা শুখার মত। কথা বললে যেন কণ্ঠ চিরে ঝরে পড়বে কান্না। চোখ জুড়ে অনুশোচনার বন্যা। পবনকে দেখে সে কিছুতেই সামলাতে পারে না আবেগ, হ্যাঁ-রে পবন, তোর বাবা কিছু বলে গিয়েছে? কোন চিঠি এসেছে তোদের ঘরে? যদি চিঠি আসে আমাকে একটু জানিয়ে যাস। তার চিন্তাতে আমার ঘুম হয় না রাতকালে। তুই আমার ছেলের মত, তোর কাছে আমি আর কী বলব। তবে বুঝতে পারছি—আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। সে গেল যাত্রা করতে, আমি এবার যাত্রাপালা শেষ করে চলে যাব। যাওয়ার সময় তার সাথে একবার দেখা হলে ভাল হোত। আমার জন্য তারও তো কম অপবাদ হয়নি। আমার জন্য তাকেও তো কাঁদতে হয়েছে।

যুগলবুড়া মোক্ষম কথা বলল, সে যখন নেই তার শ্রাদ্ধশান্তি মিটিয়ে দে। আমার স্থির বিশ্বাস—সে আর নেই। যদি থাকত, তাহলে ঠিক ফিরে আসত। সে তো পাষাণ নয়, তারও রক্ত-মাংসের শরীর।

হাজার কথার হাজার রকমের ফ্যাকড়া। শুনে শুনে কান ঝালাপালা পবনের। রাতে এসব ভাবতে ভাবতে শুয়েছে।

সহদেব এল তার ঘুমের মধ্যে, পবনরে, তুই আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল। আমার আর বেশি দিন নেই। আমি গ্রামে মরব। তুই আমাকে গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দে।

হৈমবুড়ির কাশির শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল পবনের। বুড়িটার হুপিং কাশি, একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না। একনাগাড়ে কাশতে থাকে। বুকের হাড়-পাঁজরা নড়ে সেই কাশির চোটে।

ছিঁড়ে যাওয়া ঘুম খসে পড়া পাতার মত। পবন আর ঘুমাতে পারেনি ভোর রাতে। কাকের আওয়াজ ভেসে আসছিল কানে। যুগলবুড়া খঞ্জনী বাজিয়ে হরেকৃষ্ণ গাইছিল আপন মনে। জেগে ওঠা পাখ-পাখালির গলায় সেই গান। ঘুম ভেঙে গোয়ালঘরে হাম্বা ডাক ছাড়ছিল গোরু। খুলে দিতে বলছিল গলার রশা। চারদিক ভরে ছিল নরম আলোয়। মাঝরাতের বৃষ্টিতে ঘাসেরা কনে বউ। আষাঢ় মাসের জল তাদের কাছে সালসার সমান। এই শ্রাবণে ঘাসগুলো বাসনা তেল মাখা যুবতীর মুখের মত। তাকালে চোখ ফেরান যায় না। সবচেয়ে রূপ বদলেছে বাঁশ বাগান। কোঁড়া ছেড়ে ওদের এখন সুখী সংসার।

বিছানা ছেড়ে পবন সময় নষ্ট করেনি। চোখে-মুখে জল দিয়ে দাঁতন করেছে কাঁচা কঞ্চির। তারপর জামা-প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়েছে ঘরের বাইরে। সুভদ্রার নজর এড়ায়নি এসব। সে ছুটে এসে বিস্ময়ভরা চোখ মেলে তাকিয়েছে, কোথায় যাচ্ছিস বাবা। চা খাবি না?

—চা খেলে বেলা বেড়ে যাবে। আমি যাই মা।

—তোর অত কিসের তাড়া?

পবন চুপ করে থাকে। সে যে সহদেবের খোঁজে চলেছে—একথা মুখে আসলেও শব্দ হয়ে বেরয় না। অস্থির সুভদ্রার কপালে ভাঁজ পড়ে, কোথায় যাচ্ছিস বলে যাবি নে? দিনভর আমি যে পথ দেখব।

—আমি যে কোথায় যাব—আমিও জানি না। তবে যে কাজে যাচ্ছি তা যদি করে আসতে পারি—তাহলে আমাদের সংসারে আবার সুখ ফিরে আসবে।

হেঁয়ালী কথা মগজে ঢোকে না সুভদ্রার, সে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, যেখানেই যাস না কেন, দুপুরবেলায় ফিরে আসবি। তুই না ফেরা পর্যন্ত আমিও খাবো না।

ভোরের বাসে পবন বেলদায় এসে নামল। দোকানপাঠ সব খোলেনি, চাঁপাকলির মত আঁটা। বুড়ো চা-দোকানী ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, ওর গায়ে একটা ফাটা-ফুটো গেঞ্জি, গেঞ্জির উপর দিয়ে হাড়ের খাঁচাটা বোঝা যায়। পবন গিয়ে বেঞ্চির উপর বসতেই বুড়োটা ধুঁকো কের মত গলা নড়িয়ে বলল, চা খাবেন নাকি বাবু?

ঘাড় ঝাঁকাল পবন, হাত বাড়িয়ে বলল, দুটো বিস্কুট দিন। খালি পেটে চা খেলে পেট গুলাবে।

বিস্কুটে কামড় মেরে পবন দেখল ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা সকালের বেলদা। গতরাতের বৃষ্টিতে পাকা বাড়ির চুন ভিজে মনমরা। টিভির অ্যানটেনায় কাক ডাকছে, কা-কা। শালিক-চড়ুইয়ের মেলা বসেছে রাস্তার পাশের গাছটায়। কাটা ডাবের খোলের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে জল, ছাগলে মুখ ঢুকিয়ে বের করে খেয়ে যায় শাঁস।

পবন চায়ে চুমুক লাগিয়ে শুধোল, নিশিকান্তবাবুর যাত্রার অফিসঘর কোনটা?

—কোন নিশিকান্তবাবু? বুড়োটা কিছুটা ঝুঁকে পড়ল পবনের মুখের উপব। পবন অপ্রস্তুত চোখে তাকাল, আমি তাকে দেখিনি। তবে বাবার মুখে শুনেছি নিশিকান্তবাবু সিনেমার নায়কগুলোর মত দেখতে। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। ঘনঘন পান খায়। ধুতি পরে।

—ওঃ বুঝেছি। নিশিকান্ত মান্না তো? ঐ যে ঐ টিনের ঘরটা। বুড়ো চামচনাড়া নামিয়ে গম্ভীর চোখে তাকাল, নিশিকান্তবাবু আপনার কে হয়?

—কেউ নয়। বাবা কাজ করে তার যাত্রাদলে—

—আপনার বাবা কাজ করেন যাত্রাদলে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

বুড়ো এবার দাপনা চুলকে ঘোলাটে আকাশের দিকে তাকাল, তারপর বার দুই কেশে নিয়ে নড়েচড়ে বসল, নিশিকান্তবাবু দু'বছর হল মারা গিয়েছে। সে মারা যাবার পর অত বড় যাত্রাদলটা ভেঙে গেল। হাল ধরার কেউ ছিল না। ওদের দলের কাউকে আমি এখন আর দেখতে পাই না, ওরা যে কোথায় গিয়েছে তা-ও জানি না। পয়সা মিটিয়ে পবন উঠে এল পিচ রাস্তায়। তার ধারণা ছিল না যাত্রাদল অমন হুটহাট ভেঙে যায়। বাবা কোথায় যেতে পারে—এই চিন্তায় পবন ঝাপসা দেখল চোখে। বেলা বাড়তেই সে আরো খোঁজ নিল চার জায়গায়। সবখানেই মন খারাপের খবর। ওরা কেউই সহদেবকে দু-বছর থেকে দেখেনি। সহদেব কোথায় যে গিয়েছে—ওদের কাছেও ঠিকানা রেখে যায়নি। তাহলে কোথায় গিয়েছে সহদেব? পবন আর ভাবতে পারছিল না। রাতের স্বপ্নটা বারবার করে মনে পড়ল তার। মাকে চমকে দেবে সে—এমন ভাবনাটা আষাঢ়ের মেঘ হয়ে উড়ে গেল দূরে। সব মেঘই মানুষের নাগালের বাইরে থাকে।

ভাঙা মন নিয়ে বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিল পবন। পাকা রাস্তায় গিজগিজ মানুষের ভিড়। যাত্রার রঙিন সাইনবোর্ডগুলো দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিল সে। পরপর বেশ কয়েকটা দোকান ঘরের মত যাত্রার ঠেক। ওখানে কী এমন নেশা আছে যার জন্য সহদেব ঘর ছাড়তে বাধ্য হল। মাথায় কিছু ঢোকে না পবনের। মেঘ সরে যাওয়া আকাশ থেকে রোদের ঢল নামছিল হুড়হুড়িয়ে। গত রাতের বৃষ্টির জেরে চারপাশ ঠাণ্ডা এখনও। পবন দূরের দিকে তাকাল। মাইক বাজিয়ে দাঁতের পাউডার বিক্রি করছে রোগা-দুবলা মানুষটা। পাউডারের প্রশংসায় গমগম করছে আশপাশ। দাঁত মাজা পাউডারের এমন বিজ্ঞাপন পবন গ্রামের হাটগুলোতে দেখেছে। সে আশ্চর্য হল না। মানুষের বেঁচে থাকাটাই একটা দীর্ঘ লড়াই। সহদেব এমনভাবে বেঁচে থাকতে পারত। ধরা বাঁধা ছকের মধ্যে সে যায়নি। ঘর তার কাছে বিঁচুটির ঝোপ। আপনজন তার কাছে শুঁয়োপোকার চলন। জ্ঞানত পবনের মনে পড়ে না সংসারের প্রতি সহদেবের ভালবাসার কথা। একটা মানুষ এমন অনীহা পোষন করে কী করে? সংসার যখন করবে না তখন কেন হাত ধরেছিল সুভদ্রার? কেন জন্ম দিল সন্তানের? দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া মানুষকে পবন শ্রদ্ধা করতে শেখেনি। যখন তার স্কুলে যাবার কথা তখন তাকে মাছ ব্যবসায় মেতে থাকতে হল। ব্রজবুড়ার হাত ধরে যেতে হল ভাগাড়ে। মরা গোরু-ছাগলের ছাল ছাড়িয়ে নুন ঘষে মেলে দিতে হল পুকুরপাড়ে। লাঠি হাতে পাহারা দিতে হল চাম। পাড়ার কুকুরগুলো বজ্জাতের বজ্জাত। চাম ক্ষামি হলে দাদু ভীষণ বকত। হুড়হুড় করে কথার ফুল ছড়িয়ে পড়ছে মনে। মনের উঠোন ভরে যাচ্ছে স্মৃতির কণায়। এতবড় জায়গায় তার চেনা-জানা কেউ নেই। কেউ নেই জেনেই সে এখানে এসেছে। কে যেন তাকে টেনে এনেছে জোর করে। পবন কখনও ভাবেনি এখানে এসেও বাবার সাথে তার দেখা হবে না। সে শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত ছিল সহদেবের সঙ্গে তার দেখা হবেই। দেখা না হবার জ্বালাটা বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকে আরও তীব্র হয়। কষ্টটা ধীরে-ধীরে দখল নেয় মনের। মাজনওলার কথাগুলো কানে বিষ ঢেলে দেয়। পবন শব্দহীন এমন কোনো জায়গায় দাঁড়াতে চাইল। আকাশের দিকে মুখ তুলে শান্তি পেতে চাইল। বাসটা তাড়াতাড়ি এলেই সে ফিরে যাবে চোরপালিয়ায়। এখানে তার ভাল লাগছে না। বড় নিঃসঙ্গ বোধ করছে সে।

বাস আসার আগেই দূরের লাইট পোষ্টটার কাছে পবন দেখতে পেল ফর্সা, উজ্জ্বল মাঝ বয়েসী একজন মহিলাকে। কী দেখছে সে অমন করে? সে এমনভাবে তাকিয়ে আছে পবন যেন তার খুব চেনা। মুখটা পবনের চেনা চেনা মনে হল। কিছুক্ষণ আগে মা দুর্গা যাত্রা কোম্পানীর ঘরে ঐ মহিলাটিকে

পবন দেখেছে। মাদুর পাতা মেঝের উপর বসেছিল সে। চোখের দৃষ্টিতে কুয়াশা মাখা সকাল। পবন সহদেবের খোঁজ জানতে চাওয়ায় তার চোখের তারায় কাঁপুনী উঠেছিল সহসা। তার মুখ দেখে মনে হয়েছিল, সহদেবের খোঁজ জানে। কিন্তু বলবে না। পবন সেখানে বসেনি, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা সেরে চলে এসেছে। যে ভদ্রলোক উত্তর দিচ্ছিল পবনের জিজ্ঞাসার তার কথায় ছিল না আন্তরিকতার ছোঁয়া। সে চাইছিল পবন চলে যাক তাড়াতাড়ি। তার উপস্থিতি অসহনীয়। পবন ফিরে এসেছিল মা দুর্গা যাত্রা কোম্পানীর ঘর থেকে। সেই মহিলাই চেয়ে আছে পবনের দিকে হা করে। কিছু কি বলতে চায় তাকে? কী বলবে? মুখ ঘুরিয়ে নেয় পবন। আবার মন দিয়ে শোনে মাজনওলার ভাষণগুলো।

দূরে একটা বাস দেখতে পায় পবন। ছাদের উপরেও মানুষ। যতই ভিড় থাকুক না কেন এ বাসটা কিছুতেই ছাড়বে না পবন। ঘরে ফিরে যাবে সে। স্বপ্নটার কথা ভুলে যাবে। স্বপ্ন তো অনেক সময় সত্যি হয় না।

বাস আসার আগেই হন্তদন্ত হয়ে সেই মহিলা জোর কদমে হেঁটে এল পবনের কাছে। শুধু চোখে-মুখে নয়, শরীরের হাবভাবে প্রকট আড়ষ্টতা। সে এসে পবনের মুখোমুখি দাঁড়াল। ঠোঁটে বয়স্ক হাসির ছোঁয়া। এই বয়সেও গালে টোল পড়েছে তার। টানা ভুরুর লোমগুলো ভীষণ কালো। গলায় চিকচিক করছে সোনার হার। হাতে শাঁখা নেই, সিঁথিতে নেই সিঁদুর। শাড়িখানাও পুরনো। রঙ জ্বলা। খোঁপা বাঁধা চুল কানের পাশে ঢেউখেলান। ফাঁকা সিঁথির দিকে তাকিয়ে পবন ভাবল, এত বয়সে বিয়ে হয়নি মহিলার। সাধারণতঃ যা হয় না. এর বেলায় তাই হয়েছে। পবন কিছু না বলে বোকার মত তাকাল। ভদ্রমহিলা জোর করে হাসল। নড়ে উঠল ঠোঁট। শরীরের জড়তা-সংকোচ ঝেড়ে ফেলে সে আবার স্নেহভরা চোখে তাকাল, তুমি কি তোমার বাবার খোঁজ জানতে চাও? কথা কেঁপে উঠল মাঝপথে, আবার সেই ব্যাকুল ব্যথা ভরা চাহনী, তোমার যদি তাড়া না থাকে তাহলে পরের বাসে যেও। চলো, ঐ দোকানটায় গিয়ে বসি। তোমার সাথে আমার অনেক কথা আছে। যদি শুনতে আগ্রহ থাকে তো বলব।

পবনের চোখে উপছে পড়ল বিস্ময়। কী বলবে সে? শুধু একটা বাস কেন, দরকার হলে সব কটা বাসই সে ছেড়ে দিতে পারবে বাবার কথা শোনার জন্য।

ওরা হেঁটে এল পাশাপাশি। পথ চলতে চলতে ভদ্রমহিলা বলল, আমি তোমার মাসীর মত। আমাকে তুমি লতা মাসী বলতে পারো। যাত্রা সমাজে এসে আমি আশালতা থেকে লতা হয়েছি। এ সমাজে শুধু নাম নয়—বড় মানুষও ছোট হয়ে যায় এর বিষে নীল হয়ে। তুমি আমাকে দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে আমি মিথ্যা কথা বলছি না। লতার কথাগুলো শুকনো, কঠিন ঃ রসকষহীন। তবু কোথাও একটা সূক্ষ্ম আকর্ষণ আছে।

মিষ্টি দোকানে মুখোমুখি বসে লতা কাচের আলমারিটার দিকে তাকাল, দুটো করে মিষ্টি খাওয়া যাক। তোমার সাথে এই প্রথম আলাপ হলো। লতা মিষ্টির অর্ডার দিয়ে কী যেন ভাবল, তোমার বাবার মুখে তোমার কথা শুনেছি। সহদেবদা এখানে থাকলেও সব সময় তোমাদের কথা বলত। তোমার মায়ের নাম তো সুভদ্রা তাই না?

মিষ্টি এল। পবনের দিকে সাদা প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে লতা বলল, খাও। তোমাকে যে জন্য আটকে দিলাম সেই কথাটাই বলি। ছোট মিষ্টি দোকান। ভিড় তেমন নেই। দোকানের সামনে বড় চুলায় চায়ের জল ফুটছে টগবগিয়ে। লতা চারপাশ দেখে নিয়ে নীচু গলায় বলল, সহদেবদার সাথে আমার দেখা হয়েছিল বছর দুয়েক আগে। তার থাকার কোনো জায়গা ছিল না। সে আমার ঘরেই থাকত। খাওয়া-দাওয়া করত। আমিও তার সেবা-যত্ন করতাম। মানুষটার মন ছিল খোলা আকাশ। কী সুন্দর হাসত কথায় কথায়। আমি তার কথার ফাঁদে আটকে যাই। পাড়ার লোকে দশটা কথা বললেও আমি তাকে

চলে যেতে বলিনি। কেন বলিনি জান? তার উপর আমার টানও কম ছিল না। আমি একলা মেয়েমানুষ, যাত্রা করে খাই—আমারও তো নিরাপত্তার দরকার। সেই জন্য—। থেমে গেল লতা। যেন টেপ রেকর্ডারে জড়িয়ে গিয়েছে কথা। আঁচলে মুখ মুছে নিয়ে লতা উদাসীন চোখে তাকাল, তাকে ভালবেসেছিলাম। সে আমার ভালবাসার মর্যাদা দিল না। একদিন ঝড়-বৃষ্টির রাতে সে ঝগড়া করে কোথায় চলে গেল আমি তার সন্ধানও পেলাম না। তবে ঢোলকওলা বলছিল—তাকে সে কলকাতার বাসে উঠতে দেখেছে। গায়ে জ্বর। সে ঢুলিদাদার নিষেধ শুনল না। সেই থেকে তার কোনো খোঁজ নেই। আমি এখনও তার পথ চেয়ে থাকি। আমার বিশ্বাস সে একদিন ফিরবে। আমার ফাঁকা মন সে আবার ভরাট করে দেবে। প্লেটের মিষ্টি ছুঁয়েও দেখল না লতা। ছলছলিয়ে উঠল চোখ। পবন হা করে শুনছিল কথাগুলো। সব শোনার পর তারও বলার কিছু থাকল না। জ্ঞান পড়ার পর থেকে সে সহদেবের সম্বন্ধে এত কথা শুনেছে, এখন সেই একই কথা শুনতে তার ভাল লাগে না। গুমরে ওঠে মন। একটা মানুষকে নিয়ে মানুষের টানাহিঁচড়া কেন হয়, কিসের জন্য হয়—সে তার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে না। কী আছে সহদেবের মধ্যে যার আকর্ষণে এতগুলো মানুষ আগুনে সঁপে দিয়েছে ভালবাসা। বাবার জন্য বিন্দুমাত্র গর্ববোধ হল না পবনের, বরং সে চোখ কুঁচকে লতার দিকে তাকাল। আগুনের রঙের চেয়ে উজ্জ্বল গায়ের রঙ, চোখে আছে মানুষ ভুলানোর যাদুটোনা। রাতজাগা চোখে ক্লান্তি থাকলেও সেই ক্লান্তি মুছে ফেলার চেষ্টা করছে লতা। পেশাদারী দক্ষতার ছাপ চোখে-মুখে। কথা বলে গুছিয়ে, প্রতি কথায় টান আছে যাত্রার। পবন যাত্রার আসরে এমন মেয়েমানুষ অনেক দেখেছে, হ্যাজাকের আলোয় তারা নজর কাড়ে মানুষের। এদের চরিত্রের রঙ আদৌ যে সাদা নয়—এটা সে লোকের মুখেই শুনেছে। প্লেটের উপর মিষ্টি দুটো পড়েছিল একইভাবে, পবন ছুঁয়েও দেখেনি। লতা বলল, মিষ্টিটা খেয়ে নাও, নাহলে মাছি বসবে। আজ তুমি আমার ঘরে চলো। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলের বাসে চলে যেও।

চুপ করে থাকল পবন, লতাকে সহ্য হচ্ছিল না তার। এরা সবাই মিলে সহদেবকে পাগল করে ছেড়েছে। এরা যে যার স্বার্থ নিয়ে ভালবেসেছে তাকে। এদের ভালবাসার দহনে সহদেব আজ গ্রাম ছাড়া। লতা পবনের চিন্তিত মুখের দিকে তাকাল, নিস্তেজ হয়ে এল তার গলা, তোমার মাকে আমার কথা বলো না। তার অনেক দুঃখ আমি জানি। সহদেবদা তার উপর নজর দেয়নি একদম। অন্য মেয়েছেলে হলে সংসার ফেঁলে চলে যেত কোথাও, নয়ত গলায় দড়ি দিয়ে মরত। তার মত মনের জোর আমার নেই। মাত্র ক'বছরে আমি যে আঘাত পেয়েছি—তা সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন। আমিও তোমার বাবাকে খুঁজছি। দেখা হলে তার সাথে আমার নিজের হিসাবটা মিটিয়ে নেব। এই মাঝবেলায় আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। আমি তো তার ছায়ায় বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমাকে ঠকিয়ে সে চলে গেল। তুমি আমার ছেলের মত, তোমার কাছে আমি এর বেশী কী বলব। তার সব আব্দার আমি মিটিয়েছি। সে আমার একটা কথাও শুনল না। পবন কী জবাব দেবে এসব কথার—বুঝে পেল না। ঝিমঝিমিয়ে উঠল মাথা। মিষ্টি দুটো নেড়ে-ঘেঁটে চেষ্টা করল খাওয়ার। ওগুলো খেয়েই সে মুক্তি চাইবে। আর ভাল লাগছে না এসব শুনতে। আগুনের মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে আছে। কথা আগুনের হল্‌কা হয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে সর্বাঙ্গ। লতার সঙ্গে আলাপ না হলে ভাল হোত। সহদেবের কুকীর্তি তাকে আর শুনতে হোত না। পবন অস্থির হয়ে উঠল, মিষ্টি দুটো কোনমতে খেয়ে নিয়ে সে বাইরের দিকে তাকাল, আমি এবার যাই। মা বলেছে—দুপুরের মধ্যে ফিরে আসতে। আমি না গেলে সে খাবে না। আমার পথ চেয়ে সে বসে থাকবে। লতার হাবভাবে ফুটে উঠল অন্যমনস্কতা, তুমি যেতে চাইলে আমি তোমাকে আটকাব না। আমি কাউকে জোর করে আটকে রাখতে ভালবাসি না।

—আমাকে ভুল বুঝবেন না, মা'র কাছে আমি কথা দিয়ে এসেছি দুপুরের মধ্যে ফিরব।

—তুমি যে এখানে এসেছ তা তোমার মা জানে?

—না। মাকে আমি কিছু বলিনি। যদি বলতাম তাহলে মা আমাকে আসতে দিত না। মা চায় না আমরা কেউ বাবার জন্য চিন্তা করে নিজেদের কাজকর্ম নষ্ট করি।

গুম হয়ে বসে থাকল লতা। ওর চোখের দৃষ্টি পবনের মুখের উপর নিবদ্ধ। কী বলবে কথা হাতড়াচ্ছিল সে। জুতসই কথা খুঁজে না পেয়ে শাড়ির আঁচলে ঘাম মুছল পাউডার মাখার মত করে, জান, আমি যখন প্রথম তোমার বাবার বাঁশি শুনি—সেদিন চমকে উঠেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, রেডিওতে আমি বাঁশির সুর শুনছি। সেদিন থেকে আমি তার সুরের ভক্ত। এখনও চোখ বুজে থাকলে তার বাঁশির সুর আমার কানে ভাসে। মানুষটার অনেক গুণ ছিল। বাঁশিকে সে ভালবাসত সন্তানের মত। কোনদিন সে বাঁশি ছাড়া হয়ে থাকে নি। বুকের রোগ ধরা পড়ল—তবুও সে বাঁশি ছাড়ল না। আমি বকলে সে বলত, বাঁশি আমার ধ্যানজ্ঞান। মরার আগেও যেন আমার হাতে বাঁশি থাকে—মা শীতলা বুড়ির কাছে এই প্রার্থনা করো। তুমি সেই গুণী মানুষের ছেলে। তার রক্ত তোমার শরীরে বয়। তুমি নিশ্চয়ই তোমার বাবার মত বাঁশি বাজাতে পার।

পবন ঘাড় নাড়ল 'না' সূচক, ছোটবেলায় বাবার বাঁশিগুলো নিয়ে ফুঁ দিতাম। মা দেখতে পেলেই ছুটে এসে কেড়ে নিত বাঁশি। ধমক দিয়ে বলত, খবরদার বাঁশি ছুঁবি নে। একজন ছন্নছাড়া হয়েছে বলে তোকে আমি তোর বাবার পথে হাঁটতে দেব না। বাঁশি সবার কপালে সয় না। তোর কপালেও সইবে না। সেদিন থেকে আমি আর কোনদিন বাঁশি ছুঁইনি। বাঁশি দেখলেই মায়ের কথা মনে পড়ে।

লতা থুতনীতে তর্জনী ছুঁইয়ে চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল, ঘর পোড়া গোরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই তো ভয় পাবেই। আমি হলেও সেই একই কথা বলতাম। সব হারিয়ে মানুষ তো বাঁচতে পারে না।

রোদ বাড়ার সাথে সাথে ভিড় বাড়ছিল মানুষের। গাড়িঘোড়ার আওয়াজে ব্যস্ত চারপাশ। উড়ে আসা মেঘেগুলো এখন আর গোমড়া মুখ করে ঝুলে নেই আকাশে। হাওয়ারা রাখাল সেজে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে ওদের, কোথায় কোনখানে। এই প্রথম পবন লতার মুখের দিকে শ্রদ্ধাভরা চোখে তাকাল। যাকে সে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল তার মধ্যে হঠাৎ খুঁজে পেল কাঁচা মাটির চেয়েও নরম একটা মন। লতা সেই সুগন্ধি ফুলের গাছ যার গন্ধ উদগ্র নয়, খুব কাছে না গেলে বোঝা যাবে না ফুলের নির্যাস। সব মানুষই মনে হয় লতার মত। মাটিকে দেখে বোঝা যায় না তার কী শক্তি। মায়েরা কি তাহলে মাটির মত? পবনের ঠোঁট নড়ে উঠল আবেগে, আপনার সাথে দেখা হয়ে ভালোই হয়েছে। আমি তো শূন্য হাতে ফিরছিলাম। এই বেলদা আমার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা। আপনাদের জাতটাও আমার কাছে অজানা। আমি ভাবতাম যারা যাত্রা দলে রঙ মাখে তাদের জীবনটাও রঙে ঢাকা। আমি যা জেনেছি এতদিন, তা ভুল। আপনি সত্যিই আমার মায়ের মত। মা যা পারেনি, আপনি তাই করেছেন। এখানে তো বাবার কেউ ছিল না। আপনি তাকে খাইয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন। তার সুখ-দুঃখকে নিজের বলে ভাগ করে নিয়েছেন। সে চলে যাওয়াতে আপনারও কষ্ট হয়েছে বুঝতে পারছি। বাবা শুধু আমাদের কষ্ট দেয়নি, সে নিজেকেও কষ্ট দিয়েছে। তার জীবনটা তরলা বাঁশের মত সিধাসাদা নয়, তার জীবনটা তার নিজের মত। আমি আজ যাই। পরে আবার কখনো দেখা হবে।

মিষ্টি দোকানের পয়সা মিটিয়ে দিল লতা। বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ শুধোল, তোমার একটা বোন আছে তাই না? কী যেন নাম? লতা হাতড়াতে থাকল, ওঃ মনে পড়েছে—মেনি। তার বয়স এখন কত হল? সে কি শাড়ি পরতে শিখেছে?

—গ্রামের মেয়ে। জ্ঞানপড়ার পর থেকেই তো শাড়ি পরে। পবনের দায়সারা উত্তরে খুশি হল না লতা, সে আমি জানি। আমি কেন জিজ্ঞাসা করলাম বল তো? তোমাদের তো অভাব। মেনিকে যাত্রাদলে ঢুকিয়ে দাও। আমি যেখানে আছি, সেই কোম্পানীতে একটা অল্প বয়েসী ফিমেলের দরকার। যদি

তোমাদের আপত্তি না থাকে তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করো। আজকাল যাত্রা দলে পেমেন্ট ভাল। ভাল গলা থাকলে এ লাইনে উন্নতিও আছে। কলকাতার দলগুলো তো এখন নতুন নতুন মুখ চাইছে।

লতা হ্যাঁ-না কিছু শোনার জন্য পবনের দিকে চেয়ে থাকল চাতক চোখে। পবনও প্রস্তুত ছিল না এমন প্রস্তাব শোনার জন্য। কিছু বলার আগেই মেদিনীপুর যাওয়ার বাসটা এসে থামল তার হাত দশেক দূরে। হুড়মুড়িয়ে নেমে আসছিল লোক। পবন ছুটে গেল সেই দিকে। সে যেন পালাতে চাইছিল, এমন একটা সুযোগ হঠাৎ এসে যাওয়াতে বড় হালকা বোধ করল সে। বাস ছেড়ে দিল মিনিট খানিক থেমেই। পিছনে পড়ে থাকল বেলদা, আশালতা আর সহদেবের যাত্রা সমাজ।

বাস থেকে নেমে আর হাঁটতে পারছিল না পবন, আকাশ জুড়ে মেঘ-রোদ্দুরের খেলা, হাটখোলায় এখনও চরে বেড়াচ্ছে ক্ষুধার্ত শালিক। কানাই ডাক্তারের চেম্বারে ঠাস ভিড় রোগীর। বর্ষা শুরু হবার পর থেকে মানুষের রোগ-জ্বালা লাফিয়ে বাড়ছে, স্যাঁতসেতে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে রোগের জীবাণু।

ক'পা হেঁটে এসেই পবন বটগাছটার ছায়ায় এসে দাঁড়াল। চোখে পড়ল তাদের রুগ্ন পাড়াখানা। বর্ষায় নাজেহাল দশা। পচা খড়ের চালে কাক ডাকছিল তারস্বরে। বেওয়ারিশ কুকুরগুলোর এই বর্ষায় পোয়াবারো। ওরা পাড়া ছেড়ে ভাগাড়ের দিকে ঝুঁকেছে। গলা ফুলো আর ছেরানী রোগে ধড়াধড় মরছে ছাগল-গোরু। পাড়ায় আওলাদ মোড়লের যাতায়াত বেড়েছে ক'দিন থেকে। তার কোমরের ঝুলিমনিতে কড়কড়ে টাকার নোট। ছাল পিছু দামও বেড়েছে দশ টাকা। হরিয়া আর বাঁকার এখন পোয়াবারো। ওরা চাইছে দেশ দুনিয়া ভেসে যাক জলে। ভাগাড় ভরে উঠুক মরা গোরু-ছাগলে। ব্রজবুড়া নেই, ওরাই ছাড়িয়ে আনবে ছাল। এই পচা বর্ষায় পালকি-সুয়ারী যাবে না, পরীযানও ভেজাতে চাইবে না মালিক। অনেক টাকার জিনিস, জল খেলে কাঠ ফুলবে, নষ্ট হয়ে যাবে সাজান বাহার। বটতলায় ঘুলঘুলি গোল আলোর ছড়াছড়ি। রেডিও দোকানী টেপ চালিয়ে দিয়েছে দোকানে, বেশ ঝম্পোরম্পো গান হচ্ছে হিন্দিতে। অন্য সময় হলে মন দিয়ে শুনত পবন, তাল দিত পা ঠুকে—এখন তার কোন কিছুই ভাল লাগছে না। গত রাতের স্বপ্নটার কথা সে বারবার করে ভাবছিল। সহদেব কোথায় যেতে পারে অসুস্থ শরীর নিয়ে। লতা বলছিল, কলকাতার বাস ধরে চলে গিয়েছে। গায়ে জ্বর। এখন কোথায়, কেমন আছে সহদেব? এ কথা সুভদ্রার কাছে সে কোনদিনও বলতে পারবে না। তাহলে কেঁদে কেটে পাড়া মাথায় তুলবে সে। তাকে বোঝান তখন সবচাইতে কঠিন কাজ হবে। চারটে শালিক উড়ে যায় রাস্তা পেরিয়ে ময়রা দোকানের ছাদে। ওদের ভেজা পালকে ঠোকা খেয়ে পিছলে যায় নরম রোদ। কোথা থেকে ডাকতে ডাকছে ছুটে আসে দুটো ছাগল। ওদের নজর বটগাছের পাতাগুলোর দিকে। বটপাতা পুরু এবং ঘন সবুজ। তেলা পাতা চিবিয়ে ছাগল জাবর কাটতে ভালবাসে। প্রতি বছর এ সময় পাখ পাখালিতে ভরে যায় বটগাছ। ঠিক এই সময় এক ঝাঁক হরিয়াল পাখি আসে বটগাছের পাতার আড়ালে বিশ্রাম নিতে। স্বজাতীয় চিৎকারে ভরিয়ে তোলে আশপাশ। এবছরও পাখিগুলো এসেছে। একদিন সকাল বেলায় পবন হরিয়াল পাখির ঝাঁক দেখেছিল। কী সুন্দর দেখতে পাখিগুলো, মেনি ঘাড় উঁচু করে বলেছিল, দাদারে, হরিয়াল পাখির মান্‌সো ডাহুক পাখির চেয়েও ভাল। তুই একটা মেরে দিবি?

পেয়ারা ডাল কেটে গুলতি বানিয়েছিল পবন। পুকুরের এঁটেল মাটি এনে ভেঁটুল বানিয়েছিল মেনি। সুভদ্রা পাতার জ্বালে পুড়িয়ে দিয়েছিল সেই ভেঁটুলগুলো। পবন ক'দিনের জন্য শিকারী হয়েছিল বোনের আব্দার মেটাতে। দুলুবাবুর মেয়ে মালা স্কুল থেকে ফেরার পথে তাকে দেখে বলেছিল, তুমি যদি পাখি মারো তাহলে আমি তোমার সাথে কথা বলব না। যারা পাখি মারে তাদের মনে দয়া-মায়া বলে কোন কিছু নেই। কথাগুলো খুব সহজভাবে বললেও পবন তা সহজভাবে নেয়নি। পাখি মারার সখ সেদিনই উড়িয়ে দিয়েছে মন থেকে। মেনিকে বলেছে, তোর মান্‌সো খেতে মন হলে পোলট্রি থেকে মুরগী এনে

দেব। হরিয়াল পাখি আমি মারতে পারব না। ওরা দল বেঁধে থাকে। একটাকে মারলে অন্যগুলো যে উড়ে যাবে।

মেনি তার নিষ্পাপ চোখের দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল পবনের দিকে, ঠিক আছে, আর পাখি মেরে কাজ নেই তোর। চামগুলতিটা তুলে রাখ বাতার চালে। হনুমান লাউ খেতে এলে গুলতি দিয়ে মারব।

সকালে এক পশলা বৃষ্টি ঝরে গেছে চোরপালিয়ার উপর। এখন চড়া রোদে বোঝাই যায় না এখানে ঘণ্টা কয়েক আগে বৃষ্টি ঝরেছিল। আজ হাটবার নয়, তবু মানুষ গিজগিজ করছে হাটখোলায়। দীঘা যাওয়ার পাকা সড়কে গাড়ি-ঘোড়ারও বিরাম নেই। একটু আগে এগরা থেকে যে বাসটা এল—তার ড্রাইভার সীটে বসেই ছুঁড়ে দিল কাগজের বাণ্ডিল ঘাসের উপর। রোজ এ বাসেই খবরের কাগজ আসে এগরা থেকে। উৎসাহী মানুষ হুমড়ে পড়েছে তাজা খবর পড়ার জন্য। বসন্ত জানাও এসেছেন কাগজের আশায়। প্রতিদিনই আসেন দোকান ছেড়ে। খবরের কাগজ না পড়লে তার ঘুম হয় না। দেশ-বিদেশের খবর জানার নেশাটা তার ছোটবেলাকার। চোরপালিয়া হাটের উপর তার ছোট্ট একটা টেলারিংয়ের দোকান। বেশিরভাগ সময়ই ফাটা-ফুটো সারেন। গ্রামের নব্য আধুনিক ছেলেছোকরার দল তার কাছে লুঙ্গি ছাড়া কোনও প্যান্ট-জামা সেলাই করায় না। বসন্ত জানা চোখে একটু কম দেখেন। কালো ফ্রেমের হাই পাওয়ারের চশমা তাই নাকের উপর। চশমার দাগ নাক থেকে কোন সময় মোছে না। পবন চোরের মত পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, বসন্ত জানা হাত বাড়িয়ে পবনের হাতটা ধরে ফেললেন, কোথায় গিয়েছিলিস, সকাল থেকে যে দেখলাম না।

পবন ঘাবড়ে গেল, কোথাও যাইনি তো, এই একটু এগরা থেকে ঘুরে ঘুরে এলাম।

—কোন কাজ ছিল বুঝি? বসন্ত জানা অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন পবনকে। আজ দীঘায় গেলি না যে।

পবন আর কত মিথ্যা কথা বলবে, একটা মিথ্যাকে চাপা দেবার জন্য হাজার মিথ্যা কথার জাল বুনতে হয়। পবন চুপ করে থাকল মুখ নীচু করে। বসন্ত জানা শুধোলেন, তোর কি শরীর খারাপ? চোখ-মুখ বসে গিয়েছে একেবারে। যা যা, ঘর যা। স্নান-খাওয়া করে একটু বিশ্রাম নে। এই অল্প বয়সে তোর উপর যা ধকল যাচ্ছে আমি তা ভাবতেও পারি না। তোর জন্য আমার কষ্ট হয় পবন। লেখা-পড়ায় তোর মাথা কত ভাল ছিল। শুধু সহদেবের জন্য তোর পড়া হল না। তাকে যদি আমি কোনদিন কাছে পেতাম তাহলে আচ্ছা করে বকে দিতাম। বিশ্বাস কর—তোর বাবার মত মানুষ আমি জীবনে দুটি দেখিনি। সংসার পাতল অথচ দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে গেল—এমন মানুষের সংখ্যা খুব কমই আছে।

সহদেবের প্রসঙ্গ খুবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চুপ করে থাকা ছাড়া পবনের গত্যন্তর নেই। বসন্ত জানা পবনের হাত ছেড়ে দিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে বললেন, তোর দুঃখটা আমি বুঝি। তোর যা দুঃখ তার চাইতে শতগুণ দুঃখ তোর মায়ের। সুভদ্রার মত বউ পাড়ায় আর কটা আছে? সেই কবে বাপের ঘর থেকে এল তবু আমি তাকে একদিনের জন্য হাটে দেখতে পেলাম না। সে তার আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে আছে। যা আজকালকার দিনে অনেক মানুষই পারে না।

মোড়ক খোলা হয়েছে খবরের কাগজের। বসন্ত জানা নগদ দাম দিয়ে একটা কাগজ কিনলেন। বড় বড় অক্ষরগুলোয় চোখ বুলিয়ে আবার ভাঁজ করে রাখলেন কাগজ। ধীরে সুস্থে দোকানে বসে পড়বেন। চশমার কাচ মুছে আবার নাকের উপর বসিয়ে দিয়ে তিনি বটগাছের ছায়ার ভেতর দিয়ে পেছন দিকের ধানমাঠটার দিকে তাকালেন, জানিস, এবছর ধান খুব ভাল হবে মনে হচ্ছে। টাইমে বৃষ্টি হলে এই এক সুবিধা।

পবন শুনল কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। তার মন পড়ে আছে ঘরে। বেলা অনেক হল। সুভদ্রা নিশ্চয়ই তার জন্য বসে আছে। সে না যাওয়া পর্যন্ত খাবে না। হাজার বার বলেও পবন তার মাকে বোঝাতে পারেনি। মাকে এত বেলা অব্দি অভুক্ত রাখা ঠিক নয়। পবন ফিরতে চাইল ঘরে।

বসন্ত জানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে পেরিয়ে এল পাকা সড়ক। লতার মুখটা মনে পড়ল হঠাৎ । কত দুঃখ নিয়ে সে-ও তো বেঁচে আছে। সহদেব ফিরবে আবার এই আশায় হয়ত তার বেঁচে থাকা। পবনও নিশ্চিত তার বাবা একদিন না একদিন ঠিক ফিরবে। পৃথিবী গোল, দেখা হবেই হবে। পবন পাড়ায় ঢোকার পথটায় পা রাখতে যাবে তখনই রেণু ছুটে এল তার দামাল শরীর নিয়ে। বয়সের তুলনায় খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেছে রেণু। ওর পুরুষ্টো পায়ের গোড়ালী দুটোই জানিয়ে দেয় সে এখন ডাগর, ঋতুবতী। চোখ থেকেও হারিয়ে গেছে কিশোরীপনা। এখন ভীতু ডাহুকের আত্মবিহ্বল চাহুনী। শুধু চোখ নয় শরীরের সব কিছু দিয়ে রেণু জানিয়ে দেয় সে অনেক বড় হয়ে গেছে। হয়ত এইজন্য যখন তখন হাটখোলায় আসে না সে। গ্রামের ছেলেছোকরাদের চোখ আটকে যায় ওর বুকের উপর। রেণু লজ্জায় চোখ খুলতে পারে না। বুকের উপর হেঁটে বেড়ায় বিরক্তির শুঁয়োপোকা। বয়সের যা ধর্ম, বয়স তা পালন করে। প্রকৃতির যা কর্তব্য, অকাতরে উজাড় করে দেয় নারী শরীরে। আগুন রঙা বুকের মাঝখানে চকিতে ফুটে ওঠে ভালবাসার কলি। এক সময় ফুল হয় তা থেকে। পাপড়ি মেলা ফুল সুগন্ধ ছড়াবেই। রেণু দৌড়ে এল উদ্‌ভ্রান্ত শরীরে। ভয় বিছানা পেতেছে দু চোখে। ভরাট গোলমুখে দুশ্চিন্তার পোকা। ঘামছিল সে। এতটা পথ দৌড়ে আসায় ঘনঘন ওঠা-নামা করছিল হাঁপু ধরা বুক। বড় করে শ্বাস নিয়ে রেণু আঁচলটা ঠিক করে বুকের উপর চাপা দিল, ঘাম মুছল হাতের তালুতে, কিছুতেই নিজেকে বশে রাখতে পারছিল না সে, তবু ঘনঘন শ্বাস নিয়ে বুকের ভেতরটা জুড়ানোর চেষ্টা করল সে, মার খুব অসুখ, তোমাকে একবার আমার সাথে যেতে হবে। আমি কানাই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, সে বলল, ভিড় কমলে যাবে। রেণুর চোখের কোণে চিকচিকানো জল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মায়ের যে কী হল। ক'দিন থেকে বলছিল শরীরটা খাবাপ। আমি ওযুধ এনে দিয়েছি কানাই ডাক্তারের কাছ থেকে। সেই ওযুধ খেয়ে মা ভালই ছিল। আজ যে হঠাৎ কী হল ঠিক বুঝতে পারছি নে। রেণু ফুঁপিয়ে উঠল কান্নায়, পবনের দিকে সব হাবানোর চোখে তাকাল, পবনদা, দেরী করো না গো, চলো। দেরী হলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। মাঠের ঘবে মাকে জল দেবার কেউ নেই। তার কথা শোনারও কেউ নেই। আর দেরী কবা চলবে না। এক্ষুণি চলো।

হাটখোলা পেরিয়ে পাকা সড়ক ধরে ছুটতে লাগল ওরা। হাওয়ায় উড়ছিল রেণুর আঁচল। পিঠ ছাপান চুলগুলো মাঠ পালান হাওয়ায় ফুলে ফেঁপে উঠছিল ফনা তোলা সাপের মত। ছুটতে ছুটতে পবন ডাকল রেণু, এই রেণু।

রেণু থামল না, গলা কেঁপে উঠল তার, মার কষ্ট আর চোখে দেখা যাচ্ছে না। আমাব খুব ভয় করছে। বাঁ দিকে মুখ ঘোরাল রেণু। পবনের চোখে চোখ পড়তেই ভয়ের বিদ্যুৎ চিকুব হানল বুকের ভেতর, জানো, আমার খালি মনে হচ্ছে মা আর বাঁচবে না। সে বার বার করে তোমার বাবাকে খুঁজছে। মনে হয় কিছু বলতে চায় শেষ সময়ে।

—বাবা তো কয়েক বছর হল ঘরছাড়া তুমি তো জানো। তার খোঁজ আমি কোথাও পাইনি। অসহায় শোনাল পবনের গলা।

আগড় সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই সব শেষ। অতসী বোষ্টমীর খোপা ভাঙা চুল বালিশের উপর ছড়ান। ঘাড় কাৎ হয়ে হেলে গিয়েছে মাটির দিকে। ঠোঁটের দু-কোণে কালচে রক্তের আলপনা। ধানমাঠের মাছিগুলো ভিড় করে উড়ছে মুখের উপর। রেণু আছাড় দিয়ে পড়ল সেই নিষ্প্রাণ শরীরের উপর। মায়ের বুকের কাছে হাত রেখে হিম স্পর্শে চমকে উঠল সে। তার মনে হল মা নয়, বিশাল একটা সাপ শুয়ে আছে বিছানায়। ভয়ে পিছাতে-পিছাতে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল রেণু। তারপর কেঁদে উঠল হু হু শব্দে।

তেইশ

অতসী বোষ্টমীর মৃত্যু রেণুর জীবনে বিনা মেঘে ব্রজপাত। ক্রিয়া কাজ মিটে যাওয়ার পরও সে কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। পবনও বেশ কয়েকদিন দীঘায় মাছ আনতে যায়নি, সুভদ্রাই তাকে যেতে দেয়নি, মানুষের বিপদে তার পাশে দাঁড়ানোই মানুষের কাজ। তুই চলে গেলে এদিকে কে দেখা শোনা করবে। তাছাড়া রেণু একা থাকবে। এখন সবসময় ওর কাছে একজনের থাকা দরকার। পবন রেণুকে তাদের ঘরে এসে থাকতে বলেছিল। রেণু রাজি হয়নি। সে মাঠের ঘর ছেড়ে আর কোথাও যেতে চায় না। মায়ের স্মৃতি তার মন জুড়ে বসে আছে।

দুলুবাবু রেণুর মাথায় হাত রাখলেন স্নেহের, তোর কোন চিন্তা নেই মা। আমরা সবাই তোর পাশে আছি। আমি তোর কাকিমাকে বলেছি, তুই আমাদের ঘরে থাকবি। আমার তো একটা মেয়ে, আজ থেকে আমি দুটি মেয়ের বাবা হলাম।

রেণু ভাবছিল, ওর চোখ সুদূরে ছড়ানো। ক'দিন থেকে বৃষ্টি ঝরেনি মোটে, পথঘাট শুকিয়ে খটখটে। গুমোট গরম মাটিকেও জ্বালাতন করে ছাড়ছে। এই দুপুরে গাছের পাতা নড়ে না, খেজুর-গাছের ঝাঁটামুখ পাতাগুলোও কাঁপছে না হাওয়ার ধমকে। মেঠোপথ এখন নিচিহ্ন ধানচাষে। ধানগাছের গোড়ায় বিঘোৎ খানিক জল, লাল কাঁকড়ারা ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁড়া দিয়ে ঠেলে উঠে আসে আলের উপর। কারোর পায়ের শব্দ পেলেই সে আবার সুড়ুৎ করে নেমে যায় জলে। লাল কাঁকড়ার চালচলনের মত এখনকার মেঘের চরিত্র; কখনও গুম ধরে, বুকে কিল মেরে বসে থাকে মাথার উপর। গোমড়ামুখো মেঘ নেই কোথাও, অথচ মুখ ভার করে সজল চোখে দূরের পানে চেয়ে বসে থাকে রেণু। পবন তার কাছে যেতে সাহস পায় না, তবু সুভদ্রার অনুরোধে তাকে আসতে হয়। রেণুর মুখের দিকে তাকালে তার বুক ঠেলে কান্না ওঠে, সেই কান্নার শক্তি এত বেশী যে চোখের কোণগুলো ভিজে যায় পবনের। অতসী বোষ্টমীর হঠাৎ চলে যাওয়া দিশেহারা করে তুলেছে পবনকে। বিশেষত রেণুর কথা ভেবে তাব মাথা ভার হয়ে আছে ক'দিন থেকে। রেণু কোথায় খাবে, কোথায় থাকবে সর্ব্বদা এই তার চিন্তা। সুভদ্রা নিজে থেকেই বলেছে, রেণুর জন্য ভাববি নে। ও তো আমার মেয়ের মত। তোর বাবা থাকলে রেণু তো আমাদের ঘরেই থাকত। তোর বাবা যখন ঘরে নেই তখন সেই দায়িত্বটা তোকে নিতে হবে পবন। রেণুর যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেসব তোকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মা-বাপ মরা সোমত্ত মেয়ের জ্বালা অনেক। ওকে কোথাও রেখে আমার মন বসবে না। ওকে বল, আমাদের ঘরে চলে আসুক। চারটে পেট যদি চলতে পারে তো তাহলে আর একটা পেট ঠিক চলবে।

মায়ের কথাগুলো রেণুকে সব বলেছিল পবন, রেণু সব শুনল মন দিয়ে কিন্তু কোন কথার জবাব দিল না। পবনদের ঘরে সে যে থাকবে না—এ ব্যাপারে একরকম নিশ্চিত। এমনিতে ওদের সংসারে টানা-পোড়ন অভাব-অনটন। সব জেনে-শুনে ওখানে সে যাবে কী ভাবে? পবনের বলার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব নেই, সে-ও চাইল রেণু এসে থাকুক তাদের ঘরে। কিন্তু এখনও অব্দি রেণুর প্রতিক্রিয়া সে জানতে পারেনি। জানার জন্য জোর করল না পবন। এখন জোর করার সময় নয়। যার মাথায় আকাশ ভাঙে, সে কেবল জানে আকাশের ভার। রেণুর বিষণ্ণ দুঃখী মুখটার দিকে তাকিয়ে পবনের মনে পড়ে বাসি ফুলের কথা। ঝড় বয়ে যাওয়া ফুলের গাছ যেন রেণুর চেহারা। টানা চোখের

নীচে রাজ্যের যাতনা সে লুকিয়ে রেখেছে নিভৃতে, সঙ্গোপনে। সে এখন বেশী কথা বলার মত মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। দুলুবাবুর প্রস্তাব রেণুর মনে কোন ঢেউ তুলল না। কতদিন সে অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকবে। এখন যে সমবেদনার ঢেউ তার উপর উপছে পড়ছে তা কদিন পরেই যে ম্লান হয়ে যাবে—এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। তবু গ্রামের মানুষ তার কথা ভাবছে, তার বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এসব রেণুকে পুরোপুরি ভেঙে পড়তে দেয় না।

বসন্ত জানা হাটখোলার বয়স্ক মানুষ। ছাতা মাথায় দিয়ে তিনি এলেন ধীরে-ধীরে। দাওয়ায় উঠে পাশে বসলেন রেণুর, ছাতাটা বুজিয়ে হেলান দিয়ে রাখলেন দেওয়ালে। তার গায়ে ঢোলা জামা, শিরা জাগান হাত বেরিয়ে আছে অল্প। কাঁচা পাকা গোঁফের উপর তার নাকটা টিয়াপাখির ঠোঁটের মত। কাপা ভ্রু-কুঁচকে তিনি মুখের ঘাম মুছলেন জামার কোণা দিয়ে, হুঁশ করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, আমার আসতে টুকে দেরী হল মা। কী করব, একলা মানুষ। রাঁধা বাড়া করে খেতে নিতে একটু দেরী হয়ে যায়। তোর দুঃখের কথা আমি সব শুনেছি। শোনার পর থেকে ঘুম নেই রাতে। তোর মা'টা যে হট্ করে মরে যাবে আমি ভাবিনি। তার সাথে আমার দেখা হোত হাটখোলায়। বড় মিষ্টি মুখের মেয়ে ছিল তোর মা। চোখে চোখ পড়লেই হাসত। কথা হোত না ঠিকই কিন্তু সেই হাসি দেখে আমি বুঝতাম মেয়েটা আমার ভাল আছে। সেই ভাল মেয়ে যে এমনভাবে অবেলায় চলে যাবে—কে জানত। তুই দুঃখ করিস না মা। তোকে আমি আর কী সান্ত্বনা দেব। এ পৃথিবী কারোর নয়। তোরও নয়, আমারও নয়। সবাইকে একদিন এর মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। সে যখন গিয়েছে মা, তখন আরাম করে তাকে যেতে দে। কেঁদে-কেটে তার যাওয়ার পথ পেছল করে দিসনে।

লম্বা বারান্দায় আলোর কোন অভাব নেই, ফাঁকা মাঠের পুরো আলোর মেলা বসেছে দাওয়ায়। এত আলোর মাঝখানে রেণু মুখ কালো করে বসেছিল। চোখ ধুয়ে যাচ্ছিল চোখের জলে। চোখের পাতা ভিজে গিয়ে জলো ঘাস। চোখ ছাপিয়ে জল এসে ঠেকেছে ঠোঁটের কোণে। জলের দাগ পথ করে নিয়েছে নিজের। বসন্ত জানা তার রুগ্ন হাত নাড়িয়ে বললেন, তুই আর কাঁদিস না মা। তোর চোখের জল আমার আর সহ্য হচ্ছে না। অনেকদিন আমি কারোর কান্না দেখিনি। কান্না দেখলে এই বয়সে আমিও আর চোখের জল আটকে রাখতে পারিনে। আমার বুকের ভেতরটা ধরফড় করে ওঠে। মনে হয় দম বন্ধ হয়ে যাবে। বসন্ত জানা কথা থামিয়ে ঢোলা জামার কোণে চোখের জল মুছে নিলেন, আমি রোদ মাথায় তোর কাছে কেন এলাম বল তো? আমি তোকে নিতে এসেছি। তুই চল। তোকে আর কোথাও থাকতে হবে না। তুই আমার কাছে থাকবি। জয়ন্ত ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই। সে তো থেকেও না থাকার মত। সে তার মাস্টারী নিয়ে পড়ে আছে এগরায়। ইস্কুল ছুটি থাকলেও গ্রামে আসতে চায় না। ছেলেটার এই অল্প বয়সে ধর্ম-কর্মের দিকে মন ঝুঁকেছে। পড়াশোনা শিখে ছেলেটা আমার পর হয়ে গেল। ও ছেলে জীবনে যে সংসারধর্ম করবে না এটা আমি জানি। তাই ওকে আমি জোর করি না। ও তার নিজের ইচ্ছায় চলুক। আমি বাধা দেব না। তুই চল মা। তুই আমার ছন্নছাড়া ঘরটা একটু গুছিয়ে রাখবি। দুটো রেঁধে-বেড়ে দিবি। এই বুড়ো মানুষটাকে টুকে দেখবি। একটু আদর-যত্ন করবি। ব্যস, এর বেশি তোর কাছে আমি কিছু চাইব না। —বসন্ত জানা রেণুর হাত ধরলেন, আবেগে বুজে আসছিল তার গলা, তবু কোনমতে বললেন, আর না করিস নে। এখানে সবাই আছে। আমি সবার কাছ থেকে তোকে চেয়ে নিলাম। এ কথা কেন বললাম জানিস মা? তোকে যে সবাই ভালবাসে। তোর মধ্যে এমন কী ক্ষমতা আছে আমি জানি না তবে তোকে ভাল না বেসে কেউ থাকতে পারবে না।

দুলুবাবু বসন্ত জানাকে শ্রদ্ধা করেন, তিনি ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বললেন, কাকা ভাল প্রস্তাবই দিয়েছে। রেণু তুই রাজি হয়ে যা। কাকার অত বড় ঘর অথচ ঘরে থাকার কেউ নেই। তুই সেখানে নিজের মত করে থাকবি। বুড়ো বয়সে কাকাকে দেখার কেউ নেই। জয়ন্ত যে গ্রামে ফিরবে না—

এটা আমিও জানি। ও এখন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নিয়ে পড়েছে। নানান জায়গায় ধর্ম নিয়ে সভা-সমিতি করছে। এ লাইনে তার খ্যাতিও বাড়ছে। ফলে তোর কোন চিন্তা নেই। তুই কাকার বাড়িতে রাণীর মত থাকতে পারবি। কাকা তো দিনভর দোকানে থাকে, রাতে গিয়ে দুটো গরম গরম ভাত পাবে এবার।

মাঝ বিকেলে রেণু তার প্রয়োজনীয় জামা-কাপড় গুছিয়ে নিল। ফাঁকা মাঠের মধ্যে তাদের ঘর। এখানে থাকা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। রাত্রি নয়, দিনেরবেলাতেই যে কোন সময় অঘটন ঘটে যেতে পারে। ভূত-প্রেতকে ভয় পায় না রেণু। তার ভয় মানুষকে।

ঘরের মধ্যে ডিবরির আলো জ্বালিয়ে রেণু যখন কাপড় গোছাতে ব্যস্ত, পবন মাথা নীচু করে ঢুকে এল সেই আলো-আঁধারি ঘরে। পবনের পায়ের শব্দে রেণু একটা লাল রঙের শাড়ি ভাঁজ করা থামিয়ে বলল, তোমার সাথে কথা বলার সুযোগ তো হল না। আমি ভেবেছি বসন্ত দাদুর ঘরে আমি চলে যাবো। ওখানে যাওয়াই মনে হয় ঠিক হবে। বুড়ো মানুষটার কেউ নেই। সব থেকেও সময়মত দুটো খেতে পায় না। আমি দুটো রান্নাবান্না করে দিলে তার সুবিধা হবে। এ ব্যাপারে তোমার কী মত?

পবন গম্ভীর হয়ে শুনল রেণুর কথাগুলো। রেণু কারোর ঘরে গিয়ে কাজ করে খাক—এতে তার মন নেই। সহদেব এখানে থাকালে রেণুকে সে কারোর দোরে পাঠাত না। রেণুরও সাহস হোত না কারোর দোরে যাবার। রেণুর উপর তার অধিকার ছিল সব চাইতে বেশী। বাসি কাজল চোখের জলে ধুয়ে যায় যেমন ঠিক তেমনি ভাবেই রেণু চলে যাচ্ছে তাদের ছেড়ে। পবন কী বলবে রেণুকে, বলার মত আজ তার আর কোনো কথা নেই। অতসী বোষ্টমী মৃত্যুর আগে পর্যন্ত একটা নাম নিয়েই মরেছে—সেই নামটা হল সহদেবের। মৃত্যুযন্ত্রণায় তার মুখ যখন নীল হয়ে যাচ্ছে কষ্টে তখনও সে সহদেবের নাম উচ্চারণ করতে ভোলেনি। আশালতার চোখেও ছিল সেই ব্যথা, যন্ত্রণা। মানুষ পাগল হলেও বুঝি অমন প্রলাপ বকে না। সহদেব হঠাৎ নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে তার শরীরে বুঝি মাংস নেই, বালি দিয়ে গড়া মরুভূমি। চাতক চোখে সে-ও তো পথ চেয়ে আছে সহদেবের। তৃষ্ণা মেটাবার মত এ পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই। সুভদ্রা চাতকের মত তৃষ্ণায় বুক না ফাটালেও তার চোখেও সেই একই আর্তি। পবনের মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল রেণুর ভেজা মুখের দিকে তাকিয়ে। সে যা কোনদিন করেনি, তাই হঠাৎ করে বসল। রেণুর হাত ধরে সে কেমন ভিখারী গলায় বলল, তুমি চলে যাচ্ছো এতে আমার কোন দুঃখ পাবার নেই, কিন্তু তুমি যে ক্ষত এঁকে দিয়ে যাচ্ছো বুকে—সেই ক্ষতে সান্ত্বনার প্রলেপ দেবারও কেউ নেই। তুমি ঠিক এইভাবে হারিয়ে যাবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। মা'র কাছে আমি বড় মুখ করে বলে এসেছিলাম, তোমাকে ঘরে নিয়ে যাব। তা যখন পারলাম না, তখন সে-ঘরে আমি ফিরব কেমন করে? যাওয়ার আগে আমার এই প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে যাও।

হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না রেণু, শুধু হতবাক চোখে তাকাল। তখনও ভেজা তার চোখের দৃষ্টি, কোমল ঠোঁট দুটোয় অস্থির কাঁপন। স্ফটিক স্বচ্ছ জল চোখ থেকে ঠিকরে এসে অসহায়ভাবে ঝুলে থাকল চিবুকে। কিছু না বলে কে যেন বোঝাতে চাইল অনেক কথা। পবন অস্থির চিত্তে বলল, কিছু বলো, অমন করে থেকো না। তুমি চুপ করে থাকলে নিজেকে আমার অপরাধী মনে হচ্ছে। আমি চাই না তুমি কাঁদতে কাঁদতে কারোর দোরে যাও। যাবার জন্য কাউকে কাঁদাও। তোমার মা সে-ও তো আমার মায়ের মতই ছিল। তাকে আমি মা বলেই জানতাম। জ্ঞান পড়ার পরে আমি তার সম্মুখে খুব কমই এসেছি। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কটা আমি তখন জেনেছি। এ-ও জেনেছি আমার বাবা তোমার মাকে ভালবাসত নিজের কলিজার চেয়েও। সে যদি এই মৃত্যুর খবর শোনে তাহলে তাকে হয়ত আর বাঁচানো যাবে না। একমাত্র তুমিই পারবে তাকে বাঁচাতে। সেই তুমিই যখন চলে যাচ্ছো তখন আমি আর কী বলে সান্ত্বনা দেব নিজেকে। তবে যাবার যখন মন হয়েছে যাও। আমি তোমাকে আর বাধা দেব না। আমি তোমার কে হই যে বাধা দেব?

রেণু চোখ মুছল শাড়ির আঁচলে, ভেজা মাটির মত মুখ করে সে বলল, আমি তোমার কষ্টটা বুঝতে পারি। তুমি ভাবছ—তুমি হেরে গেলে, তা নয়। আমি কি কোনদিন তোমাকে হারিয়ে দিতে পারি? তোমার মনের কাছে আমার মন বাঁধা রেখেই আমি যাচ্ছি। যত দূরেই যাই না কেন মন আমার পড়ে থাকবে। আমার মনটা যে তোমাদের সবাইকে ঘিরে বড় হয়েছে। তুমি আর রাগ করো না, হাসি মুখে আমাকে যাওয়ার কথা বলো। বসন্তদাদু অমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বসে আছে। তুমি অনুমতি না দিলে তো আমি যেতে পারি না।

পবন মনমরা গলায় বলল, আমি তোমাকে অনুমতি দেবার কে? তোমার যেখানে ইচ্ছে মন চায় চলে যাও। আমি আর বাধা দেব না। ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল পবন, দাওয়া পেরিয়ে সে চলে এল আগড়ের কাছে। রেণুও বেরিয়ে এল তার পেছন পেছন। আঁচলে চোখ রগড়ে লাল হয়ে গেছে চোখের জমি। বিকেলের ফুল ফোটান আলোয় সে দেখল পবন চলে যাচ্ছে আলপথ ধরে। সে এত দূরে চলে গিয়েছে, তাকে আর এত দূব থেকে ডাকা যায় না। শুধু দেখা যায় ঝাপসা চোখে। প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে রেণু যেন এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল এমন যন্ত্রণাদগ্ধ শারীর নিয়ে সে আবার ফিরে এল বসন্ত জানার কাছে। রেণুর এই পরিবর্তন বসন্ত জানার বৃদ্ধ চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল না, তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বেলা পরখ করে, চল মা, আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। একে একে তো সবাই চলে গেল। এবার ধীরে সুস্থে আমাদেরও যাওয়ার দরকার। সন্ধে নামলে আমি ভাল চোখে দেখতে পাই না। আলপথ। হেঁটে যেতে খুব কষ্ট হবে মা।

রেণু শেষবারের মত তার ফেলে যাওয়া কৈশোরের স্মৃতিচিহ্নগুলোর দিকে তাকাল, আচমকা হাওয়ায় তার শাড়ির আঁচল উড়ল ফরফরিয়ে, কাঁপা কাঁপা পায়ে সে আগড় সরিয়ে হেঁটে এল আলপথ পর্যন্ত। বসন্ত জানা বৃদ্ধ হলেও রসিক মানুষ, দেখিস মা আলপথে হাঁটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়িস নে। আলপথ কখনও সুপথ নয়। গেঁড়ি গুগলি ভাঙা আর গ্যাংটা পাথরের ছড়াছড়ি। বেকায়দায় লাগলে নখ ফেটে রক্ত বেরবে। রেণু এ কথার কোন জবাব দিল না, সরু আলপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সে পৌঁছে গেল একটা নতুন ঠিকানায়।

নতুন জীবনের স্বাদ সব সময় যে আনন্দের হয তা নয়।

বসন্ত বুড়ার ঘরে রেণুর স্বাধীনতা ছিল অবাধ, তবু মাঝে মাঝে তার মনে হোত সে বুঝি খাঁচার একলা ময়না। একটা শিকড় চারানো গাছকে দ্বিতীয়বার অন্যত্র লাগানোর যন্ত্রণা অনেক। গাছটা যে সবসময় বাঁচবে তা নয়। যদি শুকিয়ে যায় সে দোষ গাছের নয়। রেণু ভাবত সেও একটা গাছেব মত, তাকে নতুন করে জল ঢেলে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন বসন্ত জানা। ঐ বুড়ো মানুষটার মধ্যে সততার বিন্দুমাত্র অভাব নেই, খেটে খুটে ঘরে ফিরে আসলেও তার হাসিমুখ দেখতে পেত রেণু। বসন্ত জানা বলতেন, মানুষের জীবনটা সুচের ডগায় শিশির বিন্দুর মত। কখন যে ঝরে পড়বে কেউ জানে না। তুই মা মুখ ভার করে থাকবি নে। হাসবি, খেলবি। তোর যা দরকার, আমি সব এনে দেব। আমি তোকে ঘর পাহারা দেবার জন্য এখানে আনি নি। আমি তোকে এনেছি, তুই নিজেকে গড়ে তুলবি এখানে। দশটা লোক যেন তোকে দেখে বলে, হ্যাঁ, রেণুটা সত্যিকারের মানুষ হয়েছে। বুড়োটা ওর কোন অভাব রাখেনি। নিজের মেয়ের মত মানুষ করেছে। যার এত ভাবনা রেণুর উপর, তার সম্বন্ধে না ভেবে সে থাকবে কী করে? দুপুরে বসন্ত জানা দোকান বন্ধ করে খেতে আসতে পারে না। এই এত বয়সে এতটা পথ হাঁটতে গেলে তার বুকটা ধড়ফড় করে বিষ দেওয়া পুকুরের মাছের মত। রেণু সেই অসহনীর কষ্ট নিজের চোখে দেখছে। যত দেখছে ততই যেন মুচড়ে যাচ্ছে বিবেক। সে ঘরে বসে থাকবে, আর বুড়ো মানুষটা দিনভর মেসিন চালাবে—এটা হতে পারে না। সেও যাবে বসন্ত জানার সাথে মেসিন চালাতে। দোকানঘরের কাজকর্ম দেখাশোনা করবে সে। কিছু না হোক এক গ্লাস জল

তো সে এগিয়ে দিতে পারবে। এইটুকুতেই তার তৃপ্তি, আনন্দ। মনের কথা বসন্ত জানার কাছে সবিস্তারে বলতেই 'হায়-হায়' করে উঠলেন তিনি, তা হয় না মা। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকাই ভাল। পথ তোর জন্য নয়, পথ তো আমার জন্য। আমার এখনও ঠিকমত মাজা পড়েনি, আমি কি পারব না তোকে দু-বেলা দু'মুঠো ভাত দিতে। তুই কেন মিছেমিছি ভাবছিস। আমি যতদিন বেঁচে আছি, তোর ভাত-কাপড়ের কোনদিন অভাব হবে না। তবু কথা শুনত না রেণু। তবু সে যেত দুপুরের ভাত নিয়ে দোকানে। বসন্ত জানা হাটখোলার পুকুরে স্নান সেরে এসে কাটা ছিট কাপড়ের উপরে বসত বাবু হয়ে। তার আগে রেণুর দোকান ঝাঁট দেওয়া সারা। টুকরো ছিট কাপড়গুলো পোঁটলা বেঁধে ফেলে রাখত দোকানের এক কোণে। ধূপ জ্বেলে দিত গণেশ ঠাকুরের বেদীতে। হাতজোড় করে বলত, দাদুর দোকানটাকে আর একটু শ্রী দাও সিদ্ধিদাতা ভগবান। মানুষটার মন খুব ভাল। ওকে আরো অনেকদিন আয়ু দাও। মেসিন চালাবার শক্তি দাও।

বসন্ত জানা তৃপ্তি সহকারে খেতেন রেণুর রান্না। খেতে-খেতে বলতেন, তোর হাতে ভগবান মধুর ভাণ্ড দিয়েছেন। এটা সে কিন্তু সবাইকে দেয় না। আঃ, মন ভরে খেলাম রে। তোর হাতের রান্না খেয়ে আমার আয়ু বেড়ে গেছে দশ বছর।

—তুমি এত যে প্রশংসা করো, আমি কি তার যোগ্য? রেণুর গোলাপী ঠোঁটে হাসির অনাবিল মিশ্রণ, বসন্ত জানা সেই হাসির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাসতেন, একটুও বাড়িয়ে বলছি না, যা বলছি তা একেবারে নির্ভেজাল সত্যি। এই দেখ, আমি তোর রান্না খেয়ে হাত চাটছি কেমন। জানিস মা, তোর রান্না খেলে আমার শুধু মায়ার কথা মনে পড়ে। সে-ও ঠিক তোর মতন ভাল রাঁধত। বেশী কথা বলত না ঠিকই, কিন্তু রান্না করত নানা পদের। আজ আমি যেমন খাচ্ছি, তখনও ঠিক এমন খেতাম। তবে সে ছিল ভীষণ রকমের ঘরকুণো। মাথায় এক বিঘোৎ ঘোমটা টেনে পুকুরঘাটে যেত নাইতে। জয় হওয়ার পরেও তার লজ্জা গেল না। আমি তাকে ক্ষেপাবার জন্য বলতাম, তুমি তো মায়াবতী নও, লজ্জাবতী। এতদিন বিয়ে হল আমাদের, তুমি এখনও পর্যন্ত আমার দোকানঘরটা দেখলে না। সে মুখ টিপে টিপে হাসত। বলত, ঘরের বউ বাইরে গেলে লোকে কি ভাল বলবে? নাকি সেটা ভাল দেখায়? আমি এই ঘরের বউ হয়ে এসেছি, আমি এখানেই থাকব। এ ঘর ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। জয় তখন ছোট। সে একদিনের জ্বরে নিজেকে মিথ্যেবাদী সাজিয়ে চলে গেল। আমি যখন তাকে ডাঙাপড়িয়ায় পুড়িয়ে এলাম, তখন আমিও যে পুড়ে এসেছি জানতাম না। গ্রামের সবাই বলল, ফিরে বিয়ে করতে। বয়সও কম ছিল, মন চাইলে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারতাম। কিন্তু ভেবে দেখলাম—সেটা ঠিক হবে না। একজন মানুষ জীবনে ক'বার বিয়ের পিঁড়িতে বসবে? তাছাড়া সে তো বলেছিল সে যাবে না, এই ঘরেই থাকবে। তার চোখের সামনে আমি আবার অন্য মেয়েমানুষের হাত ধরব কী করে? আমি তো লম্পট হতে শিখিনি মা।

দুপুর গড়িয়ে যায় এইভাবে কথায় কথায়। হাটখোলায় পবন রোজ আসত অথচ এখন দেখা পায় না রেণু। চোখে শূন্যতা এঁকে নিয়ে ঘরে ফিরে যায় সে। হু-হু করে ওঠে মন। রুগ্ন আলপথে দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ে। পবনেব স্বপ্নিল চোখ দুটোর মধ্যে সে খুঁজতে থাকে নিজেকে। আবিষ্কার করতে চায় নিজেকে। এই দুর্বলতা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। এই ভাবনা তার মাদুলি, রক্ষা কবচ।

সেদিন যুগলবুড়া রোদ মাথায় এল তার উঠোনে ভিক্ষা চাইতে। ক্ষয়ে যাওয়া হাতে দড়ি বাঁধা খঞ্জনী। গলায় তুলসীর মালা। কণ্ঠে—হরেকৃষ্ণ।

—মা গো , ভিক্ষা দাও। বলে সে গান থামিয়ে চেঁচিয়ে ডেকেছিল রেণুকে। বাইরে এসে রেণু দেখল যুগলবুড়া হাঁপাচ্ছে। চেহারা ঘুনলাগা কাঁচা বাঁশ নয়, উইয়ে কাটা পাকাটি। তোপড়ান বাটিটা সে এগিয়ে দিয়েছিল সামনে, যা হয় কিছু দাও মা। আমার আর শরীর চলছে না। তোমার এখান থেকে সিধা ঘর ফিরে যাব। ভাত চড়াতে হবে। বেলাও তো অনেক হল।

—আমার এখানে খেয়ে যাও। রেণু বলেছিল আত্মীয়তার গলায়, অনেকদিন আসোনি তো। শরীর কি খারাপ হয়েছিল?

—না, না। শরীর ঠিক ছিল। তবু আসতে পারিনি মা।

থালায় করে ভাত দিয়েছিল রেণু। ডাল তরকারী সব। বলেছিল, ঐ চালতাগাছের ছায়ায় বসে খাও। সংকোচ করো না। আমি তো তোমার মেয়ের মতো।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি তো আমাদেরই মেয়ে। তোমাকে আমরা কখনও অন্যের ভাবি না। জান তো মা, তোমার বাবা আমার কাছে আসত প্রায়ই। সে একটু গাঁজা-ভাং খেত। তবু তার মনটা ছিল সবুজ ধানচারা। গান-বাজনা ভালবাসত খুব। সেখার আগ্রহ্ও ছিল প্রচুর। আমাকে গুরুজ্ঞানে মানত। সে বৈষ্ণব হলে কী হবে—তার মনে ধর্ম নিয়ে কোন গলদ ছিল না। তুমি তার মেয়ে। যদি তার সিকি ভাগও না পেয়ে থাকো, তবু বলব তোমার তুলনা শুধু তুমি। কেন বললাম জানো এ কথা। এ গাঁয়ের অনেক ঘরে আমি ·ˈই। কেউ আমাকে বসে দুটো খেতে দেয় না। তুমি আমাকে শুধু খেতে দিলে না, ছায়াও দিলে। আজ তোমাকে দেখে—আজ ভরত বোষ্টমকে দেখলাম।

রেণু নিমেষে হারিয়ে গেল ছোটবেলায়। বাবার মুখখানা মনে করাব চেষ্টা করল বারবার। জলের ভেতর যেন আঁকা আছে বাবার মুখ। ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে সেই মুখ। বিসর্জনের ঠাকুর নেই, পড়ে আছে শুধু কাঠামো।

নিজেকে বাঁধ দেয় রেণু। ভেজা হাতে চোখ মোছে। চালতাগাছের আড়ালে হলুদ পাখিটা ডাকছে। বাতাসে কম্পন। ডাক ছড়িয়ে যাচ্ছে মাঠে। হাওয়া ছুটে এসে উড়িয়ে দিল আঁচল। কানের দু-পাশে ফুরফুরে চুল। উড়ছে শুধু উড়ছে। নাকছাবিটায় বেঁধে গিয়েছে এক ফোটা চোখের জল। ফুঁপিয়ে উঠছে অন্তরাত্মা। সে কাঁদছে। এক মাথা রোদের মধ্যে সে কাঁদছে। নিজস্ব উঠোনে সে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে সে পালিয়ে যাবে। কোথায় পালাবে? সামনে আগড়, বেড়া। রাংচিতে, কটা কচার বেড়া। ফড়িং বসেছে কঞ্চির ডগালে। রোদ মাখছে গায়ে। উড়ে যাবে পুকুরের ধারে। কলমীলতায় বসবে। শরীর ছোঁয়াবে জলে। একটা ফড়িং যা পারে সে কেন পারবে না। তারও তো জল চাই পিপাসার। আকাশ যদি দয়া না করে তাহলে সে কোথায় যাবে? এই তৃষ্ণার কথা আকাশকেও বলা যায় না। আকাশ সবার কথা শোনে না। আগে তো সে এমন ফটিক পাখির মত ছিল না। কই ক'দিন আগেও তো এত ঘনঘন তেষ্টা পেত না। দু-চোখ নিদ্রাহীন ছিল না। তাহলে কেউ কি তাকে নজরবাণ মেরেছে? কে সেই মানুষ। মনের ভেতর লুকোচুরি খেলা শুরু হল। চোখ বেঁধে দিয়ে কানামাছি দৌড় শুরু হল। মন বলল—পেয়েছি। হৃদয় বলল—চিনেছি। চোখ দেখল—তাকে? তবু চিনতে পারল না চোখ। তবু স্পর্শ পেল না শরীর। এ এক অস্থির জ্বালাতন। সামনে জল। বুক জ্বলা তৃষ্ণা। তবু খেতে পারছে না। ঐ লবণাক্ত জল সে পান করবে কী ভাবে? কী ভাবে হাত ছোঁয়াবে সেই জলে। কে দেখিয়ে দেবে পথ? কে জ্বেলে দেবে দু চোখে আলো? সে কে? ঠোঁটের কোণটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল রেণু। গলা কেঁপে উঠল যুগলবুড়ার ক্ষুধার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে, পবনদার কোন খবর জানো? খাওয়া থামিয়ে তাকাল বুড়োটা। ভাঙা ভাতের টুকরো লেগে আছে মুখের দু-পাশে। তবু রহস্য করে হাসল, জানি, জানি। আগে খেতে দাও। তারপর সব বলবো।

রেণুর তর সয় না। তছনছ শুধু বুকের ভেতর। মানুষের দেহ কি তাহলে চোরাবালি গড়া। নরম কাদা কি তার মন? সাদা ফুলের পাপড়ি কি তার চোখ? অশ্রু কি শিশির কণা? সিঁথি কি পথ? রেণু ভাবছিল। যুগলবুড়া খাওয়া শেষ করে বলল, পাবনাটাকে ক'দিন থেকে দেখছি মনমরা। বলছিল, কলকাতায় চলে যাবে। মাছের ব্যবসা আর চলছে না।

—সে চলে যাবে, কবে যাবে? ব্যাকুল হয়ে উঠল রেণুর হৃদয়-মন, তোমার সাথে দেখা হলে আমার এখানে একবার আসতে বলো। বলো, আমার খুব অসুখ। আমি বাঁচব না।

—ছিঃ, এ কথা বলে না মা।

—আমি কী সাধ করে বলেছি! রেণু চোখ রগড়ে নিল। বেঁকে উঠল ভ্রু'র ধনুক। কপালে ঘাম জমল ফোঁটা ফোঁটা। ডাগর ঠোঁটে অভিমানের গাঢ় ছায়া, আমি কী দোষ করেছি—যার জন্য সে আসবে না?

যুগলবুড়া ভাবল। সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, জল তো উঁচু থেকে নামলা ক্ষেতে গড়িয়ে পড়ে। নদীও তাই। পবনকে আমি যতদূর জানি, তার স্বভাব ঐ জলের মত। সে আসবে না উঁচু টিবিতে। তুমি যাও মা। জেদ করলে জেদ বাড়ে। জেদ করলে মনে ঘা হয়। চোখের জল কোনদিন কপালে ওঠে না। চোখের জল ঠোঁট ছোঁয়, থুতনী ছোঁয়। বুক ছোঁয়, মন ছোঁয়। তুমি তারে ছোঁও। শান্তি পাবে। নাহলে কাঁদবে। কেঁদে কেঁদে নদী হবে, পুকুর হবে, ডোবা হবে। তারপর শুকিয়ে যাবে। যুগলবুড়া চলে যাবার পরও তার কথাগুলো বাতাস বলল। চালতাগাছের হলুদ পাখিটাও সুর করে বলল। ফড়িংয়ের ডানায় যে শব্দ হল—সে-ও তো সেই একই কথা।

রেণু ভাত নিয়ে দোকানে চলে গেল বসন্ত জানার জন্য। আজ আর সে পাশে বসে খাওয়াল না। আব্দার করে বলল, আমার কাজ আছে। আমি যাই। তুমি বাসনগুলো সাঁঝের বেলায় নিয়ে এসো।

—তোর এত কিসের কাজ?

রেণু চুপ করে থাকে। দোকানঘর পেরিয়ে এক সময় নেমে আসে পাকা রাস্তায়। চোখে পড়ে ছিন্ন, মলিন পাড়াখানা। অভাব তার সর্বাঙ্গে। গাছপালাগুলোও এই বর্ষায় মনমরা। রোদ এসে আদর করে পাতায়। সূর্য ঢেলে দেয় আলো। এখানেও এত আলো থাকে? এত হাওয়া? কোনদিন তো এমনভাবে সে উপলব্ধি করেনি। আজ জোয়ার আসার শব্দ সারা শরীরে। উথলে উঠছে আবেগ। বাঁশ ডগালের ঘুঘু উড়ে যায় ডানা ঝাপটিয়ে। কোথায় যায়? ঘরে? একটা পাখিও ঘর খোঁজে, ঘরে ফেরে। রেণুও যাবে। সে যায়। আগড় সরায়। গোবর লেপা উঠোনে এসে দাঁড়ায়।

হৈমবুড়ি পায়ের শব্দ পেয়ে শুধায়, কে, কে ওখানে?

—আমি গো দিদিমা।

—ওঃ! রেণু বুঝি?

—হ্যাঁ। আমি রেণু।

—তা, দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আয়।

—আমি বসব না।

—তাহলে এলি কেন? এত রোদ। ভরা দুপুর। তা এসেছিস যখন ঢুকে বসে যা। হৈমবুড়ি চোখ রগড়ে নিয়ে তাকাল, পবন তো ঘরে নেই।

—আমি তার খোঁজে আসিনি। ডাহা মিথ্যা কথা বলে রেণু ঠোঁট কামড়াল। এতদূর সে এল শুধু কি এই মিথ্যা কথাটুকু বলবার জন্য? তাহলে কেন এল সে? এই রোদ মাথায়, এত তড়িঘড়ি করে? কেউ তো তাকে মাথার দিব্যি দেয়নি আসার জন্য। এসেছে যখন তখন না বসাটা অশোভনীয়। রেণু শামুকের পায়ে এগিয়ে গেল দাওয়ায়। পাশে গিয়ে বসল হৈমবুড়ির।

—দিদিমা তোমার চোখ এখন কেমন আছে?

—আমি এখন চোখ দিয়ে দেখি না, সারা শরীর দিয়ে দেখি। হৈমবুড়ি নড়েচড়ে বসল, আয়, কাছে আয় তো। তোকে আমি কতদিন দেখিনি। তার খড়খড়ে হাত দুটো স্পর্শ করল রেণুর কাচ পিচ্ছিল দুই গাল, হাত দুটো খেলা করল যত্নে, স্নেহে। চুপ করে থাকল রেণু। বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে উঠছিল

মুখমণ্ডল। আবেগ স্পর্শে কেঁপে উঠছিল নাকের পাটা, ঠোঁট। ঝড়ো হাওয়ায় এলোমেলো হল শরীর। কিছু বলার আগে হৈমবুড়ি বলল, তোর মাকে আমি দেখিনি। তবে তার রূপের প্রশংসা আমি অনেকের মুখে শুনেছি। সে খৈ হলে, তুই হলি কদমা। তোর মনটা টুকে ভালবাসা পেলে জলে গুলে যায় চিনির মত। আমি তোকে মিছরির ঢেলা হতে বলব না। তুই যেমন, তেমন হয়েই বেঁচে থাক। তাহলে সুখ পাবি, কাঁদতে হবে না।

চুপ করে থাকল রেণু। হৈমবুড়ি বলল, তোকে দেখার অনেক দিনের সখ ছিল। ভগবান আমার সেই ইচ্ছেটাও মিটিয়ে দিল। দাঁড়া মা, আমি তোর জন্য কিছু নিয়ে আসি। তুই তো আমাদের ঘরে আসিস না। এসেছিস যখন তখন আজ দুটো ভাত খেয়ে যা। কুঁচো চিংড়ি আর ওল দিয়ে তেঁতুলের টক রেঁধেছি। মেনির মা তো ঘরে নেই। সে গিয়েছে মাইতি দুয়ারে ছেলে ধরতে।

—মেনি কোথায়?

—সে গিয়েছে চান করতে।

—পবনদা? রেণুর কথা আটকে গেল গলায়। ঢোঁক গিলে আশা করল প্রার্থিত জবাব।

হৈমবুড়ি মাথা চুলকে দূরের দিকে তাকাল। তার ঘোলাটে চোখ দুটো স্বপ্নহীন। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, পবনাটার মাথার কোনো ঠিক নেই। সে-ও তার বাপের মত এখন ছন্নছাড়া। কোথায় যায় সে কি বলে যায়? সে তো নিজেই নিজের রাজা।

—তাহলে পবনদার সঙ্গে দেখা হবে না? দু-চোখে শূন্যতা নিয়ে রেণু তাকাল, আমি অনেক আশা করে এসেছিলাম দেখা করতে। অনেকদিন সে আমার কোনো খোঁজখবর নেয়নি। কেন নেয়নি তাই শুধোতে এসেছিলাম। আগে তো হাটখোলায় দেখা হত, এখন তা-ও হয় না। জানি না সে আমার উপর রাগ করেছে কি না। তবে আমি তার উপর রাগ করে নেই। আমার মনে কোনো রাগ জ্বালা নেই। তাই ছুটে এলাম—

এসে ভাল করেছিস। সে নেই তো কী হল, আমরা তো আছি।

হৈমবুড়ি সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল, আমরা কি তোর কেউ নই? এসে থেকে পালাই পালাই করছিস—এটা ভাল নয়। মেয়েমানুষকে স্থিতু হতে হয়, সরপড়া দুধের মত জুড়োতে হয়। নাহলে তার গতি হয় না।

মাথার উপর বেলা বাড়ছিল। বাঁশঝাড়ের ছায়া পড়েছে পুকুরের জলে। দুটো হাঁস সাঁতার কাটছিল জলে। চাওড় বাঁধা কলমীলতার মধ্যে জল ঘুঘরো পোকা খেলা করছিল আপন মনে। দুপুর হলেও এসময়টা বড় সুখের সময়। আকাশ সোডায় কাচা সাদা কাপড়ের মত। হাওয়া চামর বুলিয়ে চলে যায়। রেণু পুরনো খড়ের চালটার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল, ওর মাছ ব্যবসা কি ভাল চলছে না দিদিমা?

—কেন বলতো? পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল হৈমবুড়ি, পবনার কি ব্যবসার দিকে মন আছে? ওর মন যে কোথায় থাকে তা আমরা কেউ জানি না। মেনির মা বলছিল পবন নাকি কলকাতায় চলে যাবে। শুধু আমার শরীরটা ভাল নেই বলে যেতে পারছে না। আমি একটু সেরে উঠলে ও চলে যাবেই। ওকে তখন আটকে রাখা মুশকিল হবে। ওর গোঁ তো ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের গোঁ। মাথায় যা একবার ঢুকবে তা সে করবেই।

রেণু নীরবে ভাবল কিছুক্ষণ, ও কেন কলকাতায় যাবে তার কারণ কি কিছু বলেছে?

—না-না, সে সব আমার কাছে কিছু বলেনি। তবে তোমার মাকে সৎকার করে আসার পর থেকেই ও বড় গম্ভীর। বলতে গেলে কারোর সাথে কথা বলে না। একা থাকতে ভালবাসে। মেনির সাথে আগে অনেক হাসি-ঠাট্টা করত, এখন মেনিকেও পাত্তা দেয় না।

রেণুর বুকের ভেতরটা পুড়ে যেতে লাগল এই কথা শুনে, সে আত্মমগ্ন হয়ে কী যেন ভাববার চেষ্টা করছিল, তার মনে শুরু হয়েছে তোলপাড়। সে কিছুতেই বুঝে পেল না পবন কেন কলকাতায় চলে যাবে? গ্রামের আবহাওয়ায় যে মানুষ হয়েছে হঠাৎ তার কেন শহরের উপর ঝোঁক উঠল? তাহলে কি রেণুর উপর অভিমান করে এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছে পবন? কেন নিচ্ছে? এভাবে নিজেকে শেষ করার কোনো কি অর্থ আছে?

রেণু বেলা দেখল আড়চোখে। বর্ষার বেলা মরা মরা। রোদের তেজ নেই তেমন। গাছের পাতায় রোদের নরম স্পর্শ মিশে আছে শুধু। সেই স্পর্শটুকুও রেণুকে আরাম দিল না মোটেও, রেণুর ঠোঁট কেঁপে উঠল ইচ্ছার বিরুদ্ধে, দিদিমা, ও এলে একবার আমার সাথে দেখা করতে বলো। বলো, আমিও ভাল নেই। ক'দিন থেকে কী যে হয়েছে জানি না, শুধু বাবার কথা মনে পড়ছে। তখন খুব ভয় লাগে।

রেণু শাড়ি গুছিয়ে ফিরে যেতে চাইল দোকান ঘরে, তখনই সুভদ্রা এল ব্যস্ত পায়ে। রেণুকে দেখে তার বিস্ময় আর ধরে না। আঁচলে মুখ মুছে নিয়ে সে বলল, আমি এলাম আর তুই চলে যাবি— তা তো হয় না। চল, ঘরে চল। হাত ধরল সুভদ্রা, আন্তরিক ভঙ্গিতে ডাকল, তোর সাথে কথা আছে। ঝগড়া আছে।

—ঝগড়া! আমি আবার কী করলাম? চোখ বড় বড় করে তাকাল রেণু, ভ্রু বেঁকে গেল চিন্তায়, আমার তো মনে পড়ছে না আমি কোন দোষ করেছি।

— সে বিচার পরে হবে। এখন চল—

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেঁটে এল রেণু। চওড়া উঠোনটা কঞ্চির বেড়ায় ঘেরা। উঠোনের একপাশে ছোট মতন একটা বাগান। লঙ্কা গাছ থেকে শুরু করে দোপাটি ফুলের গাছও নজরে পড়ে রেণুর। বাগানের মাঝখানে বাঁশের খুঁটিতে কাকতাড়ুয়া, চুনের ফোঁটাগুলো জ্বলজ্বল করছে আলোয়।

রেণুর হাতটা তখনও ছাড়েনি সুভদ্রা, গলা ভরা অভিমান নিয়ে সে শুধাল, কেন এলি না আমার ঘরে? আমরা কি তোর এত পর? তোর মা তো কোনদিন আমার দুয়ারে আসল না। সে আসেনি বলেই কি তুই-ও আসবি না।

রেণুর মুখে কোন কথা নেই, দাঁত দিয়ে অন্যমনস্কভাবে নখ খুঁটছিল সে, সুভদ্রার অতর্কিত প্রশ্নে ডাগর চোখ মেলে তাকাল, আসতে তো আমার মন করে কিন্তু সময় পাই না।

—তোর কী এমন কাজ যার জন্য সময় পাস না? সুভদ্রার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, বল, মন করে না সেইজন্য আসি না। আমি তো ভেবেছিলাম—এবার তুই আমার ঘরে আসবি। আমি যা ভাবলাম তা হল না। পবন বলল, তোর আসার মন নেই। সত্যি কথা?

—সে যখন বলেছে এখন আমি আর কী বলব। তবে আসলে তো তোমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হোত। আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছি। দাদুর ঘরে আমি খেটে খাই। এখানে এলে সেটা কি সম্ভব হোত। তুমি আমাকে খাটতেই দিতে না। মেনিকে তো দেখছি। ও দিন দিন মুটিয়ে যাচ্ছে কাজ না করে। পাতলা হাসিতে ঠোঁট ভরে উঠল রেণুর, যুক্তি দেখিয়ে সে বলল আমি গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও যাইনি। আমি গ্রামের মেয়ে, গ্রামেই আছি। তোমাদের মাঝখানে আছি। কিছু হলে তোমরা আমার পাশে দাঁড়াবে—এও জানি।

—অনেক কথা শিখেছিস দেখছি। সুভদ্রা মেনে নিতে পারল না রেণুর যুক্তি, তুই আমাকে অনেক দুঃখ দিলি মা, আমি তোর কাছ থেকে এত দুঃখ পাব আশা করিনি। তোদের সাথে আমাদের সম্পর্কটা অন্যখানে, যেখানে আর কেউ ঢুকতেই পারে না।

কথা-বার্তা তর্কের পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল, রেণু বুদ্ধিমতীর মত চুপ করে থাকল। বড়দের সাথে তর্ক করা শোভনীয় নয়, তাদের মনে আঘাত দেওয়াও ঠিক নয়। বসন্ত জানার ঘরে সে যে হঠাৎ চলে

যাবে বসবাসের জন্য এটা পবন কেন তার পরিবারের কেউই মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। তারা ভালবাসে বলেই দুঃখটা আরও বেশি বেজেছে। রেণু অনুতপ্ত হল না, শুধু করুণ চোখে তাকাল। এ পাড়ায় হঠাৎ করে ছুটে আসা—এটাও তার এক ধরনের পাগলামী। এমন আবেগ-উদ্বেলিত হওয়ার কি কোন নিগূঢ় কারণ ছিল? রেণু অন্যমনস্ক হয়ে গেল ভাবতে ভাবতে। সুভদ্রা তার মুখোমুখি বসে বলল, আমি জানতাম তুই আসবি। তবে বড় দেরী করে এলি মা। পবন এখন ভুল করেও তোর নাম মুখে আনে না। তোর কথা উঠলেই সে উঠে যায়। আমি মা, আমাকে তো সব লক্ষ্য করতে হয়। তোর ভাল চাই বলে বলছি—তুই আর ওর সাথে যোগাযোগ করিস না। দূরে আছিস যখন দূরেই থাক। নিষ্ঠুর কথাগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে সুভদ্রার গলায় কোন দুর্বলতা ধরা পড়ল না।

রেণু এমন কথা শুনবে বলে প্রস্তুত ছিল না। কথাগুলো শোনার পর থেকেই তার মুখে কোন কথা নেই। চারপাশ অন্ধকার দেখল সে। নির্জন পথের দিকে তাকিয়ে ছলছলিয়ে উঠল চোখ। মন বলে উঠল, আর নয়, এবার যাওয়া দরকার। কোনো সম্পর্কই একতরফা বাঁচতে পারে না। আগাছারও শেকড় থাকে, সেও এই পৃথিবী থেকে আলো বাতাস জল শুষে নেয়। তার এই জীবন আগাছার মত। যদি আগাছারা বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে সে কেন পারবে না। মানুষেব কথায় যেমন মধু থাকে, তেমন থাকে বিষ। সাপের মত মানুষের বিষের থলিটা লুকানো থাকে। সময় আসলে বিষ ঢেলে দিতে কেউ কসুর করে না। রেণু ফিরে যাচ্ছিল মুখ নীচু করে। আগড় সরিয়ে সে যখন বাইরে এল তখনও ছটফট করছে রোদ। দুটো হাঁস সাঁতার কাটছে পাশপাশি। বাঁধাজলে ঢেউ উঠেছে ফুলে ফেঁপে। ঐ অত রোদে কলমীর ডগাল ধরে রেখেছে মাইক চোঙা ফুল। ভ্রমর উড়ে এসেছে সেই ফুলেব গন্ধে। কিছুটা হেঁটে আসার পরেই কলা বেগো ভেঙে পড়ার শব্দ শুনল রেণু। পিছন ঘুরে দেখল কলাপাতাটা ছিঁড়ে ফালাফালা হয়েছে হাওয়ার ক্ষুরধার ঠোঁটে। ভূমি স্পর্শ করা কলাপাতা মাটিব কাছে নতজানু।

দু-বেড়ার মাঝখান দিয়ে পায়ে চলার পথ। এই পথ পাকা সড়কে গিয়ে উঠেছে। পাকা সড়ক মিশে গিয়েছে সমুদ্রে। রেণুর ভয় করল না একা হেঁটে আসতে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে চিকন সবুজ ঘাস। ঘাসগুলোর কচিমুখে দুঃখ নেই। ওরা চিরসবুজ। সদা হাস্যময়ী। প্রাণশক্তিতে ভরপুর। মাটি থেকে শুষে নিচ্ছে রস। জীবনধারণের উপকরণ। সামান্য ঘাস যদি পারে তাহলে রেণু কেন পারবে না বাঁচতে। যন্ত্রণাহীন জীবন সে চায় না, সে চায় ঘাসের জীবন। মায়াময় বন্ধন।

চব্বিশ

খবরটা শুনেছিল পবন, শোনার পর থেকে মাথাটা তার ঠিক নেই। এক বুক ঘাম আর অস্বস্তি ঘিরে ধরেছিল তাকে। হাটখোলায় দাঁড়িয়ে সে দুলুবাবুর ঘরটার দিকে তাকাল। কষ্ট হল ঐ সরল সাদাসিধে মানুষটার জন্য। এই দুঃসময়ে তার কাছে যাওয়া উচিত। না গেলে অধর্ম হবে তার।

হাটখোলা ছাড়িয়ে এলেই ডানে-বাঁয়ে ছোটবড় দোকান। তেমন ভিড় নেই, সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা। ঐ দোকানগুলোকে ছোট থেকে দেখতে দেখতে পবনের চোখে ওগুলো কোন দাগ কাটে না। গ্রামের সম্পন্ন মানুষ এগরা ছোটে বাজার করতে। এসব দোকানগুলোর উপর তাদের আস্থা কম।

বসন্ত জানা ঘ্যারঘ্যার শব্দে মেসিন চালাচ্ছিল, রাস্তা থেকে সেই শব্দ কানে গেল পবনের। বাইরে বেরনোর মত জামা-কাপড় ঘরে নেই তার। বসন্ত জানা বলেছিলেন, ছিটটা কিনে দিস, আমি একটা জামা সেলাই করে দেব। পুরনো মেসিন আঁকড়ে আছেন বসন্ত জানা। পা চলছে মেসিন চলার ছন্দে। কালো ফ্রেমের চশমা ঝুঁকে পড়েছে নাকের উপর। চশমা ছাড়া এখন আর এক লাইনও পড়তে পারেন

না বসন্ত জানা। রেণু দুপুরে এসে ভাত দিয়ে যায় রোজ। দোকান ঝাঁট দেয়। গল্প গুজব করে। সে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে এসব। তার আর এখন কোন কিছুতেই কষ্ট নেই। বসন্ত বুড়াও খুশি রেণুর ব্যবহারে। দোকানে গেলে প্রায়ই রেণুর প্রশংসা শুনতে পায় সে।

আজ এখনও রেণু আসেনি ভাত দিতে। দুপুরের বাসটা খবরের কাগজ নামিয়ে চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। বসন্ত জানা খবরের হেডিংগুলো পড়ে নিয়ে মন দিয়েছেন কাজে। সময় চলে যায় হাওয়ার বেগে। ঐ দুরন্ত সময়কে ধরে রাখা দায়।

সকাল থেকে কাজে মন বসেনি পবনের। কাল রাতের ঘটনা, আজ হাটখোলায় সবাই আলোচনা করল বিকৃতভাবে। মিষ্টি দোকানী চাপা স্বরে বলল, হবে না কেন? পিঁপড়ের পাখা গজায় মরিবার তরে। দলুবাবু দিন-রাত গ্রামসেবা নিয়ে আছে। তার সময় কোথায় বউকে সেবা করার। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। বাঁধা গোরু দড়া ছিঁড়ে ঘাস খেতে গিয়েছে অন্যের বাগানে। সেখানে যদি শিং ভাঙে তাহলে কার কী করার আছে।

রেডিও দোকানের ছোকরাটা কম কথা বলে। তার কথা যাতে কেউ শুনতে না পায় সেইজন্য মাইকের সাউণ্ড বাড়িয়ে দিয়ে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। দুলুবাবুর বউয়ের বড় বাড় বেড়েছে। ধরাকে সরা জ্ঞান করে হাঁটত। ছোঁড়াটাও থাকত পাশে। যেন সিনেমার হিরো-হিরোইন। এবার ঠ্যালা সামলাও। এতবড় মোটর সাইকেল থেকে পড়লে কার না হাড়-গোড় ভাঙে।

মিষ্টি দোকানী ঘাড় নাড়ল, আমি শুনেছি সুদেববাবু মদ খেয়েছিল। বৌদির মুখেও নাকি মদের গন্ধ পেয়েছে ডাক্তার। ছিঃ ছিঃ এসব কথা শোনাও পাপ। মেয়েমানুষ যে মদ খায়, বাপের জন্মে শুনিনি।

—শোনো নি তো—শোন। কলিকাল, বুঝলে কী না।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। তবে সুদেববাবুর দোষ আমি দিই না। সে তো ছেলে, মেয়ে ভোলাবেই। তা বলে ঘরের বউ কেন যাবে তার পিছে-পিছে। তার তো স্বামী আছে, সব আছে। সে তো বিধবা নয়....

কথাগুলো সকাল থেকেই উড়ছিল বাতাসে। আলোচনার মাঝে মন্তব্য কবা ঠিক নয়। তাছাড়া পবনের কী সাহস আছে—ওদের মুখে হাত চাপা দেবে। গুজব আগুনের চেয়েও পোড়ায় বেশি। গুজবের ডানা হাওয়ার ডানার চাইতে বিশাল। সেই সকালেই পবন ভেবেছিল, সময় পেলে দুলুবাবুর ঘরে যাবে। দেখে আসবে মুক্তাকে। তাছাড়া অনেকদিন মালার সাথে তার দেখা হ নি। সেই যে এগরা বাজারে দেখা হয়েছিল—তারপর আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

মাঠের মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে দীঘায়। বাসরাস্তার দু'ধারে ধানমাঠ। সবুজ হয়ে আছে চারপাশ। আর ক'দিন পরে থোড় আসবে ধানেব বুকে। দুধধানে ভরে উঠবে মাঠ। মা কাঁকড়া ছানা-পোনা নিয়ে চরে বেড়াবে মাঠে। দুধধান খাওয়া তার উদ্দেশ্য। সুদেববাবু কি সেই চতুর কাঁকড়ার মত। পবন ভাবল। দূর থেকে মালার মুখটা মনে করার চেষ্টা করল সে। মালা নিশ্চয়ই লজ্জায় ঢুকে আছে ঘরে। সে তো আগে থেকেই জানত—এমন কিছু একটা ঘটতে চলেছে। ফলে মনে মনে তৈরী ছিল মালা। পাপীর শাস্তি না হলে অধর্মে ডুবে যাবে গোটা দেশ-দুনিয়া। অতি বাড় বাড়লে তার তো হাড়গোড় ভাঙবে। মালা এখন ঘরে বসে কী করছে? নিশ্চয়ই তার মায়ের শোচনীয় পরিণতির কথা ভাবছে।

ছোট গ্রাম। বেসামাল কিছু হলেই হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়ে কথা। নিমেষে চড়ে যায় গুজবের রঙ। তিল হলে হয় তাল। তাল হলে বলে পাহাড় সমান। কতকগুলো দোকানদারের সতর্ক চোখ এড়িয়ে পবন চলে আসে মালার কাছে।

গেট খুললেই ইট বিছান পথ। দু-ধারে ছোট বড় গাছপালা। ঠাসাঠাসি ফুলগাছের চারা। দোপাটি আর গাঁদা আছে অনেক। গোবর সার খেয়ে ওদের পাতার রঙ কালচে সবুজ। গেল বছরও ফুল ফুটেছিল জব্বর। সরস্বতী পুজোর সময় লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরে গ্যাঁদাফুলের মালা গেঁথেছিল মালা। বড় ইস্কুলে অঞ্জলি দিয়েছিল সে। শীতের সকালে পবন তাকে দেখে চোখ ফেরাতে পারেনি। দিদিমার কাছে গল্প শোনা শ্বেতপরীদের মত মালার মুখ। কপালে ভেলভেটের খয়েরী টিপ। সিল্কের চেয়েও নরম চুল কানের দু-পাশে ছড়ানো। সুকেশী সে। সোনার রিং হারিয়ে গিয়েছিল চুলের অরণ্যে। টানা ভ্রূ ছিলা টান ধনুকের মত বাঁকানো। ফর্সা দীর্ঘাঙ্গী শরীর তার তরলা বাঁশের পাতার চেয়েও নমনীয়। অনেকটা সার্কাসের মেয়েগুলোর মত, মন চাইলে যেদিকে খুশি, যতটা খুশি বেঁকে যেতে পারে তরঙ্গায়িত দেহ। মালার হাতে গ্যাঁদাফুলের মালা। চুড়ির রিনরিন শব্দ পা ফেলার সাথে-সাথে। পবন কী জন্য হাটখোলায় এসেছিল। মালা হাসি মুখ করে বলেছিল, ঘরেও পুজো হচ্ছে। তুমি এসো। প্রসাদ খেয়ে যেও। আমি প্রতি বছর ইস্কুলে অঞ্জলি দিই। এবারও ইস্কুলেই দেব। দুপুরে কলেজে যাব। চাঁদা দিয়েছি। জান তো আজ আমাদের কলেজে ফ্যাংশন আছে। কলকাতা থেকে আর্টিস্ট আসছে। যদি সময় পাও তো চলো। দেখে আসবে। যেতে পারেনি পবন। মালাব সাথে তার এখন কোথাও যাওয়া সাজে না। আগুনের সাথে পতঙ্গ কি পাল্লা দিয়ে পারে। পুড়ে যাবার ভয় সব পোকাবই। পবন জেনে শুনে কেন হাত দেবে আগুনে। গ্রামের উঠতি ছেলেগুলোর আলোচনার বিষয় এখন মালা। তারা বলে, দুলুবাবুর মেয়েটা চেষ্টা করলে সিনেমায় চান্স পেয়ে যাবে। এত রূপ যার, তার কোনদিন প্রেমিকেব অভাব হবে না। তবে সমঝে না চললে বিপদ আছে ওর কপালে।

সেই মালা এখন নিজেই খোলা তরোয়াল। হাসলে দু'গালে টোল পড়ে মাখা ময়দায় আঙুল ঢুকিয়ে দেবার মত। চাহনিতে গর্জে ওঠে বিদ্যুৎ। ওর মুখটা গোলাপী আকাশ। ঠোঁটের উপব চেপে বসা ঠোঁট দুটো পাকা বাতাবী লেবুর কোয়া। রস টুসটুসে গোলাপী ঠোঁট দুটোয রাজ্যের কথার জাল বোনা। একবার কথা শুরু হলে থামার লক্ষণ নেই। বুক উজাড় করে কথা বলে সে। গলার নিচে ঘামের মধ্যে শুয়ে থাকে সোনালী চেন। মালা বলে, নকল নয়, পিওর সোনার। হায়ার সেকেণ্ডারীতে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিলাম। বাবা কিনে দিয়েছে। হাতে মানান সই ঘড়ি। কপালে শাড়ির রঙের সাথে ম্যাচ কবা টিপ। কলেজে গেলে এসব নার্কি পরতে হয়। সবাই পরে, কিন্তু মালার পরাটা অন্য ধরনের। সে বুঝি দক্ষ শিল্পী, নিজেকে সাজায় নিজের মনের মত করে। এই নিয়ে মা-মেয়েতে সংঘাত। মুক্তা বলেন, তোর সাজের বাহার দেখে বাঁচি না। কলেজে যাচ্ছিস না শুটিংয়ে যাচ্ছিস?

—তুমি যখন সাজো?

—আমাকে তোর সব সময় হিংসা।

—আমি কাউকে হিংসা করি না।

—হিংসা করিস না?

—না। মালার স্পষ্ট জবাব।

মুক্তা হারবেন না, তোব সুদেবমামা আসলে তোর মুখটা কেন ফুলে যায় শুনি? ওকে তুই সহ্য করতে পারিস না। তোর স্বভাবও তোর বাবার মত।

—বাবার মেয়ে আমি। আমার স্বভাব তো বাবার মত হবেই।

—তুই বুঝি আমার মেয়ে নোস?

—তোমার মেয়ে বলেই তো আমার ঘেন্না লাগে পথ চলতে। সবাই জানে তুমি কেমন।

—কে কী জানে; বল, তোকে বলতেই হবে।

—আমি হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙতে ভালবাসি না। তুমি নিজে একটু সতর্ক হও।

—মেয়ে হয়ে তুই মাকে সতর্ক করবি?

—দরকার হলে করতে হয় বৈকি।

—তুই এত উচ্ছন্নে গিয়েছিস, তোর আর কিছু হবে না।

—যার হবার শ্মশানে গিয়েও হবে। তুমি বললেও হবে, না বললেও হবে।

মালা তার মায়ের কাছে হারবে না। সুদেববাবু তার চোখের বালি। চোখ ধুয়ে ফেলবে সে। আর কোনদিন বালিয়াড়িতে যাবে না। তবে বালিয়াড়ি যদি ঝড়ো হাওয়ার মতো তাদের ঘরে ঢুকে আসে তাহলে কী করবে মালা। গাই-বাছুরে মিল থাকলে বনে গিয়ে দুধ দেয়। বাছুর দুধ খায়। সুদেববাবুর দোষ মালা এখন আর বড় করে দেখে না। মুক্তা তো তার কাছে মলাটহীন বই। খোলা পুকুরের সহজলভ্য জল। তৃষ্ণায় সুদেববাবু পান করেন। তবে দুলুবাবু থাকলে তিনি নদীর দিকে তাকান না। বড় চালাক মানুষ তিনি। সুচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরবার ধান্দা। ধান্দাবাজ লোকের শাস্তি উপরওলার হাতে তোলা থাকে। সেদিন দুপুরে মালা শুনেছিল সুদেববাবুর গলা, তোমাকে সিনেমায় যেতেই হবে। হেভি বই, যা আছে না।

—কী আছে? মুক্তার ঠোঁট বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল হাসি, এত দেখেও সখ মিটল না। পর্দায় কি মুক্তা আছে?

হাসিতে ঘর ফেটে যাবার উপক্রম। পড়া থামিয়ে মালা আড়াল থেকে দেখেছিল, মুক্তাকে লতার মত জড়িয়ে ধরেছে সুদেববাবুর হাত। ঠোঁটে ঠোঁট ঘষছেন তিনি। প্রতিটি ছোবলে শিহরিত হচ্ছে মুক্তা। আধো গলায় কাতর আব্দার, এ্যায় ছেড়ে দাও। পাশের ঘরে মালা আছে। ও কিন্তু ডাউট করে।

—করল তো বয়ে গেল।

—না, না। দুপুরবেলায় আর নয়। কেউ এসে গেলে—

—কে আসবে?

—আমি তার কী জানি, ছাড় তো।

—ছাড়ব না, আজ তোমাকে আদরে আদরে ভরিয়ে দেব।

—আমার কি আদর করার লোক নেই?

—যে আছে, সে তো বুড়া। বুড়ো ষাঁড় দিয়ে চাষ হয়?

—তুমি বুঝি জোয়ান?

—জোয়ান নয় তো কি। ইচ্ছে করলে বুকের চাপে তোমার বুক আমি প্লেন করে দিতে পারি।

—এ্যাই, অসভ্য কোথাকার। ছাড়ো, ছাড়ো বলছি—

এরকম দৃশ্য তো মালা প্রায়ই দেখে। চোখ ফেটে জল আসে ওর। ঘৃণায় বুজে আসে দৃষ্টি। কখনও মনে হয় শেষ করে দিতে ওদের। একটা চাকু সে কাছে রাখে সবসময়। কাকে মারবে সে? মাকে না সুদেববাবুকে? দু-জনের কেউ কম নয়। একজন পচা পাঁক হলে অন্যজন কৃমিকীট। ওদের দিকে তাকাতেও ঘেন্না করে মালার। কখনও বা তার মনে হয়—সে নিজেই চলে যাবে। থাকবে না এই পাপের সংসারে। মেয়ে হয়ে দিনের পর দিন এসব চোখে দেখে কি স্থির থাকা যায়? বুকের ভেতরে শুরু হয় তছনছ। বুকের ঢালু জমি বেয়ে নামে ঘামের ধারা। নাভির চারপাশে জাগে অদ্ভুত রোমাঞ্চ, শিহরণ। কানের লতি, নাকের পাটা লাল হয়ে ওঠে। মৌরালা মাছের লেজ কাঁপান জলের মত নড়ে। উরুর কাছে টান হয়ে থাকে মসৃণ চামড়া। চোখের মায়াবী পুকুরে অজস্র ছোট ছোট যৌনতার ঢেউ। বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে গরম নিঃশ্বাস। চুলের গোড়ায় জমে বিন্দু বিন্দু ঘাম। নাকছাবিটা ভিজে যায় সেই ঘামে। পেছল হয়ে ওঠে পুরো দেহ। শরীর তখন থোড় আসা ধানের মত। লাল কাঁকড়া চরে বেড়াক বুকের জলাশয়ে। এমন দৃশ্য দেখতে-দেখতে সে মরে যাবে। ক্ষিদে বাড়লে শরীর তো

শরীর খায়। সে তখন ধর্ম জানে না, বেড়া বন্ধন সমাজ জানে না। সে জানে নিজেকে, নিজের তৃপ্ত যৌবনকে। যৌবন পল্লবিত শাখার মত ছড়িয়ে দেয় কামনার ডালপালা। ফুল ফুটে ওঠে। সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। রক্ত নদীর ধমনীতে বন্যা আসে আবেগের। মালা ভেসে যায় ঢেউয়ের মাথায়। মালা হারিয়ে যায় ঢেউয়ে-ঢেউয়ে। মালা খুঁজে পায় নিজেকে সমুদ্রের ধর্মে।

পবনের ডাক শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মালা। ভেজা চুলের ডগায় শিশির জমা জল। ভেজা মুখ শুকিয়ে খসখসে। চোখের নিচে হরিণী কাজল নেই এখন। স্পষ্ট ভেসে উঠছে শুকিয়ে যাওয়া ব্রণর দাগ। ওগুলো কালো কালো ফুটকি তিলের মত। স্নান করে এসেছে মলা—পবন বুঝতে পারে স্পষ্ট। ভালো করে শাড়িটা পরেনি সে। আলতা আঁচল হার মেনেছে ঢেউখেলানো বুকের কাছে। খোলা চুল কাঁধ ছাপিয়ে ছুঁয়ে দিয়েছে বুকের সীমানা। এই শরীরে বাইরে আসতে মালার কোনো সংকোচ নেই। ঢিলেঢালা সাজ-পোষাকে অত্যন্ত ঘরোয়া লাগে তাকে। শূন্য কপালে ভাঁজ পড়েনি তখনও। শুধু সাবানের মিষ্টি গন্ধটা বাতাস ভরিয়ে তোলে। মালা টুলটা এগিয়ে দেয় পবনের দিকে, অস্ফুটে বলে, তুমি বসো, আমি একটু আসছি। —বলেই ঘরে ঢুকে যায় সে। ভেজা পায়ের জলছবি আঁকা হয়ে থাকে মেঝেয়। পবন তাকিয়ে থাকে সেইদিকে। কিছুক্ষণ পরেই চুল বেঁধে, গলায়-মুখে পাউডাবেব হাল্‌কা ছোঁয়া লাগিয়ে ফিরে আসে মালা। এবার তার হাসিমুখ দেখবার মতো। যেন ফুল ফুটেছে এইমাত্র। ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলছে শরীর। ভুরভুর করে শরীর বেয়ে ধেয়ে আসছে সুগন্ধ। রীতিমত অস্বস্তির চোখে পবন তাকাল, লোহায় লোহা কাটার মত অবস্থা। মালা-ই সহজ করে দিল সব। গোলাপী ঠোঁটে মিশিয়ে দিল হাসির রঙ, তুমি আসবে, আমি জানতাম। তবে মা তো ঘরে নেই। সে এখন দারুয়া হাসপাতালে পড়ে আছে। তার হাত ভেঙেছে। বাবা সকালে এসে আবার দশটার বাস ধরে চলে গেল। বাবা খুব ভেঙে পড়েছে।

—সুদেববাবু কেমন আছে?

—তারও সেই একই অবস্থা। কঠিন কথা শোনাল মালার ঠোঁট, পাপেব শাস্তি তো পেতেই হবে। পা ভেঙেছে তার। সম্ভবত দারুয়ায় হবে না। কলকাতায় যেতে হবে।

—এসব কী করে হল?

—কী করে হল তা না শোনাই ভাল। মালা চুপ করে গেল হঠাৎ। ঠোঁট থেকে মুছে গেল হাসি। দু-চোখে বিষণ্ণ ভাসমান মেঘ। নিয়ন্ত্রণহীন ঠোঁটদুটো তার কেঁপে উঠল বারবার। শুধু ঠোঁট নয়, কেঁপে উঠল চোখের তারা। ঝরে পড়ল শিউলি ফুল অশ্রু; গাল বেয়ে, পথ তৈরী কবে ভাসমান হল চিবুকের খাড়িপথে।

মালা কাঁদছিল। তার কান্না পাড় ভেঙে পড়া নদীর চেয়েও হৃদয়বিদারক। কী বলে সান্ত্বনা দেবে পবন। অভিজ্ঞতার নদীতে ডুব দিয়েও সে সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পায় না। মন জুড়ে থাকে বিষাদ বাষ্প। মালা তার চিকন হাতের ছোঁয়ায় মুছে নিল চোখের জল। চেষ্টা করল নিজেকে স্বাভাবিক করার। চোখ রগড়ে লাল হয়ে গেছে সাদা চোখের জমি। চোখের ভেতরে বুঝি লুকিয়ে থাকে রক্তজবার গোপন চাষ। চোখ দিয়ে সে বোঝাতে চাইল অনেক না বলা কথা।

পবন অনেকক্ষণ পরে ঢোক গিলল। ঘরে সে আর মালা ছাড়া কেউ নেই। পুরো ঘর জুড়ে আছে মালার শরীরের প্রসাধনের সুগন্ধ।

—এত বড় ঘরে তোমার ভয় করে না? শুধোল পবন।

মালার ঠোঁটের কোণে নিমেষে খেলে গেল সূক্ষ্ম হাসির রেখা, ভয় করলে চলবে? মেয়ে হয়ে জন্মেছি যখন তখন ভয় পুষে রাখলে দুধ-কলা দিয়ে পোষা সাপের মত সে আমাকে ছোবল মারবে। বাবা কি বলে জান? মরার আগে যে মানুষ মরে যায়, সে তো মানুষ নয়। মরতে যখন হবে তখন ভয়

কিসের জন্য? বাবাই আমার সাহস। বাবাই আমার পথ। তার পথ ধরে চললে আমি কাউকে ভয় পাব না। কথা থামিয়ে উঠে দাঁড়াল হঠাৎ, আমি যাই চা করে আনি। তুমি বসো। চলে যেও না কিন্তু—

মালার দৃষ্টিতে কাতরতা। দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে যাবার শপথ তার বুকে। ঘরে জ্বলছে অশান্তির দাবানল। দুলুবাবু কি জানেন না সুদেববাবুর ঘটনা। উনি অত বুদ্ধিমান, উনি কি চোখ বুঁজে আছেন? হতেই পারে না। পবন নিজেই নিজের প্রতিপক্ষ।

চা নিয়ে এল মালা। সরে সরে যাওয়া পরিচ্ছন্ন মুখ। হাসি ধরা আছে পুরো মুখমণ্ডলে, কী ভাবছ?

—কিছু না। গোপন করতে চাইল পবন, ঘর ফিরতে হবে। দিদিমার শরীর ভাল নেই। মেনিও জ্বরে পড়েছে। কানাই ডাক্তারের ওষুধ এনে দিয়েছি। কাজ হচ্ছে না।

—এগরায় গিয়ে দেখিয়ে আন। মেনি তো ঘরের বাইরে বেরয় না। ওকে অনেকদিন দেখিনি। ওকে আসতে বলো তো।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পবন আবার ডুবে গেল অন্যমনস্কতায়। মালা তাকে ফেরাল বাস্তবে। চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল সে, তারপর ফিরে গেল পুরনো প্রসঙ্গে, মায়ের জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। এমন যে হবে আমি তা আগে থেকেই জানতাম। সুদেববাবুকে ঘরে ঢুকিয়ে বাবা ভাল কাজ করে নি।

--তোমার বাবা জানে এসব?

—নিশ্চয়ই জানে। সে তো অন্ধ নয়। আমি মেয়ে হয়ে যেটুকু বলার বলেছি। সে নিশ্চয়ই বুঝেছে। যদি না বুঝে থাকে তাহলে সেটা তার বোকামী। মালার সপ্রতিভ চোখে উথলে উঠল ব্যথার বুদবুদ, জান, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় বাবার মত সরল, প্রাণখোলা মানুষ এ যুগে অচল। সে যদি চায় তাহলে একদিনেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু বাবা কারোর মুখের উপর কড়া কথা বলতে পারে না। এটা বাবার দোষ। আগুনে গা পুড়ে গেলেও বাবা আগুনকে থামিয়ে দেবে না। এই না দেওয়ার জন্য আগুন বেড়েছে লকলকিয়ে। পুড়িয়ে দিয়েছে সংসার। তবে বাবা যা পারে নি, আমি তা করব। আমি ঐ শয়তান লোকটাকে সহজে ছাড়ব না। মালার গলা ঠেলে উঠে এল ঝাঁঝ, আগুন। মুখের কমনীয়তা হারিয়ে গেল নিমেষে। সে যেন ভোরে ফোটা পদ্ম নয়, খরায় ঝলসে যাওয়া কাঠবাদাম ফুল, গলায় ধ্বনিত হল পাথর রূঢ়তা, সুদেববাবু আমার হাতেই মরবে। জানো, সেদিন মা ছিল না ঘরে। সে আমার দিকে হাত বাড়িয়েছে। আমি তাকে নিষেধ করিনি। কেন জান? পাপের শেষ দেখতে চাই আমি। পাপের কলসী না ভরলে তাকে ভাঙব না। আমি শুধু সেই দিনেব অপেক্ষায় আছি...

—তুমি কী করতে চাও? ভয়ের অণু-কণিকায় পাংশু দেখাল পবনের মুখ। ঘাম ফুটে ওঠা চিবুকে আলতো হাত রেখে সে শুধোল, তাকে আমি বিষ খাইয়ে মারব। তার সাথে শক্তিতে আমি পারব না। তাই বুদ্ধির আশ্রয় নিতে হবে আমাকে। বাবা যা পারে নি, আমি তাই করব। পাপের গাছ দুটোকে সমূলে উৎখাত করব আমি। ওরা কেউই আমার ক্ষমা পাবে না। ওদের জন্য আমার জীবন এখন পাঁকে তলিয়ে যাওয়া নৌকা। আমি জানি—আমি আর কোনদিন তা টেনে তুলতে পারব না। আমার আর পড়াশোনা হবে না। পড়তে বসলে আমার চোখের সামনে নরকদৃশ্য ভেসে ওঠে। আমি পড়ায় মন বসাতে পারি না। আমার তখন মনে হয়, আমি নিজেই বিষ খেয়ে মরে যাই। কিন্তু আমি মরব না। প্রতিশোধ নেবার জন্য বেঁচে থাকব।

মালার শরীর জুড়ে বুনো জেদের শেকড় ছড়ানো। সেই জেদ এতই কঠিন, এতই রূঢ় যা কথার শক্তিতে উৎপাটিত হবে না। বাঁধ ভাঙা বন্যার জল যেমন প্রতিরোধ করা যায় না তেমনি অদমনীয় মালার জেদ। সে নিজে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হবে—তবু অন্যায়ের বেদীমূলে সঁপে দেবে না নিজেকে। মেঘ যেমন প্রতিক্ষায় থাকে বরষার, তেমনি বিষ আর ঘৃণা উগরে দেবার জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকে মালা।

জন্মাষ্টমীর মেলায় পবনের সাথে আবার দেখা হল মালার। মুক্তা হাতে প্লাস্টার নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। তাঁর চেহারা এখন পাতা ঝরে যাওয়া শীতের বৃক্ষ। চোখের নিচে কালি, রূপটানে লেগেছে ভাটার হাওয়া। কতদিন হল মাথায় চিরুনি দেননি তিনি। পাট ফেঁসোর মত হয়ে আছে মাথার চুলগুলো। সিঁথির বাসি সিঁদুর, কপালের গভীর ভাঁজ বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁর। প্লাস্টার করা হাত নিয়ে তাঁর সমস্যার শেষ নেই। সুদেববাবু কাঁথির ঘরে শয্যাশায়ী। মুক্তা তার কথা ভাবেন সবসময়। অবৈধ প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া মন শুশুকের মত শ্বাস নিতে চায় যখন-তখন। মন করে ছুটে চলে যেতে কাঁথিতে। কিন্তু পারেন না। খোঁয়াড় মনে হয় ঘরখানা। মালা পারতপক্ষে তার সাথে কথা বলে না। একসাথে খেতে হবে বলে দেরী করে সে স্নান করে। পড়ার অজুহাতে আলাদা ঘরে সে এখন ঘুমায়। সকালে আগে চা করে দিত মুক্তাকে, এখন সে নিজেই চা খায় না, চা করে না। মুক্তাও বুকে কিল মেরে বসে আছে অভিমানী শরীর নিয়ে। তিনিও যেচে কথা বলতে নারাজ। নিজের মেয়ের কাছে তিনি ছোট হবেন না কোন দিনও। তার আগে মৃত্যু এসে তাকে নিয়ে গেলেও কোন ক্ষতি নেই।

গ্রামের মেলা। গ্রাম্যতা ছড়ান চারপাশে। এসেছে পাঁপড়ভাজা, কুলফি বরফ, কাঠের নাগরদোলা। মরণকুয়া, সার্কাসও আছে পাশপাশি। চুড়ি আর মনিহারী দোকানের ছড়াছড়ি। পুরো ধানমাঠ অব্দি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে মেলা। মাইক আর ভেঁপুর শব্দে বাতাস মাতোয়ারা। বেলুন, গ্যাসবেলুন সবই এসেছে শহর থেকে। খাজাওলা ডাক দিয়ে ফেরি করছে তিলের খাজা। গিজগিজ করছে ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে মালা পবনকে ডাকল দূর থেকে। হাওয়ায় ভেসে গেল তার স্বর। পবন জন্মাষ্টমীর পুতুলগুলো দেখছিল মন দিয়ে। সে একাই এসেছে মেলায়। মেনি আর সুভদ্রাও এসেছে। ওরা আলাদা আলাদা ঘুরছে। পবন ওদের দেখার টাকা দিয়েছে। মেয়েলী ডাকটা কানে যেতেই পবন পিছন ঘুরে তাকাল। মালার সুডৌল হাতের চিকন আঙুল ইশারা করল তাকে। দূর থেকেই পবন দেখল মালার চওড়া কপালের খয়েরী রঙের টিপটা। সিল্কের শাড়ি হাওয়ায় উড়ছিল পতপতিয়ে, ফুল-লতা-পাতা আঁকা শাড়িতে মালা নিজেই একটা ফুলের বাগান। পবনের মনে হল, মালা ফুল নয়, প্রজাপতি। হাওয়ায় উড়ে-উড়ে ফুলের গন্ধে এসেছে। মালা ডাকলে সে কী না গিয়ে থাকতে পারে? আজ তাব চওড়া বুকের ছাতি ঢেকেছে পাতলা ফিনফিনে পাঞ্জাবী। বসন্ত জানা বানিয়ে দিয়েছিল যত্ন করে। পায়জামাটা ঢেকে দিয়েছে রবারের চপ্পল। এখনও নতুন কাপড়ের মাড়ের গন্ধ যায়নি। কোম্পানীর নীল ছাপ আছে দাপনার কাছে। পায়জামাটা সামান্য ঝুলে বড়। বসন্ত জানা অভয় দিয়ে বলেছেন, দু'বার ধুলেই ঝুল খাটো হয়ে একেবারে মাপ মত হয়ে যাবে।

নতুন জামাকাপড় পরলেও পবন নিজের প্রতি যত্নশীল হয় না কখনও। তার একমাথা চুল স্প্রিংয়ের চেয়েও কোঁকড়ান। মাথায় নারকেল তেল নয়, বরাবরই ঘানির সরষের তেল মাখে সে। গায়ে সাবান মাখলেও মাথায় সে কোনদিন সাবান মাখে না। পুকুরপাড়ের কাঁকড়ামাটি নামী সাবানের কান কেটে দেবে। মাথায় শ্যাম্পুর মত মাখলেই চুল একেবারে ঝরঝরে রেশম কালো। মেলায় আসবে বলে পবন মাথা ঘষেছে কাঁকড়ার তোলা এঁটেল মাটিতে। প্রায় ঘণ্টাখানিক সাঁতার কেটেছে পুকুরের জল দাপিয়ে। মেনি তার বাড়াবাড়ি দেখে সাবধান করে বলেছে—নতুন জলে আর থাকিস নে দাদা, জ্বর আসবে। তোর গায়ে খড়ি ফুটেছে কাদা জলের। এবার উঠে আয়—

পবনকে এমন ভালো পোষাকে দেখেনি মালা। ওর অগোছাল চেহারায় ভদ্রতার প্রলেপ পড়েছে হঠাৎ। তবু সে তার গ্রাম্যতা ঢাকতে পারেনি। চোখে-মুখে নতুন কাপড় পরার লজ্জাজনিত জড়তা।

মালা হাসল, তোমার মেলার সাজটা ভালই হয়েছে। কবে বানালে পায়জামা-পাঞ্জাবী।

পবনের গোঁফের নীচে খেলে গেল হাসির রেখা। মালা গোটা গোটা চোখ মেলে তখনও চেয়ে আছে তার দিকে। পবনের চেহারায় বাড়তি কোন আকর্ষণ নেই, সে একটা কর্মঠ যুবকের প্রতিচ্ছবি

ছাড়া আর কিছু নয়। তার মোটা ঠোঁটের রঙ লাল নয়, মেটে রঙ। দু-কানে দুটো ছিদ্র। খুব ছোটবেলায় ক্ষামি করে দিয়েছিল ব্রজবুড়া। হৈমবুড়ি একমুখ হেসে বলেছিল, ক্ষামি করে দিলে, ওকে আর কেউ ছোঁবে না। সেই কানের ছিদ্রে অনেকদিন নিমের কাঠি ঢুকিয়ে রেখেছিল তার মা। কৃষ্ণযাত্রায় সে একবার কৃষ্ণ সেজেছিল। তখন ঐ কানের ছিদ্রে দুল পরাতে গিয়ে রক্ত বের করে ফেলেছিল ড্রেস কোম্পানীর লোক। সেই থেকে ঐ পথে আর হাঁটেনি পবন। এখন আর নিমকাঠি ঢোকে না, শুধু সুচ ফোটানোর দাগ দুটো জন্মদাগের মত এখনও কানের লতিতে শোভা পায়। এই ছিদ্রদুটো পবনকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে হাটখোলা এবং তার নিজের পাড়ায়। সুভদ্রা তাকে বাইরে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। হৈমবুড়ি বলে, ওর কোনো বিপদ-আপদ হবে না। মা শীতলা বুড়ির দয়া আছে ছেলেটার সঙ্গে। আমি পবনটার জন্য ভাবি না। ও ঠিক পথ করে বেরিয়ে আসবে। বিপদ ওর শরীর ছুঁতে পারবে না।

মালার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পবন ঘামছিল অস্বস্তিতে, মেলার হৈ-হুল্লোড় তার চিত্ত চাঞ্চল্যের কারণ ঘটাচ্ছিল। এত মানুষের ভিড়ে পবন নিজেকে হারিয়ে ফেলার আনন্দে বিভোর হতে পারছিল না। মালা বলল, চলো, আমরা একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াই। এ জায়গাটায় বড় ঠেলাঠেলি। আমার ভিড় ভাল লাগে না, একলা থেকে মনটা আমার একানে হয়ে গিয়েছে।

পবনের ভ্রমরকালো চোখে বিস্ময়, মেলায় এসে একা হয়ে গেলে এর চেয়ে আর দুঃখ কিছু থাকে না।

মালা নিরুত্তাপ গলায় বলল, ঠিকই বলেছ। একা-একা আমারও ঘুরতে ভাল লাগে না। তোমার সাথে দেখা হয়ে ভাল লাগল। চলো, আমরা কোথাও গিয়ে বসি।

পবনের চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল ইতস্ততা। সে তার নিজের ওজন জানে। গ্রামের লোক তাদের কী চোখে দেখে—এটাও সে ভাল মতন অনুভব করে। নিজের ক্ষমতার বাইরে সে যেতে চায় না। যে সীমারেখা বিধাতা তার কপালে এঁকে দিয়েছেন সেই সীমারেখা অতিক্রম করে মালাকে সে সঙ্গ দেবে কী ভাবে? অথচ মালার সঙ্গ তার ভাললাগে। নিজেকে গর্বিত বোধ করে সে। মালা পাশে থাকলে সে কেন যে কোন পুরুষেরই গর্বিত বোধ হবে। পবন ভেতরে ভেতরে গর্ব অনুভব করলেও তার চালচলনে শামুকের আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। দু-পা এগিয়ে গিয়ে দশ পা পিছিয়ে আসে সে। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝখানে দাড়িয়ে মালা শুধোল, সেই যে গেলে, তারপর আর একবারও এলে না। বাবা বারবার করে তোমার কথা বলছিল।

—বাবুকে বলো আমি তার সাথে পরে দেখা করব। ক'দিন থেকে আমারও মন মেজাজ ঠিক নেই। মেনির জন্য পাত্র দেখা চলছে। বোনটাকে এবার বিদায় করতে হবে। তুমি তো জান—বাবা ঘরে থাকে না। সংসারের সব দায়-দায়িত্ব আমার একার ঘাড়ে। কী ভাবে কী করব কিছু বুঝতে পারছি না।

মালা সমব্যথীর কণ্ঠে বলল, মেনির জন্য ভেবো না। তোমার বোন তো দেখতে শুনতে ভালই। যে ছেলে দেখবে ওকে ঠিক পছন্দ হবেই।

—শুধু পছন্দ দিয়ে আজকাল কন্যা উদ্ধার হয় না। টাকা চাই বুঝলে?

—কত টাকার দরকার? মালা শুধোল।

পবন ভাববার জন্য কিছু সময় নিল, তারপর মাথা চুলকে বলল, আমাদের সমাজে দাবীর বহর কিছুটা খাটো। ঘড়ি-সাইকেল-আংটি আর একটা টেপ কিংবা রেডিও দিলেই হয়ে যাবে। এছাড়া ঘর খরচ আর লোক খাওয়ানোর খরচ। সব মিলিয়ে সে তো অনেক টাকার দরকার।

এবার ভাববার পালা মালার, অথচ সে তত মনোযোগ সহকারে না ভেবেই বলল, বাবাকে বলে সব টাকার যোগাড় আমি করে দেব। তোমার উপর বাবার খুব উচ্চ ধারণা। তুমি পড়াশুনা শিখলে না বলে বাবার মনে খুব দুঃখ আছে।

পবন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, পড়াশুনার উপর আমারও ঝোঁক কম ছিল না। কিন্তু অভাবের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়। বাবা চলে গেল কাউকে কিছু না বলে। দাদু একা আর কত টানবে। তার শরীরও চলছিল না। আমি তখন দাদুর পাশে দাঁড়ালাম। এছাড়া কোন উপায়ও ছিল না।

—তুমি যা করেছ তা অনেকেই করতে পারে না।

—আমি কিছুই করিনি, আমি শুধু নিজেকে শেষ করেছি। পবন শূন্য, নিঃসঙ্গ চোখে তাকাল।

মালা বলল, এখনও সময় আছে তোমার পড়াশুনা করার। গ্রামে বয়স্ক শিক্ষার আসর বসে সন্ধ্যায়। তুমি যেখানে যোগ দিতে পারো।

—শিং ভেঙে বাছুরের দলে যাওয়া কি ঠিক হবে? পবনের ঠোঁট বেয়ে গড়িয়ে পড়ল হাসি, যে মাছটা হাত ফসকে পালিয়ে গিয়েছে অথৈ জলে তাকে কি দ্বিতীয়বার ধরা যাবে?

—চেষ্টা থাকলে ঠিক ধরা যাবে। শুধু সেই মাছটা নয়, অন্য মাছও ধরা যাবে। তুমি যা আশা করোনি তা ও ধরা যাবে।

—তার মানে? পবনের বিস্ময়ভরা চোখ, তুমি আমাকে স্বপ্ন দেখতে বলছ জেগে-জেগে, তা কি সম্ভব।

—দু-চোখে স্বপ্ন না থাকলে মানুষ যে মরে যায়—স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখা মানুষের কাজ।

বিকালের আলো টিকটিকির লেজের মত খসে পড়বে আর কিছুক্ষণ পরেই। বাতাসে শীতের পরশ। ধানমাঠে এখন সবুজ গালিচা পাতা, হাওয়ার মাদলে ধানগাছ নৃত্য প্রতিযোগিতায় মত্ত। পবন অবাক করা চোখে তাকিয়েছিল সেই দিকে, মালার কথাগুলো তার মনের জলাশয়ে জলঘুঘরো পোকার মত ঘুরছে। এরা এই অল্প বয়সে বড়দের মত কত সুন্দর কথা বলে। হাজার চেষ্টা করেও পবন তা পারে না। বিকেলের শেষ রোদের স্বর্ণ আভা এসে লেগেছে মালার গোলাপী মুখমণ্ডলে। ওর সাজ-পোযাক এত মার্জিত যা দেখে বিস্মিত বোধ করে পবন। মালা যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা অপ্সরাদের একজন। এই মাটির পৃথিবীতে তার চলাফেরা অত্যন্ত বিস্ময়কর। ভগবান যাকে দেয়, সব দেয়। পবনের রূপপিপাসু চোখ মালার মুখের উপর নিবদ্ধ। তখনই সোরগোল ভেসে এল হাওয়ায়। ক্রমশ বাড়তে থাকল সেই সোরগোল। মালা ভীতু চোখে বলল, চলো, এবার আমরা চলে যাই। আমার মনে হয় মদ খেয়ে কেউ গণ্ডগোল করছে সরবত দোকানের সামনে।

পবন কান খাড়া করে শুনতে চাইল সোরগোলের প্রকৃত কারণ। এত দূর থেকে কিছুই বোধগম্য হল না তার। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে। মালা তাকে অনুসরণ করল।

বটগাছ লাগোয়া যে সরবতের দোকানটা বসেছিল সেখানে থিকথিক করছিল ভিড়। ভিড়ের মাঝখান থেকে হঠাৎ-ই ভেসে এল নারীকণ্ঠের কান্না। সুর করে বুক চাপড়ে প্রলাপ বকছিল কেউ। মেলা কমিটির লোক ঘিরে ধরেছিল অভিশপ্ত জায়গাটা। ওদেরই কেউ ডেকে আনল পুলিশ। ঘটনা রহস্য জমজমাট। মালার উৎসাহ নেই এতে। সে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে বলল, চলো, আমরা এবার ফিরে যাই। তুমি আমাকে ঘর অব্দি এগিয়ে দেবে।

পবন বলল, আর একটু দাঁড়াও। দেখি কী হয়েছে—

সরবত দোকানকে ঘিরে যে ভিড়, সেই ভিড়ের মাঝখানে হাত-পা ছড়িয়ে মুখে গাঁজরা নিয়ে মৃতাবস্থায় পড়েছিল প্রায় তিরিশের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া একজন যুবক। বিষক্রিয়ায় নীল হয়ে গেছে তার শরীর। জিভ বেরিয়ে ঝুলে ছিল ঠোঁটের এক পাশে। নাকের ছিদ্র বেয়ে সরু রক্তের ধারা। জামা-প্যান্ট ভিজে গিয়েছে বমিতে। গলার কাছে জড়িয়ে ছিল অজীর্ণ ভাত-কফ-লালা।

মানুষটার মৃত্যু বিষ সরবত পানে হয়েছে এই নিয়ে জোর আলোচনা ভিড়ের মধ্যে। যে বউটা কাঁদছিল বুক চাপড়ে, আলুথালু বসনে—সে তার স্ত্রী। যে তাকে সরবত খাইয়েছে সে এখন বেপাত্তা।

পুলিশের লাঠি সরবতওলার গায়ে পড়তেই সে গড়গড় করে ফাঁস করে দিল গোপন রহস্য। যে ছেলেটি সরবতওলার সাথে যোগসাজস করে বিষ সরবত খাইয়েছে—তার নাম কাল্টু। কাল্টু বিয়ে করেনি সবিতার জন্য। সবিতা তার প্রেমিকা। স্কুল জীবন থেকে ভাব-ভালবাসা। সবিতার স্বামী মন্মথ কাজ করে সরকারী অফিসে। স্বামী না থাকলে কাল্টু আসে তাদের ঘরে, ফস্টি-নষ্টি করে চলে যায়। এভাবেই চলছিল ওদের অবৈধ মেলামেশা। সবিতাকে নিয়ে সংসার পাতার ইচ্ছায় কাল্টু এই জটিল পথ বেছে নিল। সে পথের কাঁটা সরিয়ে দিয়ে সবিতাকে নিয়ে সুখী জীবন কাটাতে চেয়েছে। বন্ধুত্বের আড়ালে সে লুকিয়ে রেখেছিল তীব্র, জীবনহরণ বিষের গুঁড়ো। একসাথে মেলায় এসে প্রথমে সে সরবতওলাকে হাত করে। তিন গ্লাস সরবতের একটা গ্লাসে মিশিয়ে দিতে হবে বিষ। সেই বিষমিশ্রিত সরবত কায়দা করে তুলে দিতে হবে মন্মথর হাতে। কাজটা সঠিকভাবে করতে পারলে পাঁচশ টাকা বকশিস দেবে কাল্টু। বকশিসের পাঁচশ টাকা সরবতওলার পকেটে। পুলিশ তার মাজায় দড়ি দিয়ে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে মেলার বাইরে। এমন ষড়যন্ত্রের ঘটনা রীতিমতন চাঞ্চল্য জাগিয়ে দেয় পুরো মেলায়। ঘটনার পূর্ণ বিবরণ শুনে মালা ভীতু চোখে তাকাল। মানুষের প্রেম সম্বন্ধীয় সম্পর্ক খুবই জটিল বিষয়। মুক্তা আর সুদেববাবুর গোপন সম্পর্কের কথা মনে পড়ল তার। এই ত্রিভুজ প্রেমের কী পরিণতি সে নিজেও জানে না। তবে মালা চায় সুদেববাবু সরে যাক দুনিয়া থেকে। তাকে সরানোর দায়িত্ব মালা ছাড়া আর কে নেবে। পাপবৃক্ষ সমূলে উপড়ে ফেলাই ভালো। পাপগাছের ছায়ায় যে দাঁড়াবে তার গায়েও হাওয়া লাগবে পাপের। মালা যে ঝুঁকি নিতে চলেছে তার পরিণতির কথা সে ভালভাবেই জানে। গুপ্ত ঘাতকের ভূমিকায় সে যখন অবতীর্ণ হবে বলে দৃঢ় সংকল্প তখন সে আর কোন কিছুকে ভয় পায় না। তার শুধু একটাই চিন্তা সে যেন পুরো কাজটা সঠিকভাবে করতে পারে।

মুহূর্তের মধ্যে মালার হাসি-খুশি মুখের আদলটা বদলে গেল। হাঁপিয়ে উঠে সে পবনকে বলল, আমার আর ভাল লাগছে না, চলো তুমি আমাকে ঘর অব্দি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

—কেন, তোমার আবার কী হলো? পবনের প্রশ্নে বিরক্ত হল মালা, ব্যথাতুর চোখ তুলে সে অসহায় বিধ্বস্ত গলায় বলল, আমি যা ভুলে থাকতে চাই, তা বারবার করে চোখের সামনে চলে আসে। পুরনো ঘাটা থেকে আজ খুব রক্ত বের হচ্ছে। আমি আর পারছি না। দোহাই তোমার, আমাকে একটু পৌঁছে দেবে চলো।

রাত ন'টার সময় যাত্রা শুরু হবার কথা বটতলায়। একটা অপ্রত্যাশিত মৃত্যু আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে মানুষের মনে। তবু মেলা কমিটির চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। তারা বারবার করে মাইকে ঘোষণা করছে আজকের পালার নাম, বস্ত্রহরণ। কার বস্ত্র কে হরণ করবে এই নিয়ে মাইকে কোন ঘোষণা নেই। তবে যাত্রাটা যে ভাল হবে এই বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ। স্থানীয় শিল্পীদের প্রায় মাস দুয়েকের প্রয়াস এই বস্ত্রহরণ। মেলা উপলক্ষে প্রতি বছরই যাত্রার আসর বসে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হবে না।

বসন্ত জানার ক'দিন থেকে সুখ ধরছিল না, তার মন এখন শরৎ-এর কাশের মত খুশিতে ডগমগ। দশ দিনের ছুটি নিয়ে হঠাৎ-ই ঘরে এসেছে জয়ন্ত, তার শরীর বিশেষ ভাল নেই, ক'দিন সে বিশ্রাম নিতে চায় গ্রামে। রেণুর কাজ বেড়েছে সংসারে। বসন্ত জানা তাকে একটু আড়ালে ডেকে বললেন, ছেলেটা আমার ভাল-মন্দ খেতে পায় না। হোটেলে খেয়ে খেয়ে ওর শরীরে আর কিছু নেই। যে কয়দিন ছেলেটা ঘরে থাকে, সে কয়দিন তুই একটু কষ্ট কর মা। দু-চার পদ ভাল করে রেঁধে খাওয়া। তোর হাতের রান্না খেলে ও আবার ঠিক চাঙ্গা হয়ে যাবে।

রেণু খুবই লজ্জিত হয়েছিল বসন্ত জানার কথা শুনে, এটা কি বলার মত কথা নাকি দাদু। আমি তো এ ঘরেরই একজন। আমি থাকতে জয়মামার খাওয়ার কোনো অসুবিধাই হবে না। তুমি নিশ্চিন্তে দোকান সামলাও, আমি ঘর ঠিক সামলে নেব।

জয়ন্ত এসেছে, তার আগমনে রেণুরও মনে আনন্দ আর ধরে না। সকালে প্রায় কিলো দেড়েকের ইলিশ কেটে সে নিয়ে গিয়েছিল পুকুরে ধুতে। মাছ ধুয়ে ফিরে আসার সময় তার সাথে দেখা হয়েছিল কেতকী মাসীর। অনেক দিনের জানা-শোনা, তাই দাঁড়িয়ে পড়েছিল রেণু। কেতকী মাসীর চোখে-মুখে শহুরে হাসি, সে কেমন আশ্চর্যভরা চোখ দিয়ে রেণুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। রেণু লজ্জা আরক্ত মুখ নাড়িয়ে বলেছিল, মাসী গো, কবে এলে?

কেতকী মাসীর বিস্ময় তখনও মেলায়নি দু-চোখ থেকে, ঢোক গিলে বলেছিল, পরশু এসেছি রে। একদম ছুটি দেয় না বাবুরা। সেখানে খুব কাজের চাপ। কাজ করতে করতে আমার শরীরটার বারোটা বেজে গেল। কেতকী মাসীর শরীর-স্বাস্থ্য আদৌ খারাপ নয়। শহর কলকাতায় থেকে থেকে তার শরীরে এসেছে নকল সোনার পালিশ। কথা-বার্তায় সে খুব সেয়ানা। চাল-চলনে পুরোদস্তুর শহুরেপনা। রেণুকে নিবিষ্ট চোখে দেখে কেতকী মাসীর দুঃখ উথলে ওঠে, তোর মা যে অমন বিনা নোটিশে চলে যাবে—আমি ভাবতেই পারছি না। বড় কষ্ট পেয়েছি তার মরার খবর শুনে। বড় ভাল মানুষ ছিল সে। দেখা হলে পান না খাইয়ে ছাড়ত না। আহা, এমন মানুষ দুম করে চলে যাবে ভাবাই যায় না।

রেণু চোখ মুছে নিল ভেজা হাতে, এসব কথা আর বলো না মাসী, আমি ওসব ভুলে থাকতে চাই।

—ভুলে থাকবি বললে কি ভুলে থাকা যায় রে। ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠে কেতকী মাসীর চোখজোড়া, হা-হুতোশ করে বলে, ভাল মানুষ চলে গেলে দুঃখ হয় রে। তুই ছোট, তুই আর কী বুঝবি? —বানান আন্তরিকতায় মন ভিজে গেল রেণুর, সে দেখল কেতকী মাসী শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে তাকে দেখছে জুলজুলিয়ে। একসময় কেতকী মাসী বলেই ফেলল, আহা, কী মিষ্টি তোর মুখখানা, একেবারে চিনি পাতা দইয়ের মত। আমার যদি ছেলে থাকত, তার সাথে তোর বিয়ে দিতাম।

রেণু লজ্জা পেয়ে হাসল, যাই মাসী, সংসারের অনেক কাজ বাকি আছে। তোমার সাথে আবার পরে দেখা হবে।

—মেলায় যাবি নে?

—যাব তো। সেইজন্যই তাড়াহুড়ো করছি সকাল থেকে।

—বুড়োর ঘরে কি, তুই কাজে লেগেছিস?

—না, না। তা কেন হবে। রেণু লজ্জা-সংকোচে জিভ বের করল, দাদু আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। মার ঘাট-কাজ চুকে যাওয়ার পর থেকে আমি এখানেই আছি।

—ভালো করেছিস। তবে পয়সা-কড়ি কিছু দেবে তো? বুড়ো যা কৃপণ আমার তো মনে হয় না কিছু দেবে।

রেণু বিরক্তির চোখে তাকাল, দাদু আমাকে পয়সা দেবে কেন? আমি তো এ ঘরের কাজের মেয়ে নই। আমি এ ঘরের মেয়ে। দাদু আমাকে খাওয়া-পরা সব দেয়। যখন যা দরকার বললেই এনে দেয়। এরপর তুমি বলো—আমার আর চাওয়ার কী থাকতে পারে?

—এ ভাবে কি সারা জীবন কারোর চলে রে? কেতকী মাসী রহস্যভরা চোখে তাকাল, পরের পায়ে সারা জীবন দাঁড়ানো যায় না। দাঁড়াতে গেলে নিজের পায়েই দাঁড়াতে হয়। বুড়ো তোকে পটিয়ে-পাটিয়ে বশ করে রেখেছে। সে তোকে চাকর ছাড়া আর কিছু ভাবে না। যদি ভাবত তাহলে তার একমাত্র ছেলের সাথে তোর বিয়ে দিত।

—ছিঃ ছিঃ, এসব কী কথা বলছ? এসব কানে শোনাও পাপ।

—পাপ নয় রে, যা সত্যি তাই বললাম। কেতকী মাসী গম্ভীর হয়ে গেল, নদীর জল আর ডোবার জল এক হয় না। আমি তোর ভাল চাই বলেই কথাটা বললাম। এমনিতে আমি একটু ঠোঁটকাটা। আমার মধ্যে ঢাকঢাক গুড়গুড় ভাব নেই। যা মুখে আসে আমি তাই বলতে ভালবাসি।

ইলিশ মাছ গরম তেলে ছেড়ে কেতকী মাসীর কথাগুলো ভাবছিল রেণু। ওরা কত সুখী। কলকাতায় বাবুর বাড়িতে থাকে। ভাল-মন্দ খায়, কত কী দেখতে পায়। ওদের শরীর কত তেলতেলা, ওরা পাঁকাল মাছ নয়, একেবারে শিঙ্গি মাছের চেয়েও চকচকে। রেণুর মন খারাপ করে তার এই বন্দী জীবনটার জন্য। মাঝে মধ্যে সে খুব হাঁপিয়ে ওঠে। মনে হয় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়তে চালতাগাছে। পবন তার সাথে কথা বলে না কত মাস। দেখা হলে মুখ নীচু করে চলে যায়। সে কেন কথা বলবে? তার তো মালা আছে। চোখের জল হলুদ হাতে মুছে নেয় রেণু। পবন যে মালার দিকে ঝুঁকে যাবে এটা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। মালা ভীষণ চালাক মেয়ে। ওর কলেজে পড়া মনটা কী ভাবে যে পবনের দিকে ঝুঁকল—সেটাই এখন রেণুর গবেষণার বিষয়। তার সারা শরীর জ্বালা-পোড়া করে ওঠে চুলার সামনে বসে। মাথা নুয়ে পড়তে চায় ভূমিতে। বুকের চারপাশ থেকে উঠে আসে ব্যথা। এত অবহেলা নিয়ে কোন মানুষ কি বেঁচে থাকতে পারে? কিছুতেই পারে না। আবার ভরা চোখ আঁচলে রগড়ে নিল রেণু। কড়াইয়ের মাছগুলো গরম তেলের উপর উল্টে দিল খুন্তি দিয়ে। তারপর একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ের দিকে।

জয়ন্ত সকালবেলায় চা-বিস্কুট খেয়ে ঘুরতে গিয়েছিল গ্রামে। ফিরে এসেছে দুপুরের পরে। সরাসরি রান্নাঘরে ঢুকে এসে সে বলেছিল, তোমাকে আমি অনেক ছোটতে দেখেছিলাম।

রেণু চুপ করে থাকল।

জয়ন্ত বলল, মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। কেন যায় বল তো?

লজ্জায় রেণু মাটি হয়ে যেতে চাইল সহসা।

জয়ন্ত একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল রান্নাঘর থেকে। রেণু আঁচলে মুখের ঘাম মুছে নিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এত লেখা-পড়া জানা মানুষের সামনে তার মুখ খুলতে ভয় করে। কী কথায় কী বলে ফেলবে এই তার জড়তা।

খেতে বসার সময় জয়ন্ত তাকে বলেছিল, তোমাকে একটা স্বামীজীর বই দেবো. পড়ো। আমার কাছে স্বামীজীর লকেট দেওয়া হার আছে নেবে?

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল রেণু।

সেই লকেট দেওয়া চেনটা মেলা দেখতে যাওয়ার সময় গলায় পরেছিল রেণু। বসন্ত জানা তাকে মেলা দেখার জন্য কুড়ি টাকা দিল জোর করে।

মেলা দেখে ফেরার পথে রেণুর শরীর আর চলছিল না। আলপথে সহসা দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে। সন্ধ্যার আকাশে ফুটেছিল গুটি গুটি তারা। হাওয়া আছড়ে পড়ছিল বুকের উপর। আঁচল সরে গিয়ে স্পষ্টত দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল কাঁকড়া মাটি নরম বুকের মাংসল বৃন্ত। থরথর করে কাঁপছিল সে হাওয়ায়। চুল উড়ে আছড়ে পড়ল মুখের উপর। মেঘে ঢাকা চাঁদের মত তার মুখ। জমির আলে সে যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা লক্ষ্মী। তবু পবন তাকে এড়িয়ে চলে কেন? এত অহঙ্কার ঐ কালো ছেলেটার? অসহ্য। রেণুর ঠোঁট বেঁকে উঠল যন্ত্রণায়। মেলায় সে পবনকে দেখেছে মালার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে ঘুরতে। হেসে হেসে কথা বলছিল ওরা। মালা বড্ড গায়ে পড়া। সে ওর মায়ের স্বভাবই পেয়েছে। পবনকে বশ করেছে সে। পবনকে ছিনিয়ে নিয়েছে সে। সেই থেকে রেণুর মাথাটা ভার হয়ে আছে চিন্তায়। বুকের ভেতরে কে যেন নখ ঢুকিয়ে দিয়েছে অতর্কিতে। তার শরীর ফুলে উঠছে কান্নায়। কপালের শিরাগুলো জেগে উঠেছে যন্ত্রণায়। ঘরে ফিরে এসে রেণু গা এলিয়ে দিল বিছানায়। বসন্ত জানা তার মাথার কাছে বসে বললেন, কী রে মা, যাত্রা দেখতে যাবি নে?

রেণু ঘাড় নেড়ে বলল, শরীর ভাল নেই। মাথাটা খুব ধরেছে। মনে হয় জ্বর আসবে।

—কদিন্ থেকে তোর বড্ড ধকল যাচ্ছে।

রেণু কোন কথা না বলে পাশ ফিরে শুলো। বুকের কাছে হাত রেখে সে শব্দ শুনতে চাইল হৃৎযন্ত্রের। বড্ড লাফাচ্ছে কলিজাটা। সে বুঝি মারা যাবে আজ রাতে। মৃত্যুভয়ে একলা ঘরে বালিশ আঁকড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল রেণু।

মরা জ্যোৎস্নায় খেলা করে রাতচরা হাওয়া। চালতাগাছের ডালে বসে থাকা পেঁচাটা কলিজার গতি বাড়িয়ে দিয়ে ডেকে উঠল। ভীষণ নিষ্ঠুর সেই ডাক। রেণু চোখ খুলে চেয়ে থাকল দূরের দিকে। রাত কত হবে অনুমান করার চেষ্টা করল সে। তখনই হাওয়া বয়ে আনল যাত্রাগানের কনসার্টের ধ্বনি। বড় অদ্ভুত সেই শব্দ। রেণুর আর ঘুম এলো না। সে বুঝতে পারল—আর ঘণ্টাখানিকের মধ্যেই হয়ত ভোর নামবে। আর একটা সকাল এসে কড়া নাড়বে মনের দরজায়। হৃদয়ের জানলা খুলে সে ঢুকিয়ে নেবে পবনের নিঃশ্বাসভরা বাতাস। সরে যাবে মেঘ। সে আবার মুখোমুখি হবে পবনের। মাছ ঘাই দেওয়া পুকুরের জলের মত আবার আন্দোলিত হবে তার শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যাওয়া হৃদয়। সে আবার বেঁচে উঠবে ধীরে ধীরে, আলোর দিকে শাখা-প্রশাখা বাড়ানো গাছের মত সে হেসে উঠবে নতুন জীবনের স্পর্শে। সোনালী স্বপ্নের আবেশে চোখ বুজে এসেছিল রেণুর। তখনই বাইরের দরজায় কার যেন কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেল রেণু। তাহলে কি যাত্রাপালা ভেঙে গেল? ধড়ফড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল রেণু। হ্যারিকেনের পলতেটা বাড়িয়ে দিয়ে সে শুধোল, কে?

—আমি।

জয়ন্তর গলাটা চিনতে ভুল হল না তার। হ্যারিকেন হাতে সে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকে এল জয়ন্ত। রাত জাগা চোখের নীচে অস্পষ্ট কালির আঁচড়। হিম ঝরা ভোরের বাতাসে জয়ন্তর সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ওগুলো না মুছেই জয়ন্ত তাকাল রেণুর দিকে। ভীষণ অস্বাভাবিক রকমের অস্পষ্ট তার দৃষ্টি। ঘোলাটে কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণোদিত। রেণু চমকে উঠল চোখের তারায় চোখ ফেলে। ধক করে উঠল বুক। ভয় এসে বিছিয়ে গেল চোখে-মুখে।

জয়ন্ত তাকে অভয় দিয়ে বলল, ভয় পেও না, আমি যাত্রা না দেখে চলে এলাম। তোমার শরীর খারাপ দেখে গিয়েছি। এখন কেমন আছো।

—ভাল। গলা কেঁপে উঠল রেণুর।

পা-টিপে টিপে তার বিছানার পাশে সরে এল জয়ন্ত, আচমকা রেণুর হাত ধরে বলল, কৈ দেখি জ্বর আছে কি না।

রেণু কিছু বলার আগেই জয়ন্ত তার হাতের চেটোটা চেপে ধরল বুকের কাছে, তারপর একসময় সেই দুরন্ত কামাতুর হাত পিছলে ছুঁয়ে দিল ভেজা চালতার মত রেণুর বক্ষযুগল। রেণু গভীর রাতে সাপ দেখা ভীতু পায়রার মত কেঁপে উঠল, ছটফটান গলায় সে বাধা দিয়ে বলল, একী অসভ্যতা করছেন? হাত সরিয়ে নিন, না হলে আমি বাধ্য হব সরিয়ে দিতে।

—কেন ভালো লাগছে না বুঝি? জয়ন্ত চিবিয়ে-চিবিয়ে হাসল, ওর চোখে-মুখে আজন্ম ক্ষুধা, ফিসফিসিয়ে বলল, তোমাকে দেখার পর থেকেই স্বামীজীর বইগুলো আমি সরিয়ে রেখেছি। আমি অতিক্ষুদ্র মানুষ। তাই সংযমের বেড়া ভেঙে আমি তোমার কাছে চলে এলাম। তুমি যদি আমাকে সরিয়ে দাও, তাহলে আমি বলপ্রয়োগ করব। আর যদি ঠাণ্ডা মাথায় আমাকে মেনে নাও তাহলে বাকি জীবনটা আমি তোমাকে এইভাবেই সুখ দিয়ে যাবো। তবে বিয়ের কথা আমাকে কোনদিনও বলবে না। আমি ধার্মিক, সংসারবিমুখ মানুষ। বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই না। তাহলে আমার সামাজিক প্রতিপত্তি বিনষ্ট হবে।

—ছিঃ ছিঃ, এসব কথা শুনলেও পাপ হয়। রেণুর চোখ-মুখ সাদা হয়ে ওঠে ঘৃণায়। সে প্রাণপণে চেষ্টা করে হাতটা সরিয়ে দিতে বুকের উদ্যান থেকে। মানুষের সাত্ত্বিক হাত নিমেষে হয়ে যায় বিষধর সাপ। রেণুর পুরনো অন্তর্বাস ছিঁড়ে যায় হাতের চাপে। মেঘ সরে যাওয়া বর্তুল চাঁদের মত স্পষ্টত

দৃশ্যমান হয় ঝিনুক শরীরের লুকিয়ে রাখা অক্ষত মুক্তা। নগ্ন আকাশের উপর বজ্রবিদ্যুৎ খেলা করে মুহুর্মুহু। রেণু মৃত্তিকার মত শুয়ে থাকে, তার প্রতিরোধ শক্তি হার স্বীকার করেছে কামাতুর বজ্রের রোষানলে। এক পশলা বৃষ্টিপাতের পরে ভিজে মাটি থেকে ভাপ বেরনোর মত ঠেলে আসে কূল ছাপানো কান্না। সিগ্রেট ধরিয়ে তৃপ্ত জয়ন্ত তাকে বোঝায়, জীবন যা চায় তাই করাই জীবনের ধর্ম। আত্মাকে ফাঁকি দেওয়া এক ধরনের পাপ। আজ আমি যা করলাম এবার থেকে তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে বারবার। তবে ভয় পাবার কিছু নেই। মর্ডার্ন যুগের ছেলে আমি। এবার থেকে সব ব্যবস্থা করেই আসরে নামব। সিগারেটের ছাই ঝেড়ে জয়ন্ত বলল, ছিঃ, ওভাবে কেঁদো না। সংসারে এমন তো আকছার ঘটেই থাকে। যাও, চোখের জল মুছে চা করে আনো। গরম গরম চা খেলে শরীরটা চাঙ্গা হয়ে যাবে আবার।

রেণুর চোখের সামনে পশুটা হেসে উঠল দাঁত দেখিয়ে। মানুষের চামড়া পরে যে তার সামনে হাসতে-হাসতে সিগারেট টানছে—সে তো একটা পশুর অধম। ওর দাড়ি ভর্তি মুখটায় আগুন ধরিয়ে দিলেও তার বুকের জ্বালা জুড়াবে না। উদ্‌ভ্রান্ত, বিহ্বল চোখে ঘরের চারদিকে তাকাল। যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাওয়া শরীর নিয়ে সে ধীরে ধীরে হেঁটে গেল রান্নাঘরে। উরুর কাছ বেয়ে ক্ষীণ রক্তের ধারা মরিয়া করে তুলল তাকে। এত বিষ শরীরে নিয়ে কি কোন মেয়েমানুষ বাঁচতে পারে? নিমেষে আঁধার হয়ে এল তার দু-চোখ। চোখ ভাসানো চোখের জলে ভিজে যেতে থাকল তার এঁটো শরীর। শিক্ষিত ঐ কুকুরটার সাথে সে সম্মুখ লড়াইয়ে পারবে না। সে আবার হেরে যাবে। কিন্তু শুধু কি হারবার জন্য তার বা তাদের মত মেয়ের জন্ম এই পৃথিবীতে। না। শক্ত হয়ে এল রেণুর হাতের মুঠি এবং সর্বাঙ্গ। চটকান শাড়িটা চটকান নাভির কাছে গুঁজে নিয়ে রেণু স্টোভ ধরনোর জন্য খুঁজতে থাকল দেশলাই। হাতড়াতে হাতড়াতে সে পেয়ে গেল দেশলাই। তবু সে আধো স্বরে ডাকল, শুনছেন, আমাকে একটু দেশলাইটা দিয়ে যান। শোওয়ার ঘর থেকে রান্নাঘরে ছুটে এল জয়ন্ত। পাখি দানা খেয়েছে দেখে তার চোখে আনন্দ। দেশলাইটা রেণুর হাতে দিয়ে আবার গলা জড়িয়ে দীর্ঘস্থায়ী চুমু খেল সে। তারপর ঠোঁট শিথিল করে সে বলল, আমি জানতাম তুমি ঠিক পোয মেনে যাবে। পোষ না মানা ছাড়া তোমার তো কোন উপায় নেই। গুড, ভেরি গুড।—জয়ন্ত ফিরে যাচ্ছিল শোবার ঘরে। রেণু তার হাত ধরে টানল, গলায় ঝরে পড়ল আব্দার, যাবেন না, আমার ভীষণ ভয় করছে। পিঁড়ি পেতে দিই, বসুন।

আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে জয়ন্ত বাবু হয়ে বসেছে পিঁড়িতে। স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চড়াল রেণু। বসে-বসেই সে অলক্ষ্যে খুলে ফেলল স্টোভের স্ক্রু, তেল ঢোকা‍েব ছিপি। বাটিতে জল ফুটছে টগবগিয়ে। স্টোভ জ্বলছে নীল শিখা ছড়িয়ে। ক্লান্তিতে ঝুঁকে আসছিল .রণুর চোখ-মুখ। সে অনুভব করতে পারছিল জাংয়ের কাছে রক্তধারা শুকিয়ে তার অক্ষত যৌবনের গলা টিপে মেরেছে ঐ সামনে বসে থাকা পশুটা। গুঁড়ো দুধ গুলো বাটিতে ঢেলে দিয়ে রেণু আবার ফিতেওলা নীলশিখা স্টোভটার দিকে তাকাল। রক্ত ঝরে ঝরে পড়ল উরু বেয়ে। সে কি এই ভাবে বিসর্জনের প্রতিমার মত মুখ বুজে থাকবে রাতের পর রাত। এইভাবে কি পশুটা তাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাবে রোজ রাতে? রেণুর হাত কাঁপল না, চোখের নিমেষে জ্বলন্ত স্টোভটা জয়ন্তর দাড়ি-ভর্তি মুখের উপর ছুঁড়ে দিতে। অব্যর্থ তার নিশানা। জয়ন্তর মুখের উপর স্টোভটা আছড়ে পড়তেই দ্বিখণ্ডিত হলো স্ক্রু খোলা স্টোভের নীচের অংশ। কেরোসিন তেল আগুন সোহাগে জ্বলে উঠল দাউ দাউ।

জয়ন্তর দগ্ধানো আর্ত চিৎকার রেণুর আর কানে আসছে না। সে উঠোন পেরিয়ে ছুটে এসেছে আলপথে। আলপথ ছাড়িয়ে সে ঝড়ের বেগে উঠে এল পাকা সড়কে। তখনও বেজে চলেছে যাত্রার কনসার্ট হাটখোলায়। তখনও আর্ত চিৎকারে বাতাস মথিত করে আত্মরক্ষার জন্য চালতাছায়া পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়েছে বকধার্মিক জয়ন্ত।

রেণু আর কোনো কিছু ভাবল না, সে হাঁটতে লাগল পাকা সড়ক ধরে। উদ্‌ভ্রান্ত তার হাঁটা। ভোরের বাতাস এসে খুলে দিয়েছে তার কেশরাশি। পিঠের উপর অন্ধকারের পাশে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে ক্ষীণ জ্যোৎস্নার আলো।

ক'পা হেঁটে আসার পরেই রেণুকে থামতে হল কেতকীর ডাকে, ভোরবেলায় কোথায় যাচ্ছিস রে রেণু?

রেণু আঁচলে মুখ রগড়ে নিয়ে লুকাতে চাইল তার যাবতীয় যন্ত্রণা। কাছে সরে এসে সে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, তুমি কোথায় যাচ্ছো মাসী?

—কলকাতায়।

—আমাকে নিয়ে যাবে?

চমকে উঠল কেতকী, তুই যাবি, সত্যি?

রেণুর ঠোঁট জুড়ে বাসি জ্যোৎস্নার হাসি। দুই উরুর মাঝখানে অসহ্য যন্ত্রণা হজম করে সে বলল, যাব মাসী, আমি যাব।

কলকাতাগামী সরকারী বাসটা আলপথে, ধানমাঠে ডিজেলের ধোঁয়া উগরে ওদের নিয়ে চলে গেল।

পঁচিশ

মাছ ব্যবসায় মন ছিল না পবনের, সকালে জোর করে তাকে পাঠাল সুভদ্রা, যারে বাবা, না গেলে যে পুরো সংসারটা শুকিয়ে মরবে।

পবনের চোখে জল, সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিল মায়ের দিকে, এর আগে এত কাতরতা সে তার মায়ের চোখে দেখেনি। নিরাপত্তাহীনতার রোগ সব মানুষকে এক সময় পেয়ে বসে। তখন রোগটা কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। পবন অস্থির হয়ে পড়ছিল—মা কেন এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তাকে সমুদ্রে পাঠানোর জন্য। কিন্তু এর কারণ খুঁজতে গেলে রোদ বেড়ে যাবে চড়চড়িয়ে, তাই সে আর কাল বিলম্ব না করে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল দীঘার দিকে।

মেনি আজ খুব ভোরবেলায় উঠেছে, সে ছড়া দিচ্ছিল উঠোনে, পবনকে সাইকেল ঠেলে আগড়ের দিকের যেতে দেখে বলল, দাদা, আজ মেঘের অবস্থা ভাল নয়। হা দেখ কেমন মেঘ করেছে পুব দিকে। আমার মনে হচ্ছে আজ বৃষ্টি হলেও হতে পারে।

পবন সকাল বেলায় চোখ পাকিয়ে তাকাল, বৃষ্টির জন্য আমি ভয় পাই না। হোক না বৃষ্টি, তাতে আমার কী? তবে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরতে আমার ভাল লাগে না। মনটা কিছুতেই সায় দেয় না বলেই যত অরুচি।

তার কথা শুনে ছড়া দেওয়া থামিয়ে ডাগর চোখে তাকাল মেনি, গোবর হাতটা ময়লা শাড়িতে মুছে নিয়ে সে বলল, তুই চলে গেলে আমারও ভাল লাগে না, ঘরটা বড় ফাঁকা লাগে। না ফেরা পর্যন্ত চিন্তা হয়। মাকেও দেখেছি কেমন মুখ শুকিয়ে ঘোরে। কারোর সাথে ভালমতন কথা বলে না। তার ভাবখানা এমন তুই যেন চাকরি করতে গিয়েছিস দূরের দেশে, অনেকদিন পরে ফিরবি। পবন মেনির মুখের দিকে তাকাল। ঘুমের কোনো চিহ্ন নেই তার চোখে-মুখে বরং সকালে ফোটা ফুলের চেয়েও তরতাজা। হাসি লেগে আছে ঠোঁটে। চোখে ফুলঝুরি রঙমশাল।

দুলুবাবুদের সাইকেলটার বয়স হয়েছে অনেক, একটু জোরে চালালেই ঘটাং ঘটাং শব্দ করে। মালা একদিন তাকে ইয়ার্কি করে বলেছিল, বুড়ো ঘোড়াটার এখন আর কোন দাম নেই। তুমি বলে ওকে দিয়ে এখনও পর্যন্ত ঘানি টানাচ্ছো। বাবা হলে কবে ছুঁড়ে ফেলে দিত।

এতদিন মাছ ব্যবসা করেও একটা নতুন সাইকেল কেনার ক্ষমতা হল না পবনের। মেনির শাড়িটার দিকে তাকালে কষ্ট হয়। অথচ মেনি কোনদিন তাকে মুখ ফুটিয়ে বলল না, দাদা, আমার জন্য তুই একটা নতুন শাড়ি কিনে আনিস।

সে না বললেও পবন মনে মনে ভেবেছে জুৎসই কামাই হলে সে ভাল দেখে একটা শাড়ি কিনে আনবে মেনির জন্য। বোনটা ছেঁড়া শাড়ি পরে ঘুরবে—এটা কখনও ভাল দেখায় না। বোনের মুখে হাসি ফোটাতে পারলে পবনের মাছ ব্যবসা করা সার্থক হবে।

কিন্তু তার ভাবনা মরে যায় কুঁড়ি অবস্থাতে। মাছ ব্যবসায় আশাপ্রদ লাভ হয় না। সমুদ্র কাছিমের ব্যবসা অনেকদিন থেকে বন্ধ।

পুলিশ কড়া নজর রেখেছে বালিগড় ব্যবসার উপর। ধরতে পারলে মারধোরের সঙ্গে প্রায় মাস ছয়েকের হাজতবাস। তবু পবন চেষ্টা করে বালিগড় কিনে আনতে চোরাপথে। খড়িকাহাটে বালিগড়ের মাংস বিক্রি হয় ভালো। আদিবাসী মেয়েগুলো আসে হাট করতে। ওদের মাথার চুলে কৃষ্ণচূড়া ফুল গোঁজা। চুলে জবজবে কুসুম তেল। গায়ের বর্ণ মাগুর মাছের চেয়েও মনোহরণ। ওরা হাট করতে ভালবাসে। ভালবাসে বালিগড়ের মাংস কিনে ঘর ফিরতে। ওদের মুখে পবন একদিন শুনেছিল, আমরা ভাতার ছাড়ি দিবেক, কিন্তু হাট ছাড়বেক নাই। কথাগুলো বলতে বলতে ওরা পথ ভাঙছিল নদী পেরিয়ে। রাস্তার দু-পাশে শাল, পিয়াল আর গামারের জঙ্গল। অর্জুনগাছগুলো কালো কালো গাছগুলোর মাঝে সাহেবদের মত। খড়িকাহাটের কথা পবন কোনদিনও বিস্মৃত হতে পারবে না। হাট শুধু তাকে পয়সা দেয়নি, দিয়েছে মান-সম্মান ইজ্জোৎ। বৃষ্টি বাদলার রাতে ঐ অদিবাসী মেয়েগুলোই তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে ঘরে। খাতির-যত্ন করে খাটিয়া পেতে দিয়েছে দাওয়ায়। পা-ধোওয়ার জন্য এনে দিয়েছে ঘটি ভর্তি জল। রাঁধা-বাড়ার জন্য দিয়েছে আলাদা হাঁড়ি-বাসন-কড়াই। এমন সম্মান সে তো এর আগে কোথাও পায়নি। মন ভরে গিয়েছে কাণায় কাণায়। যতটা তার প্রাপ্য নয় তার বেশি অনেক কিছু পেয়েছে সে। জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে অপরিচিত মেয়েগুলোর ভালবাসায়। সারারাত কাটিয়ে সকালবেলায় বাসের ছাদে সাইকেল তুলে দিয়ে সে খোশ মেজাজে ফিরে এসেছে ঘর। মাছ ব্যবসায় ছিল বলেই এমন অঢেল তার প্রাপ্তিযোগ।

বেলা করে বেরিয়েছে বলেই পবনের পা চলছিল দ্রুতগতিতে। ফাঁকা রাস্তায় সাঁই সাঁই করে ছুটছিল সাইকেল। দড়ি বাঁধা ঝুড়িটা লাফিয়ে উঠছিল ঘন ঘন। রোদের আদুরে স্নেহ এসে পড়েছে তার সর্বাঙ্গে। সকালের রোদে কুটকুটায় না গা। আরাম বোধ হয় বড্ড। সুভদ্রা ভোর থেকেই তাকেই ঠেলা মেরে জাগাচ্ছিল। সকাল সকাল না গেলে মনের মত মাছ পাওয়া যাবে না। হাটবার থাকলে সমুদ্রমাছের আকাল পড়ে। এ সময়টাতে বর্ষার ইলিশ আসে ঝাঁকে-ঝাঁকে। এবার ইলিশের আমদানী কম, দামও চড়া। পবন আজ যদি এক ঝুড়ি ইলিশ পেয়ে যায় তাহলে তো আর কথা নেই। দু তিনটে হাট ঘুরে সে বেচতে পারবে।

দীর্ঘদিন হল সে মাছের আড়তে আসেনি। ইলিশের এখন কী দাম চলছে সে নিজেও ভাল জানে না। নারাণ সাউয়ের মাছখটিতে সে একবার পৌঁছাতে পারলে তার আর কোন চিন্তা নেই। যে করেই হোক জোগাড় হয়ে যাবে মাছ। কোটিমণির চা-দোকানে একবার না বসলে তার সমুদ্রে আসা বৃথা। নারাণ সাউ ওখানে রোজ আসে। কোটিমণির সাথে তার ঠাট্টা-ইয়ার্কির সম্পর্ক। ওখানে এক কাপ চা না খেলে অতবড় মানুষটারও পেটের ভাত হজম হয় না।

সেই কারণে পবনের চিন্তা কম। সে জানে দীঘায় একবার পৌঁছাতে পারলেই নারাণ সাউয়ের দয়া-আশীর্বাদ সে ঠিক পেয়ে যাবে।

সাইকেল বালিয়াড়িতে থামল রোদের রঙ যখন কটকটে। সারণি জাল তুলে জেলেরা ফিরে গিয়েছে যে যার ঘরে। মন খারাপের চোখে পবন সমুদ্রের দিকে তাকাল। অনেকদিন পরে তার মনের কোণে

ভেসে উঠল রেণুর মুখখানা। মেয়েটা যে দুম করে কোথায় নিরুদ্দেশ হল তার খোঁজ কেউ জানে না। জয়ন্তর দাড়িভর্তি মুখ আর শরীরের এক তৃতীয়াংশ পুড়ে গিয়েছিল কেরোসিন তেলের আগুনে। চালতাপুকুরে ডুব দিয়েও নিজেকে সে অক্ষত রাখতে পারেনি। গ্রামের সবাই জানে—স্টোভ বার্স্ট করে মুখ পুড়িয়েছে গাঁয়ের গর্ব জয়ন্ত। বসন্ত জানার সেই থেকে মন খারাপ। তিনি এখনও গভীর মনযোগ সহকারে খবরের কাগজ পড়েন। তার কাগজ পড়ার একটাই উদ্দেশ্য রেণুকে খুঁজে বের করা। মেয়েটা না ফেরা পর্যন্ত তার চিন্তার শেষ নেই। পবন বার দুয়েক জয়ন্তকে দেখে এসেছে দারুয়া হাসপাতালে গিয়ে। লেখা-পড়া জানা জয়ন্ত পবনের সাথে কথা বলার প্রয়োজনও মনে করেনি। সে কথা না বললেও পবনের মনে কোন ক্ষত নেই। তার মনে এখন শুধু একটাই ক্ষত সেটা শুধু রেণুর জন্য। একদিন দোকান ঘরে বসন্ত জানা আক্ষেপ করে বলেছিলেন, মেয়েটা ফিরে এলে আমি শান্তিতে মরতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—রেণু কোথাও যায়নি। ওকে কেউ জোর করে তুলে নিয়ে গেছে।

কে এমন কুকর্ম করতে পারে? পবন কপালে গভীর ভাঁজ ফেলেও এ প্রশ্নের উত্তর পায় না। তবে তার সন্দেহের আঙুল জয়ন্তর দিকে ফেরান। তবে কি জয়ন্ত রেণুকে মেরে ফেলেছে কোন অজ্ঞাত কারণে। কিন্তু রেণুকে সে কেন মারবে, কিসের জন্য? বসন্ত জানা ছেলের মুখের দিকে সন্দেহের চোখে তাকালেও তার মুখে কোন শব্দ নেই। ছেলের জীবনের কাছে রেণু তুচ্ছ, খড়কুটো। নদীর এক কুল ভাঙলে অন্য কুল গড়ে ওঠে। জয়ন্ত হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে এসেছে ঘরে। সে তার পোড়া মুখ নিয়ে ইস্কুলে ফিরতে সংকোচবোধ করে। ঘরেই থাকে সর্বদা। এই দেড় মাসে সে একবারও হাটখোলায় আসেনি, একদিনও ধর্মসভায় যায়নি। কেন, কিসের জন্য ঘর থেকে বেরয় না জয়ন্ত? কেন পোড়ামুখ লুকিয়ে রেখেছে সবার আড়ালে।

এই বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির কোথায় শেষ, কোথায় শুরু পবন তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক দিয়ে অনুমান করতে পারে না। বিশাল জলরাশির পাদভূমে মানুষের আনাগোনা অষ্টপ্রহর। পবনের আশা সে এখানেই হয়ত একদিন খুঁজে পাবে রেণুকে। জানতে পারবে তার পালিয়ে আসার আসল কারণ। চোখ চলে যায় দূরে, বহুদূরে। মন উদাস করা হাওয়া এসে বালি ছিটিয়ে দেয় তার ঘর্মাক্ত বুকে। একভাবে তাকিয়ে থাকলে টনটন করে চোখ। অসীম শূন্যতা বাসা বাঁধে বুকের গভীরে। অতসী বোষ্টমী মারা যাবার পর থেকেই রেণুকে এড়িয়ে চলছিল পবন। রেণুও তাকে ততো বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। সে কারোর চোখে গুরুত্বহীন জড়বৎ মানুষ থাকতে চায় না। যেদিন রেণু তাদের ঘরে এল, সেদিনও পবন তার সাথে কথা বলেনি ইচ্ছে করে। সে আশা করেছিল রেণু তাদের ঘরে থাকবে। মেনির সাথে বড় হয়ে উঠবে হাসি খেলায়। তার সেই সুপ্ত ইচ্ছা পূরণ হয়নি। রেণু নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থেকে চলে গেল। তার যাওয়াটা বীরের মত যাওয়া নয়, ভীরুর মত যাওয়া। যে যেতে চায় তাকে পবন কীভাবে আটকে রাখবে? সেই যাওয়া আর এই যাওয়ার মধ্যে ফারাক বিস্তর।

নারাণ সাউ পবনের কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখে শুধোলেন, কী রে পবন, ঘরের খবর ভাল তো—

পবন চুপ করে থাকলেও মনের ভেতর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল। মেলা যদি না বসত তাহলে এত সব কাণ্ড ঘটত না আদৌ। মেলা খেলায় মানুষের প্রতিহিংসাপরায়ণতা বেড়ে ওঠে।

আজ আর ইলিশ মাছ নয়, এক ঝুড়ি পমপ্লেট মাছ নিয়ে পবন বালিয়াড়ি থেকে উঠে এল ঝাউ বাগানে। নীল ঢেউকে ধমক দিয়ে কোমর দুলাচ্ছিল ঝাউবাগান। আকাশ নেমে এসে মুখ দেখছে জলের আয়নায়। ভেজা বালির উপর লাল কাঁকড়ার ভীতু যাতায়াত নজরে পড়ল পবনের। এখানে, এই নির্জন ঝাউবাগানের শেষ প্রান্তে মুক্তা আর সুদেববাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল পবনের। মুক্তার কোলে মাথা দিয়ে পা ছড়িয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে শুয়েছিলেন সুদেববাবু। মুক্তার চিকন আঙুল খেলা করছিল সুদেববাবুর চুলের মধ্যে। আকাশ যেমন ঝুঁকে পড়ে মুখ দেখে নীল জলরাশির, তেমনই মুগ্ধ-বিহ্বল

চোখে সুদেববাবুর মুখের দিকে চেয়েছিলেন মুক্তা। চুলে বিলি কাটছিলেন ধীরে ধীরে। ওরা পবনকে দেখে সামান্য ভীত হয়ে যে যার কাজে মন দিয়েছিল। পবনও ওদের সাথে কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করেনি। ঘরে ফিরে এসে মালার কাছে খুলে বলেছিল সব। মালা মেয়ায় ঠোঁট ঠেকিয়ে বলেছিল, দু-কান কাটাদের লাজলজ্জার বালাই নেই। ওরা হয়ত যুক্তি করেছে বাবার সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। তবে তুমিও শুনে রাখো—ওটা আমি কোনদিনও হতে দেব না। যদি ওদের না মারতে পারি—তাহলে আমি নিজেই মরব।

মালার জেদের কাছে সেদিন পবনকে নোয়াতে হয়েছিল মাথা। মালা সহসা তার হাত দুটি ধরে বলেছিল, তুমি আমাকে সাহায্য করবে বলো। তুমি আমাকে সাহস দিলে আমি ওদের দু-জনকেই খতম করব।

সাইকেল ঠেলতে-ঠেলতে পিচ রাস্তার উপরে এসে দাঁড়াল পবন। পথের ক্লান্তি পাংশু করেছে তার মুখমণ্ডল। তড়িঘড়ি করে না ফিরলে মাছ পচে গন্ধ ছাড়বে। নোনাজলের মাছের এই এক ফ্যাসাদ।

পানিপারুলের বাজারে মাছ বিক্রি করে পবন যখন ফিরছিল তখন দুপুরের রোদ চড়ে গিয়েছে মাথার উপর। ক্লান্তিতে নুয়ে আসছিল শরীর। সাইকেলের প্যাডেলে পা দিতে ইচ্ছে করল না তার। তবু হাতছানি দিয়ে ডাকে ঘর, ফিরতে হয় মানুষকে।

হাটখোলায় দুপুরের রোদ পরস্পর বংশবৃদ্ধির আদি খেলায় মেতেছে। একটা দীঘাগামী বাস এসে থামল ঠিক হাটের উপর। ড্রাইভার বাঁ হাতে খবরের কাগজের বাণ্ডিলগুলো ফেলে দিল রাস্তায়। বসন্তবুড়া দোকান ছেড়ে এগিয়ে এলেন, চোখে তখনও ধরা কালো ফ্রেমের চশমা, নাকে চশমার কলঙ্কদাগ। বাসটা চলে যাবার পরেই পবন সাইকেলের ক্যারিয়ারে খালি ঝুড়ি বেঁধে নিয়ে ফিরে যেতে চাইল ঘরে। মেনি এত বড় হল তবু ওর জিলাপি খাওয়ার সখ এখনও গেল না। সাইকেলটা ঠেলতে-ঠেলতে পবন যখন ময়রা দোকানের কাছে এল তখনই তার নজরে পড়ল গঁড়ার বড় ছেলে বাসুকে। দোকানঘরের খুঁটিতে গোরু বাঁধার রশা দিয়ে পাকমোড়া করে বাঁধা ছিল সে। কেঁদে-কেঁদে তার চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে, জলের ধারায় মুখের ময়লা পথ নিয়েছে স্পষ্ট। ছেলেটার চুলে তেল নেই, উসকো খুসকো—সারা শরীরে অযত্নের ছাপ। পরনে শুধু দড়ি বাঁধা পেন্টুলুন, এছাড়া সারা গা উদোম। গায়ের থোক থোক ময়লা তার অভাবী শরীরটাকে দিয়েছে পুরোমাত্রায় দীনতা। সে পবনকে দূর থেকে দেখেই ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল, কাকা গো, ময়রা দোকানী আমাকে বেঁধে রেখেছে অনেকক্ষণ হল। খুব মেরেছে আমাকে। হা-দেখ, মেরে আমার গা-হাত-পা ফুলিয়ে দিয়েছে। খুব ব্যথা করছে। তিন-চারজন বসেছিল উৎসুক চোখ নিয়ে দোকান ঘরের বেঞ্চিতে। মজা লুটবার জন্য ওরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাসুর গালের চামড়া বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল মাটিতে। বাঁধা হাতদুটো ছাড়াবার জন্য চেষ্টা করছিল প্রাণপণ। বেঞ্চিতে বসা একজন উঠে এসে থাপ্পড় মারল বাসুর গালে, চোরের ছেলে চোর না হয়ে ডাকাত হবে। দাঁড়া, তোর হাত দুটো ছিঁড়ে আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াব। চুরি বিদ্যা শেখা তোর আমি ঘুচিয়ে দেব। —বলেই সে অন্ধ রাগে টানাহিঁচড়া করতে থাকল বাসুকে। ময়রা দোকানী ভয় পেয়ে বলল, আর মেরো না, পটল তুললে তখন আমাকে ফাঁসতে হবে। যা দিনকাল পড়েছে আমি আর ঝামেলায় জড়াতে চাই না। ওর বাঁধন খুলে দাও। ওকে আর ঘা দুয়েক দিয়ে ছেড়ে দাও।

ছুটে আসা সেই অগ্নিমূর্তির রাগ কমল না একফোঁটা। চোখ লাল ভেঁটুলের মত করে বলল, এখন থেকে যখন চুরি করা শিখেছে তখন এ ছেলে বড় হয়ে গড়াঁকেও ছাপিয়ে যাবে। ছোট থেকে ওর বিষদাঁত ভেঙে দিলে আর চরতে সাহস পাবে না। ওর চুরি বিদ্যা শেখা হাত দুটো দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে দেওয়াই ভাল হবে। পবন বাসুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল, দু-চোখে সহানুভূতির ছোঁয়া, কী করেছিস তুই, ওরা কেন তোকে বেঁধে রেখেছে?

বাসুর চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল অনবরত, ঢোক গিলে সে বলল, আমার খুব ক্ষিদে লেগেছিল। মা আমাকে খেতে দেয় নি কাল থেকে। ক্ষিদের ঘোরে আমি একটা পাউরুটি নিয়ে পালাচ্ছিলাম ময়রা দোকান থেকে। সেইজন্য ওরা আমাকে কত মারল। হা দেখ কেমন ফুলিয়ে দিয়েছে পিঠটা।

পবন ভাষাহীন চোখে তাকাল। ওর চোখের তারায় অক্ষমতার কাঁপুনি। বাসুর মধ্যে সে হঠাৎ নিজের ছবি দেখতে পেল। ছেলেটা ক্ষিদের চোটে লোভ সামলাতে পারেনি। একটা পাউরুটি নিয়ে পালিয়েছে। শুধু এই অপরাধে বাসুকে ওরা যেভাবে মেরেছে তা দেখে বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে কষ্টে। অভাব মানুষের স্বভাব নষ্ট করে দেয়—এ কথা পবন ছোটবেলা থেকে শুনেছে। বাসু সেই পুরনো কথাটাকে আবার নতুন করে মাত্রা দিল আজ। পবন ময়রা দোকানীকে অনুরোধ করে বলল, বাসুকে ছেড়ে দাও, ও ক্ষিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে চুরি করেছে। ছোট ছেলে, ও এখন চুরির মারপ্যাঁচ বোঝে না।

—বোঝে না, এ তুই কী বলছিস? ময়রা দোকানীর চোখে বিচ্ছুরিত হলো আগুনের ফুলকি, উঠাগাছের পাতা দেখেই বোঝা যায় সে গাছটা কেমন হবে। ওর চোখ দুটো দেখ—কেমন চঞ্চল, ধূর্ত। এ ছেলে ডাকাত না হয়ে যাবে কোথায়? এখন থেকে না সামলালে এ ছেলে সুযোগ পেলে তঁপসাপের মত ছোবল মারবে।

বেঞ্চিতে বসা লুঙ্গি পরা লোকটা আবার উঠে দাঁড়াল, ওর পেছনে লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে দাও। দেগে দিলে মনে রাখবে জীবনভর। চুরি করার কথা ভাবতে পারবে না স্বপ্নেও।

ময়রা দোকানী মাথা চুলকে মুখের ঘাম মুছল গামছায়, গলার স্বর পাথর কঠিন করে বলল, হাকিম এসে বললেও ওকে আমি ছাড়ব না। ওর বাপ-মাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি। ওরা না আসা পর্যন্ত আমি ছাড়ব না।

পথ চলতি দু-একজন থমকে দাঁড়িয়েছে ময়রা দোকানের সামনে। সবার কৌতূহলী চোখ বাসুব দিকে নিবদ্ধ। সে আর কাঁদছে না, ফ্যালফ্যাল করে দেখছে। এতগুলো মানুষের চোখ তার দিকে ফেরান, এই দেখে ভয়ে কিছুটা কুঁকড়ে গিয়েছে বাসু।

—কী হয়েছে গো ময়রা দোকানে? হাঁটা থামিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় টেকো মাথার একজন।

—পাউরুটি চুরি করে পালাচ্ছিল গঁড়ার ছেলেটা।

—দাও দু-চার ঘা উত্তম-মধ্যম। তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—মার তো পড়েছে তবু দেখ কেমন জুলজুল করে তাকাচ্ছে।

—সেয়ানা মাল। কার ছেলে দেখতে হবে তো? গঁড়ার বেটা গো...

পবনের কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল, সে দোকানে ওঠেনি, কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে। ময়রা দোকানী ধুতির গিঁট শক্ত করে বেঁধে বলল, তুই যা ওর বাবা-মাকে ডেকে আন তাহলে ওকে আমি ছেড়ে দেব। আমার একটা আস্ত পাউরুটি নষ্ট করেছে। পাউরুটির দাম দিতে হবে গড়াঁকে।

—পাউরুটির দাম আমি দিয়ে দিচ্ছি। বাসুকে তোমরা ছেড়ে দাও।

পবনের কথা শুনে ময়রা দোকানী বলল, তা হবে না। যার বোঝা সে-ই বইবে। তুই কেন মাথা পেতে দিবি মিছিমিছি।

—বাসু তো আমার ভাইপো হয়। তাছাড়া—

—তোর কোন কথা আমি শুনব না, তুই যেতে পারিস। ময়রা দোকানী পবনকে পাত্তা না দিয়ে নিজের কাজে মন দিল। দুধ মরে ক্ষীর হচ্ছিল বড় কড়াইয়ে, খুন্তি নাড়তে নাড়তে ময়রা দোকানী ঘাড় উঁচিয়ে তাকাল, একটা ঝড়ো শব্দ কানে আসছিল তার। হঠাৎ এসে যাওয়া কালবৈশাখীর মত রাধীর গলা, বছরখানিকের ছেলেটাকে কাঁখে নিয়ে সে হাউহাউ কান্নায় ভেঙে পড়ল ময়রা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে, বাবু গো, আমার ছেলেটাকে ছেড়ে দাও। কাল রাত থেকে তাকে আমি কিছু খেতে দিতে পারিনি। ক্ষিদের জ্বালায় তার মাথার ঠিক ছিল না, কী করতে কী করে বসেছে।

—এসব তোদের সাজানো, শেখানো—আমি কি বুঝি নে। ময়রা দোকানী পেটে হাত বুলিয়ে রাধীর দিকে তাকাল, তারপর সদয় হয়ে বলল, একটা পাউরুটির দাম দিয়ে বাসুকে তুই ঘর নিয়ে যা। আর যদি কোনদিন বেচাল দেখি—সেদিন তোদের সবকটাকে জেলে ঢুকাব। সেদিন নাকে কাঁদলেও ক্ষমা পাবি নে।

আঁচল শূন্য, দু-দিন হল রাধীর কোন কামাই নেই। মাইতিদুয়ারে ধান ঝেড়ে সে যে কটা চাল পেয়েছিল তা দিয়ে এক দিনের সংসার খরচ চলেছে। গঁড়া বাঁশের গোড়া তুলতে যায়নি অনেকদিন হল। বাঁক, শিকারশা আর ঝুড়ি দুটো পড়ে আছে দাওয়ায়। অত কষ্ট করে কেনা কুড়ুলটাতে মরচে ধরেছে বাইরের জল-হাওয়ায়। রাধী তাকে বলেছিল, সংসারের হাল ধরতে। জন-মজুর খাটতে লোকের দোরে-দোরে। সে রাধীর কথা শোনেনি। চোখ লাল করে বলেছে, জন খাটার জন্য আমার জন্ম হয়নি। যারা জন খাটে খাটুক, আমি খাটব না।

—তাহলে তোমার এই রাক্ষসের সংসার কে সামলাবে? আমি কি গতর বেচে তোমাকে খাওয়াব নাকি?

—তোর যা গতর ঐ গতর কাকও দেখবে না। গঁড়া রাধীর মুখে কালি ঢেলে দিয়েছিল অপমানের, যা-যা, কথা না বাড়িয়ে শাক-পাতা তুলে আন বাবুদের বাগান থেকে। আমি আর এ ঘরে থাকব না, আমার ভাত অন্য জায়গায় রাঁধা হচ্ছে।

—রমণীবুড়ার ভাতার খেদানো মেয়েটা তোমার মাথা খেয়েছে—এ আমি ভাল বুঝতে পারছি। কথা শেষ করে গলা ফাড়িয়ে কেঁদে উঠেছিল রাধী, ও আমার কী হলো গো। ঘরের মানুষটাকে জ্যান্ত পেত্নীতে ধরেছে। হে মা শীতলা বুড়ি, তুমি ওকে বাঁচাও। নাহলে এই বয়সে ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমি যে বানের জলে ভেসে যাব।

গঁড়া ছুটে গিয়ে লাথি মেরেছে রাধীর পেটে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছে, তুই চুপ কর। যারে তুই পেত্নী বলিস, তুই তার পায়ের নখের যুগ্যিও নোস। ফের যদি গলা ফাড়াস তাহলে তোর গলা আমি পা দিয়ে বুজিয়ে দেব।

—তাই দাও গো, আমি আর বাঁচতে চাই না, মরতে চাই। দু'হাতে পেট ধরে খনখনিয়ে কেঁদে ওঠে রাধী। তার কান্না দেখে কোলেরটা ভ্যা-ভ্যা করে কাঁদে। তার দেখাদেখি আরো দুটো ধুলায় লুটোয়। গঁড়ার চোখ জ্বলে যায় এসব দেখে। ঘরে তার একফোঁটা শান্তি নেই। এত বড় পৃথিবীতে কোথাও তার জন্য একফোঁটা শান্তি নেই। রমণীবুড়ার মেয়েটা তাকে পাত্তা দেয় না আজকাল। কাছে গেলেই বলে, তোমার ঘর সংসার সবই আছে, তুমি কেন আমার জন্য পুড়বে। আমার চোখে বিষ আছে, সেই বিষ তুমি হজমাতে পারবে না। যাও, চলে যাও। খবরদার, এদিকে আর এসো না কোনদিন।

—আমি আসব। না আসলে যে আমি বাঁচব না। গঁড়া কামিনীর পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে কৃপা ভিক্ষার আশায়। কামিনীর মন গলেনি, যত দিন যায় ততই সে কঠোর হয়ে ওঠে।

বাসুর বাঁধন খুলতে গিয়ে চোখের জল টপটপিয়ে খসে পড়ল রাধীর। পবন তাকে পাউরুটির দাম দিল, বলল, বাসুকে ঘরে নিয়ে যাও। বুঝিয়ে বলো—চুরিবিদ্যা ভাল নয়। যা করেছে তা যেন আর সে ফিরে না করে। অভাব কার না নেই? তাবলে চুরি করতে হবে? ময়রা দোকানী সায় দিল, ঠিক বলেছিস। তোরাও তো অভাবের মধ্যে বড় হলি, কই কোনদিন তো চুরি করলি না। আসলে বাসু যা করেছে—তা হল রক্তের দোষ। বাপের স্বভাব তো ছেলের উপর বর্তায়। কয়লাকে যত ধোও তার ময়লা যায় না কোনদিন।

রাধী জলভরা চোখে তাকাল, এদের মিষ্টিমিষ্টি কথাগুলো বিষে নীল করে দিল তার পুরো দেহ। মুহূর্তে চোখ-মুখ নিরেট পাথরের মতো হয়ে গেল তার। বাসুর চুলের মুঠি ধরে দুমাদুম ক' ঘা কিল-

চড় বসিয়ে দিয়ে সে কেঁদে উঠল ঝাঁকা দেওয়া ফলন্ত কুলগাছের মত। বাসু চিৎকার করে উঠল, মাগো, আর মেরো না। এবার যদি মারো তাহলে আমি মরে যাবো। হা দেখ, ময়রা দোকানী আমাকে কেমন চ্যালাকাঠ দিয়ে মেরেছে। পিঠটা ফুলে গিয়েছে বদরক্ত জমে। ছেলের কথা শুনে চোখের জলে ভিজে যেতে থাকল রাধী। পবন জিলিপি না কিনে একটা পাঁচ টাকা রাধীর হাতে দিয়ে বলল, আমিও তোমার মত গরীব। তবে এই পাঁচ টাকা বাড়তি আছে। তুমি ওদের জন্য কিছু কিনে নিয়ে ঘর যাও।

রাধী জলে ভেজা চোখ তুলে পবনের দিকে তাকাল, এক সময় ওর হাত দুটো ধরে কাতর গলায় বলল, তুমি বাসুর বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলো। ও যেন ঘরে ফিরে আসে। আমি এতগুলো পেট কী দিয়ে ভরব বলো? চেয়ে-চিন্তে একটা পেটই ভরে না। এ তো পঙ্গপালের সংসার।

রাধীর রুগ্ন, অসুস্থ, অভুক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে পবন পুরো পাড়াটার হালফিল চিত্র দেখতে পায়। ভাদ্র-আশ্বিন এই দুই মাস পাড়ার অনেক ঘরেই হাঁড়ি চড়ে না, ওরা আটা ঘ্যাটা, জাউ চটকান খেয়ে [illegible] করে। এ সময় মাঠে [illegible] জনমজুর। ফলে অভাব ময়ূরকণ্ঠী সাপের মত পেঁচিয়ে ধরে ছোবল মারে। টানা বর্ষায় অসুখ বিসুখ লেগে থাকে প্রায় ঘরে ঘরে।

গঁড়ার দায়িত্বহীনতার শেষ নেই। সন্তানের জন্ম দিয়েই যে বাপ হওয়া যায় না তার প্রমাণ সে নিজে। ঘরে হাঁড়ি ঠনঠনায়, কোলের শিশু কাঁদে ক্ষিদের তাড়নায় অথচ সে বাবুর মেজাজে চলে যায় রমণীবুড়ার চুল্লু ভাঁটিতে। ক'দিনের হাজতবাসের মনোযাতনায় তার নেশা করার বহর বেড়েছে। কামিনীও তাকে পতঙ্গভুক পোকার মত কাছে পেতে চায়। গঁড়া তার মন রাখার জন্য সদা ব্যস্ত। সেদিন এগরা থেকে বাসনা তেলের শিশি, একটা লাল রঙের ব্লাউজ কিনে নিয়ে সে কামিনীকে উপহার দিল। এমন খবর লোকমুখে শুনে রাধীর মাথায় বজ্র পড়েছে। ঘরের মানুষ বাইরের দিকে নজর ফেললে সেই সংসার ভাগাড়ের চেয়েও দীন হয়ে যায়। আঁধার ঘরে অভাগী রাধী ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছে, তার কান্না বাইরের কারোর কাছে পৌঁছায়নি। সে ইচ্ছে করেই কারোর কাছে বলেনি। বাইরের মানুষ ঘা চুলকে রক্ত বের করবে, কিন্তু কেউ মলম লাগাবে না যত্ন করে। তাছাড়া উপরদিকে থুতু ফেললে তা নিজের গায়েই লাগে। অভাব আছে বলেই যে স্বভাব খারাপ হবে—এটা রাধী মন থেকে মানে না। কামিনীর অভাব নেই তবু সে স্বভাবটাকে খুইয়ে বসেছে। যে মেয়েমানুষের নজর পরপুরুষের দিকে তার নজর কখনই উঁচু হয় না। যে অন্যের ঘর ভাঙে তার মন কি কোনদিন জোড়া লাগে? রাধী কামিনীর কাছে গিয়েছিল একদিন দুপুরবেলায়। তাকে দেখে কামিনী চমকে উঠেছিল ভূত দেখার মত, গলা দিয়ে ভয়ে স্বর বেরুচ্ছিল না তার, তবু কোনমতে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল রাধীকে, আগে ঘর সামলাও, তারপর পরকে এসে গাল দেবা। আমি তো তাকে মন্ত্রবলে ডেকে আনিনে। সে যদি আসে তো আমি কী করব? আমি তো তার জন্য গলায় দড়ি দিতে পারব না।

—তুমি কেন গলায় দড়ি দেবে? গলায় দড়ি তো আমি দেব। ঘর পুড়েছে আমার, তুমি তাতে আরো বাতাস দিচ্ছো। পরের যারা ক্ষতি করে তাদের কোনদিন ভাল হয় না। এখন আমি কাঁদছি, কোনদিন তুমিও কাঁদবে। মনে রেখো—ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।

পাপী মন যতই প্রতিবাদ করুক—কোন না কোনদিন তাকে হার মানতে হয়। কামিনীর বেশি কথা বলার মনের জোর ছিল না। রাধী তাকে কথা দিয়ে পিষে দিয়ে চলে গেল। সেই থেকে গঁড়ার যত রাগ রাধীর উপর। ছুঁতোনাতায় সে গায়ে হাত তোলে বউটার, চুল ছিঁড়ে উড়িয়ে দেয় হাওয়ায়, আবার যদি ওমুখো হবি তাহলে তোর লাশ আমি পুঁতে দেব পুকুরপাড়ে। কেউ আমার কিছু করতে পারবে না। শুনে রাখ, কামিনী আছে বলেই আমি বেঁচে আছি। সে যদি কোথাও চলে যায়—তাহলে তার পর দিন থেকে তুই আমার টিকিটাও দেখতে পাবি না।

জেদে টইটুম্বুর গঁড়ার জীবন, ভালবাসার জন্য সে কাঙাল। কামিনীকে পাবার জন্য সে জীবন বাজি ধরতে রাজি আছে। এত যার জেদ, তার সম্মুখে কীভাবে দাঁড়াবে রাধী? হেরো মানুষের গলায় সে পবনকে বলল, ঠাকুর পো, একবার চেষ্টা করে দেখো না—যদি তুমি তাকে ফিরাতে পারো। আমি তো বলে বলে গলা শুকিয়ে ধুঁকছি। সে এখন আমাকে সহ্য করতে পারে না। আমি তার দু-চোখের বালি। আমার দিকে সে ভুল করেও তাকায় না।

পবন চুপ করে থাকলেও এই সমস্যার সঙ্গে সে অনেক আগে থেকেই পরিচিত। সুভদ্রার চোখের নীচে যে দুঃশ্চিন্তার অন্ধকার আছে তা যেন রাধীর চোখের কোণে উঠে এসেছে। নিজেকে যে সান্ত্বনা দিতে পারেনি সে অন্যকে সান্ত্বনা দেবে কীভাবে।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে পবন বলল, কমিনীদিকে আমি দেখেছি। সে খুব চালাক-চতুর মেয়েছেলে। তার যেমন রূপ আছে তেমনি আছে কথার বাঁধন। জীবনে সে সুখ পায়নি। পালানন্দা তার সঙ্গে ঘর করল না। সারা জীবন সে একা থাকবে কী করে? তাই গঁড়াদাকে আঁকড়ে ধরেছে। সে যখন একবার ধরেছে—তখন কি সহজে ছাড়বে। ভালবাসা যে কাছিমের কামড়ের চেয়েও মারাত্মক।

পথ ফুরিয়ে আসে কথায় কথায়। রাধী ছেলে কাঁখে নিয়ে চলে গেল তার ঘরে। পবন যুগলবুড়ার ঘরের দিকে তাকাল একবার। দেখতে পেল না তাকে। বুড়োটা কখন ফেরে কখন যে খায়—তার খোঁজ এ পাড়ার কেউ রাখে না। আসলে অনেকেই ভয় পায় তাকে। কুষ্ঠ যে দুরারোগ্য রোগ নয়—এই সরল সত্য এ পাড়ার অনেকেরই অজানা। পবনও কি জানত এসব! দুলুবাবু সব শিখিয়েছেন। মালাও জ্ঞান দেবার বেলায় পাকা বুড়ি। প্রায়ই এমন কথা বলে যা পবনও জানে না।

রোদের ফুল ফুটেছিল সর্বত্র। বাঁশ ডগালে চিতে ঘুঘু ডাকছিল একনাগাড়ে। সেই ক্লান্তিকর এক-টানা ডাকে ঘুমের আমেজ বিদ্যমান। পবন সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে রাখল বেড়ার একধারে। দূর থেকে তার নজরে পড়ল দাওয়ায় কে যেন বসে আছে। সুভদ্রা আর মেনি মুখোমুখি বসে গল্প করছে তার সাথে। ক'পা আসার পরেই পবন চিনতে পারল আশালতার মুখটা। সহসা মনে পড়ে গেল বেলদার সেই মিষ্টি দোকানটার কথা। সে ভাবেনি আশালতা এমনভাবে সাহসে বুক বেঁধে হাজির হবে তাদের ঘরে। পবন অবাক না হয়ে পারল না। দাওয়ার উঠে এসে সে চারিদ্দিকে তাকাল, তার আগে আশালতা মাদুর ছেড়ে উঠে এল তার কাছে, চোখের ভ্রু টানটান করে বলল, আমি চলে আসব ঘর পর্যন্ত তুমি ভাবতে পারছো না তাই না? মধ্যবয়স্কা আশালতার গলায় ফুটে উঠল অভিমান, কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে বলল, এদিকেই এসেছিলাম, কী মনে হতেই নেমে পড়লাম বাস থেকে। ভাবলাম—তোমাদের সাথে দেখা করে যাই।

এক একজনের উপস্থিতি বিরক্তির উদ্রেক করে মনে, পবন যথাসম্ভব বিরক্তি এড়িয়ে শুধোল,'বাবার কি কোন খবর পেলেন?

—না। গম্ভীর হয়ে গেল আশালতা। চোখের মণিদুটো কেমন অনুজ্বল দেখাল তখন। পবনের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সে বলল, আমি আসাতে তুমি খুশি হওনি বুঝতে পারছি। তোমার খুশি না হবার কারণ আছে যথেষ্ট। চিবুকের নীচের অংশ, গলা এবং ঠোঁট কেঁপে উঠল আশালতার, কুঁচো চুল কানের পাশে ফড়ফড়িয়ে উঠল ঘাস ফড়িংয়ের মত, জোড়া চোখের চাহনি অদ্ভুত বিষণ্ণতায় ভরা, তবু সে শরীর ঝাঁকিয়ে বলল, না এসে পারলাম না তাই চলে এলাম। তবে তোমার আর সময় নষ্ট করব না। আমাকে এগরায় ফিরে যেতে হবে। সেখানে আমার অনেক কাজ আছে। মেনি কিছুদূরে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল ওদের, সে এগিয়ে এসে বলল, না মাসী, আজ তোমার যাওয়া হবে না, কাল ভোরের বাসে যেও।

ছাব্বিশ

শীত পড়ে গেল, হিম সবুজ গাছের পাতায় সূর্যের আলো উত্তাপ নিংড়ে দিযে পালিয়ে যায দ্রুত। চারিদিকে ঘন কুয়াশার আবরণ, মায়াময়—স্বপ্নিল কুয়াশার পরী হাওয়ার সংগতে নেচে নেচে ধানমাঠ পেরিয়ে চলে যায় দিকচক্রবালের আড়ালে। নিঃসঙ্গ রাতে হিম ঢেলে দেয় জ্যোৎস্না, সারারাত জ্যোৎস্না-ফুল ফুটে থাকে থৈ-থৈ। অথচ মাত্র ক'দিন আগেও আঁধার ছিল মহিষকালো। শীত হাওয়ায় খোঁচা ছিল শীতের। কানাই ডাক্তারের দুয়ারে মহোৎসবের সংবাদটা আগেই শুনেছিল এ পাড়ার অনেকেই। পবন মাসের উপর কর্মহীন হয়ে বসে আছে। সাইকেলের টায়ার-টিউব বদলাতে হবে। পুরো সাইকেলটার খোলনলচে পাল্টে না ফেললে ওটা আর ব্যবহারের যোগ্য হবে না কোনদিনও। বুড়ো ঘোড়াকে দানা খাওয়ালেও সে আর যৌবনকালে ফিরে যেতে পারে না, তেমনি অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে পবনের লঝ্‌ঝড় সাইকেল।

সেদিন দীঘা থেকে ফেরার সময় পুলিশে তার সব মাল কেড়ে নিল। একটা বালিগড় সে লুকিয়ে কিনেছিল তালসারি থেকে। ইচ্ছে ছিল—হাটে বসে বেচবে। অনেকদিন এ অঞ্চলের মানুষ বালিগড় খায়নি। পবন মনে মনে লাভের অঙ্কটা কষে রেখেছিল। কিন্তু চেকপোস্ট পেরুতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল সে। মাছ ভর্তি ঝুড়িটা পুলিশের হাতে সঁপে দিয়ে সে কোনমতে প্রাণে বেঁচে ফিরে এল। ঘরে এসেও তার সেই ভয় মোছেনি। এত টাকার মাছ নিজের ভুলে ক্ষুইয়ে এসে মেঘলা আকাশের চেয়েও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঘরের দাওয়ায় পিঠ দিয়ে বসেছিল পবন। মেনির স্বভাব ফাটা শিমুল তুলোর মতন, সে সবকিছু শোনার পরেও রাঙা ঠোঁটে দুষ্টু হাসির ঢেউ খেলিয়ে বলল, ভালই হয়েছে, তোকে আর এই হাড়কাঁপান শীতে পেটের জন্য ঘরের বাইরে যেতে হবে না। শীতকালটা চলে যাক, তারপর নয়ত ব্যবসার কথা ভাবা যাবে। শীতকালে তো মানুষ ঘরে বসে আরাম করে। দেখিস না—কোণাব্যাঙ কেমন শীতকালে জুবুথুবু হয়ে নিদ যায়। মেনির কথা শুনে প্রাণখোলা হেসে উঠতে পারেনি পবন। দুঃশ্চিন্তায় গ্রহণ লেগেছে তার মুখমণ্ডলে। ব্যবসা না করলে সংসারের খরচ চলবে কী ভাবে এই নিয়ে তার যত ভাবনা। মেনি সহজ গলায় বলল, যার ভাবনা সে ভাববে, তুই ভেবে ভেবে মাথা ভেঙে ফেললেও কূল-কিনারা পাবি না। তার চেয়ে যা কানাই ডাক্তারের ঘর থেকে মহোৎসব খেয়ে আয়। শুনতে পাচ্ছিস না, খোল বাজছে হরিতলায়।

পবন কান খাড়া করে খোলের শব্দ শোনার চেষ্টা করেছিল। মন ভালো না থাকলে পৃথিবীর কোন শব্দই তার কানে ঢোকে না।

বিকেলের পর থেকেই পাড়ায় উৎসবের মেজাজ। রাধী তার চার ছেলে-মেয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে আগেভাগে। প্রসাদ ভোগ খাওয়ার ব্যাপারে সে কোনমতে ঝুঁকি নিতে চায় না। গঁড়া আজকাল রাতে ঘরে ফেরে না, রমণীবুড়ার চুল্লু ঠেক হয়েছে তার মাথা গোঁজার ঠাঁই। রাধী বেশ কয়েকবার ডাকতে গিয়ে মার খেয়ে ফিরে এসেছে। গঁড়া বলেছে, আমি আর ঘর যাবো না। ঘরে আমার শান্তি নেই। চৌকিদার আসে রোজ রাতে। সকালে উঠে হাজিরা দিতে হয় থানায়। এর চেয়ে আমার পালিয়ে বেড়ানোই ভাল। সবাই মিলে আমার জীবনটাকে ঝাঁঝরা করে দিল।

ফি-সকালে রাধীর ঘুম ভাঙলে মড়াকান্না কাঁদে। পাড়া পেরিয়ে তার কান্না চলে যায় হাটখোলায়। সে কাঁদে, কিন্তু চোখের জল পড়ে না। তার সুর করা কান্নায় মিশে থাকে কান ঝালাপালা গালিগালাজ। সে রোজ নাম উল্লেখ করে দু'জনের বংশ লোপ পাওয়ার অভিসম্পাত দেয়। ভজনলাল চৌকিদার এবং কামিনীকে সে রোজ গাল দেয় মনের জ্বালা জুড়াতে। যুগলবুড়া রাধীকে বুঝিয়েছে, গাল-মন্দ করে কিছু হবে না। গঁড়ার বিচার হবে পাড়ায়। ওকে তুই যে করেই হোক ধরে আন। তারপর ওর মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে আমরা ছাড়ব। কী ভেবেছে ও। গাঁয়ে কি ধর্ম বলতে কিছু থাকবে না!

সন্ধের পরে গুটি গুটি তারা ফুটেছিল আকাশে। বুনো ফুলের গন্ধে আমোদিত ছিল বাতাস। ফাঁকা ধানমাঠ থেকে উঠে আসছিল শীতের লহর। আঁধার পথ বলে পুরনো সাইকেলের টায়ার ধরিয়ে নিয়েছে পাড়ার সদ্য জ্ঞানপড়া ছেলে-মেয়েরা। রবার পোড়ার গন্ধে নাক টিপে ধরেছে হৈমবুড়ি। সবাইকে সাবধান করে বলল, খসা আগুন যেন পায়ে না পড়ে বাবাসকল। গায়ে লাগলে মাংস তুলে নেবে একেবারে। সাবধানে চল। পথ আলো করতে গিয়ে যেন জীবন কালো করে ফেলিস নে।

হৈমবুড়ির কথাকে গুরুত্ব দেয় দলের সবাই। বাসি খাওয়ার দিনে ওরা বুড়ির সঙ্গ ছাড়ে না। হৈমবুড়ি থাকে সবার আগে। তার পিছনে পাড়ার যত ছেলেবুড়ো। বাসিভাত মেঙ্গে খায় ওরা। এটাই চলে আসছে বহুবছর থেকে। সে রেওয়াজে ছেদ পড়েনি এখনও। বাবুপাড়ার মানুষগুলো ওদের হাত উজাড় করে বাসি খাওয়ায়। উঠোনে পাত পেড়ে দেয় সারি সারি। কাঁচা কলাপাতার উপর জল নিংড়ানো ভিজে ভাত। ডাঁটা শাক-চচ্চড়ি। সাতভাজা। আলুমাখা। বরাত ভাল হলে আলু-কুমড়োর ঘ্যাট। পেটভরে খেয়ে বাদবাকি বেঁধে নেয় পাতায়। ঘরে গিয়ে অবসরমত খাবে এমন ইচ্ছা।

এ বছরও হৈমবুড়ি গিয়েছিল দলবল নিয়ে। পবন জানতে পেরে রাগারাগি করল, কেন যাবে পরের দুয়ারে ভিখ মাঙ্গতে? এখন আর এসব চলে না।

হৈমবুড়ি ফোকলা মাড়ি দেখিয়ে হেসেছিল, এটা একটা নেশা রে। বাসি কুড়োতে না গেলে পাড়ার যে মঙ্গল হবে না। এ সংসারে কে কাকে খাওয়ায়, কে কাকে ভিখ দেয়! যে যার আপন ভাগ্যে খায়, বাঁচে।

টায়ারের আলোয় গ্রামের কাঁচা পথ আলোকিত, শহুরে পথের চেয়েও বর্ণহীন কম নয়। রবার গলে গলে পড়ছিল হাওয়ায়, যেন জ্বলন্ত তারা খসে পড়ছিল অসীম আকাশ থেকে। পবনও কানাই ডাক্তারের ঘরে গিয়েছিল মহোৎসব খেতে। ঠাকুরের প্রসাদ পেটে না পড়লে সারা বছর ভাল যাবে না মানুষের, পবন ভয়ে-ভয়ে কানাই ডাক্তারের আঙ্গিনায় গিয়েছিল নি[illegible]র মঙ্গলের কথা ভেবে। তার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না আদৌ, সুভদ্রা তাকে জোর করে ঠেলে পাঠাল। ফেরার পথে হাটখোলার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল পবন। মনে পড়ে গেল, মুক্তা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন লোক মারফৎ। বিশেষ দরকার। কী দরকার পবনের সঙ্গে? যাকে মুক্তা এড়িয়ে চলেন, কথা বলেন না, সামান্য ঘৃণার চোখে দেখেন—সেই পবনের সঙ্গে তার কী দরকার থাকতে পারে? মাথা চুলকে পবন আকাশ দেখল। শীত হাওয়া চাবুকের মত আছড়ে পড়ছিল গায়ে। খদ্দরের চাদরটা ভালমতন গায়ে জড়িয়ে নিয়ে পবন ভাবল, এখনই একবার দুলুবাবুর ঘর থেকে ঘুরে আসা দরকার। মুক্তা ডেকেছেন যখন, তাকে তো এড়িয়ে-যেতে পারবে না। মুক্তাকে অপমান করা তো দুলুবাবুকেই অপমান করা।

পাড়ার ছেলে-মেয়েরা হৈ হৈ করে ঢুকে গেল ঘরের ভেতর। হৈমবুড়ি বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে বলল, তুই ঘর যাবি নে পবন? ঘাড় নাড়ল পবন, ঢোক গিলে বলল, আমি দুলুবাবুর ঘরে যাব এখন। মাকে বলো খেয়ে নিতে, আমার ফিরতে রাত হতে পারে।

—বেশি রাত করবি নে। প্রথম শীতের হাওয়া শরীরের পক্ষে ভাল নয়। হৈমবুড়ি চলে গেল সতর্ক করে। পবন ভাবল—মালার সঙ্গে তার কতদিন দেখা হয়নি। মালাকে দেখলে পবনের উৎসাহ উদ্দীপনা

বেড়ে যায় হাজার গুণ। মালা তার চেয়ে বয়সে তিন-চার বছরের ছোট হবে, কিন্তু কথা বলে আদর্শ শিক্ষিকার মত॥ ভগবান মেয়েদের মধ্যে সহজাতভাবে এমন কিছু গুণ প্রদান করেন যা কোন পুরুষের মধ্যে থাকে না। যা শুধু প্রকৃতির মাঝে নজর বুলালে দেখা যায় নির্জনে ফুটে ওঠা বনফুলের মত। মিহি মিঠে সুগন্ধ ফুলের নির্যাস হয়ে মিশে থাকে প্রতিটি নারী মনে। তাই নারী মন কুসুমকানন, যে কাননের খোঁজ পেতে গেলে পুরুষকে হতে হয় সরল বৃক্ষসমান।

মালা ঘরে ছিল না, কী কাজে যেন কাঁথি গিয়েছিল সে, মুক্তা আলো হাতে এলেন পবনের সামনে, আসো, বসো। তোমাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি একটা বিশেষ দরকারে। আজ মালা নেই, তোমার বাবুও নেই। ভালই হল। মুক্তা থামলেন, গলা ঝেড়ে নিলেন, তারপর খুবই নিস্তেজ ভঙ্গিতে বললেন, তোমাকে যেজন্য ডেকেছি—সেই কথাটা যে কী ভাবে বলব তাই ভাবছি...। কথা শেষ না করে মালা পবনের দিকে তাকালেন, ইতস্তত করে বললেন, এ গ্রামের অনেকের চেয়ে তোমাকে সৎ এবং বিশ্বাসী বলে মনে হয় আমার বিশ্বাস, তুমি আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনবে। এবং আমাকে ভুল না বুঝে সাহায্য করবে।

দীর্ঘ অনাবশ্যক ভূমিকায় পবন মনে মনে বিরক্ত। একটা কাঠের টুলের উপর সে বসে আছে মুখ নীচু করে। মুক্তা চেয়ার সরিয়ে এগিয়ে এলেন তার সামনে, শরীর থেকে আড়ষ্টতা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন, তারপর নীচু গলায় বললেন, তুমি আমার ছেলের মত। তোমাব কাছে এসব কথা বলতে আমার সংকোচ হয়। তবু বলছি—কেননা তুমি এ বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছ।

পবন মন দিয়ে শুনছিল, মুক্তার সামনে তার বসে থাকাটাই অস্বস্তিকর, তবু সে বলল, আপনি যা বলতে চান আমাকে বলতে পারেন নির্দ্বিধায়। আমি কারোর কাছে তা বলব না।

—হ্যাঁ, আমি ঠিক এটাই চাইছিলাম শুনতে। মুক্তা শরীর দুলিয়ে হাসলেন, তার বয়স্ক গালের চামড়া কুঁচকে গেল হঠাৎ, আমি মালার সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে চাই। তুমি কি জান—মালা এখন কী করে বেড়াচ্ছে। সে প্রেমে পড়েছে। কলেজে যাওয়ার নাম করে সে সিনেমায় গিয়ে বসে থাকে। ও যাকে ভালবাসে সেই ছেলেটা একটা লোফার। ওর নামে পুলিশ কেস আছে। তাছাড়া বাড়ির অবস্থা মোটেই ভাল নয়, দিন এনে দিন খাওয়ার মত। মালা যে ভুল করছে এটা সে মানতে চায় না। আমি কিছু বললেই সে ধরান্ তুবড়ির চেয়েও জ্বলে ওঠে। আমি যে ওর মা হই এটা সে মানতে চায় না। পবন আমতা আমতা করে বলল, কিন্তু মালা তো অমন মেয়ে নয়। আমি ওকে যতটুকু জেনেছি—তাতে ও যে কোন ভুল করবে এটা আমার বিশ্বাস হয় না। মালা নিজের সম্বন্ধে বড় বেশী সতর্ক।

তুমি যা জানতে তা পুরোপুরি ভুল জানতে। কলেজে যাওয়ার পর থেকে মালা বদলে গিয়েছে। মুক্তার অনমনীয় চোখে দয়ার কোনো চিহ্ন নেই, তিনি রূঢ় কণ্ঠে বললেন, মেয়েরা যে কত দ্রুত বদলে যেতে পারে—সেই অভিজ্ঞতা তোমার নেই। যদি থাকত তাহলে এত সহজে কোন মন্তব্য করতে না।

পবন এমন পাল্টা জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। মুক্তার উষ্ণ কথা বিচলিত করে তুলল তাকে। ভয়ে ছোট হয়ে এল চোখ। উশখুশিয়ে বলল, আমি যা জানি তাই বললাম। তবে আমার বোঝাব ক্ষমতা আর কতটুকু! আমি অতি সামান্য মানুষ, লেখাপড়াও শিখিনি তেমন। তাই উপর থেকে মানুষকে যেমন দেখি, তেমনটাই অনুমান করার চেষ্টা করি। আমার ভুল হতে পারে—এটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি।

—এটা তোমার বোঝার ভুল নয়, তুমি যা বলেছ—এ গ্রামের প্রত্যেকেই মালার সম্বন্ধে একই মতামত দেবে। আসলে ওর মিষ্টি মুখ দেখে সকলে গলে যায়। সবাই গললেও আমি কিন্তু গলি না, এখানেই সবার সাথে আমার পার্থক্য। মুক্তা আবার কথা থামালেন, পবনের মুখের দিকে চেয়ে তিনি কী যেন বোঝার চেষ্টা করলেন, তারপর ধীরে-সুস্থে বললেন, আমার কথা যদি তোমার বিশ্বাস না হয় তাহলে ওকে একদিন তুমি ফলো করে দেখ। তাহলে আসল সত্য তুমি জানতে পারবে। আমি তার

মা। আমি মা হয়ে যখন বলছি, তখন খারাপ কিছু না দেখে কি বলব? আইবুড়ো মেয়ের নামে বদনাম রটলে আমাদেরই তো ক্ষতি হবে। আর সেই ক্ষতি পূরণ করতে এক জন্ম লেগে যাবে।

পবন এত কথার পরেও বুঝতে পারল না মুক্তা তাকে কী কথা বলার জন্য এখানে ডেকেছে। রাত বাড়ছিল। হ্যারিকেনের অনুজ্জ্বল আলোয় পবন দেখল মুক্তার মুখে কালো বাদল ছায়া। মালাকে নিয়ে তিনি যে বেশ চিন্তায় আছেন এটা তার চেহারা দেখলই অনুমান করা যায়। পবনের মনে হল, মালাকে নিয়ে মুক্তা যা ভাবছেন তাতে দুধের বদলে জলই বেশি। যে যেটা খায় তার সেটা ঢেকুর ওঠে। মানুষও গোরুর মত জাবর কাটে সময়ে-অসময়ে। তখন তার বোধ-বিচার শক্তি থাকে না। মুক্তা কি তাহলে মালার উপর বদলা নিতে গিয়ে নির্লজ্জ হয়ে উঠেছেন দিনে দিনে? পবনের ক্ষুদ্র মাথায় কোনকিছুই ঢুকল না, সে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল, আমাকে কী করতে হবে বলুন? আপনি যা বলবেন আমি তা করার জন্য তৈরী আছি।

—তোমাকে তেমন কিছু করতে হবে না। মুক্তা বললেন, তুমি শুধু মালাকে একটু বোঝাবে—ও যে পথে হাঁটছে, সে পথটা সঠিক নয়। সেখানে লোভ আছে, ফাঁদ আছে। সে যেন কোন কিছুতেই জড়িয়ে না পড়ে। তাহলে ওর ক্ষতি হবে। মা হয়ে আমি সেটা চাই না।

মালাকে আপনি বুঝিয়ে বলেছেন? পবন শুধাল।

—হ্যাঁ, বলেছি তো! কিন্তু ও আমার কোন কথা শুনবে না। ওব জেদ ওর বাবার মত। এই জেদই ওর কাল হবে।

—এ আপনি কী বলছেন! পবন আশ্চর্যভরা চোখ মেলে তাকাল। ওব মুখ থেকে কথা ছিনিয়ে নিলেন মুক্তা, আমি যা বলছি ঠিকই বলছি। আমি ওব মা। আমি চাই না ওর সর্বনাশ হয়ে যাক—মুক্তার বুকের ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠল, ভাসমান চোখে সে পবনের দিকে তাকাল অপলক। তারপর গলা খাদে নামিয়ে বলল, তোমাকে কেন ডেকেছি এবার তুমি নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারলে। আজকের আলোচনার কথা তুমি মালাকে বলবে না। যদি বলো—তাহলে ও সতর্ক হয়ে যাবে। আমি জানি—ও তোমাকে ভালবাসে না তবু তোমার জন্য ওর মনে অনেক জায়গা রাখা আছে। তুমি একটু চেষ্টা করলেই ওকে শুধবে দিতে পারবে।

পবনকে গেট অব্দি এগিয়ে দিতে এলেন মুক্তা। আবছা আলো আঁধারীর মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, তোমাকে একটা কথা শুধোই। এটাও খুব গোপন কথা। আমার এক বান্ধবীর চরম বিপদ। ও আবার মা হতে চলেছে। তোমার তো কানাই ডাক্তারের সাথে জানা-শোনা। দে- না সে যদি সন্তানটাকে নষ্ট করে দিতে পারে। ওরা তো খুব গরীব। তাছাড়া অনেকগুলো বাচ্চা-কাচ্চা। ওরা আর সন্তান চায় না।

পবন বোকার চোখে তাকাল, নিজের কানকে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। মুক্তার মুখ থেকে এমন ধরনের কথা তাকে শুনতে হবে—জীবনে সে ভাবেনি। এমন কথা শোনার জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তার বুকের ভেতরে ঝড় শুরু হল এলোপাথাড়ী। আবছা আঁধারে সে আর একবার মুক্তার মুখের দিকে তাকাল। তাকে সন্দেহ করার কোন চিহ্নই সে খুঁজে পেল না। সে এ-ও বুঝে পেল না—মুক্তাকে সে কী ভাবে সাহায্য করবে।

—খুব অসুবিধা হলে বলার দরকার নেই। মুক্তা সহজ চোখে তাকালেন, আমি বরং তাকে বলে দেব কাঁথির নার্সিং হোমে চলে যেতে। সেখানে গেলে মাত্র পাঁচ মিনিটেই ঝামেলা চুকে যাবে। কিন্তু ওরা তো গরীব। নার্সিং হোমে যাবার পয়সা নেই। তাই যদি হোমিওপ্যাথিতে কাজটা হয়ে যায়—সেইজন্যই তোমাকে বললাম।

কথা বলার মত অবস্থাতে ছিল না পবন, তবু সে ঢোক গিলে বলল, রোগী না দেখে কানাই ডাক্তার ওষুধ দেয় না। রোগী যদি আমার সঙ্গে যায়—তাহলে আমি বলে-কয়ে সব ঠিক করে দেব।

মহা ফাঁপড়ে পড়া চোখ করে তাকালেন মুক্তা, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, ডাক্তারের কাছে যাওয়ার মত তার অবস্থা নেই। সে লজ্জায় মরে আছে। তাকে আর মারা ঠিক হবে না। মুক্তা আড়চোখে নিজের দিকে তাকালেন, দূর আকাশের তারার মত কেঁপে উঠল তার চোখের তারা। ঠোঁটের কাছে ঝুলে থাকল সত্য।

সাতাশ

গায়ে কেরোসিনের গন্ধ, এলোমেলো চুল, দৃষ্টিতে বিছিয়ে ছিল ভয়, তবু নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেছিল রেণু। পারল না, ধরা পড়ে গেল কেতকীর চালাক নজরের কাছে। দোক্তা দেওয়া পান চিবুতে-চিবুতে কেতকী তাকে অস্থির করে তুলছিল প্রশ্নবাণে। সব প্রশ্নের উত্তর সহজভাবে দেওয়া যায় না। রেণুও পারেনি। তার গ্রামে থাকা মনটা গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার পরই ডুকরে উঠেছিল তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে। যা সে করেছে তার জন্য সে মনে মনে অনুতপ্ত নয় বরং সে গর্বিত। পড়ে পড়ে মার খাওয়ার জন্য তার জন্ম হয়নি এটা সে বুঝিয়ে দিয়েছে লেখাপড়া শেখা জয়ন্তকে। ধর্মের কবচ পরে অধর্মের সাধনা হয় না—এটা তাকে জানানোর প্রয়োজন ছিল। সেকাজে সফল হয়েছে রেণু। তার এখন আর কোন দুঃখ নেই। তিন ভুবনে যার কেউ নেই সে আবার দুঃখ পাবে কিসের জন্য। বাস গ্রাম ছাড়ার পর থেকেই রেণুর মনে পলি পড়ার মত জমতে থাকে আত্মতৃপ্তির প্রলেপ। একটা শয়তানকে সে জব্দ করতে পেরেছে—এটাই এখন তার একমাত্র সান্ত্বনা। পরে কী হবে সে তো পরের ব্যাপার। তবে বসন্ত জানার জন্য কষ্ট হল রেণুর। বুড়োটাকে সে চলে আসার পরে আর কেউ দেখার থাকল না। আবার একা হয়ে গেল বুড়োটা। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল রেণু। মাঠ পালান হাওয়ার গায়ে জড়িয়ে গেল শীত। কেতকীর গা ঘেঁষে বসে সে তাড়াতে চাইল শীত। শীত যায় না, শীত জড়িয়ে থাকে। ভয় যায় না, ভয় জেঁকে বসে। কেতকী বলেছিল, তুই যে এমন হঠাৎ করে চলে আসবি—এটা আমাব ধারণার বাইরে ছিল। এসেছিস ভাল করেছিস। গাঁয়ে কী আছে বলতো? দুটা দিনের জন্য বেড়াতে আসি তবু মন বসাতে পারি না ওখানে। কলকাতার মজাই আলাদা। তুই একবার গেলে আর আসতেই মন করবে না।

হা-করে কেতকীর কথাগুলো শুনছিল রেণু, তারপর নিজেকে স্বাভাবিক করে বলেছিল, আমি কলকাতা কোনদিন দেখিনি মাসী। তবে অনেকের মুখে গল্প শুনেছি কলকাতার । গল্প যখন শুনতাম—তখন ভাবতাম আমি কি কোনদিন কলকাতায় যেতে পারব? আমার সেই গোপন ইচ্ছে এতদিন পরে পূরণ হল। তোমার সাথে দেখা না হলে আমি কি আসতে পারতাম? ভগবান ঠিক সময় তোমার সাথে আমার দেখা করিয়ে দিয়েছে।

—হ্যাঁ, তা তো বটেই। কেতকী মুচকি হাসল। ওর গায়ে কমা পাউডারের গন্ধ। চেহারায় এমন বিকট স্থূলতা যা কেবল কুনোব্যাঙ গুলোকে মানায়। এত বয়সে কেতকী তার চুল কেটে ফেলেছে ছোট করে। জুলফি চুলগুলো কপালের উপর পড়েছে বিশ্রীভাবে। কানের পাশেও আঁকশি চুলের কেরামতি। ওর কানের দুল দুটো বেঢপ, মোটে মানায় না কানের সাথে। পরনের শাড়িটারও কটকটে রঙ। কালো রঙের সাথে অমন শাড়ি বিশ্রী দেখায়। তবু কেতকীর পাশে বসে যেতে সঙ্কোচ হয় না রেণুর। বাসের হেল্পার কেতকীর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হবে, তবু চোখের ইশারা করে হাসল। কণ্ডাক্টরের সঙ্গে চোখে চোখে ইশারা করে কী যেন বলল। তাদের চাহুনি ভাল লাগল না রেণুর। সে তখন অন্য চিন্তায় ডুবে ছিল। জয়ন্ত যদি না বাঁচে তাহলে রেণুর দশা কী হবে? যেভাবে পুড়ে গিয়েছিল সে, তাতে বাঁচার

আশা খুব কম। রেণু মনে-প্রাণে চাইল জয়ন্ত যেন না বাঁচে। সে যদি বেঁচে থাকে তাহলে অনেক মেয়ের সর্বনাশ হয়ে যাবে। বগলে ছুরি নিয়ে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের বোঝা খুব মুশকিল। তারা জাত সাপের চেয়েও ভয়ংকর। তারা চোরাবালির চেয়েও বিপজ্জনক। রেণুর শুধু মনে হচ্ছিল—কেউ বুঝি তার পিছু নিয়েছে। একটা অদৃশ্য দীর্ঘ ছায়া বুঝি এগিয়ে আসছে তাকে ধরতে। যতই এগিয়ে আসুক—রেণু কারো কাছে ধরা দেবে না। সে পালিয়ে যাবে, যতদূর চোখ যায় ততদূর পালিয়ে যাবে। আলু-পটল-কুমড়োর মত সে সহজে বিকোবে না।

বাস কোলাঘাটে দাঁড়াতেই কেতকী বলল, এবার একটু হাত পায়ের গিঁটগুলো ছাড়িয়ে নে। মনে হচ্ছে, ন'টার মধ্যেই পৌঁছে যাবো। ভোর ভোর আসার এই এক সুবিধা।

ভাষাহীন চোখে তাকিয়ে থাকল রেণু, দিনের আলোয় সে আর একবার নিজের দিকে তাকাল। নুয়ে পড়া হোগলা গাছের চেয়েও দুর্দশাগ্রস্থ তার চেহারা। ফুটফুটে রোদ এসে পড়েছে মুখে। অতি সাধারণ একটা শাড়ি পরে আছে সে। পাড়ে লেগে আছে মাঠের কাদা। সে যখন বসন্ত জানার ঘর ছেড়ে পালিয়ে এল তখন তার কোনো মাথার ঠিক ছিল না। কোথায় পা ফেলতে কোথায় ফেলেছে। চযে দেওয়া গতরটা তার এবড়ো-খেবড়ো। শুলানীর মত ব্যথা উঠছিল পায়ের বুড়ো আঙুল ছুঁয়ে একেবারে মাথার তালুতে। এই অনুভূতি জীবনে তাব প্রথম। এই প্রথম তার শরীর চাটল কোনো কুকুরে। বুক উজাড় করে ঠেলে আসছিল কান্না, তবু সে হাতের আঙুলগুলো চিরুনি বানিয়ে উড়ন্ত চুলগুলো সপাট করার চেষ্টা করল। তখনই কেতকী তার হাতে ধরিয়ে দিল মুড়ির ঠোঙা, খা। এখনও অর্দ্ধেক পথ বাকি। বাস যেমন যাচ্ছে তেমন গেলে নটার মধ্যে পৌঁছাব। ভালই হলো, তোর সাথে সবার দেখা হয়ে যাবে—

—কার সাথে মাসী?

—তুই যাদের ঘরে কাজ করবি তাদের সঙ্গে।

—আমাকে কি-কি কাজ করতে হবে? রেণুর চোখে উদ্বেগজনিত কাঁপুনি। কেতকী তার মন বুঝে বলল, তোর ভয় পাবার কিছু নেই। কলকাতার মানুষ তোদের গাঁয়ের মানুষের চেয়েও ভাল। ওদের মন আকাশ সমান। তুই ওদের মন জয় করতে পারলে রাণীর মত থাকবি।

—রাণীর মত থাকব! রেণুর চোখের তারা থেকে গড়িয়ে পড়ে বিস্ময়, ঘরের ঝি-ও রাণীর মত থাকে সেখানে? কী বলছ গো মাসী। আমার যে বিশ্বাসই হচ্ছে না।

—বিশ্বাস না হবারই কথা। আমারও কি হয়েছিল প্রথমে। যত দিন গেল, ততই আমার বিশ্বাস বাড়ল। কেতকীর পান-চিবান ঠোঁট ফুলে উঠল গর্বে, তোর মায়ের দুঃখ দেখে আমিও তাকে আসার কথা বলেছিলাম। সে তো রাজি হল না। যদি রাজি হোত তাহলে কি এত ঝটপট মরত? ভিক্ষার চালে পেট ভরে না, জীবন ভরা তো দূরে থাক। তোর মা বৈষ্ণব বলে মনের মধ্যে গর্ব ছিল। সেই গর্বই তাকে শেষ করে দিল অসময়ে। রেণু বিরক্তির চোখে তাকাল, মায়ের কথা বাদ দাও। মা যা ভাল বুঝেছে তাই করেছে। আমি যা ভাল বুঝব—তাই করব। কাউকে কোন বিষয়ে জোর করা ঠিক নয়।

কেতকী কী আঁচ করে ফণা তোলা সাপের মত ফুঁসে উঠল, সব সময় নিজের বুদ্ধিতে চললে চলে না। ছোট-বড় তার সবার কথাই শোনা দরকার। যে ভাববে—তার মত দুনিয়ায় আর কেউ নেই, দুনিয়া ছেড়ে তার পালাবার সময় হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। তার প্রমাণ তোর মা।

শুকনো মুড়ি চপ দিয়ে খেতে গিয়ে গলায় বেধে গেল রেণুর। শুকনো লঙ্কার খোসা চপ খেতে গিয়ে আটকে গেল গলায়। খকখক কাশি হল বার কয়েক। চোখের তারা চকচকিয়ে উঠল জলে ভিজে। কেতকী সাবধান করে বলল, দেখে-শুনে খা। তোকে দেখে মনে হচ্ছে জীবনে তুই বুঝি চপ-মুড়ি খাসনি।

লজ্জিত চোখ তুলেই তাকাতেই চোখের জল দু-ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। কেতকী কাছে সরে এসে হাত রাখল ঘাড়ে, মৃদু চাপ দিয়ে বলল, গাঁয়ের কথা মনে করে বুঝি চোখে জল এল? মুছে নে চোখের জল। কাঁদিস নে। কেন কাঁদবি, কার জন্য কাঁদবি? এ সংসারে তোর কে আছে? কেউ নেই। তুই এখন নিজেই নিজের রাজা। আনন্দ কর। হাস। জীবনটাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ কর। আমি তোর সঙ্গে থাকব। আমার যা নেই, তোর তা আছে। তোর যা আছে বয়সকালে আমার তা ছিল না। যদি তোর মত থাকত—তাহলে পাকা বাড়ি করে ফেলতাম কলকাতা শহরে।

রেণু ধরা পড়া গোরুচোরের মত মুখ করে শুনল কেতকীর কথাগুলো, কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও সে কোনো কথারই অর্থ বুঝতে পারল না। ড্রাইভার সীটে বসে হর্ন দিতেই ওরা ছুটে গেল বাসের কাছে। বাস ছেড়ে দেওয়ার পরেই পানের ডিবা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বের করে আনল কেতকী, পুরো একটা পান মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে সে বলল, পান খেলে ঠোঁট রাঙা হয়। বিষ খেলে হয় নীল। আর চুমা খেলে ঠোঁটের যে কী রঙ হয় তা তুই জীবনে কোনোদিন দেখেছিস?

লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছিল রেণুর। এ কী শুনছে সে মায়ের বয়েসী মহিলার কাছ থেকে? কানে বিষ পিঁপড়ে কামড়ে দেওয়ার মত যন্ত্রণা হল। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে আবার বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেরাল রেণু। বাইরের হাওয়ায় আবার ভরে উঠল চোখ। হাওয়ায় ঝরে পড়ল অশ্রুবকুল।

কলকাতা শহরের রূপের কোন সীমা নেই, যেমন সাজাবে মানুষ—সে তেমন সাজবে। হাওড়ার ব্রীজ পেরনোর সময় কেতকী তাকে ঠেলা মেরে বলেছিল, মা গঙ্গাকে প্রণাম কর। আজ থেকে তোর সব পাপ ধুয়ে গেল গঙ্গার জলে। এবার থেকে তুই অন্য রেণু।

রেণু অবাক হয়ে শুনল কেতকীর কথা, ধড়াস ধড়াস করে উঠল বুক। ট্রামে চেপে কালীঘাটের দিকে যাওয়ার সময় সেই একই শব্দ শুনতে পেল সে। ভয় এসে হলুদে করে দিল মুখ। কলকাতার হাওয়া এসে সরিয়ে দিল আঁচল। রেণুর মনে হল, হাওয়া নয় কামুক জয়ন্ত হাত রেখেছে বুকে। জ্বর দেখছে শরীরের, মনের। কিছুতেই হাত দিয়ে সে উঠাতে পারছে না আঁচল। পুরো অবশ হয়ে গিয়েছে দুটো হাত। কেতকী মেয়ে হয়েও মুগ্ধ-বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে সেই অনুপম সৌন্দর্য চাখবার জন্য। ট্রাম গড়াতেই কিছুক্ষণ পরে হুঁশ ফিরে পেল রেণু। ধাতস্থ হয়ে সে চেষ্টা করল নিজেকে ঢাকার। যেন কিছু হয়নি এমন মুখ করে কেতকী বলল, কালীঘাটের মা-কালী খুব জাগ্রত। ওখানে যা মানত করবি—তাই ফলে যাবে। আমি তোকে বিকেলে মন্দিরে নিয়ে যাবো। কি রে যাবি তো?

ঘাড় নাড়ল রেণু, ওর সারা শরীরে পথক্লান্তির ছাপ নজরে পড়ল কেতকীর। ঘাড়ের কাছে লুটিয়ে থাকা চুলগুলোতেও ধরা পড়ল রুক্ষ মলিনতা। ফাঁকা সিঁথি টানটান পথ, তবু এলোমেলো, বুকের কাছে কুঁচকে থাকা কাপড় এই কলকাতা শহরে বড় বেমানান মনে হল কেতকীর।

ট্রাম চলছিল মন্থর গতিতে, রাস্তার দু-পাশে ঘরের জঙ্গল, থিকথিকে মানুষের ভিড়ে রেণুর চোখ চলে গিয়েছিল দূরে। এত বড় বড় বাড়ি সে কি এর আগে কোনদিন দেখেছে? তার দৌড় তো দীঘা-এগরা পর্যন্ত। এখনও সে খড়্গপুরের রেল শহর, এমন কি রেল গাড়িও দেখেনি। ট্রাম যত এগোয়, ততই বিস্ময়বোধের অযাচিত বাষ্প এসে জড়ো হয় চোখের কোণে। চলমান উজ্জ্বল নরনারীর ভিড়ে সে যদি ছিটকে পড়ে কোনদিন, তাহলে কি গাঁয়ে ফেরার পথ খুঁজে পাবে কোনদিন? অসম্ভব। রেণুর ভেতর থেকে আরেকটা রেণু বলে উঠল, এ জায়গা তোর নয়। এখানে তুই রাণী হয়ে থাকতে পারবিনে। এর চেয়ে গ্রামই তোর ভাল। সেখানে তুই ফিরে যা। কী ভাবে ফিরবে রেণু। হাঙরের মুখে পা ঢুকে গেলে ছাড়ান যায় না। তবে কি সে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে হাঙর কলকাতার পেটে।

রোদ ঝলমলে শহরের আকাশে পাখি উড়ে বেড়ায় গ্রামের মত। এই রোদ গ্রাম-শহরে এসে জাঁকিয়ে বসেছে। এখানকার মাটির সাথে নাড়ির যোগ আছে গ্রামের মাটির। গাছপালা যা আছে—সবই তো

রেণুর চেনাজানা। তবু কেন ভয় করছে তার, বারবার ভেতরে ঢুকে যেতে চাইছে চোখ। কেতকী তাকে অভয় দেয়, প্রথম প্রথম মন খারাপ করলেও পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। কলকাতার মায়া ভীষণ মায়া। এর ভালবাসা গাবের কষ, গায়ে একবার লাগলে আর ছাড়তে চায় না। তুই মন খারাপ করবিনে। আমি যা বলব শুনবি। তাহলে তোর আর কোনো অসুবিধাই থাকবে না। রেণু বাধ্য পাখির মত শোনে কথাগুলো, যতই শুনুক—মন তবু ছুটে চলে যায় মাঠের মাঝখানের ঘরখানায়, বসন্ত জানার চেনা উঠোনে। আজ যে তার কলকাতায় পালিয়ে আসা—এর পেছনে মায়ের মৃত্যু যতখানি দায়ী, ঠিক ততখানি দায়ী জয়ন্তর ছিঁড়েখুঁড়ে খাওয়া বাঘের ব্যবহার। আর একজনকে সে ক্ষমা করতে পারছে না—সে হল পবন। কী এমন দোষ করেছে সে যার জন্য পবন তাকে এড়িয়ে চলে। কারোর অবজ্ঞা অবহেলা মনটাকে বিষাদে ভরিয়ে দেয় রেণুর। তখন শুরু হয় শুধু নিজেকে নিয়ে নিজের ভেতরে ভাঙাচোরার খেলা। সেই খেলা এতই দীর্ঘস্থায়ী, এতই বেদনাবহ—রেণু আর তার চোখের জল আটকে রাখতে পারে না। ঠোঁট ফুলে ওঠে অভিমানে, চোখের সব জল এসে বন্যায় ভাসিয়ে দেয় চোখের পাতা। বুকের ভেতর থেকে শিউলি ঝরে পড়ার শব্দ হয়। পুরো শরীর অবশ হয়ে জিরতে চায় নদীর মত। যেখানে সে এসেছে, সেখান থেকে তার আর ফিরে যাবার পথ নেই। যে পথ যে ফেলে এসেছে সে পথের দিকে ফিরে তাকাবারও সাহস নেই। এত অক্ষম, এত দুর্বল সে আগে ছিল না। মা তাকে সাহস জুগাত দিনভর। চোখে-চোখে রাখত। সান্ত্বনা-ভালবাসার কথা বলত। বলত, মেয়েদের জীবনটা পুতুল নাচের পুতুলগুলোর মতন। হেসে খেলে বেড়ালেও একটা সূক্ষ্ম সুতোর বাঁধন থাকে সর্বদা। ছিঁড়ে গেলে মুখ থুবড়ে পড়ে, আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকে না। আমাকে দেখ, আমি কী ছিলাম—আর কী হয়েছি। তোর বাবা গত হবার পর থেকে কত ঝড় এল গেল। সব ঝড় আমি সমানভাবে সামাল দিতে পারিনি। কত লোকে লোভের নৌকা ভাসাল আমার মনে। আমি সব নৌকো ফিরিয়ে দিয়েছি। ফিরিয়ে দিয়েও কি আমি শান্তিতে আছি? আমিও সেই পুতুল নাচের পুতুল। আমার নিজের বলতে এখন আর কোনো আলাদা সত্তা নেই।

মায়ের কথাগুলো বেশি করে মনে পড়ে রেণুর। বিপদে-আপদে কেমন মুখ শুকিয়ে মা তার দিকে তাকিয়ে থাকত। রেণু পাশে দাঁড়ালে হাত ধরে বসাত কাছে। অদ্ভুত মায়া জড়ানো সেই চোখের দৃষ্টি। কথা বলতে পারত না, শুধু দেখত।

কেতকীর ঘরখানার ছাদ খুবই নীচে, বস্তির ঘরে হাওয়া-বাতাস ঢোকে কম। তবু এই ঘরখানা নিয়ে কেতকীর গর্ব ধরে না, জানিস, কত কষ্ট করে ঘরখানা পেয়েছি। অনেকদিন আছি বলে ভাড়াও কম।

—এটা তোমার নিজের ঘর নয়? রেণুর প্রশ্নে কেতকী অবাক চোখে হাসল, কলকাতায় খুব কম মানুষেরই নিজের ঘর আছে।

—এত বড় বড় বাড়িঘর, এগুলো তাহলে কাদের?

—ওগুলো যাদের, তাদের আমরা চোখে দেখতেও পাইনে। তারা বড়লোক, গাড়ি চাপে। মদ খায়, মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তি করে। তাদের জীবনটাই আলাদা। বোঝাবার চেষ্টা করল কেতকী। রেণু আবার ছুঁড়ে দিল প্রশ্ন, কলকাতার সবাই কি তাহলে মাতাল?

কেতকী অনেক ভেবে-চিন্তে বলল, সবাই মাতাল না হলে কি কলকাতা এমন মাতাল হয়ে থাকে সব সময়? আমার চোখে মাতাল নয়—এমন মানুষ খুব কম চোখে পড়েছে। তবে ওরা মাতাল হলেও মন ভাল। তোদের গাঁয়ের মানুষগুলোর মত কুঁচুটে নয়। এরা প্রাণখুলে হাসে, দু-হাত ভরে টাকা ওড়ায়। অনেক রাত করে ঘরে ফেরে। লাস্ট ট্রাম এদেরকে ঘরে তুলে নিয়ে যায় প্রায় সময়।

বিকেলে মন্দিরে যাবার কথা ছিল অথচ বিকেল পেরিয়ে যাবার পরেও কেতকী এল না তাকে নিতে। দুপুরে ফুটপাতের হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে সে চলে গিয়েছে বাবুর বাসায়। সেই থেকে

একা ঘরে বসে আছে রেণু। মন খাঁচার পাখির মত ছটফটায়। চোখে জল এসে যায় হঠাৎ-হঠাৎ। কেতকী যাওয়ার সময় বলেছে, এই শাড়িটা পরে তুই বাইরে বেরুবি। আমার এই শাড়িটা খুবই পয়মন্ত। ম্যাচ করা ব্লাউজও রেখে গেলাম। পায়ের মাপ দে। আসার সময় আমি তোর জন্য চটি কিনে আনব।

—চটির কী দরকার? রেণু বিব্রতবোধ করে, আমার তো খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস। কেন মিছিমিছি আমার জন্য অতগুলো টাকা খরচ করবে?

—তুই কি আমার পর? কেতকীর আন্তরিকতা রেণুর হৃদয় ছোঁয়, সে ভাবে—এমনভাবে এমন মানুষের সঙ্গে তার আগে পরিচয় হলে ভাল হোত। মা যে ভুল করেছে—সেই ভুল সে আর করবে না। মা বড় বোকা ছিল। নাহলে সে কেন কলকাতায় এল না। সারাজীবন ভিক্ষা করে যে জীবন কাটাল, তার কি ইচ্ছে করল না একটু সুখে থাকার? এই অজ্ঞতার কোন অর্থ হয় না, রেণু নিজের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত হল অনেকক্ষণ পরে। স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ খুঁজে পাওয়ার তৃপ্তিতে তার ডাগর চোখের তারা নেচে উঠল বন হরিণীর মত, ঘাড় ঘুড়িয়ে বারবার করে নিজেকে দেখল। নিজেকে দেখার এত সুখ কোথায় লুকিয়ে ছিল এতদিন? আবেশে বুজে এল তার চোখ। দু-হাতের তালু দিয়ে সে আলতো ভাবে চেপে ধরল নিজের গাল। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় সে এখন অন্য রেণু। কলকাতার আলো-হাওয়ায় এমনিভাবেই কি মুমূর্ষু মানুষ বেঁচে ওঠে।

বস্তিটা বড়। পাশাপাশি ঘরগুলোর দৈন্য দশা—এ যেন কলকাতার কলঙ্কচিহ্ন। আলো-বাতাস খেলে না। হাই ড্রেন থেকে উঠে আসে মরা ইঁদুরের দুর্গন্ধ। বাইরে বেরলেই মন খারাপ হয়ে যায় রেণুর। সামান্য জলের জন্য এখানে কত হুড়োহুড়ি, লাইন। অপ্রতুল আলোয় বস্তির উঠোন আরো ছোট দেখায়। একটু আগের খুশির ঝিলিক রেণুর চোখ থেকে মুখে গিয়েছে। চঞ্চল হরিণী চোখে জমা হয়েছে দুর্ভবিনা। কোথা থেকে উড়ে এসেছে একখণ্ড মেঘ। রোদ্দুর ঢেকে গিয়ে আকাশ ছেয়েছে মেঘে। টালীর ঘরের মাথায় বসে কাক ডাকছে কর্কশ স্বরে। মাইকের গান ভেসে আসছে দূর থেকে। যাওয়া-আসার পথে কারা সব কৌতূহলী চোখ নাচিয়ে দেখে যায় রেণুকে। ওরা কেউ কথা বলে না। ওদের চোখগুলো শুধু কথা বলে ইশারায়। রেণু তবু দাঁড়িয়ে থাকে দেওয়াল ধরে। জলভবা সেরে একটা মেয়ে আসে তার কাছে, গায়ে পড়ে আলাপ জমিয়ে বলে, কোথা থেকে এসেছ গো, ভারী মিষ্টি তো তোমাব মুখখানা! এ মুখ বিকাবে চড়া দামে। কেতকীর নজর আছে বলতে হবে। মেয়েটি কথা শেষ না করেই হাসতে থাকে শারীর দুলিয়ে। ওর রোগা শরীরে বুক দুটোই কেবল মাংসল। চোখে বাসি কাজল। গাল ঢুকে যাওয়া মুখখানায় জীবনযন্ত্রণার চিহ্ন স্পষ্ট। তবু বেশ হাসি-খুশি মেয়েটা। কথা বললে নেচে ওঠে চোখের ভ্রূ ঘনঘন। গলায় মোটা পুঁতির মালা। লম্বা। ওটা দাঁত দিয়ে চিবাতে-চিবাতে সে বলল, নতুন এসেছ বুঝি? তা ঘর কোথায়?

—চোরপালিয়া। নাম শুনেছ? রেণু অনেকক্ষণ পরে মুখ খুলল।

মেয়েটি আরো জোরে জোরে হেসে উঠল, চোরপালিয়া। সেটা আবার কোথায়? বাপের জন্মে এমন নাম তো শুনিনি!

—মেদিনীপুরে। এগারার নাম শুনেছ? ঐ যে এগরা গো, দীঘা যাওয়ার পথে পড়ে। ওখান থেকে বাস যায়। পানিপারুল, দীঘা শর্ট রুট। চিনতে পারছ? রেণু বোঝাবার চেষ্টা করল অনেক। মেয়েটির বোঝার কোন ইচ্ছা নেই। সে হাসতে ভালবাসে প্রাণ খুলে। হাসলে তাকে অত রোগা দেখায় না। শুধু কণ্ঠী হাড় নড়ে, ঘনঘন ছোট হয়ে আসে চোখ। হাসির তোড়ে মুখের উপর আছড়ে পড়ে কালো চুল। বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে ঠেলে সে শুধোয়, কেন এলে মরতে এখানে? তোমার কি বাবা মা কেউ নেই?

ঘাড় নেড়ে রেণু সজল চোখে তাকাল, কেউ নেই বলেই তো মাসীর সাথে চলে এলাম। মাসী বলেছে—আমাকে বাবুর বাসায় কাজে ঢুকিয়ে দেবে। বাবুরা নাকি অনেক মোটা টাকা মাইনে দেয়। আচ্ছা, বাবুর বাসায় আমাকে কী কাজ করতে হবে?

—কাজের কি শেষ আছে গো? মেয়েটা এবার কিছুটা গম্ভীর। পরনের শাড়িটার গিঁট ঢিলে হয়ে এসেছিল হাসির ধমকে, শাড়ি ঠিক করে মেয়েটি বলল, বাবুর বাসায় মেলা কাজ। তবে তোমাকে রোজ একবার করে শুতে হবে। বাবু চটকাবে, যা ইচ্ছে তাই করবে। তারপর তোমার কদর বুঝে টাকা গুঁজে দেবে।

—তার মানে? রেণুর সরল চোখে আতঙ্কের ছায়া।

মেয়েটি বলল, কেন কেতকী তোমাকে এসব কথা বলেনি? নিশ্চয়ই বলে থাকবে—তুমি হয়ত খেয়াল করোনি।

রেণুর গলা বুজে এল ভয়ে। টানা চোখের কোণে দুশ্চিন্তার মেঘবাদল। ঢোক গিলে সে মেয়েটির দিকে অসহায় চোখে তাকাল। মেয়েটি খেলার ছলে বলল, ভয় পাবার কিছু নেই। এখানে এলে প্রথম প্রথম একটু ভয় লাগে। তারপর দুদিন যেতে না যেতেই সব ঠিক হয়ে যায়। আমারও তো তাই হয়েছিল। ভয়ে গায়ের মাংস পাথর হয়ে যেত। প্রথম দিকে খদ্দেররা রাগ-ঝাল করে ফিরে যেত। পরে সব ঠিক হয়ে গেল। এখন দেখ, আমার কোন অসুখ নেই। দিব্যি বেঁচে আছি। তবে তোমার কেসটা আলাদা। তুমি তো দেখতে হেভি। এ লাইনে না এসে যাত্রা লাইনে গেলে পারতে। ওখানেও পয়সা উড়ে বেড়ায়।

সন্ধ্যা নেমে এলে কাকেরা ফিরে যায় বাসায়। মেয়েটিও ফিরে যায় তার ছোট্ট টালীর ঘরে। হা করে তাকিয়ে থাকল রেণু। চোখের পাতা পড়ছে না—ভয়ে এখন হিম হয়ে গেছে তার সাদা চোখের জমি।

অনেক রাতে ঘরে ফিরে এল কেতকী, তার সঙ্গে আরো তিনজন। বালবের ঘোলাটে আলোয় সেই তিনজন মানুষ চৌকাঠ থেকে দেখল রেণুকে। ওদের চোখের পাতা পড়ছে না—অমন মুগ্ধতা ওদের চোখে-মুখে। একজন চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকে এল, তারপর রেণুর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। কেতকী তাকে ইশারায় দূরে সরে যেতে বলল। তারপর আলো নিভিয়ে ঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল চারজন। অন্ধকার-ভেদী তীরের ফলার মত চাপা হেসে উঠল কেতকী, কেমন দেখলে?

—লা জবাব!

—চলবে তো? কেতকী নিচু গলায় শুধোল, অনেক কষ্টে পাখি ধরে এনেছি। একেবারেই আনকোরা। দাম একটু চড়া লাগবে।

—দরদাম নিয়ে ভেবো না। পাখি যাতে পোষ মানে সেই চেষ্টা করো।

—সে সব আমার দায়িত্ব।

—ভাল কথা। আমরা তাহলে আজ আসি। কাল কখন আসব বলো?

—দুপুরের পরে। আমি চিড়িয়াখানার মেন গেটের কাছে থাকব। হিসাব মিটে গেলে ওখান থেকেই পাখি তোমাদের।

বিছানায় শুয়ে রেণুর শরীর কাঠ হয়ে যায় কেতকীর কথা শুনে। এ কোন বাঘের গুহায় সে আবার ধরা দিল? তিনটে মানুষ চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ হল। বস্তির ন্যাড়া কুলগাছে পেঁচা ডাকছে অনেকক্ষণ হলো। কেতকী পেঁচার ডাক সহ্য করতে পারে না। বারান্দার আলো জ্বেলে সে বস্তির উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। আজকের রাতটা পার করে দিতে পারলে তার আর কোন চিন্তা নেই। ওরা ট্যাক্সি নিয়ে আসবে চিড়িয়াখানার গেটে। ওখান থেকেই রেণুকে পার করে দেবে সে। তারপর সে ঝাড়া হাত-পা। আবার কয়েক মাসের জন্য নিশ্চিন্ত আরাম। রেণু এভাবে স্বেচ্ছায় খাঁচায় এসে ধরা দেবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

পেঁচাটাকে ঢিল মেরে তাড়াল কেতকী। আজ সে একটু বেশিই খেয়েছে মদটা। খেতে ইচ্ছে করে না, তবু ওরা জোর করে খাইয়ে দেয়। দেশী মদ নয় একেবারে সুদৃশ্য লেবেল আঁটা শিশি। মানুষের মন রাখতে গেলে—এসব তো তাকে একটু-আধটু করতেই হয়।

শাড়ি বদলে কেতকী খালি গায়ে শুতে পছন্দ করে। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সব ঋতুতেই শোবার সময় গায়ে জামা রাখতে পারে না সে। ছোট জামাটার দাগ পিঠের উপর পড়েছে। জামা খুলে অভ্যাসমত পিঠে হাত বুলোয় কেতকী। একবার ভাবে রেণুকে ডাকবে। কিন্তু কী মনে করে সে আর ডাকে না। মেয়েটার সারাদিন খুব ধকল গেল। আহা! কেমন চোখ বুজে পড়ে আছে। কাল থেকে ওর চোখের ঘুম চলে যাবে। কাল থেকে আবার রেণুর নতুন জন্ম হবে। ওর ভাগ্য ভাল, এক নজরেই উদ্ধার হয়ে গেল।

রেণুর পাশে শুয়ে অবসন্ন কেতকী। শোওয়া মাত্রই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সে। নাক থেকে ভেসে এল বিশ্রী ঘুমের শব্দ। ঐ নোংরা মেয়েছেলেটার পাশে রেণু ঘুমাবে কী করে? যে কথা সে শুনেছে একটু আগে—এর পরেও কি কোন মেয়ে ঘুমাতে পারে। রেণুর আর ঘুম এল না। বুক শুকিয়ে গলা চিরে গেল তেষ্টায়। একটু জলের জন্য ছটফটিয়ে উঠল সে। গলা ভিজিয়ে সে এখান থেকে পালাবে। যে দিকে দু-চোখ যায় চলে যাবে।

ঘরের কোণে ঢাকা দেওয়া ছিল জলের বালতিটা। কিন্তু গ্লাস কোথায়? সারা ঘর খুঁজেও গ্লাস পেল না রেণু। অগত্যা মুখ ডুবিয়ে দিল জলের বালতিতে। চোখ ভিজে গেল জলে। পুরো মুখ ভিজে গেল জলে। ঠাণ্ডা স্পর্শে রেণুর শরীর ফুঁসে উঠল রাগে। আনাজ কাটা ঝুড়ির পাশেই পড়ে ছিল বটিটা। রেণু হাত বাড়িয়ে বটিটাকে টেনে আনল কাছে। বাঘিনীর গুহা ছেড়ে চলে যাবার আগে সে গলা লক্ষ্য করে কোপ মারল সক্রোধে। কেতকী ছটফট করছিল কাটা পায়রার মত। ফিনকি দেওয়া রক্তের সাথে শুধু ঘড়ঘড় আওয়াজ। কেতকী মাটির চেয়েও ঠাণ্ডা হয়ে গেল এক সময়। ঘরের আলো নিভিয়ে ঘবেব বাইরে এসে দাঁড়াল রেণু। লাইটপোষ্টের আলোয় পথ জেগে আছে। রেণু বস্তির উঠোন পেরিয়ে ছুটে এল পথে।

আঠাশ

কলকাতার আকাশ ছোট নয়, নয় পাংশু ছাই বর্ণের। এখানেও নীলিমার ব্যাপ্তি আকাশকে প্রদান করে অপরাজিতা ফুলের বিচিত্র সমাহার। তারা-নক্ষত্র খচিত আকাশের তলায় এসে দাঁড়াল রেণু। কোথায় এসেছে সে, কত দূরে এল—এ প্রশ্ন তখন রেণুর মনে খেলা করল না। তার শুধু মনে হল সে শুধু একটা নিরাপদ আশ্রয়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে আকাশ ছাড়া তাকে ছায়া দেবার কেউ নেই। জায়গাটা নির্জন। সামনে দিয়ে ট্রাম লাইন চলে গিয়েছে সমান্তরাল রেখার মতো। উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর জানলা ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফ্লুরোসেন্ট আলো। আশ্চর্য নীরবতা সবখানে। রেণুব ভয় করল না। সে ওভাবে কেতকীকে শেষ করে দিতে চায়নি। পালিয়ে আসার সময় তার মাথায় যেন ভূত চেপে গেল। কিছুতেই সে সহ্য করতে পারছিল না—সাদা চোখের ভেতরে লুকিয়ে থাকা হিংস্র চোখ দুটোকে। বিকেলে যে মেয়েটির সাথে তার আলাপ হয়েছিল তার নাম জয়ী। জয়ী জয়ী হতে পারেনি, সে হেরে গেছে, হার মানতে বাধ্য হয়েছে। জয়ীই তার মনের ভেতরে প্রতিহিংসা আর প্রতিরোধের ইচ্ছাশক্তিটাকে তীব্র করে তোলে। সারাটা সন্ধ্যা জয়ীর কথাগুলো জাবর কেটেছে সে। তখনও একটি বারের জন্যও মনে হয়নি সে কেতকীকে শেষ করে দেবে। কেতকীর চাপা কথায় রেণুর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সহজে। নতুন জায়গায় তার ঘুম গাঢ় হয় না। ওদের আলোচনা শুনে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল সে। মনে মনে ভাবছিল—সে হয়ত বাঁচতে পারবে না। বাঁচার জন্য যা করার তাকে এই রাতের মধ্যে করতে হবে। রাত ফুরোলেই তার জীবনও ফুরোবে। নোংরা হাইড্রেনের মরা পচা ইঁদুরটার চেয়েও দুর্গন্ধময় জীবন

তার জন্য পড়ে আছে। জয়ী তাকে বলেছিল, এরা মেয়ে পাচার করে বিদেশে। কেতকী সেই দলের একজন। ও বাবুর ঘরে কাজ করে না, ওটা ওর একটা বাহানা। তুমি বোন পালিয়ে যাও এখান থেকে। সে রাক্ষুসী আসার আগে পালিয়ে যাও। সে এলে আর তার খপ্পর থেকে বেরতে পারবে না। তার নজরের বাইরে যাওয়া বড় কঠিন।

রেণু হাঁপিয়ে উঠেছিল কথা শুনে। সারা মুখে ফুটে উঠেছিল ঘাম। তার টিকাল নাকের ডগায়ও মাছের ডিমের মত ফুটে উঠেছিল গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম। চোখের মধ্যে জড়ো হয়েছিল অপ্রতিরোধ্য ভয়ের জীবাণু। ধড়ফড়ান বুকে সে জয়ীর হাত দুটো ধরে বলেছিল, আমাকে এখান থেকে পালিয়ে যাবার রাস্তা বলে দাও। আমি যে এখানকার কিছু চিনি না—

—চেনার দরকার নেই। ট্রাম লাইন ধরে সিধা হাঁটতে হাঁটতে চলে যাও। গঙ্গা পেরলেই হাওড়া। ওখান থেকে তুমি বাস-ট্রেন সব পাবে। জয়ী সাধ্যমত বুঝিয়ে দিয়েছিল রেণুকে। তাড়াহুড়ো করে বলেছিল, যাও, চলে যাও। আর এই পাপ জায়গায় থেকো না। থাকলে তুমি মরবে।

শত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও রেণু পালিয়ে যেতে পারেনি। তার মন বারবার করে নিষেধ করেছে। প্রশ্ন করেছে—পালিয়ে তুমি যাবে কোথায়? পৃথিবী গোল। তোমাকে একদিন ধরা পড়তেই হবে। সেদিন সুদে-আসলে ওরা তোমার সর্বস্ব কেড়ে নেবে।

সন্ধ্যায় যার উড়ে যাবার কথা, ভোরে সে দাঁড়িয়েছে লাইটপোস্টের নীচে। ভোরের বৃদ্ধ ট্রাম প্রাতঃভ্রমনে এসেছে। ঢং-ঢং ঘণ্টা বাজছে। শান্ত হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় ধাতব শব্দ। রেণু দেরী না করে ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল ট্রামে। ঐ অত ভোরে ভিড়ে ভরে আছে ট্রামটা। অনেকেই বসে-বসে ঝিমোচ্ছে সীটে। হাওয়া এসে চুল উড়িয়ে দেয় তাদের। হেলে-দুলে ট্রাম এগোয়। রেণু এখন আগের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক। মেঘ কেটে যাওয়া আকাশের মত মুখ করে তাকাল সে।

হাওড়া স্টেশনে এসে চোখে জল এসে গেল রেণুর, পৃথিবীর শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে সে, এবার কোথায় পালাবে? হাজার মানুষের ভিড়ে রেণু একলা বোধ করে নিজেকে। কার কাছে সে যাবে, কাকে শুধোবে কোন গাড়ি যায় চোরপালিয়ায়। একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন রেণুর সাহায্যে। তার পরনে ধুতি, গায়ে ঢোলা পাঞ্জাবী, পায়ে সোলক্ষয়া কমা চপ্পল। মাথার সামনে চকচক করছে টাক। এগিয়ে এসে তিনি রেণুর মুখোমুখি দাঁড়ালেন, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কোনো বিপদে পড়েছ। কী হয়েছে তোমার, কোথা থেকে আসছ?

রেণু ভ্যাবাচেখা খাওয়া চোখে তাকাল, কিছু বলতে গিয়ে তার ঠোঁট কেঁপে উঠল, বুকের ভেতর থেকে ভয়ের ঢেউটা আছড়ে পড়ল শরীরের আনাচে-কানাচে। বোবায় ধরা মানুষের চোখে সে শুধু তাকাল, কোন কিছু বলার মত তার ক্ষমতা ছিল না। বৃদ্ধ মানুষটি আরো ঘনিষ্টভাবে সরে এলেন রেণুর কাছে, তুমি কোথায় যাবে মা? আমাকে বলো। তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমার বাবার মতো। আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

রেণু তবু স্বাভাবিক হতে পারল না। বৃদ্ধ বললেন, তুমি একা এই ভোরবেলায় কোথা থেকে আসছো? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রঘরের মেয়ে। বল মা, তোমার কি হয়েছে? আমার দ্বারা যদি কোন উপকার হয় তো আমি তা করব।

ব্যথা ভরা দু-চোখে টলটল করে অশ্রু। রেণু আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে ডুকরে উঠল, বলা বা শোনানোর মত আমার কিছুই নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি—আমি একজন হতভাগিনী। একদিন আমার সব ছিল। এখন পায়ের তলায় মাটিও নেই। মানুষই জোর করে আমার মাটি কেড়ে নিল। আমি এখন কোথায় যাব—তা-ও জানি না। তবে এটা জেনেছি—আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।

—আত্মহত্যা মহাপাপ।

—সে আমি জানি কিন্তু এই মুহূর্তে আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর কোন গতি নেই।

বৃদ্ধ মানুষটি ভাবলেন অনেক সময়, তারপর রেণুর দুঃস্থ চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি কিছু মনে না কর তো চলো আমরা কোথাও গিয়ে বসি। আমি তোমার সব কথা শুনব।

—আমার দুঃখের কথা শুনে আপনার কি হবে?

—আমার কিছু হোক বা না হোক, তোমার কিছুটা উপকার হবে। তুমি অনন্ত হাল্‌কাবোধ করতে পারবে। বুকে পাথর রেখে কেউ কি কোনদিন শান্তি পেয়েছে!

ভোরের আলোয় হাঁটতে হাঁটতে ওরা চলে আসে ফাঁকা লঞ্চ ঘাটটার কাছে। ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ ভাঙে জল। পূজার ফুল ভেসে যায় ঢেউয়ের মাথায়। সেইদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রেণু। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে মায়ের জন্য পূজার ফুল তুলত সে। পায়ে জড়িয়ে যেত ভেজা ঘাস। মাটি থেকে উঠে আসত অতি চেনা একটা গন্ধ। প্রবাহিত গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রেণুর চোখ ভরে আসল জলে। বুকের ভেতর ঢেউ উঠছে অজস্র কথামালার। বৃদ্ধ মানুষটি তার দিকে চেয়ে আছেন কিছু শোনার জন্য। রেণুর মনে হল, সে নিজেও ঢেউয়ের মাথায় ভেসে যাওয়া একটা ফুল। ঐ বৃদ্ধ মানুষটি তা সযত্নে আগলে রাখতে চান। নতুন করে বেঁচে ওঠার কথা শোনাতে চান। ঐ বয়স্ক চোখ দুটোয় আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি আছে সততা। পৃথিবীর সব মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকতে চায় রেণু। তার মা বলত, মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। রেণু তাই গড়গড় করে বলে গেল তার মনের কথা। বৃদ্ধ মানুষটি ধ্যানস্থ ভঙ্গিমায় শুনলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তোমার জীবন তো অনেক সরল এবং সাদাসিধে। তুমি যা করেছে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার জায়গায় যে থাকত সেই অমন করত। তুমি যা করেছ—তার জন্য আমার গর্ব হচ্ছে। আমার দেশের মেয়ে অন্যায়কে প্রশয় দেয়নি। বিপদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। সে বিপদকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে অক্ষত শরীরে।

রেণু ভেবেছিল বৃদ্ধ মানুষটি তাকে তিরস্কার করবেন সব শোনার পরে। এমন প্রশ্রয় এবং সহানুভূতি সন্দেহাতীত। রেণু চুপ করে থাকল। বৃদ্ধ মানুষটি রেলিঙয়ে হেলান দিয়ে দূরের দিকে তাকালেন, আমি তো তোমার কথা সব শুননাম। এবার তুমি আমার কথা শোনো। আমি একজন স্কুল শিক্ষক। পাঁচবছর আগে অবসর নিয়ে আমি এখন বেকার। আমার পেনশন এখনও চালু হয়নি। টাকা-পয়সা কোন কিছুই পাইনি এখনও। প্রায় মাসেই কলকাতায় আসি খোঁজ খবর নিতে। গতকাল আমি এসেছিলাম। কিন্তু কাজ সারতে অনেক দেরী হয়ে গেল। লাস্ট ট্রেন চলে গিয়েছে, বাসও পেলাম না। সারারাত হাওড়া স্টেশনেই কাটিয়ে দিলাম। ভোর হতেই বেরিয়ে পড়েছি গঙ্গাকে দেখব বলে। আমাদের জেলায় তো গঙ্গা নেই। তা, তোমার সাথে দেখা হয়ে ভালই হল। সকালটা যার ভাল যায়, সারা দিনটাও তার ভাল যায়। বৃদ্ধ ভদ্রলোক রেণুর মুখের দিকে তাকালেন, সস্নেহে বললেন, তোমার সব কথা শোনার পরে তোমাকে একা ফেলে যাওয়া আমার উচিত হবে না। আমি যদিও তোমার বাবার মতন, তবু তুমি আমাকে মাস্টারমশাই বলে ডাকলে আমি খুব খুশি হব। গ্রামের সবাই আমাকে ঐ বলে ডাকে। তাছাড়া আমিও সবার কাছে মাস্টারমশাই হয়ে বাঁচতে চাই। যদিও শিক্ষকদের সারাজীবনই দুঃখের তবু নিজে শিক্ষক ছিলাম বলে আমার মনে এখনও গর্ব আছে।

রেণু শুধোল, আপনার সাথে কি আমার আবার কোনদিন দেখা হবে? জানিনা দেখা হবে কিনা। তাই আগাম আমি আপনার আশীর্বাদ পেতে চাই। আমি মূর্খ মেয়ে। লেখা-পড়া জানি না। আমার সব দোষ আপনি ক্ষমা করে দেবেন নিজ গুণে। মাথা ঝুঁকিয়ে রেণু পা ছুঁলো মাস্টারমশাইয়ের, আবেগে কম্পিত হল গলা, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন—আমি যেন আর কোনদিন বাঘ-বাঘিনীর হাতে না পড়ি। আমি যেন আমার মতো করে বেঁচে থাকতে পারি।

—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। মাস্টারমশাই রেণুর মাথায় হাত রাখলেন, সংসার কত আজব জায়গা—তাই ভাবছি আমি। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হল আমাদের বিবাহিত জীবন তবু এখনও অপূর্ণ থেকে গেল সংসার। যা চেয়েছি, প্রায় সব কিছুই তো পেয়েছি। শুধু সন্তান পাইনি। এই শেষ বয়সে তোমাকে পেলাম। তুমি চলো আমার সঙ্গে। বুড়ো-বুড়ির সংসারে তুমি হবে আমাদের একমাত্র সন্তান। তোমার মুখ চেয়ে বাকি দিনগুলো আমরা হেসে-খেলে কাটিয়ে দেব। তুমি আর অমত করো না। চলো।

কিছু বলার থাকলেও রেণু কিছু বলতে পারে না। পাটাতন ছিদ্র নৌকার মত তার জীবন। অনেক আগেই ডুবে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ভগবানের এমন খেলা, সেই ডুবে যাওয়া নৌকা আবার ভেসে উঠেছে জলে।

মাস্টারমশাই রেণুর হাত ধরলেন প্রগাঢ় স্নেহে, চলো, তোমাকে এবার কিছু খাওয়াই। কাল সারারাত তোমার কপালে খাবার জোটেনি। তুমি অভুক্ত। না খেলে এতটা পথ যাবে কী করে?

মাস্টারমশাইয়ের পিছন পিছন হাঁটতে থাকল রেণু। এই প্রথম মনে হল তার মাথার উপর ছাদ আছে, সে অবিভাবহীন নয়, তাকেও শাসন-স্নেহ-ভালবাসার মানুষ আছে এই পৃথিবীতে।

পাঁশকুড়া স্টেশনে নেমে আরও মাইল দুয়েক হেঁটে এলেই মাস্টারমশাইয়ের গ্রাম। গ্রামের একেবারে মাঝখানে মাস্টারমশাইয়ের মাটির দোতলা ঘরখানা। ঘরের সামনে ছোট একফালি উঠোন। উঠোনের এক কোণে খড়ের গাদা। কিছুটা জায়গা ঘিরে শাক-সবজির বাগান। বাঁশবাতার গেটখানা খুলে মাস্টার-মশাই রেণুকে বললেন, এটা তোমার ঘর। মন খারাপ করলে তোমার জেঠিমার সঙ্গে গল্প করো। আর একটা কথা—তুমি তোমার পূর্বের ইতিহাস কাউকে বলো না। সবার মন তো সমান নয়। বারান্দায় উঠে এসে মাস্টারমশাই চেঁচিয়ে ডাকলেন, রমা, ও রমা, বাইরে আসো। দেখো, কাকে আমি ধরে এনেছি। সম্ভবত রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন রমা, জলহাত আঁচলে মুছে তিনি বাইরে এসে দেখলেন রেণুকে, ও মা, এ তুমি কাকে ধরে আনলে। এ যে একেবারে সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মীর মতন। বলেই হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন তিনি, রেণু প্রণাম করতেই রমা বললেন, থাক মা, থাক। চলো, ঘরের ভেতরে চলো। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে তোমার সাথে দুপুরভর গল্প করব।

এরা মানুষ নাকি দেবতা?—রেণু অবাক না হয়ে পারল না। রমা তার হাত ধরে টানলেন রান্না-ঘরের দিকে, চলো ওখানে বসে গল্প করা যাবে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে—রাস্তায় তোমার জ্যাঠা তোমাকে কিছু খাওয়াইনি। আমি তো জানি—সে মানুষটা কেমন। [illegible]তেই রাস্তাঘাটের খাবার কিনে খেতে চায় না। বড় খুঁতখুঁতে ওর মনটা। আমি কিন্তু মা সম্পূর্ণ আ[illegible]। ট্রেনের ঝালমুড়ি না খেলে আমার মনে হয় কিছুই খাওয়া হল না। রমা তাব বয়স্ক ঠোঁটে হাসির ঢেউ তুলে তাকালেন, তারপর আফশোষ করে বললেন, আরে দেখো তো, কী ভুলো মন আমার। তোমাকে তো পরার শাড়ি দিতে ভুলে গিয়েছি। চলো, চলো বড়ঘরে চলো। আগে তোমাকে শাড়ি বের করে দিই, তারপর অন্য কাজ।

রমা লাল রঙের ট্রাঙ্ক খুলে একটা শাড়ি বের করে আনলেন রেণুর জন্য, হাসতে হাসতে বললেন, আমার কম বয়েসের শাড়ি, এখনও দেখো কেমন নতুন আছে। তোমার জ্যাঠা এই শাড়িটা কিনে দিয়েছিল বড় পুজোর সময়। এত রঙচঙে শাড়ি এই বুড়ো বয়সে কি পরা যায় মা? আমি সব গুছিয়ে তুলে রেখেছি। ভেবেছিলাম মরার আগে কাউকে দিয়ে যাব। বেশ ভাল হল। তুমি এসেছ। এখন থেকে আমার সব শাড়ি তোমার।

রেণু হা-করে শুনছিল রমার কথা। এমনও [illegible]শুপ্রাণ মানুষ থাকে—এ যেন বিশ্বাস হয় না তার। মানুষের মন আকাশের চেয়েও বড়। মানুষ চাইলে আকাশকেও ছোট করে দিতে পারে নিমেষে।

উনত্রিশ

হাতের লাল ডাইরী বুকের কাছে ধরা, মালা দাঁড়িয়ে ছিল এগরা বাস স্ট্যাণ্ডে। হাটবার বলে ভিড়ে থিকথিক করছিল পিচ রাস্তা। ফল দোকানগুলোর পাশে সামান্য ছায়া পড়ে। সেই ছায়াটুকু মাথা বাঁচাতে বেছে নিয়েছে মালা। মাইকে দাদ-চুলকানির বিজ্ঞাপন উগলে দিচ্ছিল রিকশায় বসা মানুষটা। মলমের এত ক্ষমতা যা ব্যবহারে শরীরের যাবতীয় চর্মরোগ নাকি সেরে যাবে। লাইটপোস্টটার কাছে দাঁড়িয়ে খুব মন দিয়ে শুনছিল পবন। মালাকে সে খেয়াল করেনি। মালাই দেখতে পেয়ে ডাকল চিৎকার করে।

মেনির বিয়ের সাতদিন আগে মালার সাথে দেখা হয়েছিল তার। অনুরোধ করে বলে এসেছিল, বিয়েতে এসো। তোমরা গেলে আমার মনের জোর বাড়বে।

মালা আসব বলেও এল না। কেন আসবে? ওরা তো বড় ঘরের মেয়ে! ওদের কি অভাবী পাড়ায় আসা সাজে। অভিমান, অপমানটা এখনও বুক বিঁধে আছে পবনের। সে ভেবেছিল, আর কেউ না আসুক, অন্তত মালা আসবে। মালা আসেনি, আসার প্রয়োজনও বোধ করেনি। না আসার জন্য ওর ভেতরে কোন অনুশোচনা নেই।

তাহলে কি পুরোপুরি পাল্টে গেছে মালা? পবন মনকে শুধোয় মনের কথা। মন আদালতের তুলাদণ্ডের মত, কোন দিকেই ঝোঁকে না।

পবন ভেবেছিল, মালাকে এড়িয়ে যাবে। কিন্তু সেই সুযোগ তার হল না। মালা এগিয়ে এল সামনে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, কী গো, সেই তখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছ না নাকি? কথা বলার ইচ্ছা ছিল না পবনের, তবু তাকে বলতে হল, খেয়াল করিনি। তা বলো, কী খবর?

মালা গালে টোল ফেলে হাসল, আমার উপর রাগ করেছ বুঝি?

—রাগ! তোমার উপর? না, না আমি কারোর উপর রাগ করিনি।

—তাহলে অমন মুখ ভাঁর করে কথা বলছ যে।

—আমার মুখটাই ঐ রকম!

—কই আগে তো ছিল না, এই প্রথম দেখছি তোমাকে এমন!

—তুমিও তো আগে এমন ছিলে না! পবন আশ্চর্যভরা চোখে তাকাল, আমি যে মালাকে চিনতাম সে অনেক পাল্টে গিয়েছে। তুমি যে দুলুবাবুর মেয়ে এখন তা মনে হয় না!

—কেন আমার আবার কী দেখলে?

পবন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি কিছুই দেখিনি, তবে শুনেছি অনেক কথা। তোমার মা-ই আমাকে সব বলেছে।

—কী বলেছে মা? দু'চোখের কোণে বিরক্তি নেচে উঠল মালার, মায়ের কথা শুনে তুমি আমার বিচার করছ?

—আমি বিচার করার কে? আমি তো অতি নগণ্য একজন।

—আমি কি তাহলে অসাধারণ?

—তা আমি জানি না। পবন এড়িয়ে যেতে চাইল মালার প্রশ্ন।

তখনই হর্ন দিতে দিতে বাস এসে থামল দীঘা-পানিপারুল স্ট্যাণ্ডে। পবন দম দেওয়া পুতুলের মত ব্যস্ত হয়ে বলল, যাবে না?

—না, যাব না। অভিমানের প্রগাঢ় রঙ ফুটে উঠল মালার চোখে, সেই সঙ্গে অদ্ভুত একটা ছেলেমানুষী দাবী, তুমিও যাবে না। আমরা পরের বাসে যাব। এ বাসটা ছেড়ে দাও।

—পরের বাস আসতে অনেক দেরী হবে।

—হোক দেরী, তবু তুমি যাবে না। মালা জেদ করল. তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আমার সব কথা না শুনে তোমাকে আমি যেতে দেব না। দেখা যখন হয়েছে তখন আমি তোমাকে সব কথা বলব। আমাকে ভুল বুঝেছ যখন তখন তোমার সেই ভুল আমার ভাঙ্গিয়ে দেওয়া দরকার।

মালা শান্ত হয়ে এলে পবন বলল, আমি তোমাকে ভুল বুঝিনি, তোমাকে ভুল বোঝার অধিকারও আমার নেই। তবে যদি রাগ না করো—তাহলে একটা কথা শুধাই। তুমি মেনির বিয়েতে কেন এলে না? মেনিকে কি তুমি ভালবাসতে না? নাকি মেনি তোমার কাছে এমন কোন দোষ করেছিল যার বদলা তুমি না এসে নিলে।

—ছিঃ, এ কী বলছ তুমি?

—বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি। তোমার ব্যবহারই আজ আমার মুখ খুলে দিয়েছে।

—চলো তো, এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভাল লাগছে না, দোকানে গিয়ে বসি। তুমি আমাকে ভুল বুঝে এড়িয়ে যাবে তা আমার সহ্য হবে না। মেনির বিয়েতে আমি কেন যাইনি, তা তোমাকে শুনতে হবে। সবকথা শোনার পর তুমি যা বলবে আমি তা মেনে নেব।

কোন মিষ্টি কিংবা চায়ের দোকানে নয়, পবন এসে দাঁড়াল একটা গাছের ছায়ার। মালা ছোট্ট রুমালে মুখের ঘাম মুঝে বলল, সেদিন আমি যাব বলে সাজগোজ করছি। এমন সময় মা এল আটটার বাসে। তাকে দেখে আমি বুঝতে পারিনি, মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগে সে কাঁথির নার্সিং হোমে নিজের পেটের সন্তানকে বলি দিয়ে এসেছে। আমি যখন জানতে পারলাম, তখন মা প্রায় সংজ্ঞাহীন। তার এমন দুর্দশা মেয়ে হয়ে আমাকে দেখতে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। ঐ অত বাতে আমি কানাই ডাক্তারকে ডেকে আনি ভয় পেয়ে। বাবা ঘরে ছিল না। বাবা ঘরে থাকলে যে কী হোত তা ভগবানই জানে! মা কিছুটা সুস্থ হবার পর আমার হাত ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, মালারে, আমি বিরাট ভুল করেছি। তোর সুদেবমামা আমার সব সর্বনাশ করে দিল। যা করার নয় আমি তা করেছি ওর প্ররোচনায়। আমাকে তুই ছুঁস নে। আমি পাপী। নরকেও আমার জায়গা হবে না। মার কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়ি। মানুষের যে এমন পরিণতি হয় জানা ছিল না। বিশ্বাস কর পবনদা, সে রাতে ঘরের বাইরে বেরতে আমার মন করল না। সারারাত আমি মায়ের পাশে বসে থাকলাম।

বাস চলে যায় ধুলো উড়িয়ে, মালা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকে ধুলো এড়াতে। কলেজে এসেও তার মন পড়ে আছে ঘরে। ক'দিন থেকে মুক্তা শয্যাশায়ী, সংসারেব সব কাজ সারতে হয় মালাকে। কানাই ডাক্তার প্রতিদিন দু-বেলা এসে দেখে যান মুক্তাকে। মালাকে আড়ালে ডেকে বলেন, ভয়ের কিছু নেই। তুমি চিন্তা করো না। আমি যা ওযুধ দিলাম তাতে সব ঠিক হয়ে যাবে।

পবনের নিরুত্তর চোখের দৃষ্টিতে মালার প্রতি সহানুভূতি ছিল কিনা বুঝতে পারে না মালা। গাছের ছায়ায় সে কেমন বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল। অব্যক্ত চোখের চাহুনীতে কী যেন বোঝাতে চাইল মালা। পবন অস্থির হয়ে উঠছিল ঘরে ফেরার জন্য। সে অনেকক্ষণ পরে মালাকে বলল, বাসটা ছেড়ে দেওয়া আমার ঠিক হল না। অবনীর আজ আসার কথা আছে।

—অবনী কে? মালা শুধাল। পবন ম্রিয়মাণ হেসে বলল, মেনির বর। ছেলেটা খুব ভাল তবে চাকরি-বাকরি নেই। আমার মত বেকার। সারাদিন পঞ্চায়েতের ঝুট-ঝামেলা নিয়ে মেতে আছে। জান, অবনী ইস্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। ওর পড়াশোনার মাথা বেশ ভাল কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর আর পড়তে পারল না।

মালার ঠোঁটে ধ্বনিত হল আফশোষ, এই তো হয়। যার পড়াশোনা করার ইচ্ছা থাকে শেষ পর্যন্ত তারই পড়াশোনা হয় না। কথা শেষ করে মালা নিজের দিকে তাকাল। ঠোঁট ছুঁয়ে ছোট্ট একটা হাসির রেখা খেলে গেল চকিতে। পবনের মনে পড়ছিল মুক্তার কথা। মেয়েটা উচ্ছন্নে গিয়েছে—এমন কোন চিহ্ন সে মালার মধ্যে দেখতে পেল না। বরং তার মনে হল মালা আগের তুলনায় অনেক বেশি মার্জিত এবং পরিশীলিত। সে যে বড় হয়েছে তার ছাপ সুস্পষ্ট চোখে-মুখে। দায়িত্ব-সচেতনতা তাকে দিয়েছে আলাদা মর্যাদা।

মুক্তার কথাগুলো পবনের মনে ঘোঁট পাকায়। সে কীভাবে শুধাবে মালাকে তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। সেটা শোভন নয়।

মালা-ই আগ বাড়িয়ে বলল, তোমাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে—কী ব্যাপার? কি হয়েছে?

পবন স্মিত হাসল, না তেমন কিছু নয়, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

—আমার কথা! আকাশ থেকে পড়ল মালা। বুকের উপর শুয়ে থাকা মালাটা নিয়ে সে তর্জনীতে জড়াতে লাগল আনমনে।

পবন না ভেবেই বলল, আমার মনে কিছু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তোমাকে নিয়ে। অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম—দেখা হলে শুধোব।

—কিসের প্রশ্ন? মালা গলার হারটা তর্জনীতে জড়িয়ে আবার ছেড়ে দিল, বল না কি শুধোতে চাও? জানা থাকলে নিশ্চয়ই আমি বলব। তোমার কাছে আমার তো কিছু লুকাবার নেই।

—সে আমি জানি। পবন মালার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি শুনেছি কলেজের কোন একটি ছেলের সাথে তোমার জানাশোনা হয়েছে।

মালা উচ্চকিত হেসে উঠল, ওঃ, এই কথা। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ তুমি। ছেলেটার নাম অমিতাভ। ও বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়ছে। খুব ভাল ছেলে।

—তোমার বাবা-মা জানে এসব?

—বাবা হয়ত জানে না। মা সব জানে। মালা স্বপ্নালু চোখে তাকাল, মার ইচ্ছে নেই আমি ওর সাথে ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করি।

—তোমার মায়ের যখন ইচ্ছে নেই তখন কেন মেলামেশা করছ। পবন বোঝাতে চাইল, ওদের মনে দুঃখ দেওয়া তোমার উচিত হবে না।

—আমার ভাললাগা যদি অন্যের অপছন্দের কারণ হয় তাহলে আমি কী করতে পারি? আমিও নিরুপায়। মালা খোলামেলা গলায় বলল, অমিতাভ'র মত ছেলে হয় না। ও শুধু পড়াশোনায় ভাল নয়, ওর মনটাও বিশাল আকাশের মত। ওর কাছে গেলে আমার মনের ক্ষুদ্রতা ধুয়ে-মুছে যায়।

পবনের যেন কিছু বলার নেই এমন চোখ করে তাকাল। মালা তির্যক চোখে তাকাল, সামান্য উত্তেজিত সে। কানের কাছের চুলগুলো হাওয়ার ছটফটাচ্ছিল, ওগুলোকে তর্জনী দিয়ে ঠেলে সে বলল, আমি আমার নিজের ভালটা বুঝি। আমি তো আর এখন কচি খুকিটি নেই। আগুন-জলের পার্থক্য আমি বুঝি। বুঝতে শিখেছি।

পবন হা-হয়ে শুনছিল। মালা বলল, মা চায় না আমি অমিতাভর সাথে মেলামেশা করি। মা না চাইলেও আমার কিছু করার নেই। আমাদের সম্পর্ক এখন এমন জায়গায় পৌঁচেছে যেখান থেকে আর ফেরা যায় না। কী করব বলো? আমার আজকের এই পরিণতির জন্য মা-ই দায়ী। সে যদি সময়ে আমাকে একটু স্নেহ-ভালবাসা দিত তাহলে আজকে আমার জীবনে এসব কিছুই ঘটত না। মা'র অবহেলা আমাকে জেদী করে তোলে। আমি সুদেববাবুকে সহ্য করতে পারি না। তাকে দেখলে আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়। জান, সে-ও আমার দিকে লোভের হাত বাড়িয়েছিল। আমি তার হাত দুমড়ে-মুচড়ে ফিরিয়ে দিয়েছি।

—বলো কী। নিজের কানকে অবিশ্বাস করল পবন। মালার ঠোঁট কঠিন হয়ে উঠল, সে একটা পশু। পশু না হলে কেউ কি অমন নোংরা কাজ করার সাহস পায়! তুমি বিশ্বাস কর পবনদা, আমার যদি একটা রিভলবার থাকত—তাহলে ঐ নারীমাংসখেগো বাঘটাকে আমি গুলি করে মারতাম। সে আমার মায়ের সাথে খেলা করে হাঁপিয়ে উঠেছে। এবার সে আমার সাথে খেলা করতে চায়।

—চুপ করো। পবন আর শুনতে চাইছিল না। মালার গলার শিরা ফুলে উঠল, তবে শুনে রাখো, আমি তাকে ছাড়ব না। সে মায়ের কাছে ক্ষমা পেলেও আমার কাছে ক্ষমা পাবে না। আমি তাকে আগে মারব, তারপর মরব। সে আমাদের সবাইকে ঠকিয়েছে। সে ঠগ, প্রতারক। মালার শান্ত চোখ থেকে ঝরে পড়ল আগুন, হাঁপাতে-হাঁপাতে আঁচল দিয়ে মুখ মুছে নিল মালা। পবনের মুখে টুঃ শব্দটি নেই, যেন সে বোবা হয়ে গিয়েছে মালার কথায়।

মেদিনীপুর থেকে হাওয়ার বেগে বাস এসে থামল স্ট্যাণ্ডে। ধুলো উড়ল একরাশ, টুকরো কাগজ হাওয়ার ঘূর্ণিতে উড়তে উড়তে মাথার উপর দিয়ে চলে গেল লাটখাওয়া ঘুড়ির মত। পবন ব্যস্ত হয়ে উঠল, মালা, চলো আমরা এই বাসটায় চলে যাই। এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না। এগরায় এলে আমার দম আটকে আসে মানুষের ভিড়ে।

মালা নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, আমারও ভাল লাগে না। তবু রোজ আসতে হয়। কলেজে না এসে ঘরে বসেই বা কী করব? মায়ের অসুস্থ, বিষণ্ণ মুখ আমার আর দেখতে ভাল লাগে না। এখানে এলে বরং অনেক কিছু ভুলে থাকা যায়।

পবন দ্রুত পায়ে হেঁটে এল বাস স্ট্যাণ্ডে। ক'দিন থেকে ধকলের শেষ নেই তার। যুগলবুড়া বলেছিল, পবনারে, তোর বাবাকে দেখলাম এগরা বাজারে। তার নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। সে আমাকে দেখেও চিনতে পারল না তবে তাকে আমি ঠিক চিনেছি। সে যতই গোঁফ-দাড়িতে মুখ ভর্তি করে রাখুক না কেন—তাকে আমি এক নজর দেখেই চিনেছি। যেচে কথা বলতে গেলাম, সে আমার সঙ্গে কথা বলল না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। তার দু-চোখে জল। সে যেন কিছু খুঁজছিল।

যুগলবুড়ার কথাগুলো পবনকে হিড়হিড়িয়ে টেনে এনেছে এগরায়। পুরো এগরা বাজার তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে তার বাবার দেখা পাইনি। যুগলবুড়ার বর্ণনানুযায়ী সে একজন ভিখারীকে দেখেছিল বাস স্ট্যাণ্ডের চাতালে শুয়ে থাকতে। ঐ মাঝবয়েসী লোকটার সঙ্গে সহদেবের চেহারা খানিকটা মিল খায়। তবে সে সহদেব নয়—এ সম্বন্ধে পবনের মনে কোন দ্বন্দ্ব নেই। যে মানুষ নিজের ইচ্ছায় হারিয়ে যায় তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। পবন তাই সময় ব্যয় না করে ফিরে যেতে চাইছিল গ্রামে।

মালা পবনের চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল অপলক, ওর মনে বাস ধরার কোন তাড়া নেই, ধীর শামুকের চেয়েও নিস্তেজ তার হাবভাব। পবন অধৈর্য হয়ে উঠল, কি হল যাবে না এ বাসে?

মালার ঠোঁট থেকে গড়িয়ে নামল নিস্তেজ হাসির ঢল, যাব বলেই তো হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলাম। চলো বাসে উঠে পড়ি। বসার জায়গা পেলে ভাল হোত।

পবন কিছু না বলে আঁচ করার চেষ্টা করল মালার মনোভাব। মালার উদ্বেগহীন চোখে ঘরে ফেরার তাড়া ছিল না। সে যেন পথভোলা এক পাখি; তার কোন ঠিকানা নেই, ঘর নেই। কিন্তু মালা কেন ঘরে ফিরতে চায় না—এ প্রশ্নে উদ্বেলিত হল পবন। পরক্ষণে সে ভাবল—মালা ঘরে ফিরতে চায় না তার একমাত্র কারণ মুক্তা। মুক্তার বিপর্যস্ত হেরো মুখ কিছুতেই শান্তি দেয় না মালাকে। একজন মেয়ে হয়ে সে কি ভাবে মেনে নেবে এই অবিচার। মুক্তা যা পারেনি মালা তাই করে দেখাতে চায়। সে ছিঁড়ে ফেলতে চায় মুখোশ। দেখাতে চায় মুখোশের আড়ালের মুখটাকে। সুদেববাবু কোথায় পালাবে, পালিয়ে সে কি বাঁচতে পারবে? মালা তাকে সহজে নিষ্কৃতি দেবে না। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সে ক্ষমা করতে পারবে না সুদেববাবুকে।

বাস এসে থামল চোরপালিয়া বাজারে। প্রাক বিকেলের আলোয় মালা আর পবন নেমে এল পাশাপাশি। ময়রা দোকানের সামনে নিকোন মাটিতে চট পেতে বসে 'তাসপালি' খেলছিল গ্রামের বুড়ো-ছোকরা। পিচ রাস্তা ফাঁকা। বৈকালিক আসর আর একটু পরেই জমে উঠবে হাটখোলায়। পবনকে দেখতে পেয়েই বসন্ত জানা হাতের ইশারায় ডাকলেন। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল পবন। তার উসকো-খুসকো চুল, চিন্তায় জমাট হয়ে আছে পুরো মুখ। ফোঁটা ফোঁটা ঘামে সমস্ত মুখটাতে ধকলের চিহ্ন। দু-চোখের নীচে দোল খায় স্বপ্নহীনতার ছায়া। অভিজ্ঞ বসন্ত জানা একঝলক দেখেই পবনকে বসার জন্য টুলটা দেখিয়ে দিলেন, বস। এই বুঝি ফিরলি? তোর সাথে কিছু কথা ছিল।—সেলাই মেসিনেব চাকা থেমে গেল নিমেষে, বসন্ত জানা কালো ফ্রেমের চশমাটা নাকের উপর ঠিকঠাক বসিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, আমি তোদের পাড়ায় গিয়েছিলাম। ওখানেই শুনলাম—তুই এগরায় গিয়েছিস। কী ব্যাপার, হঠাৎ যে এগরা গেলি?

কথা বলার ইচ্ছা ছিল না পবনের, তবু সে নিমপাতা চিবানোর মত মুখ করে বলল, কোন কাজ ছিল না, হঠাৎ-ই চলে গেলাম।

—কাজ ছাড়া কেউ কি এগরা যায়? বসন্ত জানার সন্দেহভরা চোখ, তুই কেন এগরায় গিয়েছিলিস আমাকে সব যুগলবুড়া বলেছে। আমার কাছে লুকিয়ে কী হবে! সহদেবের কি দেখা পেলি?

পবন উত্তেজিত হল না, শুধু হাতেব তালুতে মুখের ঘাম মুছে বলল, ভগবানের দেখা পাওয়া গেলেও তার দেখা পাওয়া যাবে না। আমি এগবায় গিয়েছিলাম বাবাকে খুঁজতে। যেতাম না, শুধু মায়ের মুখ চেয়ে আমাকে যেতে হল।

—গিয়ে কোন অন্যায় করিস নি, এটা তোর কর্তব্য।

—কতর্ব্য কি শুধু আমার একার, তার নয়? পবনের শান্ত চোখ থেকে ঠিকরে পড়ল আগুন, আমাদের জন্ম দিয়ে সে পাখি হয়ে উড়ছে। আজ পর্যন্ত সে কি কোন দায়িত্ব পালন কবেছে সংসারের? তার কথা ভেবে ভেবে মা-ও দড়ির মত শুকিয়ে গেল। আমবা কেউই তার জন্য সুখে নেই। সে থেকেও না থাকার মত।

বসন্ত জানা সান্ত্বনার চোখে তাকালেন, সংসারে থেকেও সব মানুষ সংসারী হয় না। এটাও মানুষের একটা ধর্ম। তাকে তোরা ভুলে না গিয়ে বরং তার দোষটাকে ক্ষমা করে দে। সংসারের কিছু মানুষ আসে উড়োপাখির মত। তারা দানা খায় কিন্তু পোষ মানে না। তাবা এক জায়গায় স্থিতু হতে জানে না। তারা বাউল নয়, ফকিরও নয়। তারা ঢেউ। তারা জল। তাদের না হলে আবার সংসার বাঁচে না।

হেঁয়ালী কথায় কোন ভাবান্তর হয় না পবনের। ক্লান্ত চোখ মেলে সে শুধু তাকায়। বসন্ত জানা মেসিন ছেড়ে উঠে যান দেওয়ালের দিকে। কাঠের তক্তার উপর সাজান খবরের কাগজ। খবরের কাগজের উপর চাপা দেওয়া ছেঁড়া ডাইরীটা হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে আনেন তিনি। পাতা ওল্টাতে গিয়ে মাটিতে খসে পড়ে মুখ ছেঁড়া একটা খাম। পবন অপলক চোখে দেখছিল। বসন্ত জানা খামের ভেতর থেকে চিঠিটা বের করে এনে বললেন, এটা পড়।

—কার চিঠি?

—রেণু লিখেছে। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন বসন্ত জানা।

পবন চমকে উঠল, শিরায় শিরায় বান ডাকা জোয়ার, নিমেষে শরীর থেকে মুছে গেল ক্লান্তি অবসাদ, রেণু লিখেছে, কোঁথা থেকে লিখেছে? কী লিখেছে ও?

—চিঠিটা পড়লেই সব বুঝতে পারবি। চুপ করে গেলেন বসন্ত জানা। পবনের চোখের তারা কাঁপছিল, চিঠিটা হাতে ধরে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল মৌন শরীরে। তারপর ধীরে ধীরে তার চোখ পাঁকে ডোবা পদ্ম গোঁড়ার মত ডুবে গেল চিঠির গভীরে।

রেণু লিখেছে— সে চোরপালিয়ায় ফিরতে চায়। কেউ যেন তাকে এসে নিয়ে যায়। সে একা ফিরতে পারবে না।

—কে যাবে রেণুকে আনতে? বসন্ত জানার কালো ফ্রেমের চশমা আরো ঝুঁকে আসে নাকের উপর, তোকে যেতে হবে পবন। মেয়েটা কষ্ট পাচ্ছে। আমি বুড়ো মানুষ। দোকান ফেলে কোথায় যাব বলত।

—আর কেউ যাবার নেই?

—আছে। কিন্তু তারা কি রেণুকে ফিরিয়ে আনতে পাববে? আমি জয়কে বলেছিলাম, কিন্তু ওর সময় নেই। বসন্ত জানার চোখে-মুখে ক্রমে-ক্রমে ছড়িয়ে পডছিল উত্তেজনা, তুই যা, আমি তোর যাওয়া-আসার খরচা সব দেব। মেয়েটার জন্য আমার মন বড় কাঁদছে। কতদিন ওকে দেখিনি।

পবনও ভাবল— কতদিন রেণুকে সে দেখেনি। চোখের আড়ালে চলে গিয়ে রেণু কেন আবার ফিরে আসতে চাইছে চোখের সামনে—এ প্রশ্ন জাবর কাটতে-কাটতে স্বপ্নিল হয়ে উঠল তার কৃষ্ণভ্রমর চোখ দুটো। তবে কি ফিরে আসাই জীবনের ধর্ম? সমুদ্র যে ধর্ম লালন করে বুকে—সেই ধর্মই কি মানুষ আজীবন বয়ে বেড়ায়? রেণু কি তাহলে ফুল? পবনের বুকের ভেতরে কেন উড়ে বেড়ায় ভালবাসার ভ্রমর?

ত্রিশ

সকালের নিস্তেজ আলোয় বসন্ত জানার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল পবন। পিচ রাস্তায় এখন ফোঁটা ফোঁটা শিশিরঘাম, পা দিলে স্পষ্ট পায়ের ছাপ দৃশ্যমান হয় কালো পিচে। পবন রেণুকে আনতে যাবে বলে বসন্ত জানা সাত সকালে মাঠ পেরিয়ে চলে এসেছেন দোকানে। সারা রাত ভাল ঘুম হয়নি তার। জয়ন্ত তাকে শুধিয়েছিল, বাবা, তোমার কি শরীর খারাপ?

ছেলের প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নি বসন্ত জানা। তবু গায়ে পড়ে জয় বলেছিল, যদি শরীর খারাপ থাকে তাহলে চলো তোমাকে এগরা থেকে ডাক্তার দেখিয়ে আনি। দরকার হলে ক'দিন দোকান বন্ধ রাখো। বসন্ত জানা সস্নেহে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, অনুমান করার চেষ্টা করছিলেন ছেলের মতি-গতি। কিন্তু এত কাছে থেকেও তিনি জয়কে পুরোপুরি চিনতে পারেন না। জয় যে কী চায় তা এখনও জানা হয়নি তার। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পরে জয়ন্তের মুখের পোড়া দাগ গুলো আরও প্রকট হয়ে উঠেছে তার চোখে। সচরাচর জয়ন্ত কম কথা বলে। সারাদিন নির্জন ঘরে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে সে। কারোর সাথে কথা বলার আগ্রহ নেই। তাকে দেখে বসন্ত জানার মনে হয় সে যেন বিরাট কোন অপরাধ করে বসেছে। অনুশোচনায় দগ্ধে যাচ্ছে মন, হৃদয়। কিছুতেই সে যেন তার অতীতকে ভুলতে পারছে না। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ঐ অত রাতে বসন্ত জানা বলেছিলেন, রেণুর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। আমি কাল পবনকে পাঠাচ্ছি। পবন যাচ্ছে রেণুকে আনতে। তোর যদি যেতে মন চায় তো ওর সাথে যেতে পারিস। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে জয়ন্তর কোন কথা বলার ক্ষমতা ছিল না, ছুঁয়ে দেওয়া শামুকের মত ভয়ে সে কিছুটা গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। বসন্ত জানা একই কথা আর একবার উচ্চারণ করতেই জয়ন্ত বহু কষ্টে ঠোঁটের কোণে ছড়িয়ে দিয়েছিল শুষ্ক হাসি, ভাল তো, রেণু ফিরে এলে ভালই হবে। আমি তো সব সময় এখানে থাকব না। আমার ইস্কুল আছে। আমি চলে যাব। রেণু তোমাকে দেখবে—

জয়ন্তর হাবভাবে স্ফূর্ততার অভাব ছিল, এটা অনুভব করতে পেরে বসন্ত জানা নিজেই চুপ করে গিয়েছিলেন। জয় আর কথা না বাড়িয়ে একটা ধর্মগ্রন্থ টেনে নিয়ে ডুবে গিয়েছিল বইয়ের পাতায়।

রেণু ফিরে এলে জয়ন্ত যে খুশি হবে না—এটা স্পষ্ট অনুমান করতে পারছিলেন বসন্ত জানা। কিন্তু জয়ন্ত অখুশি হবে বলেই রেণুকে তিনি নির্বাসনে রাখবেন— এটাও তিনি মন থেকে মেনে নেবেন কী ভাবে? এতবড় পৃথিবীতে রেণুর সে ছাড়া আর কেউ নেই। মেয়েটার সুন্দর, কোমল মুখটার দিকে তাকালে সারা দিনের সমস্ত ক্লান্তি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে যায় বসন্ত জানার। মনে মনে তিনি রেণুকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছেন। তার ইচ্ছা রেণুর সাথে তিনি জয়ন্তর বিয়ে দিয়ে দেবেন। সংসার বিমুখ জয়ন্তকে একমাত্র রেণুই পারবে সংসারের মায়ায় বেঁধে রাখতে। তার মনের সাধ কোনদিন পূরণ হবে কী না তা তিনি স্পষ্ট করে জানেন না, তবে রেণু যদি তার পুত্রবধূ হয় তাহলে সব চাইতে খুশি হবেন তিনি। মনের ইচ্ছাটা মনের কোণে এত দিন লুকিয়ে রেখেছেন তিনি। রেণুর চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই এই একটা স্বপ্নই তিনি লালন করছেন বুকের ভেতর। একথা তিনি পবনকেও বলতে পারেননি। গ্রামের কাউকে বলার ইচ্ছাও হয়নি। রেণু আগে ভালভাবে ফিরে আসুক, তারপর দু-হাত এক করে দেবেন শুভ দিন দেখে।

ফাঁকা বাস রাস্তায় সকালের নরম আলো এসে পড়েছে। দু-একটা গোরু পিচ রাস্তা পেরিয়ে মাঠে নেমে যাচ্ছে পেট ভরানোর আশায়। হাটখোলার বটগাছ থেকে ভেসে আসছে পাখির কিচির মিচির ডাক। পবন চোখ মেলে তাকাল, গাছের পাতা নড়ে না এমন ভাব গম্ভীর পরিবেশ। কুয়াশার দল মাঠের মাঝখানে ঝুলে আছে হঠাৎ উড়ে আসা জলবাহী মেঘের মত। চারদিক ধোয়াশা এবং শীতার্ত। শিশির জলে গা ধুয়ে রোদের অপেক্ষায় শুয়ে আছে দূর্বা ঘাস। সকাল থেকে ঠাণ্ডা ছিল বলে পবন একটা রঙ জ্বলা সোয়েটার পরেছে, গলায় জড়িয়ে নিয়েছে মাফলার। সুভদ্রা ঐ অত সকালে সেদ্ধ ভাত রেঁধে দিয়েছে ছেলের জন্য। আসার সময় সাবধান করে বলেছে, রাতে কোথাও থাকবিনে, চলে আসবি। আমার একা থাকতে ভয় করে।

পাশাপাশি ঘর হলেও এখন হাড়িসাইয়ের প্রতিটি ঘর যেন আলাদা, প্রতিটি ঘরেই গজিয়ে উঠেছে সমস্যার পাহাড়। অভাব এসে থাবা মেরেছে প্রতিটি গৃহ কোণে। ফলে কারোর মনেই সুখ নেই।

সুখ পবনের মনেও.নেই। তবু সে মনে-প্রাণে চায় রেণু ফিরে আসুক। এ গ্রামে তার জন্ম। এই গ্রামের মাটিতে সে আর দশটা মেয়ের মত বড় হয়ে উঠুক। সবার ভালবাসা পাক। স্নেহ-ভালবাসায় ধন্য হয়ে উঠুক তার জীবন। সুভদ্রা রেণুর প্রসঙ্গ উঠলে নিশ্চুপ হয়ে যায়, তার আগ্রহে ভাটা পড়ে। তবু পবন রেণুকে আনতে যাচ্ছে শুনে, সুভদ্রা বিড়বিড় করে বলল, ভালই হল। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসুক। তুই যা পবন, রেণুকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেল বাসের কোন দেখা নেই। বসন্ত জানা উশখুশিয়ে বললেন, চ পবন, চা খেয়ে আসি। বড্ড শীত লাগছে। পবনের ইচ্ছা ছিল না চা-খাওয়ার। সে নীরব থেকে তার অসম্মতি জানিয়ে দিল। কোথাও যেতে গেলে তার মনের অবস্থা ঝড়ের মুখে পড়ে যাওয়া নৌকোর চেয়েও অসহায়। মনের সর্বত্র জুড়ে থাকে ভয়। টান টান উত্তেজনা বিছিয়ে থাকে পুরো মনে। কিছুতেই সে এগুলো দূর করতে পারে না।

বসন্ত জানা দূরের দিকে তাকালেন; আড়মোড়া ভেঙে বললেন, তুই তাহলে বাসের জন্য অপেক্ষা কর। আমি যাই, দোকান খুলি। আর শোন, ফেরার সময় দোকানে আসার দরকার নেই। রেণুকে নিয়ে সরাসরি ঘরে চলে যাবি। বিকেলে আমি দোকান খুলব না, ঘরেই থাকব।

বসন্ত জানা চলে যাবার পরেই পবন হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে অনেক দূর। গলার মাফলারটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সে আর একবার হাড়িসাইয়ের দিকে তাকায়। জীর্ণ, অভাবী ঘরগুলোয় আলোর

কোন কমতি নেই। তবু কেমন নিষ্প্রাণ মনে হয় পুরো পাড়াটাকে। কাল রাতে গঁড়ার খোঁজে চৌকিদার এসেছিল পাড়ায়। গঁড়াকে ঘরে পাইনি চৌকিদার। রাগারাগি করে রাধীকে শাসিয়ে চলে গিয়েছে সে। পবন জানে—গঁড়া এখন আর চুরি-চামারি করে না। তবু সবার সন্দেহের চোখ গঁড়ার উপর। কেন এমন হয়—পবন বুঝতে পারে না। সব পাখি মাছ খায়, শুধু বদনাম হয় মাছরাঙার। গঁড়া কি তাহলে মাছরাঙা পাখি? এই বদনাম কি তার কোনদিন ঘুচবেনা?

পবনের অন্যমনস্কতা কেটে গেল জয়ন্তর ডাকে। এ সময় জয়ন্তকে সে রাস্তায় দেখবে ভাবতে পারেনি। শিক্ষিত বলে জয়ন্তর আত্ম অহংকার আছে। রাস্তাঘাটে দেখা হলে সে পবনের সাথে কথা বলে না। আজ ব্যতিক্রম হল। জয়ন্ত এগিয়ে এসে শুধোল, কোথায় যাচ্ছিস পবন? জয়ন্তর প্রশ্নে পবন কিছুটা বিস্মিত, রেণুকে আনতে যাচ্ছি, তোমার বাবাই তো আমাকে পাঠাচ্ছে।

—ওঃ, তাই নাকি! মুহূর্তের মধ্যে অন্যমনস্ক আর গম্ভীর দেখাল জয়ন্তকে, তবু হাসি মুখ করে বলল, রেণু কি সত্যিই আসবে?

—হ্যাঁ, আসবে তো। সে চিঠি দিয়েছে। তোমার বাবার কাছে সেই চিঠি আছে।

কই বাবা তো আমাকে কিছু বলেনি!

জয়ন্ত বেমালুম মিথ্যা কথা বলে পবনের মুখের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল, কখন ফিরবি তাহলে? নিশ্চয়ই বিকেল হয়ে যাবে।

—তা তো হবেই। পবন বলল, নতুন জায়গা। পথঘাট আমি ভাল চিনি না। তবে আজই আমি ফিরব। রাতে আমি বাইরে থাকব না। কথা ফুরোল না, হাওয়ার বেগে তেড়ে এল বাস। পবন ব্যস্ত চোখে জয়ন্ত'র মুখের দিকে তাকাল, তারপর হাত নেড়ে সে ছুটে গেল বাসের দিকে।

নতুন পথ, নতুন ঠিকানা পবনের মনে ক'দিন থেকে বীজ পুঁতে দিয়েছিল ভয়ের। মাস্টারমশাই মানুষটা কেমন এ নিয়ে তার মনে সংশয় ছিল যথেষ্ট। আলাপ হবার পরে পবনের মনে হল সে যেন দেবদর্শনে এসেছে। মানুষের ব্যবহারই তার আসল পরিচয়। পবনের সংকোচ, জড়তা হাওয়ার তোড়ে মাকড়সার জালের মত ছিঁড়ে পড়েছে, সে যেন অতি চেনা একজন বৃদ্ধ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মাস্টারমশাই পবনকে বসতে বলে ঘরে গেলেন। মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরে এলেন, সঙ্গে রেণু।

চোখাচোখি হল ওদের। রেণু কাঁপা কাঁপা গলায় শুধোল, কখন এলে? রাস্তা চিনে আসতে কোন অসুবিধা হয়নি তো?

খুবই সাধারণ প্রশ্ন তবু পবনের মনে হল এই কথাগুলো শোনার জন্য তার এখানে ছুটে আসা। রেণুর চোখের পাতা পড়ছিল না, এমনভাবে তাকিয়েছিল সে। নতুন পরিবেশের সঙ্গে সে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে, তার কথা-বার্তা চালচলন দেখে অনুমান করে নিল পবন। মাস্টারমশাই চেয়ারে বসে পবনকে বললেন, যাও বাবা, হাত-মুখ ধুয়ে এসে দুটো কিছু খেয়ে নাও। সেই কখন বেরিয়েছ ঘর থেকে। নিশ্চয়ই পথে কিছু খাওয়া হয়নি? পুকুর থেকে বালতি ভরে জল এনে দিল রেণু। ইটপাতা একটা জায়গায় বালতি নামিয়ে রেণু বলল, তোমাদের জন্য খুব মন খারাপ করত সবসময়। গ্রামের কথা মনে পড়ত খুব। থাকতে না পেরে তাই চিঠি লিখেছি। জ্যাঠারা খুব ভাল লোক। ওরা না থাকলে আমি হয়ত ভেসে যেতাম।

পবনের মনে হাজার প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি দেয়, তবু নিজেকে সে গুটিয়ে রাখে। রেণুকে প্রশ্ন করা শোভন হবে কী না এ নিয়ে সে ভাবে। রেণু সহজভাবে বলল, আবার কোনদিন তোমার সাথে দেখা হবে ভাবিনি। আবার কোনদিন গ্রামে ফিরতে পারব এটাও আমি ভাবিনি। মানুষ যা ভাবে না তা অনেক সময় ঘটে যায়। কী বলো?

পবন অর্থপূর্ণ চোখে তাকাল।

রেণু হাসতে গিয়ে মলিন চোখে তাকাল। দুপুরের রোদ আছাড় দিয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। চেনা পরিবেশ নয় তবু পবনের মনে হয় সব কিছু চেনা। রেণুকে সে আবার দেখতে পাবে—এটা তার চিন্তার মধ্যে ছিল না।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতেই ঘরে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। রেণুরও তর সইছিল না আর, সে-ও ঘরে ফেরার জন্য উদগ্রীব। তবু সংযমের আড়ালে নিজেকে বেঁধে রেখেছে সে। উচ্ছাসকে দমন করেছে সে।

শুধু মাস্টারমশাই নয়, রমা দেবীও এলেন এগিয়ে দিতে বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত। ফিরে যাওয়ার সময় ওদের চোখে জল। রমাদেবী আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে বললেন, রেণুকে সাবধানে নিয়ে যেও বাবা। মাত্র ক'মাসে ও আমাদের মন জুড়ে বসেছিল। ও যদি না যেতে চাইত তাহলে ওকে আমি জীবনভর কাছে রাখতাম: আমাদের তো আর কেউ নেই!

মাস্টারমশাইয়ের দীর্ঘ শরীর নুয়ে পড়েছিল দুঃখ-বিষাদে, কথা বলার ক্ষমতা ছিল না তার। রেণু গিয়ে পায়ে হাত ছোঁয়াতেই তিনি ঝাঁকা দেওয়া ফুল গাছের মতো নড়ে উঠলেন, চোখ আর অস্থির আবেগকে সংযত করে বললেন, রেণু, তোমার যখন মন খারাপ করবে তখন আমাকে চিঠি দিও। আমি গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব। তোমার সুবিধা-অসুবিধা সব কিছু আমাকে জানাবে। এই বুড়ো মানুষটাকে ভুলে যেও না।

বাস ছেড়ে দেওয়ার পর হু-হু কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল রেণু। চোখ তার শাসন মানে না কিছুতেই। দুপুরের বাস ফাঁকা-ফাঁকা। পবন রেণুর পাশে বসেছিল। রেণুকে শান্ত হতে বলে সে আবার বাইরের দিকে তাকাল। মানুষের সম্পর্ক সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মত, আর জীবন এক বহতা নদী। এর কোথায় শেষ, কোথায় শুরু তা যেন রহস্যাবৃত। বাস কিছু দূর আসার পরে রেণু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল। পবন পাশে বসেই বলল, ওরা তোমাকে কোনদিন চলে যাবার কথা বলত না। ওদের তো ছেলে-মেয়ে নেই, তাই তুমি চল আসাতে ওরা আবার দুঃখী হয়ে গেল! বেণু সহসা কিছু না বললেও ওর তির্যক চোখের দৃষ্টিতে খেলে গেল অভিমানের সূক্ষ্ম রেখা। আশাহত গলায় সে বলল, তাহলে গ্রামে ফিরে আমি ভাল কাজ করছি না—এই তো? তোমার কথা শুনে আমার তাই মনে হচ্ছে।

—না, না তা কেন। কথা জড়িয়ে গেল পবনের। অস্বস্তিভরা চোখে সে রেণুর দিকে তাকাল।

রেণু চিলের মত ছোঁ মেরে কেড়ে নিল কথা, তাহলে তুমি কি চাও না আমি গ্রামে ফিবি? যদি না চাও তাহলে আমাকে কেন নিতে এলে? আমি জীবনভর জ্যাঠামশাইয়ের কাছে থেকে যেতাম। ওদের সংসারে আমাকে নিয়ে কোন জ্বালা ছিল না বরং জেঠিমা আমাকে সবসময় চোখে-চোখে রাখতেন, নিজের মেয়ের মত দেখতেন। তার কাছে থাকলে আমার মনে হত আমি আমার মায়ের কাছে আছি। আমার কোন কষ্টই ছিল না। পবন বিরোধের মধ্যে গেল না, সে খুব নরম গলায় বলল, তুমি গ্রামের মেয়ে,, গ্রামে ফিরছ এতে কারোর কিছু বলার নেই। তবে হঠাৎ করে তুমি যে কোথায় চলে গেলে—এ নিয়ে গ্রামে খুব আলোড়ন হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, তোমার সাথে আমার হয়ত আর কোনদিন দেখা হবে না। যাক, ভালই হল—ভগবানের দয়ায় আবার তোমার সাথে দেখা হল।

—দেখা না হলেই বুঝি ভাল হোত তাই না?

—তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, আমি আমার মনের কথাটাই বললাম। পবন রেণুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল অপলক, আমি ভাবতেই পারছি না তুমি অমন ভাবে কেন চলে গেলে? যদি কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল তাহলে বলে যেতে পারতে। তোমার জন্য ক'দিন আমি ঘুমাতে পারি নি।

রেণু ঠোঁট কামড়ে ধরল আনমনে, বলে যে যাব তার কোন উপায়ই ছিল না। আমি একরকম বাধ্য হয়েছি গ্রাম ছাড়তে।

—কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

—কোথায় গিয়েছিলাম আমি তা তুমি আমাকে শুধিও না। শুধালে আমি এর সঠিক উত্তর দিতে পারব না। তবে আমি যে আবার ফিরে আসতে পারব—এটাও আমার জানা ছিল না। জ্যাঠামশাই না থাকলে আমি হারিয়ে যেতাম পাপের জগতে। —রেণু সযত্নে যা আড়াল করতে চায়, পবন তাকে টেনে আনতে চায় সামনে। এই টানা-পোড়ন ভাল লাগছিল না রেণুর। এক সময় সে বিধ্বস্ত গলায় বলল, দোহাই, আমাকে আর অতীত নিয়ে প্রশ্ন করো না। আমি আমার অতীতকে ভুলে থাকতে চাই। রেণু মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দৃষ্টি ফেলল বাইরে। বাসের গতি বাড়ছিল, আর ক্রমশ অপসৃয়মান হচ্ছিল চেনা পৃথিবী। বাসের ভাড়া দিয়ে পবন শুধাল, তুমি কি আমাদের বাড়িতে যাবে? মা বলছিল, তোমাকে নিয়ে যেতে।

রেণু মুখ ঘুরিয়ে তাকাল, চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ চোখে-মুখে। কোনরকম·সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তার গলা কেঁপে উঠল, কথা জুড়িয়ে গেল, অসহায় চোখ তুলে সে শুধু বলল, দাদুর কাছে প্রথমে যাওয়াই ঠিক হবে। দাদু তোমাকে পাঠিয়েছে।

চোরপালিয়ায় বাস থামতেই সন্ধ্যা নেমে এল হাটের উপর। আবছা, অস্পষ্ট, ধোয়াশা অন্ধকার হুড়মুড়িয়ে উঠে আসল মাঠের চারপাশ থেকে। ধোয়াশা, প্রায় অন্ধকার মুখ নিয়ে রেণু নেমে এল বাস থেকে। দু-চোখ মেলে সে দেখতে চাইল তার চেনা জগত। মাত্র ক'মাসেই অনেক কিছু বদলে গিয়েছে। সময়ের পলি প্রকৃতির বুকে এনেছে অনাবিল পরিবর্তন। রেণুর শীত শীত করছিল। পবন তার মাফলারটা রেণুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এটা গলায় জড়িয়ে নাও। আমার কাছে চাদর নেই, থাকলে তোমাকে দিতাম। রেণু মাফলারটা না নিয়ে বসন্ত জানার টেলারিং দোকানটার দিকে তাকাল। বন্ধ দোকানটা দেখে সে শুধোল, দাদুর কি শরীর খারাপ? আজ কি দোকান খোলে নি?

পবন বলল, সকালের দিকে দোকান খোলা ছিল। তুমি আসবে বলে বিকেলে দোকান বন্ধ রেখেছেন ইচ্ছে করে—

—ওঃ। রেণু কিছুটা অন্যমনস্ক, তার মুগ্ধ চোখে থিকথিক করছে সংকোচ আর জড়তা। দূরের পিচ রাস্তার দিকে তাকিয়ে রেণু ভুলে যেতে চাইল তার পূর্ব ঘটনা। ভুলে যেতে চাইলেও সে ভুলে থাকতে পারল না। পরপর মনে পড়ে গেল কত কথা। আচমকা সাপের পিঠে পা দেওয়া মানুষের মত চমকে উঠল সে। জয়ন্তর পশুসুলভ মুখখানা ভেসে উঠল চোখের মণিতে। দাপনা চুইয়ে নেমে আসা রক্তের স্রোত-উষ্ণতা তাকে অস্থির করে তুলল চকিতে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরেও সেই অস্থিরতাকে আড়াল করতে পারল না রেণু। ভয়ের পঙ্কিলতায় তার পুরো শরীর ডুবে গেল, জলে ডোবা অসহায় মানুষের গলায় সে শুধোল, দাদুর ছেলে এখন কেমন আছে? কোথায় আছে?

—কেন বল তো? পবন সন্দেহঘন চোখে তাকাল, যাওয়ার সময় তাকে আমি ভাল দেখে গিয়েছি। তার সাথে আমার এই পিচ রাস্তায় দেখা হয়েছিল। সে তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।

আগ্রহে ঝুঁকে গেল রেণুর শরীর, কী জিজ্ঞেস করছিল সে?

পবন হাঁটতে হাঁটতে বলল, তুমি কখন ফিরবে এই নিয়ে তাকে বেশ চিন্তিত দেখলাম। এর আগে তোমার কথা সে কোনদিন শুধোয় নি।

—সে এখন কোথায়?

—ঘরেই আছে। পবন বলল, অনেকদিন সে এ পাড়ায় যায়নি। এখানেই তো ঘোরাঘুরি করতে দেখি।

রেণু থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ পবনের হাত ধরে বলল, আমি দাদুর ঘরে যাব না। যদি কোন অসুবিধা না থাকে তাহলে তুমি আমাকে তোমাদের ঘরে নিয়ে চল। আজ রাতটা আমি তোমাদের ওখানে থাকব।

কাল সকালে আমি আমার নিজের ঘরে ফিরে যাব। আমার আর কিছু ভাল লাগছে না, মাথাটা বড্ড ধরেছে।

অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পবন শুধোল, হঠাৎ মত বদলালে কেন? একটু আগেই তো তুমি বলছিলে দাদুর ওখানে যাবে।

—বলেছিলাম, কিন্তু এখন আর যাব না। যাওয়া যায় না।

—তুমি যা বলছো, ভেবেচিন্তে বলছো তো? পবনের প্রশ্নে বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না রেণু, আমি যা বলি ভেবে-চিন্তেই বলি। আমাকে নিয়ে যেতে তোমার যদি কোন অসুবিধা থাকে তাহলে আমি হাটখোলায় থাকব। খোলা আকাশের নীচে অনেকদিন থাকিনি তো। পবন অস্থির হয়ে বলল, না-না, আমার কোন অসুবিধাই নেই। তুমি গেলে মা খুশি হবে। চলো—

ওরা যখন ফিরে আসছিল হাড়িসাইয়ের দিকে তখন আলপথ ডিঙিয়ে ঝড়ের বেগে পাকা রাস্তায় উঠে এলেন বসন্ত জানা। তার পরনে খাটো ধুতি, খালি পা, গায়ে জামা নেই। অবিন্যস্ত কাঁচা পাকা চুলগুলো মুখের উপর আছড়ে পড়েছে বিশ্রী ভাবে। পাকা রাস্তায় পা দিয়ে তিনি গো হাঁপানো হাঁপাচ্ছিলেন। ঘন ঘন নিশ্বাস নেওয়ার শব্দে পবন পিছন ফিরে তাকাল। রেণুও হাঁটার গতি থামিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকাল। মাত্র দশ হাতের ব্যবধান, তবু বসন্ত জানাকে চিনতে পারল না রেণু। পবন এগিয়ে গেল সামনে। সবিস্ময়ে শুধোল, কে, কে ওখানে?

পবনের গলা চিনতে পেরে অন্ধকারে ডুকরে উঠলেন বসন্ত জানা, আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে পবন। জয় ওর শোবার ঘরে গলায় দড়ি দিয়েছে। কান্নায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল বসন্ত জানার শরীর। বুক চাপড়ে তিনি আবার কঁকিয়ে উঠলেন শোকে, জয় যে এত বড় ভুল করবে আমি তা ভাবতেই পারছি না। হায় রে, এ আমার কী সর্বনাশ হলো...

পবনের সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। রেণু আঁচলে মুখ ঢেকে সরে দাঁড়িয়েছে দূরে। অন্ধকার আকাশের মত থমথম করছিল তার মুখ। তারা খসার মত ঝরে পড়ছিল চোখের জল। বসন্ত জানা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন পিচ রাস্তায়। রেণু তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অস্ফুটে বলল, দাদু, ঘর চলো।

একত্রিশ

রমনীবুড়া বারবার করে নিষেধ করেছিল তবু কামিনী কথা শুনল না। পালানের সাথে দেখা করার জন্য ক'দিন থেকে ছটফট করছিল সে। বাপের বাড়িতে এসেও তার মনে কোন সুখ নেই। সুখ বুঝি খাঁচা ভেঙে পালিয়ে যাওয়া পাখি। তাকে কোনমতে ধরতে পারছে না কামিনী। না পারার কষ্টটা বুকের ভেতরে ধস নামায়। চোখের উপর দিয়ে নাচতে নাচতে ফুরিয়ে যায় দিন-রাত। রাতচরা পাখি তাকে বুঝি ঠাট্টা করে ডেকে ওঠে। স্বামী খেদান মেয়ের মান-সম্মান, ইজ্জোতবোধকে গুরুত্ব দিতে চায় না কেউ। রমনীবুড়া ফি-কথায় মুখ করে। পান থেকে চুন খসলে তার কোন ক্ষমা নেই। দিন-রাত ঘরে বসে থেকে মনটাও বিষিয়ে গিয়েছে তার। এ জীবন বুঝি গোড়ায় উই ধরা গাছের মত।

সকাল থেকে কামিনীর ব্যস্ততার শেষ ছিল না। শ্বশুরঘর যাবে বলেই রাতে ভাল মত ঘুমাতে পারেনি। অবুঝ মনটাকে কিছুতেই সে বোঝ মানাতে পারেনি। পালান তাকে খেদিয়ে দিলেও সে যে তার স্বামী। মানুষ তো রাগের মাথায় কত কী বলে। সব কথা গায়ে মাখলে মেয়েমানুষের চলে না। কিন্তু রাধীর কথাগুলো চাম এঁটুলির মত তার গায়ে বসে আছে। কিছুতেই মন থেকে মোছে না। বউটা ঘর বেয়ে এসে হাজার কথা শোনাল। চোখ ভর্তি জল নিয়ে সে তাকে অভিশাপ দিল। যাওয়ার সময়

গালমন্দ করে বলে গেল, তোমার ভাল হবে না গো, যে অন্যের পাত কেড়ে খায়, তার পাত ভগবান কেড়ে নেয়। আমাকে কাঁদিয়ে জীবনে তুমি সুখী হতে পারবে না। আমার মত সারাজীবন তোমাকেও পথে পথে কাঁদতে হবে। যৌবনের জ্বালা জুড়োলে মনের জ্বালা যে জুড়োবে এমন নয়। তুমি আমার ঘর ভেঙেছ, আমার ছেলে-মেয়ের মুখের ভাত কেড়ে নিয়েছ, ভেবোনা তুমি সুখে থাকবে। ঘুটে পুড়লে গোবর হাসে, কিন্তু গোবর জানে না তাকেও একদিন পুড়তে হবে। আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়ে গেলাম, এবার তুমি যত পার আগুন খাও, উগরাও। আমি আর তোমার দোরে কোনদিন কাঁদতে আসব না। আমি মরে যাব সেও ভাল তবু তোমার কাছে আর কোনদিন আমার ভাঙা সংসার জোড়া লাগানোর জন্য আসব না। —রাধী চলে যাওয়ার পরে তার কথাগুলো পাথর হয়ে চেপে বসেছিল কামিনীর বুকে। রমনীবুড়া সব শুনেছিল দূরে দাঁড়িয়ে। সেও সাত-সতের কথা শোনাল। গাঁয়ে বেরলে কামিনীর এখন এক ফোঁটা সম্মান নেই। সবাই ভাবে সে বুঝি দড়ি ছেঁড়া গোরু। সবাই চায় ধরতে। যাকে স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছে তার মুখে বড় কথা সাজে না। সেদিন ধর্মাবাবুর চাকর এসেছিল খোঁজ খবর নিতে। এ কথা সে কথার পরে আসল প্রস্তাবটা দিয়ে বসল।

—বাবুর সাথে ভিড়ে যাও, জীবন তোমার শুধরে যাবে। এ দুনিয়ায় যার টাকা নেই, তার কিছু নেই। বাবু থাকতে তুমি কেন কুঁকড়ে-মুকড়ে বাঁচবে। তুমি কি ফেলনা নাকি?

শুধু কথা নয়, সঙ্গে টাকার গোছাও এনেছিল ধর্মাবাবুর চাকর। কামিনী ঘৃণা ভরে তা প্রত্যাখান করেছে। শরীর থেকে লেবু চিপকান-র মত নিংড়ে নেমেছে চোখের জল। নিজের প্রতি ঘৃণা জন্মেছে প্রবল। অন্ধকার ঘরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। তার সব কথা শুনে এ সমাজের ঘৃণ্য গঁড়া তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, কেঁদে কেটে শরীর ক্ষয় ছাড়া আর কোন লাভ নেই। ভগবান যাকে হাত-পা-নাক-চোখ-মুখ দিয়েছে, সে কেন আঁধার ঘরে কাঁদবে। চোখের জল কি অত সস্তা নাকি? চোখ মুছো, হেসে-খেলে আগের মত বেঁচে থাকো। আমি তোমার পাশে আছি।

গঁড়ার মুখ নিঃসৃত শব্দগুলোকে বেদবাক্য বলে মেনে নিতে পারেনি কামিনী। তার নারী মন ডুকরে উঠেছে বারবার। তলা ফেঁসে যাওয়া নৌকার যে দুঃখ, সেই দুঃখ বুকে চেপে বসেছে তার। দুঃখের সাগরে ডুবে যাওয়া মন কামিনী ফুলের মত সুবাসিত হেসে উঠতে পারে না। গাছ যা পারে না, মানুষ তা কী ভাবে করবে। তবু কামিনীর চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। ঠোঁটে সে সব সময় ধরে রাখত হাসির পরশ। এই হাসিই তার কাল হল। গঁড়া তার হাত ধরে বলল, জীবন পচা সার গাদা নয়, জীবন হল তোমার বাবার দোকানের কাঁচা মদের মত। জীবনকে এক জায়গায় ... হতে দিলে এক সময় তা থেকে দুর্গন্ধ ছাড়ে। তাই বলি কী—মন যা চায়, তাই করো। একটা চনমনে ফড়িং যা পারে মানুষ তা কেন পারবে না। গঁড়া থেমে থেমে কথা বললেও তার আবেগ তখনও ফুরায়নি, তড়বড়ে লাটিমের চেয়েও সে আরও তখন ছটফটে, কামিনীর হাত ধরে ইংগিতময় স্বরে বলল, চলো, আমরা আবার নতুন করে ঘর বাঁধি। তোমার কাঁচা বয়সের ঘর আমি পাকা বাঁশের খুঁটি হয়ে সামলাব। তোমার যেটুকু ছায়া দরকার, সব আমি দেব। তুমি যদি আমার চোখে চোখ ফেলে একটুখানি হেসে ওঠো তাহলে আমি রাত-বেরাতে পরের দোরে সিঁদ কাটব না। আমি তখন তোমার শরীরে সিঁদ কাটব। তোমার মন চুরি করে আমি চোর সাজব।

—তা হয় না গো। কামিনীর কান্নাভেজা গলা, মাটির হাঁড়ি ভেঙে গেলে আর জোড় লাগে না। মন তো মাটি। পোড়া মাটিতে আবার নতুন করে হাঁড়ি বানান যায় না।

—যায়। মনের জোর থাকলে ভাঙা মন আবার জোড়া যায়। মানুষের হাত-পা ভাঙে, তা আবার জোড়ে। যেটা ভাঙতে জানে, সেটা আবার জুড়তেও জানে। ভাঙা-জোড়া নিয়েই তো জগতের লীলা খেলা। গঁড়ার মুখপানে চেয়ে পাথর থেকে পাঁকমাটি হয় কামিনীব দোদুল্যমান মন। গঁড়াকে সে দুরছাই

করে তাড়িয়ে দিতে পারে না। ভালবাসার উত্তাপ দূরে থাকলেও গায়ে লাগে। ভালবাসার চোখ সদাসর্বদা সত্যি কথা বলে। ভালবাসলে নরনারী হয়ে যায় কুসুমে আচ্ছাদিত অলীক গাছ। গঁড়া কামিনীর হাত ধরে বোঝাতে চায়, তোমার কথা ছাড়া আমি এখন আর কোন কিছু ভাবতে পারি না। তুমি আমার ক্ষুদ্র ভাবনার মাঝখানে রানী সেজে বসে আছ। আমি জানি, এটা আমার অন্যায়, পাপ। তবু জেনে-শুনে তো অনেক মানুষ বিষ খায়। অনেক মানুষ আগুনে ঝাঁপ দেয়। তুমি না ঠেকালে আমি সারাজীবন পুড়ব, মরব। তাবলে কাউকে দোষ দেব না। দোষ দিতে হলে, দোষ দেব আমার অদৃষ্টকে।

গঁড়ার পুরুষালী চেহারায় আকর্ষণের আগুন। কামিনী সেখানে নিতান্ত আগুনপোকা ছাড়া আর কিছু নয়। পিছুটান তার আছে। সে টান নোঙর ফেলেছে রক্তে। রাতকালে পালানের মুখটা ভেসে ওঠে হামেশা। বিয়ের প্রথম দিকে কত ভালবাসত সে, মোটে আড়াল হতে দিত না চোখের। খুনসুটি করত যখন তখন, কাজে মন ছিল না মোটে। কামিনীও তখন ভাব-ভালবাসায় গদগদ। ভেবেছিল এই ভালবাসা বুঝি কলার কষ। মিথ্যে তার ভাবনা। কাঁচা রঙ গায়ে বসলেও উঠে গেল সামান্য দিনে। কাঁচা রঙ, কাঁচা আবেগ মানুষকে খাঁটি সোনার মত পোড়ায় না। জীবন তখন স্রোতের মুখে ছুটে যাওয়া পানসী। তাকে ঠেকাবে এমন সাধ্যি কার? এমন কিছু কথা থাকে, স্মৃতি থাকে যা বুকের ভেতর ডিম পাড়ে—বংশ বিস্তার করে অলকলতার মূলের প্রগাঢ়তায়। কামিনী হার মানতে বাধ্য হয়। পালান তার এক হাত ধরে আছে, অন্য হাত গঁড়ার হাতে। সে কোন দিকে যাবে? শাঁখা-সিঁদুর তো মানুষ বারবার পরতে পারে না। আগুন সাক্ষী রেখে যে মন্ত্র সে খুব মন দিয়ে উচ্চারণ করেছে—তার কি কোন মূল্য নেই এই অপবাদজারিত জীবনে? পালান ভুল করেছে বলেই কি সেও ভুল পথে হাঁটবে? ঝগড়াঝাটি কোন সংসারেই বা হয় না। ঝগড়ার ফুঁপি বের করে জীবনকে ছিঁবড়ে করার কোন অর্থ নেই। তাই সকাল হতেই সেজে গুজে কামিনী একেবারে তৈরী। আয়নার সামনে বসে সে সিঁদুর পরেছে যত্নে। ময়লা লাগা শাঁখা সাফ-সুতরো করেছে। পালানের কিনে দেওয়া সর্ষে ফুল রঙের শাড়িটা সে পরেছে চমকে দেবে বলে।

রমনীবুড়া তার সাজগোজ দেখে চোখ কপালে তুলে তাকালো। সে কোন প্রশ্ন করার আগেই কামিনী স্বতস্ফূর্তভাবে বলল, বাবা, আজ আমি শ্বশুরঘরে যাচ্ছি। যদি না ফিরি তাহলে ধরে নিও, তোমার মেয়ে আবার তার সংসার ফেরত পেয়েছে। আমি তো কারোর কোনদিন ক্ষতি করিনি, আমি জানি, কেউ আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এতদিন আমি তোমার গলার কাঁটা হয়েছিলাম, আজ থেকে তুমি আরামে ঢোক গিলতে পারবে। আজ থেকে কেউ আর তোমাকে কথা শোনাবে না। তুমি নির্ভাবনায় কাঁচা মদের ব্যবসা করতে পারবে—চোখে জল এসে গিয়েছিল কামিনীর, আঁচলে তা সামাল দিয়ে সে একেবারে ঝরঝরে, তরতরে। যাওয়ার সময় গঁড়ার সাথে তার দেখা হোক—এটাও সে চায়নি। দেখা হলে পথ আটকে দেবে গঁড়া, মনটা দুর্বল করে দেবে কথার জালে। যে মানুষটা তাকে মাটির চেয়েও বেশি ভালবাসে, তাকে সে উপেক্ষা করবে কী ভাবে। গঁড়া তো ঘাস নয় যে মাড়িয়ে যাবে, গঁড়া জল নয় যে সাঁতরে পালিয়ে যাবে। গঁড়া সেই অলঙ্ঘনীয় পাঁচিল যাকে টপকাতে গেলে শুধু মন নয়, পুরো শরীরটাকে হতে হবে চাতক পাখি। কামিনীর কি সেই ক্ষমতা আছে? নিজেকে প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পায় না সে। তাই গঁড়ার চোখ এড়াতে সে হাটখোলায় না গিয়ে, মাইল দুয়েক পথ এগিয়ে এসে বাস ধরে। বাসে বসেও তার শান্তি নেই। খোলা জানালা টপকে হাওয়া এলে গঁড়ার কথা তার বেশি করে মনে পড়ে। মানুষটাকে না ভালবেসে যে উপায় নেই। জল ছাড়া কি মাছ বাঁচে, ভালবাসা ছাড়া কি মানুষ বাঁচে? দিনরাত নিজের সাথেই নিজেকে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয় কামিনীকে। তুষের আগুন হয়ে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে মন। মনের আর দোষ কী। মনের স্বভাব তো জলের মত। সে শুধু স্থিতু হতে চায় প্রচ্ছন্ন গভীরতার সন্ধান পেলে।

যে মন নিয়ে কামিনী এসেছিল পালানের কাছে, সেই সুন্দর মনটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল পালানের কথায়। পালান পানের পিক ফেলে তাচ্ছিল্য সহকারে বলল, বাঁজা গাছের গোড়া কেটে দিতে আমার খুব ভাল লাগে। ফেলে দেওয়া থুতু আমি দ্বিতীয়বার চাটি না। তাছাড়া এ যুগে ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না। আমার পয়সা আছে, আমি ফিরে আর একটা বিয়ে করেছি। নতুন বউ আমাকে যে সুখ দিয়েছে সেই সুখ আমাকে এতদিন কেউ দিতে পারেনি।

থোঁতা মুখ ভোঁতা করে ফিরে আসতে হল কামিনীকে। পালান তাকে এক কাপ চা অথবা এক খিলি পানের কথাও বলল না। বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে খব কান্না পাচ্ছিল তার, নিজেকে সান্ত্বনা দেবার কোন পথই সে খুঁজে পাচ্ছিল না। কাঁচা মদের ভাটিতে ফিরে যেতে তার আর মন করছিল না। সে ভাবছিল, আত্মহননের পথ। কিন্তু এভাবে হার মানতেও তার বড় অনীহা। পালান তার দিকে সন্দেহের আঙুল তুলেছে। বলেছে, চোরের ঘর করলে মেয়ে মানুষের দেমাগ বাড়ে। চোর যা দেবে আমার তা দেবার সাধ্য কোথায়? আমি সৎ ভাবে থাকি, সোজা পথে চলি। চোরপালিয়ার লোকের মুখে আমি সব খবর পাই। তাই তো বাধ্য হলাম আর একটা বিয়ে করতে।

—যা শুনেছ, সব মিথ্যা। কামিনীর কাতর উক্তি হাওয়ায় ভাসে। বিস্ময়ে সে শুনতে পায় পালানের চিবান হাসি। ওর নতুন বউ ওকে জোর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে খিল তুলে দেয় দরজায়।

এসব কথা বুক ভেঙে গেলেও রমনীবুড়ার কাছে বলতে পারবে না কামিনী। বাকি জীবন তার কী ভাবে কাটবে—এই ভাবনায় কালো হয়ে গেল তার পুরো মুখমণ্ডল। বাস থেকে নেমে হাঁটার কোন ক্ষমতা থাকে না কামিনীর। হাওয়ায় আঁচল সরে গিয়েছে বুক থেকে। শুকনো মুখের উপর উড়ে এসে জুড়ে বসেছে কুচো চুল। সর্বদা ভয়ে টিসটিস করে বুক। গলা শুকায় ঘন ঘন। হাঁটতে গেলে টের পায়, তার আর হাঁটার কোন ক্ষমতা নেই। সেই কোন সকালে দুটোখানি ভাত খেয়েছিল সে। তারপর পেটে এক ফোঁটা জলও পড়েনি। সারাদিন ক্ষিদে নিয়ে কাটল তার। অথচ একবারও খাওয়ার কথা মনে হল না। সময় পালিয়ে গেল হাত ফসকে। বাস রাস্তা থেকে কামিনী সোজা নেমে এল মেঠো পথে। আলপথে দুরন্ত হাওয়ার অবাধ যাতায়াত। কামিনী আঁচল গুছিয়ে আবার ঘাড়ের উপর ফেলল। কপালের সিঁদুর টিপটা ভিজে গিয়েছে ঘামে। গায়ের চামড়ায় লেপটে আছে বাসন্তী বরণ ব্লাউজ। শাড়ির খসখসে পাড় ঘসা লাগে গায়ে। জেগে ওঠে গায়ের লোম। পায়ের গোড়ালি থেকে অপরিচিত উষ্ণতা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে। লাল হয়ে ওঠে কানের লতি। লজ্জায় আরক্ত হয় পুরো মুখ। কানের পাশ থেকে আঁকসিলতা চুলগুলো পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে [illegible]ীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। মনে মনে ভাবল—এই পোড়া মুখ নিয়ে সে আবার কী ভাবে ফিরে যাবে বাপের ঘরে? ভয় এসে ঝাঁকিয়ে দিল তাকে। মৃত্যুফাঁদ হাতছানি দিয়ে ডাকল। সে প্রস্তুত। কামিনী শনহনিয়ে পেরিয়ে আসল আলপথ। তাকে বুঝি নেশায় ধরেছে। সে কোথায় চলেছে তা সে নিজেও জানে না। তবে কি মরণ তাকে শ্যামের বাঁশির মত ডাকছে? মৃত্যু কি ভালবাসতে চাইছে তাকে? আশ্রয় দিতে চাইছে বুকে? তিন-চারটে মাঠ পেরলেই বুনো জামগাছের সারি। গাছগুলো কেউ লাগায়নি, আপসেই বেড়ে ছায়া দিচ্ছে মাঠকে। বিকেলের ক্ষীণ আলোয় গাছের গোড়ায় ভুসো ছাই আঁধার। দু-একটা ছুটকো-ছাটকা চারা গাছ সেই আঁধারে গা ভাসিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কামিনী জামগাছের তলায় এসে সেই আঁধারে গা ভাসিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কামিনী জামগাছের তলায় এসে উপরের দিকে তাকাল। আকাশ নেই, আলো নেই, কেবলই শুধু ক্ষীণ অন্ধকার। এই অন্ধকার কি তার ক্ষয়া জীবনের সাথে মিশেছে? কোন উত্তর পেল না সে। শুধু দু-চোখ বেয়ে জল ঝরল টুপটুপিয়ে। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল চিড়বিড়িয়ে। প্রতিজ্ঞা করল সে আর ঘরে ফিরে যাবে না। কারোর গলগ্রহ হয়ে থাকবে না। সে মরবে, জামগাছে ফাঁস লাগিয়ে মরবে। মরার মত শান্তি আর কোথাও নেই। সে মরবে।

পালানের নতুন বউ সুখী শরীর নিয়ে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। পালানও পোষা বেড়ালের মত ঘরে ঢুকে গেল। এর পরে আর কিসের লোভে বেঁচে থাকবে কামিনী? কিসের জন্য শ্বাস নেবে পৃথিবীতে? আঁধার ঝাঁপিয়ে পড়ল পুরো মাঠে। অন্ধকার মিশে গেল জামের পাতায়। নির্জন মাঠ তাকে প্রলুব্ধ করল আত্মহত্যা করার জন্য। কামিনী শরীর থেকে খুলে ফেলল সর্ষে ফুল রঙা শাড়ি। ভার বুক দুটো নড়ে উঠল ঘনঘর্ন। নিঃশ্বাস ছুঁয়ে গেল বুকের খোদল। নিঃশ্বাস গড়িয়ে গেল নাভি বরাবর। সায়ার খোলে হাওয়া ঢুকে ফুলে উঠল দেহ। কামিনী খুবই নিবিষ্ট চোখে নিজের দিকে তাকাল। তার এই শরীরের দাম পালানের কাছে একটা ফুটো কড়িও নয়। কী হবে এমন অসার শরীর জিইয়ে রেখে? সে মরবে। হাতের শাড়ি লাফ দিয়ে ছুঁড়ে দিল জামের ডালে। ব্যর্থ তার প্রচেষ্টা। শাড়ি হাওয়ায় উড়ে গিয়ে অন্যত্র পড়ল। কামিনী তবু হারবে না। সে লাফ দেয় পায়ের চেটোয় ভর দিয়ে। মাটি কাঁপে, শব্দ হয় দুপদাপ। ঘরে ফেরা পাখিগুলোর চোখেও ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। কামিনীর হাতের চুড়ি রিন্‌ঝিন্ করে বাজে। সে লাফ দিয়ে ছুঁতে চায় জামের ডাল। পারে না। তার আগেই গঁড়া ছুটে এসে তার কোমর জড়িয়ে ধরে। ধরেই থাকে। কামিনী শত চেষ্টা করে ছাড়াবার। পারে না। গঁড়া তাকে তিরস্কার করে বলে, কেন মরবে? জীবন কি এতই সস্তা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ সস্তা। আমার জীবনের কী দাম আছে? ছেড়ে দাও আমাকে।

—তোমার জীবনটা কি তোমার? আগে আমার এই কথাটার জবাব দাও। গঁড়া শক্ত করে চেপে ধরে কামিনীকে, বুকের ঘর্ষণে বুক জেগে ওঠে। ফুলে ফুলে ওঠে কামিনীর বুক-পিঠ-গলা। শরীরের মসৃণ ত্বকে টান টান উত্তেজনা। লম্বা দু-হাত সেঁটে থাকে কোমরের দু-পাশে। আপ্রাণ চেষ্টা করে সে গঁড়াকে ছাড়াবাব। পারে না। কেঁদে ওঠে পুনরায়।

—তুমি কেন এলে? তুমি কি আমাকে শান্তিতে মরতেও দেবে না? একজন তো তাড়িয়ে দিল কুকুরের মত, তুমি কেন বুকে জড়িয়ে ধরেছ? কেন?

গঁড়ার এসব কথা কানে ঢুকল না। মাত্র ঘণ্টা খানিক আগে রাধীকে সে বাটি ছুঁড়ে মেরেছে। কপাল ফেটেছে রাধীর। পাড়া মাথায় তুলে কাঁদছে বউটা। তার কান্না গঁড়ার কানে অসহ্য লাগে। সে পালিয়ে এসেছে ফাঁকা মাঠে। সে-ও বাঁচতে চায় নির্জনতায়। সংসারের জ্বালা অসহ্য। সংসারের ফাঁদ থেকে সে পালিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু কামিনী তাকে বাঁচতে দেয় না। ওর খোলা শরীর তাকে কামনার আঁচে পোড়ায় অহরহ। গঁড়া পুড়তে চায় ঐ শরীরের চাপা আগুনে। শরীর পোড়ে নির্জন ধানমাঠে। সাক্ষী থাকে হাওয়া, খোলা আকাশ। এক তাল মাটির মত কামিনীর দেহে গঁড়া আদি শিল্পের চিহ্ন আঁকে আদিম ভালবাসায়।

বত্রিশ

অসময়ের বৃষ্টি মানুষকে কাঁদায়। গাছপালা, জীবজগত বিব্রতবোধ করে বৃষ্টির দাপটে। দুলুবাবু নির্বিকার, তার কাছে বৃষ্টি, রোদ সব সমান। মুক্তা বলেছিলেন, মেয়ে বড় হচ্ছে। এবার ওর জন্য পাত্রের খোঁজ কর। গ্রামে তোমার যে সুনাম আছে, সেটা নষ্ট হোক আমি চাই না। তাই তোমাকে আগাম সতর্ক করে দিলাম।

দুলুবাবু ভাল জামা-কাপড়-জুতো পরে গোবরে হঠাৎ পা দিয়ে ফেলেছেন এমন বিরক্তির চোখে তাকালেন। মুক্তার কথা তবু থামল না, অবিরাম বৃষ্টিপাতের মত তিনি বললেন, মালা এখন আর ছোট নেই। ওর মতিগতি ভাল ঠেকছে না আমার। এগরা গেলে অনেক রাত করে ঘরে ফেরে। কিছু বললে

মুখে-মুখে তর্ক করে। আমাকে মোটে মানতে চায় না। যত দিন যাচ্ছে, তত ওর সাহস বাড়ছে। এবার ওকে থামান দরকার। মুক্তার অভিযোগ একদিন নয়, প্রায় বছর খানিক থেকে শুনে আসছেন দুলুবাবু। মেয়ে বড় হলে সব বাবা-মাকে বুঝি কিছু না কিছু কথা শুনতে হয়। এ সত্ত্বেও মালার উপর দুলুবাবুর অগাধ বিশ্বাস। মেয়ের কাঁচা হলুদ মুখের দিকে তাকালে তিনি উচ্ছৃঙ্খলতার কোন চিহ্ন খুঁজে পান না। মালা পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে সারাদিন। ঘরের বাইরে গেলেও তার আচরণ সংযত। দুলুবাবু জানেন, মালা তার স্বভাব পেয়েছে। মালা তাই কোনদিন তাকে ঠকাবে না, দুঃখ দেবে না। এই বিশ্বাস এখনও অটুট। মুক্তা সময়ে-অসময়ে মালার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বিব্রত করেন দুলুবাবুকে। দুলুবাবুর মনে সে সব কথা পদ্মপাতার জলের মত পিছলে যায়। অভিমানে গাঢ় হয় মুক্তার মুখমণ্ডল। মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি রীতিমতন ভীত। নিজের যৌবন কালের কথা মনে পড়ে। ঘর পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে তো ভয় পাবেই।

মিটিংয়ে যাবার আগে দুলুবাবু পাঞ্জাবীটা গলিয়ে নিলেন গায়ে। আটপৌরে ধুতি বদলে কাচা সরু পাড় ধুতি পরলেন সযত্নে। গ্রামের বাইরে কোথাও গেলে তিনি কখনও ময়লা পোষাকে যান না। তার চেহারার আভিজাত্য বৃদ্ধি পায় পোযাকের লালিত্যে। মুক্তা তন্বিষ্ট চোখে দেখছিলেন, ধূমায়িত চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, এত সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছো?

—এগরাতে মিটিং আছে। দুলুবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, আজ ফিরব না, ওখানে খাওয়া-দাওয়াব ব্যবস্থা আছে। কাঁথি থেকে সব নেতারা আসছেন। মেদিনীপুর সদর থেকেও অনেকে আসবেন।

— সে তো বুঝলাম, কিন্তু কতদিন আর তুমি এভাবে সময় নষ্ট করবে! এবার চাযের কাজে একটু মন দাও। সারাদিন ভূতের বেগার খেটে কোন লাভ নেই। মুক্তার কথা শুনে বিরক্ত হলেন দুলুবাবু। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, তোমার তো কোন অভাব রাখি নি। তুমি তো দিব্যি মাসের মধ্যে তিন চারটে সিনেমা দেখে আসছ। ভাল মন্দ খাচ্ছো। ঘরে বসে টিভি দেখছো। তোমার আর কী চাই বলো? দুলুবাবু আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন মক্তার দিকে। এত বয়সেও অভিমান করলে গালে টোল পড়ে মুক্তার, চোখের মণি দুটোয় প্রস্ফুটিত ফুলের স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে থাকে। টান টান দেহলাবণ্যে এখন ভাটার কোন আভাস নেই। ঘাড়, গলা এমন কী চোখের কোলেও বয়সকে হারিয়ে দেবার বিপুল আয়োজন। যত্নে বাঁধা চুলগুলো নরম সিল্কের বোঝা। মসৃণ, ঢালু ঘাড়ের উপর রেশমী চুলগুলো বিশাল তিলের চেয়েও চকচকে। মুক্তা অভিমানী হলে দুলুবাবুর মুখের কথা নিরুদ্দেশ হয়। তখন আপোষের শব্দগুলো খুঁজতে থাকেন তিনি। অশান্তি তার ভাল লাগে না।

চারটের বাসে এগরা না গেলে মিটিং শুরু হয়ে যাবে। গ্রামের কতগুলো জরুরী সমস্যার কথা জেলার নেতাদের জানানো দরকার। মিটিংয়ে তার উপস্থিতি একান্তই দরকার। বাইরের লোকসমাজে যিনি আদরনীয়, ঘরে তার মূল্য খড়কুটোর সমান। ঘরে এলেই মুক্তা সদাসর্বদা সমস্যার জাহাজটা ঠেলে দেন তার দিকে। দুলুবাবু মুক্তার স্বভাব জানেন। তাই নীরব চোখে তাকিয়ে থাকেন মুক্তার মুখের দিকে। লক্ষ্য করেন, ফুলে ফুলে উঠছে মুক্তার ঠোঁট, কপালের সরু ভাঁজে চিন্তার সুস্পষ্ট ভাঁজ। এত অল্প সময়ে মুক্তার মান ভাঙানো যাবে না। সে চেষ্টা করাও বৃথা। মেয়েমানুষের মন পাওয়া আর ভরা পুকুরে সোনার আংটি খুঁজে পাওয়া এক কথা। দুলুবাবু বৃথা সময় ব্যয় না করে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

বৃষ্টির পরে মাটির মুখ নরম কেঁচো মাটির মতন। ঢোলকলমী গাছের পাতাগুলো চকচক করছিল বিকেলের হলুদ আলোয়। মালা কলেজ থেকে ফেরেনি তখনও। দুলুবাবু বাইরে এসে একটা সিগারেট ধরালেন আয়েস করে। হাটখোলায় এসে কথা বলার লোক খুঁজছিলেন এদিক ওদিক তাকিয়ে। বৈকালিক তাসের আসর বসেছে দোকানের সামনে। উত্তেজনার শব্দ ছাপিয়ে আসছে রাস্তায়। এই উত্তেজনা

নিত্যদিনের। দুলুবাবু চোখ ফিরিয়ে নিলেন। বাস এল মিনিট দশেক পরে। এগরা পৌঁছে নিজের কাজে ডুবে গেলেন তিনি। বাক্‌বিতণ্ডায় মহৎ কাজ হয় না। কাঁথির নেতা বললেন, সব গ্রামেই সমস্যা। সব সমস্যাকে দূর করতে হবে আমাদের। মানুষের আস্থা হারান পাপ। সাধারণ পাবলিক তত্ত্ব বোঝে না, তারা চায় কাজ। আপনারা যে যেখানে আছেন সততার সঙ্গে নিজেদের কাজটুকু করে যান। আমাকে যখন যেখানে ডাকবেন কাছে পাবেন।

তিনি দীঘা ফিরে যাবেন রাত দশটায়। দীঘায় মন্ত্রী আসার কথা আছে। ওখানে মৎসজীবি মানুষদের সঙ্গে মিটিং আছে মন্ত্রীর। এছাড়াও ঠাসা প্রোগ্রাম। তত্ত্ব কথায় ভার হয়েছিল দুলুবাবুর মাথা। অখণ্ড আরামের জন্য তিনি ঘরে ফিরে যেতে চাইলেন। নেতা বললেন, আমার গাড়িতে চলুন। আমি তো শর্ট রুট দিয়ে যাবো। আপনাকে চোরপালিয়ায় নামিয়ে দেব।

এই সুযোগ হাতছাড়া করা বোকামী। মুক্তার অভিমানী মুখ দুলুবাবুকে আরো জোর করে টেনে আনল চোরপালিয়া। সংসারের জন্য তার অবদান কতখানি এ নিয়ে তিনি ভাবলেন। জমিজমা যা আছে সবই তো ভাগে দিয়েছেন। ভাগে যা ধান পান তাতে সারা বছরের খরচাপাতি উঠে যায়। তবু মুক্তার দুঃশ্চিন্তা তাকে ভাবাল। মেয়েরা অধিক নিরাপত্তায় বিশ্বাসী। মুক্তার বিশ্বাস অর্জনের জন্য তিনি সবরকম কাজ করতে প্রস্তুত। তিনি কারোর স্বাধীনতা খর্ব করতে চান না। পুরুষালী কর্তৃত্বের বেড়াজাল তার পছন্দ নয়। মালা যদি নিজের পছন্দমত পাত্রকে বিয়ে করতে চায় তাহলে তিনি বাধা দেবেন না। মালার উপর তার বিশ্বাস অটুট। মালা ভুল পথে পা দেবে না।

রাতের চোরপালিয়া মরা তেলাপিয়া মাছের চেয়েও ঠাণ্ডা। হাটখোলায় প্রায় সব দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। শুধু বসন্ত জানার টেলারিং দোকানে কাচে কালি নিয়ে হ্যারিকেন জ্বলছিল তখনও। জয়ন্তর মৃত্যুতে প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছেন বসন্ত জানা। ছেলের আত্মহত্যার কারণ এখনও তার কাছে অজানা। দুলুবাবুকে দেখতে পেলে বুড়ো মানুষটার কথা বলার অদম্য ইচ্ছাশক্তিটা বেড়ে যাবে। তাতে রাত বাড়বে। নষ্ট হবে সময়। দুলুবাবু সে দিকে আর গেলেন না, সোজা হেঁটে এলেন বাড়ির দিকে। গেট খুলে ঢুকে এলেন ইট বিছানো রাস্তায়। অতবড় ঘরখানা প্লাবিত জ্যোৎস্নায় স্বপ্নের আবেশ ছড়িয়ে জেগে আছে। চারপাশের গাছপালা বুঝি পাহারাদার। টুপটুপিয়ে ঝরে পড়ে শিশিব কলাপাতার পেছল শবীর বেয়ে। এত রাতে ঘরে ফিরে মুক্তাকে ডাকতে সংকোচবোধ করেন তিনি। ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর ছাড়িয়ে হেঁটে এসেছে অনেকটা পথ। শীত হাওয়ার ঝাঁপটা এসে দুলুবাবুব গায়ে লাগে। শালটা ভাল মতন জড়িয়ে নিয়ে তিনি ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কালো মোটর সাইকেলটা নজর পড়ল তখন। কুয়াশায় ভিজে আছে লম্বা সীট। হিম খেয়ে মোটর সাইকেলের যন্ত্রাংশ বরফঠাণ্ডা। সুদেব বাবুর উপস্থিতি এ সময় দুলুবাবুকে সুখ দেয় না। গ্রামের মানুষ কু'কথায় বাতাস ভরায়। ছিঁটে ফোঁটা কানে আসে তার। মুক্তাকে যে নিষেধ করবেন, তেমন মনে বল, সৎসাহস তার নেই। পা টিপে-টিপে তিনি এসে দাঁড়ালেন সদর দরজার সামনে। শোবার ঘরে আলো জ্বলছিল তখনও। দরজায় টোকা মারতে গিয়ে থেমে গেল তার হাত। এলোমেলো কথায় কাঠ হয়ে গেল তার শরীর। চোখের তারা কাঁপছিল। মুক্তা রুষ্ট গলায় বলছিল, তুমি কেন এসেছ সুদেব? কে তোমাকে আসতে বলেছে? আর এলেই যখন, তখন রাতে তোমার কাঁথি ফিরে যাওয়া উচিত ছিল।

—ফিরে যাবার জন্য তো আমি আসিনি। —সুদেববাবু হাসছিলেন, কতদিন আসিনি বল'তো। তুমি আমাকে ভুলে কি করে আছো? সত্যি, মেয়েরা অনেক নিষ্ঠুর হয়।

—আমি নিষ্ঠুর হ'লে তুমি আমাকে নিয়ে ছেলেখেলা করতে পারতে না। রাগে ফেটে পড়তে চাইলেন মুক্তা, তোমার জন্য আমি খুনী সেজেছি। পেটের সন্তানকে নষ্ট করেছি। তোমার ফাঁদে পা দিয়ে আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। অথচ, বিনিময়ে আমি কিছুই পেলাম না। তুমি আমাকে ক্ষণিক সুখ দিলেও, সেই সুখের মূল্য আমার কাছে অর্থহীন।

—ঝগড়া করে রাতটা কি পার করে দেবে? সুদেববাবু বললেন, কতদিন পরে দেখা। আজকের রাতটা আমি স্মরণীয় করে রাখতে চাই। প্লিজ, আমাকে বাধা দিও না।

—তুমি তোমার বিছানায় ফিরে যাও। কঠিন শোনাল মুক্তার গলা, মালা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। ও ভয়ানক চালাক। তাছাড়া ওর ঘুমও খুব পাতলা। আমাকে ও প্রথম থেকেই সন্দেহের চোখে দেখে। নাছোড়বান্দা সুদেববাবু মুক্তার হাত ধরে জোর করে শুইয়ে দিলেন খাটের উপর। অভিমানে ঠোঁট নড়ে উঠল মুক্তার, না, তুমি আমাকে ছোঁবে না। তোমার যখন বিয়ে করার এত আগ্রহ তাহলে কেন আমার কাছে এসেছ? আমার কাছে এলে তোমাকে শুধু আমার হয়েই থাকতে হবে। যদি কথা দাও তাহলে আসো, নাহলে ফিরে যাও। আর কোনদিনও এসো না। আমাকে পাপের পথে হাঁটতে বাধ্য করিও না। আমার ঘর সংসার আছে।

দুলুবাবুর নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হল। এ কোন অন্ধকার গহ্বরে তিনি ফিরে এলেন? ঝিনুকের পেটে লুকিয়ে থাকা এমন কীটদংশন মুক্তাকে তিনি চিনতেন? পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল তার। জ্যোৎস্না রাতে আকাশ থেকে ঝরে পড়ল বিষাদ বিচ্ছেদের কালিমা। একটা হা-মুখ ফাটলের মাঝখানে তিনি বুঝি দাঁড়িয়ে আছেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি দরজার ছিদ্র দিয়ে দেখলেন মুক্তা খোলা, উন্মুক্ত সমুদ্রকন্যা হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। সুদেববাবু আকাশের মুগ্ধতায় ঢেকে দিয়েছে তার পুরো শরীর। আকাশ নেমে এসেছে নীল জলরাশির আকর্ষণে। ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ ভাঙে নীল সমুদ্র। শরীরের শব্দগুলো কমনার আর্তি হয়ে ঘরময় খেলা করে।

চকিতে খেলা থেমে গেল দুলুবাবুর ক্রোধ উন্মত্ত লাথিতে। ঘন ঘন পদাঘাতে পুরনো শালকাঠের দরজা কেঁপে ওঠে বনান্তের বন্য হাওয়ায় শালপাতার মত। হতচকিত মুক্তা শাড়িটা কোমরে জড়িয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতে বাধ্য হয়। দুলুবাবুকে দেখে তার গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে কাতর আর্তনাদ, তুমি?

তার কথা শেষ হয় না, ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যান সুদেববাবু। মোটর সাইকেলে লাথি মেরে স্টার্ট দেন তিনি। হাওয়ায় ভাসে পোড়া পেট্রোলের গন্ধ। বাতাস কেঁপে ওঠে মোটর সাইকেলের শব্দে। দুলুবাবু মুক্তার গলায় হাত দাবিয়ে ঝুঁকে পড়েছেন সক্রোশে।

—তোমাকে আমি শেষ করে ফেলব। দুধ-কলা দিয়ে এতদিন আমি জাতসাপ পুষেছিলাম। আর নয়। আজই তোমার শেষ রাত।

—আঃ, ছেড়ে দাও! মুক্তা ছটফটিয়ে উঠল শ্বাসবন্ধ পায়রার মত। ...রো সজোরে দুলুবাবুর হাত দুটো চেপে বসেছিল মুক্তার গলায়, শুধু বিকট একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ ছাড়া কিছুই ছিল না চার দেওয়ালের মাঝখানে।

মোটর সাইকেলের শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল মালার। সেই থেকে সে ঠায় দাঁড়িয়েছিল জানলার শিক ধরে। কী তার করণীয় কিছুই মাথায় আসছিল না।

মায়ের আর্তনাদে বিচলিত হয়ে উঠল মালা। অঘটন কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই সে ছুটে এল ঘরে। পিছন থেকে পাঞ্জাবী খামচে সে টেনে সরিয়ে দিতে চাইল তার বাবাকে। পারল না। না পারার যন্ত্রণায় সে কঁকিয়ে কেঁদে উঠল, ওঃ বাবা, মাকে তুমি ছেড়ে দাও। মা যে মরে যাবে তাহলে—

দুলুবাবুর মুখে কোন ভাষা নেই, শুধু হাত দুটো ক্রমশ লৌহ কঠিন হয়ে উঠছিল বুকের জ্বালা জুড়াবার জন্য। কোন উপায় না দেখে মালা চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বাবার উপর। টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে দিতে চাইল রাগী শরীরকে।

দুলুবাবুর হাতের বাঁধন তবু শিথিল হল না। তার পেশী বহুল হাতের শিরা জেগে উঠল টানটান। ঘর্মাক্ত সেই হাতে মালা মুখ ঝুঁকিয়ে সজোরে ঢুকিয়ে দিল দাঁত।

হাত আলগা হয়ে গেল দংশনের জ্বালায়। মুক্তো ছিটকে পড়ল মেঝেয়। দূরে ছিটকে গিয়ে দুলুবাবু মালার দিকে আগুন চোখে তাকালেন। মালাও উদভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে থাকল বাবার দিকে। তার চোখে ভয় নেই, নেই অনুশোচনার চিহ্ন। দুলুবাবুর আগুন চোখকে উপেক্ষা করে সে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল মায়ের দিকে। উঁচু হয়ে মায়ের পাশে বসে বাঁধ ভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। জ্যোৎস্নার রঙ মলিন হয়ে গেল চোখের জলের কাছে।

তেত্রিশ

চৈত্র মাসের রোদে গঁড়ার মাথা ছাপিয়ে ঘাম নামছিল দরদরিয়ে। ধর্মাবাবুর বাগানটা কুপিয়ে দিতে পারলে তাকে আর ধরে কে। চাল-ডাল-তেল-নুনের খরচাপাতি উঠে যাবে। সকালে জল ঢালা ভাত দিয়েছিল রাধী। গঁড়া গোগ্রাসে তা গিলেছে। মাস খানিক হল সে এখন শান্ত মাটির ঢেলা। রাত ঘনালেও তার মন বাঁধা থাকে ঘরের কোণে। কামিনীর মাথায় হাত রেখে কিরে কেটেছে সে, জীবনে আর কোনোদিন চুরি-চামারি করবে না। খাটবে খাবে, তাতে যদি নুন ভাত জোটে তা-ও আচ্ছা। কামিনী তাকে ভালবাসার মায়াজালে লটকেছে। শাসন করে বলেছে, আবার যদি তোমার নামে চুরি অপবাদ শুনি, সেদিন কিন্তু আমি বিষ খাবো। তুমি তো আমার জেদ জানো। বদনাম গায়ে মেখে আমি এক মুহূর্তের জন্য বাঁচতে চাই না।

কামিনীর কথাগুলো গঁড়াকে শাসন করে অলক্ষে। দূরে থেকেও কামিনী যেন পাশে থাকে সর্বদা। গঁড়া বলেছে, সে আর খারাপ ধান্দায় যাবে না। যে কটা দিন বাঁচবে, মানুষের মত মাথা উঁচু করে বাঁচবে। বাঁচার প্রতিযোগিতায় গঁড়া এখন ধর্মাবাবুর মুনিষ। গায়ের পুরো তাগতই সে উজাড় করে দেয় ক্ষেতিবাড়ির কাজে। টানা একমাস কাজ করেও গঁড়ার কোন ক্লান্তি নেই। রাধী রাতকালে তার পা-মাথা টিপে দেয়, মন ভাল থাকলে বলে, তোমাকে একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন। রমনীবুড়ার সোয়ামী খেদানো মেয়েটাকে তুমি ভুলে যাও। তোমার এত বড় সংসার, বাইরের দিকে মন ঝুঁকালে টানাটানি হবে বেঁচে থাকায়। ওর কাছে তুমি কী পাও, যা আমার নেই।

গরম তেলে জলের ছিঁটে দেওয়ার মত নড়ে-চড়ে ওঠে গঁড়া, নাক বেয়ে নেমে আসে গরম নিঃশ্বাস, বিছানায় উঠে বসে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে, কামিনীর নামে ফের যদি একটা কথা বলিস তাহলে তোর জিভ আমি উপড়ে নেব। সে মানুষ নয় রে—দেবী, তার ছোঁয়ায় আমি চোর থেকে সাধু হবার চেষ্টা করছি। তার নামে কেউ বাঁকা কথা বললে, আমি কাউকে ছাড়ব না।

ভয়ে সিঁটিয়ে গেলেও রাধী মিনমিন করে বলে, হাজার হোক পরের মেয়ে, তার উপর তোমার এত লোভ কেন? দশ লোকে দশ কথা বলে, শুনতে আমার ভাল লাগে না। ছেলে-মেয়ে সব বড় হচ্ছে। ওরাই বা কী ভাববে?

—যা ভাবে ভাবতে দে। কামিনী ছাড়া গঁড়া কোনদিন বাঁচবে না। ভাল চাস তো মুখ বুজে থাক। এ সংসারে থাকতে গেলে বোবা হয়ে থাকতে হবে।

—তার মানে?

—মানেটা খুব সোজা। কামিনীকে আমি বিয়ে করব। ঘরে আনব। সে হবে আমার দ্বিতীয় পক্ষ। গঁড়া চোয়ালে চোয়াল চেপে থাকে, তোর যদি গায়ে বিচুটির জ্বলন শুরু হয়, তাহলে বাপের ঘরে ফিরে যা। আমি তোকে আটকাব না।

—ছেলে-মেয়েগুলার কী হবে? তারা কোথায় যাবে?

—তাদের সব দায়-দায়িত্ব আমার। আমি যতদিন বাঁচব, তারা দু'বেলা দু-মুঠো শাক ভাত পাবে। আমি মরার পরে ওদের কী হবে জানি না। গঁড়ার জেদ আকাশ ছোঁয়া। রাধী বাতাস ভরিয়ে কাঁদলেও কোন সমাধানের পথ পায় না। সব পথ তার চোখের সামনে বন্ধ। অন্ধকার হাতড়ে সে কোথায় যাবে? বাপের ঘরের সুখ বিয়ের পরে অনেক মেয়ের ভাগ্যে লেখা থাকে না। কান্না ফুরিয়ে এলে চোখের জলও শুকিয়ে যায়। গঁড়ার জেদের কাছে সে ফণা তোলা মাথা নামাতে বাধ্য হয়। গঁড়া তাকে বোঝায়, মনে দুঃখ পুষে রাখিস না। দুঃখ বুকের ভেতবে ফাটল ধরায়। ক'দিনের আর জীবন। হেসে খেলে কাটিয়ে দে। কামিনী তোর ছোট বোনের মত। ওকে তুই মানিয়ে নে।

গঁড়ার প্রস্তাব মেনে নিয়েছে রাধী। সব শুনে কামিনীও বেজায় খুশি। অন্যমনস্ক গলায় সে বলেছে, তোমাকে একটা খুশির খবর দেব। তবে আজকে নয়, অন্যদিন। যে দিন আমাকে নিতে আসবে, সেদিনই বলব কথাটা।

—কবে তোমাকে নিতে আসব? গঁড়ার আগ্রহ শিম ডগালের মত লক্‌লকিয়ে বাড়ে। তার একাগ্রতার কাছে হার মানতে বাধ্য হয় কামিনী। আধো স্বরে বলে, আর মাসখানিক যাক, তারপর।

—এখনও এক মাস আমাকে দিন গুণতে হবে?

—সবুরে সোনা মেলে। বুঝলে কি না? গঁড়ার থুঁতনী ধরে আলতো নাড়িয়ে দিয়েছিল কামিনী। মাটি কাটতে গিয়ে সেই স্পর্শানুভূতি গঁড়াকে আনমনা করে দিল কিছু সময়ের জন্য। কামিনীর কোমল ছায়াঘন মুখটার কথা মনে পড়তেই হাতের কোদাল থেমে গেল তার। ধর্মাবাবু সিগ্রেট ধরিয়ে গঁড়ার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় তখন। ঘর্মাদ্রি গঁড়াকে দেখে তার দয়া হল।

—তোর আর কাজ করে লাভ নেই, এবার তুই বিশ্রাম নে।

—বিশ্রাম নিলে কি পেট বাঁচবে বাবু?

—পেট যাতে বাঁচে সেই ব্যবস্থা আমি করে দেব।

—তার মানে? গঁড়া আকাশ থেকে পড়ল, আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।

—বুঝবি, সব বুঝবি। আমার লোক তোকে সব বুঝিয়ে বলবে। সবুর কর, সে এল বলে। ধর্মাবাবু চলে যাবার পর গঁড়া আবার কোদাল চেপে ধরল শক্ত হাতে। কাজ করে সে টাকা নেবে। কাউকে ঠকিয়ে নিলে সেই পয়সা গায়ে লাগে না। অথচ ধর্মাবাবুর কথাগুলো পুরোমাত্রায় রহস্য। শক্ত মাটিতে কোপ মারলে লাফিয়ে ওঠে কোদাল। ধুলো উড়ে ছড়িয়ে যায় শরীরে। ঘামের সাথে ধুলোর সহাবস্থানে গঁড়ার গা-পিঠে থোক থোক কাদা। ঘোলা জলের ঘাম নামে তরতরিয়ে ধর্মাবাবুর এক নম্বর চ্যালা অশ্বিনী আসে সিগ্রেট ফুঁকতে-ফুঁকতে। গঁড়াকে দেখে সে মুখ ভরিয়ে হাসে। বানান হাসির মূল্য দিতে হয় অনেক। অশ্বিনী বলে, বাবুর সুনজব তোমার উপর পড়েছে। তমি দেখছি ভাগ্যবান।

গঁড়ার বিস্ফারিত চোখ, কিছুই মগজে ঢোকে না। ধুলোবালি ভরা শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে সে বোকার মতন তাকাল। অশ্বিনী বলল, বাবু একটা দায়িত্ব তোমাকে দিতে চায়। কাজটা করে দিতে পারলে বাবু তোমাকে এত টাকা দেবে যা তোমার মনে থাকবে। তোমার অভাব দূর হবে। ধড়ফড়িয়ে উঠল গঁড়ার বুক, কী কাজ করতে হবে আমাকে?

অশ্বিনী সিগারেটের ছাই ঝাড়ল,পাশে সরে এসে নীচু গলায় বলল, রবীনবুড়ার মেয়ে কামিনীকে নিশ্চয়ই চেনো। মেয়েটার বড় ফাট বেড়েছে। বাবুর সাথে মেয়েটাকে লটকে দিতে হবে তোমাকে। আমি শুনেছি, তোমার সাথে মেয়েটার উঠাবসা আছে। তুমি যদি বলো সে তোমার কথা ফেলতে পারবে না।

—কামিনী অমনধারা মেয়ে নয়। বুকের ভেতর রাগ চেপে রেখে কথাগুলো বলল গঁড়া। কামিনীর উপর ধর্মাবাবুর যে চিল নজর পড়েছে এটা সে জানত। কামিনী দু-চার বার তাকে বলেছে। গঁড়ার বুকের ভেতরে রাগের তুফান উঠলেও সে অনেক সংযত। রাগারাগি, মাথা গরম করলে তারই বিপদ।

অশ্বিনী বহু আশা নিয়ে তাকিয়ে ছিল কিছু শোনার জন্য। গঁড়া সাফ-সাফ জানিয়ে দিল, ওই হীন কাজ আমার দ্বারা হবে না। আমি গরীব মানুষ, সাত ঝামেলায় জড়িয়ে মান হারাতে চাই না।

—তোমার আবার মান-সম্মান! বাঁকা, কুটিল হেসে উঠল অশ্বিনী, চুরি করে যার দিন যায়, তার আবার মান-সম্মানের ভয়। আর একবার ভেবে দেখ। এমন সুযোগ বারবার আসবে না।

গঁড়া তবু প্রতিক্রিয়াহীন। কপালের ঘাম নিংড়ে সে মুখ নীচু করে দাঁড়াল। অশ্বিনীর দিকে তাকাতে তার ঘৃণা হচ্ছে। এরা সমাজের বুকে মাথা উঁচু করে বেড়ায়। এরা পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড়ায়, বড় বড় মুখভরা কথা বলে। এদের ভেতরটা কি কেউ দেখতে পায় না? গঁড়ার বুকের ভেতরে হাজার প্রশ্নের তোলপাড় শুরু হয়। কামিনীকে এদের খপ্পর থেকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে। ধর্মাবাবুর থাবা থেকে কামিনীকে বাঁচাতে হলে গঁড়ার এখনই কিছু করার দরকার।

কাজ শেষ করে মুজুরীর টাকাটা গুণে নিয়ে ঘরে ফিরে গেল গঁড়া। পুকুরে এক ডুব দিয়ে এসে রাধীকে বলল, তাড়াতাড়ি দুটো খেতে দে, আমাকে একটু যেতে হবে।

—কোথায় যাবে?

রাধীর প্রশ্নে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল গঁড়া, কোন উত্তরই তার ঠোঁটের ডগায় খেলে গেল না। রাধী অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, চুপ করে আছো যে। খেয়ে-দেয়ে তুমি ঘরে থাকো। আজ কোথাও যেও না।

—আমাকে কামিনীর কাছে যেতে হবে, ধর্মাবাবুর লোক ওর পিছনে লেগেছে। ভয়ে ছোট হয়ে এল গঁড়ার চোখ, রাধীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বলল, কামিনীকে আমি বেহাত হতে দেব না। ভাবছি আজই আমি ওকে ঘরে তুলব।

রাধীর রক্তহীন মুখ, শুধু ঠোঁট নড়ল অনবরত। বুক ভেঙে গেলেও মুখ থেকে কোন কথা বেরল না। ভাতের থালটা এগিয়ে দিয়ে সে ঘরের কাজে ডুবে গেল।

পরপর দু-দিন গঁড়ার হাতে কোন কাজ নেই।

অশ্বিনী চড়া গলায় বলল, তোমার খুব চর্বি জমেছে। তোমার চর্বি একটু কমানো দরকার। তোমাকে এখানে কাজ করতে হলে বাবুর কথা শুনতে হবে।

কোদাল হাতে সকালবেলায় ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হল গঁড়া।

রাধী মুখ গোমড়া করে বলল, আমি জানতাম—বাবু তোমাকে আর কাজে নেবে না। পরেব ঝামেলা ঘরে আনা তোমার ঠিক হল না।

গঁড়া বুঝতে পারে না কোথায় তার অপরাধ। কামিনীকে ভালবেসে সে কি কোন অন্যায করেছে? অথচ সাঁঝবেলায় কামিনী বলল, দোষ তোমার নয়, সব দোষ আমার। তুমি এখান থেকে চলে যাও। আমি তোমার সাথে যাব না। বলেই সে গঁড়ার মুখের দিকে তাকাল। গঁড়া শান্ত গাছের মত দাঁড়িয়ে থাকল দেওয়ালে পিঠ দিয়ে! কামিনী উত্তেজিত হয়ে বলল, আসতে দাও ধর্মাবাবুর লোকদের। ওদের আমি শেষ করে নিজেও শেষ হয়ে যাব। ওরা কি ভেবেছে আমি মোমের পুতুল?

গঁড়া পাশে সরে আসল কামিনীর, হাত দুটো ধরে কাতর গলায় বলল, তোমার জন্য আমি সব কু'অভ্যাস ছেড়েছি। এখন যদি তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও, তাহলে আমার মনের অবস্থাটা কী হবে বল তো? আমি তোমাকে নিতে এসেছি কামিনী, তুমি চলো।

চার দেওয়ালের মাঝখানে হ্যারিকেনের আলো এসে পড়েছে কামিনীর মুখে। উদভ্রান্ত, দিশেহারা সেই মুখ। ফোঁটা ফোঁটা ঘামে পুরো মুখ কচি জলজ শ্যাওলা। সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে কামিনীর ইতস্তুতা বাড়ছিল। গঁড়া আবার জোর করল, দেরী করো না। এখান থেকে তোমাকে না নিয়ে যেতে পারলে আমার শান্তি নেই। যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটে যেতে পারে।

—আমি বাবার কথা ভাবছি। দীর্ঘশ্বাস ঠেলে উঠল কামিনীর বুক নিংড়ে। গঁড়া বলল, সে বুড়ো মানুষ। নিজের মত করে বাঁচবে। তাকে নিয়ে তোমার না ভাবলেও চলবে। চলো তো, রাত বাড়ছে।

গঁড়ার সন্তান কামিনীর গর্ভে বাড়ছে গোপনে। এ সংবাদ সে ছাড়া আর কেউ জানে না। পালান তার নামে যে অপবাদ দিয়েছে, সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে গঁড়া। গঁড়াকে তাই অস্বীকার করা কঠিন। কামিনীর চোখ ভিজে এল জলে, বাঁধ ভাঙা আবেগকে সে আর ধরে রাখতে পারল না, গঁড়ার বুকে নিজেকে সঁপে দিয়ে সে বলল, তুমি যদি আমার মুখ চেয়ে ভাল হতে পার—তাহলে তোমার হাত ধরে পথ চলতে আমার কোন লজ্জা নেই। তুমি একটু অপেক্ষা কর—আমি আজ রাতেই তোমার সাথে ঘর ছাড়ব। তারপর তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই আমি থাকব। কামিনীর কথা বানান নয়, গঁড়া অন্তর দিয়ে বোঝে। মেয়েটার জেদ তার জানা। পালান তার মনে যে ঘা সৃষ্টি করেছে, সেই ঘা শুকাবার জন্য গঁড়া বদ্ধপরিকর। মানুষ পারে না এমন কোন কাজ কি আছে? গঁড়া ভাবল। কামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে-ও স্বপ্ন দেখল আকাশ ছোঁয়া। রাধী কামিনীকে মানিয়ে নেবে। রাধীর সহন ক্ষমতা অনেক। এত ঘাত-প্রতিঘাতে মাথা ঠিক রেখেছে বউটা। অন্য কেউ হলে বিষ খেত নয়ত গলায় দাড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ত কড়িকাঠে। রাধী সে পথে হাঁটেনি। সে যদি মানিয়ে নেয় তাহলে কামিনীর মানিয়ে নিতে আপত্তি কোথায়? সুখের ঢেকুর ওঠে গঁড়ার। আগত সুখের স্বপ্নে চোখ বুজে আসল তার। পুকুরের জলে ঘাই দিয়ে ওঠে মাছ। রাতপাখি ডেকে ওঠে, রাতের ঘুম ভাঙানোর জন্য রাত জাগবে পাখির দল। এই গরমের দিনে গায়ে হাওয়া লাগে ফুরফুরে। পুকুর থেকে উঠে আসে শীতল হাওয়া। ন্যাপথলিনের গন্ধভরা শাড়ি পরে কামিনী এসে দাঁড়ায় গঁড়ার সামনে। চোখের পাতা পড়ছে না, নতুন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তার আগ্রহের শেষ নেই। রমণীবুড়া মেয়ের ঘর ছাড়ার সংবাদ শুনে ফেটে পড়ল রাগে, যাবি নে, তুই ঘর ছেড়ে কোথাও যাবি নে। মুখে যে টুকু চুনকালি মেখেছিস—সেটুকু তুলে ফেলার চেষ্টা কর। তোর জন্য আমাকে যাতে গাঁ ছাড়তে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখ। চুপ করে ছিল কামিনী। রমণীবুড়ার নীরবতা পছন্দ হল না। মেয়েকে তা দিয়ে দেবার জন্য বলল, মুখপুড়ী, আর তুই মুখ পোড়াস্ নে। তোর জ্বালায় কি আমাকে মরতে হবে? তুই কি আমাকে পথে বসিয়ে শান্তি পাবি?

—তুমি মরবে কেন, তুমি প্রাণ খুলে বাঁচো। কামিনীর কাটছাট জবাব, আমি চললাম। আমি আর তোমার ঘরে থাকব না। আমি চলে যাচ্ছি। না গিয়ে আমার কোন উপায় নেই।

—তোকে সে চোরটা যাদু করেছে। ফুঁসে উঠল রমনীবুড়া। চুল চে[illegible] আক্রোশে গলার রগ ফুলিয়ে বলল, ওখানে তোকে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। পেটের জ্বা[illegible], মহা জ্বালা। যাওয়ার আগে শতবার ভাব। পরে না হলে আফশোষ করতে হবে। তখন তোর মুখের কালি মোছার কেউ থাকবে না। সবাই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হাসবে।

কামিনী সিদ্ধান্তে অনড়, অবিচল। রমনীবুড়াকে পাশ কাটিয়ে চলে আসে ঘরে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পোঁটলা বাঁধে। গঁড়ার হাতে পোঁটলাটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, চলো, আর দেরি করা ঠিক হবে না। আমার তো শত্রুর অভাব নেই। সবাই বাড়া ভাতে ছাই ঢালতে এগিয়ে আসবে।

রাতচরা পাখিটা ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল তেঁতুলগাছের ডাল থেকে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। এত জ্যোৎস্না এর আগে কোনদিন দেখেনি কামিনী। কানায় কানায় মন ভরে গেল তার। রমনীবুড়ার মাটির ঘরখানা পিছু ডাকছে যেন। চে[illegible] গাছপালা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জ্যোৎস্নায়। পুকুরের পাড়ে এসে থামল কামিনী। গঁড়া এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা পথ। রমনীবুড়া শেষ বারের মত বলল, যাওয়ার আগে আর একবার ভাব, মা। যার সাথে তুই যাচ্ছিস, সে কিন্তু ভাল মানুষ নয়। যার নিজের পেট চলে না, সে তোকে কী খাওয়াবে?

—আমি কারোর গলগ্রহ হয়ে থাকব না। কামিনীর ঝাঁঝাল কথায় রমনীবুড়া পিছিয়ে গেল ক'পা। কথা না বাড়িয়ে সে চুপচুপ দাঁড়িয়ে দেখল কামিনীর চলে যাওয়া। চোখ দুটো ভরে গেল জলে।

ওরা চলে যাবার পর রমনীবুড়া ফিরে এল ভাটিখানায়।

মেয়ে তার মুখে গোবর লেপে পালাল। দুর্গন্ধ! কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সে। চোখ বুজলে হলুদ আলোর বিচ্ছুরণ। এই মেয়েকে জন্ম দিয়েছিল সে? ছিঃ! এমন মেয়ের বাবা হয়ে বেঁচে থাকাটাও ঘেন্নার। ভ্রু কুঁচকে উঠল রমনীবুড়ার। বুক হালকা করে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করল সে। ক্লান্তি, অবসাদ আর বিষণ্ণতায় ডুবে গেল শরীর। কাদা ঠেলে এগিয়ে যাওয়া মাগুর মাছের চেয়েও তীব্র কষ্ট তার। গঁড়া তাকে হারিয়ে দেবে ঘুণাক্ষরে ভাবেনি। গঁড়া কিসের জোরে জিতে গেল? তীব্র আক্রোশে চুল চেপে ধরল রমনীবুড়া। কামিনী বলছিল, তার আর ফিরে আসার ক্ষমতা নেই। শিকড় ঢুকে যাওয়া গাছকে মাটি থেকে আলাদা করা যায় না। তাতে মাটির ক্ষতি না হলেও গাছ মরে যায়। গাছ মরলে ফলের আশা করা ভুল।

কামিনী গর্ভবতী—এ সংবাদ গাঁয়ের কেউ জানে না। পাশাপাশি হেঁটেও টের পায় না গঁড়া। অথচ টের পেলে সব চাইতে সুখী হোত সে। কামিনী যা চেয়েছে এতদিন, তা সে পেল। গঁড়া তার উদ্ধার-কর্তা। এ ঋণ কামিনী শোধ করবে কী ভাবে? পুরো শরীর লিখে দিলে ঐ ঋণ শোধ হবার নয়। মাটি-বীজ-জল-হাওয়ার ঋণ মানুষ কোনদিন কি পরিশোধ করতে পারে?

দু-পাশে রাঙচিতার বেড়া, মাঝখানে হাত তিনেকের চওড়া পথ। জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়েছে পথে। রাঙচিতার পাতায় আলোর স্বচ্ছতা। গঁড়ার পা ছাপিয়ে উঠে এসেছে ধুলো। কামিনীর পাট ভাঙা শাড়ির পাড়ে ধুলোর আস্তরণ যেন চন্দনের গুঁড়ো। খুশিতে টগবগিয়ে ওঠে মন। হাঁটতে হাঁটতে মাঝ পথে থেমে পড়ে সে। গঁড়া সবিস্ময়ে শুধায়, কী হল?

—কিছু না। কামিনীর চোখে স্বপ্নফুলের রেণু, পেটের কাছে হাত চলে গেল আপসে। নীচু গলায় গঁড়াকে বলল, শোন।

এগিয়ে এল গঁড়া, হাতে পোঁটলা, চোখে উদ্বেগ ছড়ানো, কিছু বলবে?

—হ্যাঁ, বলতাম। থামল কামিনী। চোখের স্বপ্ন গড়িয়ে নামল বুকে, অস্ফূটে বলল, সেই মানুষটাকে এবার আমি দেখিয়ে দেব।

—কাকে?

—ঐ যে আমার ঘরের মানুষটাকে। গলা বুজে এল কামিনীর, দীর্ঘ মসৃণ হাত পেটের কাছে এসে থামল। অন্য হাত দিয়ে গঁড়ার হাত ধরে সে বলল, এইখানে, এইখানে আমার সব সুখ লুকিয়ে আছে— কোন কিছুই বোধগম্য হল না গঁড়ার। কামিনী আবার বলল, মেঘ না চাইতে ভগবান আমাকে জল দিয়েছে। আমি আর কিছু চাইনে। এবার তুমি আমাকে শুকিয়ে মারলেও আমি তোমাকে দোষ দেব না। রহস্য উন্মোচনে গঁড়ার শক্তি কম। সে বলল, যা বলবে পরিষ্কার করে বলো। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—তুমি না ছেলেপুলের বাবা?

—হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে!

—কী হয়নি বলো। খিলখিলিয়ে হেসে উঠল কামিনী। ফুটে উঠল সুরভিত ফুল। গঁড়ার হাতটা পেটের কাছে চেপে ধরে বলল, কী বোকা গো তুমি! এখনও বুঝতে পারলে না আমি কী বলতে চাইছি। কামিনীর হাসি আর থামে না। হাসির তালে নড়ে ওঠে ভরা নদী শরীর। হাওয়া এসে আদর করে তাকে। মেঘমুক্ত আকাশে হেসে ওঠে চাঁদ। ধুলোর পথ হয়ে ওঠে চন্দন সুবাসিত বনপথ। আবেগের বাঁধ ভেঙে গেল কামিনীর, গঁড়ার পাশে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, আমি মা হবো গো। সেই মানুষটা

আমাকে যা দিতে পারেনি, তুমি আমাকে তা দিয়েছ। এবার আমি কারোর কাছে হারব না। আমিও অন্য দশটা মেয়ের মত বাঁচব।

বিস্ময়, আনন্দে গঁড়ার কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। তবু সে দু-হাত বাড়িয়ে কামিনীকে টেনে আনল নিজের কাছে। জ্যোৎস্নার চেয়েও তরল আদরে ভরিয়ে দিল তাকে। গঁড়ার বুকে নিজেকে সঁপে দিয়ে সে হারিয়ে যেতে চাইল স্বপ্ন জগতে।

জ্যোৎস্নার আলোকে ম্লান করে দিয়ে তখনই তিন ব্যাটারির টর্চের আলো এসে পড়ল তার শরীরের উপর। দূর থেকে কে যেন বলে উঠল, ঐ দেখুন স্যার, কেমন ভষ্ট্রাচার! এরা গ্রামটাকে উচ্ছন্নে দেবে। কেমন জোড়া বেঁধে আছে দেখুন।

আলোটা এগিয়ে আসার আগেই ছিটকে দাঁড়াল ওরা। পাশের কুলগাছের শির ডগাল থেকে উড়ে গেল পেঁচা দম্পতি। ওরা নাগালের বাইরে চলে গেল কিন্তু ধরা পড়ে গেল গঁড়া।

থানার দারোগা ছুটে এসে গঁড়ার হাতটা ধরে গাল দিয়ে বললেন, পীরিত হচ্ছে? চল থানায়, তোর পীরিত ঘুচিয়ে দেব।

হতবাক গঁড়ার দু-চোখ ছাপান বিস্ময়। কামিনী ভয় পেয়ে বলল, বাবু, ওকে ছেড়ে দিন। ও তো কোন দোষ করে নি।

—দোষ করে নি? বিদ্রুপে ঠোঁট বেঁকে উঠল দারোগাবাবুর, চোরের হয়ে কথা বললে তোমাকেও থানায় নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দেব।

কামিনী ভয় পেল না, কে চোর, কাকে আপনি চোর বলে ধরছেন। আপনাদের ভুল হচ্ছে বাবু। আপনারা পরের মুখে ঝাল খেয়ে এখানে দৌড়ে এসেছেন। একদিন যে চোর ছিল, সে এখন খেটে-খাওয়া মুনিশ। ওকে আপনারা ছেড়ে দিন। বিশ্বাস না হলে জিজ্ঞেস করুন ধর্মাবাবুকে।

কামিনীর চোখ চলে গেল ধর্মাবাবুর উপর। ধর্মাবাবু কুঁকড়ে গেলেন সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শক্তি সহ্য করতে না পেরে। গঁড়া অনেকক্ষণ পরে মিনমিনে স্বরে বলল, মা কালীর দিব্যি, আমি চুরি করিনি বাবু। আমাকে ছেড়ে দিন।

—তাহলে ধর্মাবাবুর বাসনকোশন কে চুরি করল?

—আমি তার কী জানি? বেশ কয়েকমাস হল, আমি তো মুনিশ খেটে খাই। ধর্মাবাবু সাক্ষী আছে। গঁড়া কাতর চোখে তাকাল।

—তোর সব খবর আমাদের নখদর্পনে। দারোগাবাবু গঁড়ার হাতটা আরও শক্তভাবে চেপে ধরলেন, অবশেষে মুচড়ে দিয়ে বললেন, যে গোরু নোংরা খায়, তার স্বভাব চট করে বদলায় না। সে সুযোগ পেলে আবার নোংরা খায়। এটাই নিয়ম।

—আমি তো গোরু নয়, মানুষ। গঁড়ার ক্ষীণ প্রতিবাদ ধোপে টেকে না।

তার আগেই তর্ক করার অপরাধে দারোগাবাবুর রুলের বাড়ি তার পিঠে কাদামাছের দাগ এঁকে দেয়। কষ্টে বেঁকে-চুরে গেল গঁড়া। কামিনী দূরে দাঁড়িয়ে দেখল অকথ্য নির্যাতন।

গঁড়া মার খেয়েও কবল করল না তার অপরাধ। দারোগাবাবু নিষ্ঠুর রাগে ফেটে পড়লেন, ধর্মাবাবুর বাসনগুলো আমরা তোর পুকুর থেকে পেয়েছি। ওগুলো পুকুরের জলে তুই ছাড়া আর কে ডুবিয়ে রাখবে? শালা, দিনেরবেলায় সাধু সেজে রাত্রিবেলায় চুরি। দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোর মজা।

থানার জিপটা দাঁড়িয়ে ছিল পিচ রাস্তায়। গঁড়াকে টেনে হিচড়ে রাস্তা অব্দি নিয়ে গেল পুলিশ। বেত-লাঠির প্রহারে তার পিঠ ফেটে রক্তে ভিজে গিয়েছে জামা। সে কাতরাচ্ছে, বাবু, আমি চুরি করি নি, আমি নির্দোষ। কামিনী কোন মুখ নিয়ে আর গঁড়ার দোরে যাবে। যে পুটুশপাতাকে তুলসীপাতায় রূপ দিতে চেয়েছিল। গঁড়া তাকে হারিয়ে দিল চিরদিনের জন্য। চোখের জল কোনভাবেই আর আটকে

রাখতে পারল না কামিনী। চলে যাওয়ার আগে সে গঁড়াকে তিরস্কার করে বলল, ছিঃ, আগে জানলে আমি তোমার হাত ধরতাম না। তোমার চেয়ে ঢের ভাল আমার ঘরের মানুষটা। কামিনীকে বোঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল গঁড়া। তার কথা ভিড়ের কেউ শুনল না। সবার চোখে সে তখন চোর, দাগী আসামী।

শূন্য চোখে গঁড়া দেখল কামিনী ফিরে যাচ্ছে ভাটিখানায়। ঝড় বয়ে যাওয়া গাছের চেহারায় তার ফিরে যাওয়া।

চৌত্রিশ

ব্যস্ততা: শেষ নেই বসন্ত জানার।

রেণুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুক ভেঙে গেলেও মনের জোর তিনি হারাননি। জয়ন্তর অপ্রত্যাশিত মৃত্যু তিনি মেনে নিতে পারেননি। পানিপারুল থেকে ফেরার সময় দুলুবাবুর সঙ্গে তার দেখা হল। চিন্তিত দুলুবাবু ভ্যান রিকশয় গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে ছিলেন। কিছু ভাবছিলেন নিবিড়ভাবে। ইদানীং তিনি কম কথা বলেন, গুমোট আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা গাছেব মত তার বেঁচে থাকা। শরীরও শুকিয়ে গিয়েছে ক'দিনে। দুলুবাবুর যে কী হয়েছে গ্রামের কেউ জানে না। মুক্তাকে তিনি রেখে এসেছেন কাঁথিতে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন, আর কোনদিন তিনি মুক্তাকে ফিরিয়ে আনবেন না। প্রায় কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবনের অন্তিম আঘাতটা তিনি বিস্মৃত হতে পারছেন না কিছুতেই। মুক্তার এমন পদস্খলন তার কাছে আশাতীত। মালা ঠিক সময়ে না এলে তিনি সেদিন রাতে খুন করে ফেলতেন মুক্তাকে। রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষ কত কী না করে বসে। রাগ শুকনো লঙ্কাব গুঁড়ো হয়ে চোখে জ্বালা ধরায়। শরীর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মস্তিষ্ক কোযে নিদারুণ যন্ত্রণা হয়। কত দিন হয়ে গেল তবু এখনও মনে পড়লে সমস্ত শরীর টান টান উত্তেজনায় ধনুকের ছিলার চেয়েও দৃঢ় হযে ওঠে। এ যন্ত্রণা অসহনীয়। মাঝে মাঝে তারও আত্মহত্যার প্রবণতা জাগে। এত বড় পৃথিবীতে নির্বান্ধব থাকা জ্বালাদায়ক। মালা ঘরে থাকলেও কদাচিৎ কথা বলেন তার সঙ্গে। প্রয়োজন ব্যতীত মালা বাক্য ব্যয় করে না। আসলে সে-ও নিদারুণ মনোকষ্টে শাস্তি পাচ্ছে। মুক্তাকে বাঁচাতে গিযে সে যা ঘটনা ঘটিয়েছে তা লজ্জা দেয় তাকে। দুলুবাবুর ডান হাতে এখনও লেগে আছে তার দাঁতের দাগ। এ দাগ শত চিকিৎসা করালেও মেলাবে না। একমাত্র শ্মশানই পারবে এই দাগকে মুছে দিতে। যে আসল অপরাধী তাকে কোন শাস্তি দিতে পারেননি দুলুবাবু। ঘরকে শাসন করতে গিয়ে অপরাধী পালিয়েছে চোখে ধুলো উড়িয়ে। মোটর সাইকেলটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যাবার পর হুঁশ ফিরেছিল দুলুবাবুর। মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকেছেন তিনি। এর পরেও কি তিনি মানুষকে বিশ্বাস করবেন, পাশে দাঁড়াবেন আপদে-বিপদে? এই প্রশ্নটাই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

মাত্র ক'বছরেই গ্রাম সমাজ বদলে গিয়েছে। ধর্মবাবুর মত মানুষ শাসন করছে গ্রামকে। কামিনী দুলুবাবুর সাহায্য চেয়েছিল গঁড়াকে ফিরিয়ে আনার জন্য। রাধীও তার সঙ্গে ছিল। দুলুবাবু ওদের কোন গুরুত্ব দেননি। যার ঘর পুড়েছে, সে আবার কেন পরের ঘর ছাইতে যাবে। ওরা চলে যাবার পর মালা বলেছিল, তুমি ওদের পাশে দাঁড়ালে পারতে? ওরা কত আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছিল। দুলুবাবু মালার কথাটা ভেবেছেন। নিজেকে অপরাধী মনে হলেও তার কিছু করার নেই। সুদেববাবুকে তিনি বিশ্বাস করে ঠকেছেন। তিনি সূচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরলেন। সেই আঘাত এফোঁড়-ওফোঁড় করল বুক। যতদিন ঐ পাপীটাকে শাস্তি না দেওয়া যায় ততদিন তিনি ঘুমাতে পারবেন না কিছুতেই।

সুদেববাবুর চোখ দুটো উপড়ে নিলে দারুণ শান্তি পেতেন দুলুবাবু। তা যখন হয়নি, তখন হাত কামড়ান ছাড়া আর কোন পথ নেই। বসন্ত জানা ভ্যান রিকশয় বসতেই দুলুবাবু সৌজন্যমূলক হাসলেন। নীরস হাসি। কোন আবেগ বা আন্তরিকতার স্পর্শ নেই। দুপুরের দিকে শেষ শীতের রোদ গায়ে চিমটি কাটতে ছাড়ে না। সেই সকালে বেরিয়েছেন দুলুবাবু। গায়ের শাল ভাঁজ করা আছে সাইড ব্যাগে। চুল আঁচড়াননি, মুখের চামড়াও খসখসে। যে মানুষটা ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় ছাড়া বাইরে বেরতেন না, ইদানীং তার পোযাকের দিকে কোন লক্ষ্য নেই। বসন্ত জানা বেশ ক'দিন থেকে দেখছেন। কাছে ডেকে যে শুধোবেন তেমন সুযোগ পাননি। আজ পাশাপাশি বসে বসন্ত জা..। দুলুবাবুর দিকে স্নেহভরা চোখে তাকালেন, দুলু, তোমাকে একটা কথা শুধোই? ক'দিন থেকে তোমাকে বড় মনমরা দেখছি। কী হয়েছে তোমার?

—কই, কিছু হয় নি তো! এড়িয়ে যেতে চাইলেন দুলুবাবু। কথা বলার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। এখন একা থাকতে ভাল লাগে। মুক্তা স্বেচ্ছায় কাঁথি যেতে চাননি। তিনি জোর করে তাকে পাঠালেন, কাঁথিতে নেমে তিনি কঠোর হয়ে বলেছিলেন, রিকশ দাঁড়িয়ে আছে, উঠে পড়। ভাড়া দেওয়ার দরকার নেই, ভাড়া আমি দিয়ে দিয়েছি। আর একটা কথা মনে রেখো, তুমি যেখানে খুশি যেতে পার। যদি ডিভোর্স চাও, তাও নিতে পার। তোমার অবাধ মেলামেশায় আমি আর বাধা দেব না। তবে নিজের ভাল যদি চাও তাহলে আর কোনদিন চোরপালিয়ায় আসার চেষ্টা করবে না। ওখানে তোমার কেউ নেই, ভাববে সবাই মরে গেছে।

–-মালাকে ছেড়ে আমি থাকব কী ভাবে? ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন মুক্তা, আমার একটা দোযকে কি তুমি ক্ষমা করে দিতে পার না?

—না, আমি তো মহাপুরুষ হতে পারিনি এখনও। যদি কোন দিন মহাপুরুষ হতে পারি, সে দিন তোমাকে ফিরিয়ে আনব। আর কোনরকম সুযোগ না দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন দুলুবাবু। কোন উপায় না দেখে মুক্তাকে ফিরে যেতে হয়েছে বাবাব বাড়ি। আসার সময় মালার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। দেখা যাতে না হয় সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন দুলুবাবু। মালাকে কাজের অজুহাতে এগরা পাঠিয়েছিলেন তিনি। সন্ধের বাসে মালা ঘরে এসে শুনল মুক্তা কাঁথি চলে গিয়েছেন। দুলুবাবু এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করলেন না। শুতে যাবার আগে পর্যন্ত ডুবে থাকলেন নিজের কাজে।

ভ্যান রিকশর গতি বাড়ছিল ফাঁকা রাস্তায়। দুলুবাবু রোদ বাঁচাতে একটু কাৎ হয়ে বসেছেন সামনের দিকে। রোদ সর্বত্রগামী। বসন্ত জানা মৃদু হাসলেন, তোমার কি শরীর খারাপ? দেখে মনে হচ্ছে খুব চিন্তার মধ্যে আছো। বাড়ির খবর সব ভালো তো? মাথা নাড়লেন দুলুবাবু। বসন্ত জানা বললেন, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। বেণুর বিয়ে ঠিক করেছি পানিপারুলে। ভাবছি—মাঘ মাসের শেষের দিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দেব।

—এ তো ভাল কথা।

—জয়ন্ত তো নেই! তোমাকে সব দেখা-শোনা করতে হবে। বসন্ত জানার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল, আমার মত ভাগ্য নিয়ে কেউ যেন সংসারে না আসে। সুখের মুখ আমি কোনদিনও দেখলাম না। ভেবেছিলাম জয়ন্তর বিয়ে দিয়ে বুড়ো বয়সে বৌমার হাতের রান্না খাবো, তাও আমার ভাগ্যে জুটল না। রেণুর বিয়ে হয়ে গেলে আমাকে আবার সেই হাত পুড়িয়ে খেতে হবে। শীতের ফাঁকা মাঠের মত মন নিয়ে কথাগুলো বললেন বসন্ত জানা।

চোরপালিয়া হাট থেকে ঘরে পৌঁছাতে দেরী হয়ে গেল তার। শেষ দুপুরে তাকে দেখে রেণু বলল, আমি সেই কখন থেকে স্নান করে বসে আছি। তোমার দেরি হল কেন?

—গাড়ি ঘোড়ার যা অবস্থা, বাস পেলাম না। ভ্যানেই আসতে হল।

খেতে বসে বসন্ত জানা বললেন, তোর বিয়ের কথা সব পাকা করে এলাম। মাঘ মাসের শেষের তারিখটাই ভাল। তুই কী বলিস? রেণুর কিছু বলার নেই এমন মুখ করে তাকাল। শামুকের লজ্জায়

গুটিয়ে গিয়ে সে বোবা হয়ে থাকল। বিয়ে নিয়ে তার মনে কোন দুর্ভাবনা নেই। পবন বলছিল, ছেলেকে সে দেখেছে। পানিপারুল বাজারে তার তেলেভাজার দোকান আছে। দোকানটা চলে ভাল। খাওয়া-পরার কোন অভাব নেই ওদের। তবে ছেলের প্রথম পক্ষ গত হয়েছে সন্তান হতে গিয়ে। রেখে গিয়েছে দুটো ছেলে-মেয়ে। রেণুকে সে বিনা পণে বিয়ে করতে চাইছে তার মূল কারণ হল ছেলে-মেয়ে দুটোর উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন।

পাত্রের নাম দুলাল। সে রেণুর থেকে আঠার বছরের বড়। সব শোনার পরে রেণুর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। পবন নিমরাজি হলেও তার কথাকে কে গুরুত্ব দেবে?

রেণুকে একলা পেয়ে সে একদিন শুধিয়েছিল, এ বিয়েতে তোমার কি মত আছে?

রেণু নিরুত্তর। তার অসহায় মুখ দেখে পবন বলেছিল, যদি অমত থাকে আমাকে বলো। তোমার মতের বিরুদ্ধে এ বিয়ে তো হতে পারে না।

রেণু তবু নির্বিকার। পবন নাছোড়বান্দা, বলো, তোমাকে বলতেই হবে। মনের মধ্যে অশান্তি রেখে কোন কাজ হয় না।

রেণুর ঠোঁট কেঁপে উঠলেও মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরল না। আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধে তার কোন কথা বলাই সাজে না। পথের খড়কুটো সে। তার পছন্দ-অপছন্দের কী দাম আছে?

বিয়ের সাত দিন আগে পবন দাঁড়িয়ে ছিল হাটখোলায়। মন জুড়ে নানান চিন্তা। আর মাত্র সাত দিন পরে রেণু পর হয়ে যাবে, শুরু হবে তার নতুন জীবন। রেণুর এই পরিণতিকে সে কিছুতেই মানতে পারছিল না। শূন্যতা গ্রাস করছিল তাকে। বুকের পাঁজর ভেঙে যাওয়ার কষ্ট অনুভব করছিল সে। চূড়ান্ত দিনটার জন্য সে-ও অপেক্ষা করছিল মনে মনে। বসন্ত জানার উপর ঘনীভূত হচ্ছিল রাগ। রেণুকে এমন ভাবে ভাসিয়ে না দিলে তিনি পারতেন। পরের মেয়ে বলেই হয়ত এই অবহেলা। বিয়ে নিয়ে এত তড়িঘড়ি করার কোন কারণই ছিল না। রেণু তো বুড়িয়ে যায়নি, দেখতে শুনতেও খারাপ নয়। তাহলে তাকে কেন দোজবরের হাতে তুলে দেওয়া হবে? মালার কাছে সব বলেছিল পবন।

মালা বলেছিল, খুব অন্যায়। রেণুর জায়গায় আমি থাকলে এ বিয়ে আমি কখনও করতাম না। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই কি আমার পছন্দ-অপছন্দের কোন মূল্য নেই।

মালা তার মনের কথাটাই বলেছে। পবন চাইছিল মালা তাকে সাহায্য করুক। মালা বুঝিয়ে বলুক রেণুকে। বিয়ে হয় একদিনে, এক ঘণ্টায় কিন্তু সারাজীবন তার দাগ থাকে। কাটা, পচা ঘায়ের চেয়েও সেই দাগ আরও মারাত্মক। সারাজীবন রক্ত চুয়ায়, জন্ম দেয় বেদনার। রেণু এত বোঝে তবু কেন এই সহজ সত্যটা বুঝতে পারছে না। দোজবরের সংসারে সে একা নয়। দুটো ছেলে-মেয়েকে দেখতে হবে তাকে। সংসার সামলে দোকানও ঠেলতে হবে। দুলাল লজ্জায় রেণুকে দেখতে আসেনি, রেণুও দুলালকে দেখার সুযোগ পায়নি। বিয়ের আগে একে অন্যকে দেখার খুব দরকার ছিল। পবন এসব কথা কাকে বলবে? রেণু তার কে হয়? গ্রামের মেয়ে ছাড়া তো অন্য কোন সম্পর্ক নেই। শুধু ভাললাগার উপর কোন সম্পর্কের ভিত গড়ে উঠতে পারে না। এর জন্য দু-জনেরই তৎপর হওয়ার প্রয়োজন ছিল। রেণু কোনদিন তাকে ভালবাসার কথা বলেনি, বললেও বুঝতে পারেনি পবন। পবনও মুখ ফুটিয়ে কোনদিন কিছু বলেনি। সে জানত রেণুকে তাদের ঘরে কেউ কোনদিন মেনে নেবে না। অতসী বোষ্টমীর জন্য সহদেব এখনও ঘর ছাড়া। এই তিক্ত স্মৃতি এখনও ভুলতে পারেনি সুভদ্রা। অতসী বোষ্টমীর মেয়ে রেণু—সে আর কত ভাল হবে। এমন সংশয় সুভদ্রার মনে বদ্ধমূল। পবন পৃথিবীর সবাইকে আঘাত দিলেও মাকে কোনদিন দুঃখ দিতে পারবে না। যে মানুষটা সারাজীবন দুঃখ সইল, তাকে আবার নতুন করে দুঃখের খাদে ফেলে দেওয়া ঠিক নয়।

মালার কাছ থেকে ফিরে এসেও রেণুর বিষাদভরা মুখটার কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারল না। সে ভেবেছিল, মালা হয়ত রেণুকে বোঝাবে। কিন্তু তার হাবভাবে তেমন কোন ব্যস্ততা লক্ষ্য করেনি পবন। মালার এই নিষ্ক্রিয়তা দুঃখ দেয় তাকে। বুকের ভেতরটা গুমরে ওঠে পবনের।

পানিপারুলের দিক থেকে একটা বাস এসে নামল হাটখোলায়। দু-চার জন লোক নেমে এল বাস থেকে। তাদের মধ্যে মাঝবয়েসী অপরিচিত একজন।

পবনকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল লোকটা। শুধাল, বসন্ত জানার টেলারিং দোকানটা কোথায় বলতে পার?

—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—পানিপারুল।

পবন ব্যস্ত হয়ে উঠল, চলুন, চলুন। নিশ্চয়ই দুলালদার ঘর থেকে আসছেন?

লোকটা কোন কথা না বলে হাঁটতে থাকল পবনের পিছন পিছন। বসন্ত জানা দোকান বন্ধ করার কথা ভাবছিলেন। শীতের সময় গাঁয়ে-ঘরে কেউ নতুন জামা সেলাই করতে চায় না। যদিও এবছর ধানের ফলন ভাল, তবু নতুন জামা-কাপড়ের দিকে কারোর তেমন আগ্রহ নেই। রেডিমেডের দোকানগুলো চলছে ভাল। ওগুলো সস্তায় হয়। সেই সকাল থেকে দোকান খুলে বাজারের খরচটা কোনমতে জোগাড় করেছেন বসন্ত জানা। ফাটা-ফুটো সেরে একটা টেলারিং দোকান চলে না। তবু বসন্ত জানার নিয়ম করে দোকান খোলা চাই। এটা একটা নেশা। এই বুড়ো বয়সে ঘরে বসে থাকলে আরো বুড়িয়ে যাবেন তিনি। তাছাড়া সময় কাটতে চায় না। দোকান খুললে দশটা লোকের সাথে দেখা হয়, কথা হয়। এইটুকু বা কম কিসে।

চশমার কাচ মুছে বসন্ত জানা তাকালেন। চিন্তায় ঝুঁকে আছে মুখ। সদাহাস্য মুখখানায় এখন আর হাসি নেই। জয়ন্তর মৃত্যু কেড়ে নিয়েছে তার মুখের হাসি। পবনের ধুতিটা কতদিন যে কাচেননি, ধুতির সাদা রঙ এখন ভীষণ রকমে ময়লা। গায়ের ফতুয়াটায় অযত্নের ছাপ। চশমার দাগ নাকের উপর চেপে বসেছে। হাড় বের করা শরীরটায় রুক্ষতার প্রলেপ। মাত্র ক'মাসেই অর্দ্ধেক হয়ে গিয়েছেন বুড়োটা। পবন গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই বসন্ত জানা বললেন, কী রে পবন, কী মনে করে? আর আসিস না কেন?

—সময় পাই না।

—সঙ্গে কে? বসন্ত জানা চশমাটা ঠিক করে তাকালেন, কে ভাই, আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

—আমাকে আপনি বলার দরকার নেই। আমি দুলালের দাদা।

—ও, দুলালের দাদা। তা বস বাবা, খবর সব ভাল তো! ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বসন্ত জানা, দুলাল তো কই তোমার কথা কোনদিন কিছু বলেনি। সে তো আমাকে বলল, তার আর কেউ নেই। সে একা।

—সে আমার কথা বলবে না। বলার মত তার মুখ নেই। —দয়াল রাগে ফেটে পড়ল, আমি আপনাকে কয়েকটা কথা বলার জন্য এখানে এসেছি। দুলাল আমার নিজের ছোট ভাই। তার সম্বন্ধে আপনি কতটা খোঁজ খবর নিয়েছেন তা আমি জানি না। তবে দুলালের আগে একটা বিয়ে হয়েছিল। তার দুটো ছেলে-মেয়ে আছে।

—এসব তো আমি জানি। বসন্ত জানা কপালে ভাঁজ ফেলে বিরক্তির চোখে তাকালেন।

—দুলাল ভ্যাসেকটমি করিয়েছিল পানিপারুল হাসপাতালে—এটা কি আপনি জানেন? যদি বিশ্বাস না হয় হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নিন। বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র দেড় বছর আগের ঘটনা। খোঁজ নিলেই সব জানতে পারবেন। দয়াল ঠোঁট কামড়ে পিচ রাস্তার দিকে তাকাল। তারপর সহজভাবে বলল,

একটা মেয়ের জীবন আপনি এভাবে নষ্ট করে দেবেন না। দুলালের জীবন তো নষ্ট হয়েছে, তার দুটো ছেলে-মেয়ে। সে ওদের নিয়ে কোনভাবে বেঁচে থাকবে। কিন্তু আপনি যার বিয়ে দিচ্ছেন—সেই মেয়েটার ভবিষ্যৎ কী হবে বলুন তো! আমি দুলালের ভাল হোক এটাই সবসময় চাই। কারোর ক্ষতি হোক, এ আমি চাই না। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। এবার যা করার আপনিই করুন, পরে আমাকে দোষ দেবেন না।

দয়াল চলে যাবার পরেও ঘণ্টাখানিক ঝিম ধরে দোকান ঘরে বসে থাকলেন বসন্ত জানা। পবনের মুখে কোন কথা নেই, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল সে। গণেশের ক্যালেণ্ডারটা হাওয়ায় নড়ছিল টিনের পাতের শব্দ তুলে। স্বল্প পরিসর ঘরের ভেতর হাওয়ায় ওড়া উড়ি করছিল ছিট কাপড়। বসন্ত জানা চশমাটা খুলে রাখলেন টেবিলে। ধুতির খুঁটে মুছে নিলেন চোখ-মুখ। ক্লান্তি, অবসাদে নুয়ে পড়ছিল মাথা, ঘরে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না তার। পবন কোন কথা না বলে নেমে আসছিল দোকান ঘর থেকে। বসন্ত জানা ডাকলেন, শোন পবন। পবন ফিরে এল। বসন্ত জানা ধরা গলায় বললেন, সব তো শুনলি, এবার কী করা যায় বল তো?

পবন ফাঁপরে পড়া চোখ মেলে তাকাল। বসন্ত জানা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে খুব অসহায়ভাবে হাত চেপে ধরলেন পবনের, রেণুকে তোর পছন্দ হয়? ওর সাথে যদি তোর বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করি তাহলে কি তোর অমত আছে? পবন সহসা কোন উত্তর দিতে পারল না। নতমুখে সে বলল, এ প্রশ্নের উত্তর শুধু রেণুই দিতে পারবে। বিয়ে তো একার নয়, দু-জনার।

পঁয়ত্রিশ

ভাগ্যে না থাকলে ঘি, ঠকঠকালে হবে কী!

রেণুর ভীষণ মন খারাপ। আষাঢ়ের গম্ভীর মেঘ হার মেনে যাবে তার চাপা, গুমোট, অস্থির মনের কাছে। বসন্ত জানা দোকান থেকে ফিরে রেণুর মুখোমুখি হলেন। কথাটা বলা সমীচীন হবে কিনা ভাবলেন। মনকে প্রশ্ন করলেন অনেকবার। রেণুর ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি চিন্তিত। পরের মেয়ে, সে যেন কোনদিন দোষ না দেয়—এ দিকটা তাকে ভাবতে হবে। বিবাহবন্ধন কাঁচা সুতোর গিঁট নয়। লৌহকঠিন বন্ধন, যা সহজে ছেঁড়ে না, ছিঁড়লেও মন পোড়ে, হৃদয় পোড়ে, অশান্তির ঝড়ে ভেসে যায় সুখের ঘর।

দাদুর চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে রেণু সাহস করে বলল, তোমার কী হয়েছে? দোকান থেকে ফেরার পর তুমি কথা বলছ না কেন? স্বতঃস্ফূর্ততা রেণুর মধ্যে বিদ্যমান। সহজে ভেঙে পড়ার মেয়ে নয় সে। সহজাত ধী-শক্তি দিয়ে সে সব কিছুকে সামাল দিতে সক্ষম। বৃদ্ধ মানুষটার উপর দিয়ে কোন কারণে ঝড় বয়ে গেছে, এটা বুঝতে পারল রেণু। কোন কিছু প্রশ্ন করার আগেই সে রান্নাঘর থেকে জল আনল গ্লাস ভরে। বলল, খেয়ে নাও। বেলা অনেক হয়েছে। গা ধুয়ে আসো। যদি কোন কিছু বলার থাকে তো পরে শুনব।

জলের গ্লাসটা চুপচাপ হাতে ধরে বসে থাকলেন বসন্ত জানা। বাইরে খেলা করছিল ঢল নামা রোদ। চালতাগাছের ডালে বসে আছে একটা 'বউ-কথা-কও' পাখি। পাখিটা ডাকছে মিষ্টি স্বরে। রোজই এসময় পাখিটা উড়ে আসে। গাঢ় পাতার আড়ালে বসে মনের সুখে ডাকে। অন্য দিন হলে রেণু পাখিটাকে মুখ ভেঙাত। আজ সে-ও চুপচাপ। তবু কথা বলতে হয় বলেই সে বলল, বেলা অনেক হল। এবার তুমি যাও স্নান করে আসো দাদু। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে হল তাকে। অলস, ক্লান্তিকর হাই তুলে তিনি রেণুর দিকে তাকালেন। দয়ালের কথাগুলো রেণুকে বলা দরকার। জেনে-শুনে তিনি তো কারোর মুখে বিষ ঢেলে দিতে পারবেন না। পরের মেয়ে বলেই বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার। নাহলে গ্রামের লোকেই বা কী বলবে। রেণুই বা তাকে কী বলবে?

ভাল করে গায়ে তেল মাখলেন বসন্ত জানা। কাচা গামছাটা এগিয়ে দিল রেণু। বলল, চান করতে মন না করলে শুধু গা-হাত-পা ধুয়ে আসো। যদি বলো তো কলতলা অব্দি আমি যেতে পারি। আমি কল টিপে দেব, তুমি মাথাটা ধুয়ে নেবে।

রেণুর কথায় কলি থেকে ফুল ফুটে ওঠার আন্তরিকতা ছিল, ক'পা গিয়েই বসন্ত জানা পিছন ফিরে তাকালেন। নড়ে উঠল ঠোঁট, মুখটা শুকনো করে বললেন, রেণু, তোকে একটা কথা বলি; মন দিয়ে শোন। কথাটা আমি তোকে বলতে চাই না, তবু না বলে আমার উপায় নেই।

—কী কথা যার জন্য তুমি সেই তখন থেকে চিন্তার মধ্যে ডুবে আছো? রেণুর প্রশ্নে বসন্ত জানা শুকনো, বিবর্ণ মুখ তুলে তাকালেন, ভগবানের কোনো বিচার নেই। বিচার থাকলে এসব তো ঘটত না। আজ পানিপারুল থেকে ছেলের দাদা এসেছিল। সে অনেক কথা বলে গেল, যা দুলাল আমার কাছে লুকিয়ে ছিল। তিনি থামলেন, ঢোক গিললেন। রেণু প্রতিক্রিয়াহীন, সঙ্কোচে কিছুটা গোটান। ইতস্তত করে বললেন, ছেলের দাদা যা বলে গেল তারপর ওখানে তোর বিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। কথাগুলো শোনার পর থেকে মাথাটা আমার ঘুরছে আমি যে কী করব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না!

—ছেলের দাদা তোমাকে কী বলে গেল?

—সে যা বলেছে, তা তোর না শোনাই ভাল।

—তাহলে ও নিয়ে আর ভাবছ কেন, চুপচাপ থাকাই ভাল। আমি তো ভেসে যাই নি, আমি তো তোমার আশ্রয়ে আছি। এখানে আমার কোন অসুবিধা নেই। রেণু জড়তার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল; সংসারে ঘা খাওয়া মেয়ের মত দৃঢ় গলায় সে বলল, আমি নিজেকে নিয়ে ভাবি না। আমার যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে। তিন কূলে যার কেউ নেই, তার অত নিজেকে নিয়ে ভাবলে চলে না। তোমার শরীর খারাপ, তুমিও আমাকে নিয়ে ভাববে না।

—না ভাবলে কি উপায় আছে, মা? তুই বড় হয়েছিস। কতদিন তোকে আর ঘরে আটকে রাখব।

—আমাকে তো তুমি বেঁধে রাখোনি। আমি পাখির চেয়েও স্বাধীন।

—পাখিরও তো ঘরবাঁধার সময় হয়। সময়েরটা সময়ে হলে ভ...

—আমার ভাল করতে গিয়ে তোমার যদি মন্দ হয় তাহলে সে ভালোতে আমার কাজ নেই। রেণু ফর্সা আকাশের চোখে তাকাল। মাত্র ক'দিনেই সে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে, এটাই বোঝাতে চাইল সে। অকৃতজ্ঞ নয় সে, অবুঝ নয়। আশ্রয়দাতার সুখ-দুঃখ তার নিজেরও। মা মারা যাওয়ার পর থেকে এই বৃদ্ধ মানুষটাই তার আপনজন। আপনজনের দুঃখ, সমস্যা তো সব নিজেরই হয়। রেণু নিজেকে আরো শক্ত এবং সংযত করার চেষ্টা করল। রোদ এড়িয়ে মানুষ যেমন মাথা বাঁচায়, ততটুকু সতর্কতা সে নিজের ক্ষেত্রে নেবে না। তার এই ক্ষুদ্র জীবন এলোমেলো ঢেউয়ের মাথায় ভেসে যাওয়া বিসর্জনের ফুল, তা যদি কারোর কাজে লাগে লাগুক, সে জোর করে কারোর ঠাকুর ঘরে ঢুকে ফুলের মাধুর্যময়তা দাবী করবে না। বসন্ত জানা অনেকক্ষণ কী যেন ভাবলেন, তারপর শুকনো ঠোঁটে আঙুল বুলিয়ে বললেন, তুই নিজেকে নিয়ে ভাবিস না বলেই তো তোকে নিয়ে আমার ভাবনা। আমার বয়স হয়েছে, শরীর-মন কোনটাই ভাল যাচ্ছে না, আমার আর ক'দিন! পাড়ের কড়ি কেনার আগে তোকে আমি সুখী দেখতে চাই।

—তুমি আমাকে নিয়ে মিছিমিছি ভাবছ।

—তুই ছাড়া আমার আর কে আছে, যাকে নিয়ে আমি ভাবব। তুই আমার পাশে আছিস বলেই আমার ভাবনাগুলো এখনও বেঁচে আছে। না হলে সাত তাড়াতাড়ি আমি শ্মশানের পথ ধরে নিতাম।

—দুপুরবেলায় অলুক্ষুণে কথা বলো না তো। ভারী হয়ে এল রেণুর গলা, কোথা থেকে অশ্রুবাষ্প এসে ছেঁকে ধরল চোখ, মরণকে আমি খুব ভয় পাই। চোখের সামনে মা মরল, সেই শোক আমি ভুলেছিলাম। একটা মৃত্যুকে ভুলতে না ভুলতেই আর একটা মৃত্যু এসে আমাকে অবশ করে দিল। আমি জানি না, ভগবানের কাছে আমি কী দোষ করেছি; সে কেন বারবার আমাকে কাঁদায়।

—চুপ কর। ও কথা বলে আমাকে দুর্বল করে দিস নে। আমিও চেষ্টা করছি মৃত্যুর জ্বালা যন্ত্রণাকে ভুলে থাকতে। গামছায় চোখ মুছে নিলেন তিনি, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থায় ছিলেন না তবু চেষ্টা করলেন নিজের দুর্বলতাকে চেপে রেখে রেণুর কাছে আদর্শ একজন অবিভাবকের মত দাঁড়িয়ে থাকার।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। রেণু আগড় অব্দি এল তার পেছন-পেছন। বসন্ত জানা বললেন, তুই ঘর যা। আজ ফিরতে আমার একটু রাত হবে।

—বেশি রাত করো না, একা থাকতে আমার ভয় করে।

চমকে উঠলেন অভিজ্ঞতার ঝুরি নামা বৃদ্ধ মানুষটি, অভয় দিয়ে বললেন, তোর ভয় কীসের, আমি আছি না।

রেণু জোর করে হাসল, আসলে ভয় ঠিক নয়, আমার একা থাকতে ভাল লাগে না। একা থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

—একা থাকতে কার ভাল লাগে? গাঢ় দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি, তুই চলে গেলে আমি তো সর্বক্ষণ একাই থাকবো।

—আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। ছেলেমানুষী প্রকাশ পেল বেণুর গলায়।

—যাব না বললে কি হয়, যেতেই হয়। মেয়েরা এ সংসারে দাতার ভূমিকায়। আমি তোকে আটকে রাখব কোন সাহসে?

দাদুর কথায় কেঁপে উঠল বেণু। বুকের ভেতরটা খামচে ধবল কেউ। কষ্টের ছাপ পড়ল মুখে। সহজ হতে গিয়ে সে কিছুতেই সহজ হতে পারল না। আগড়েব উপর এক হাত রেখে সে বলল, দাদু। তুমি আমাকে বোঝা মনে করো না তো। আমি মেয়ে হলেও অন্য মেয়ের মত নরম নই। দশ ঘাটের জল খেয়ে আমার মনটা লোহার চেয়েও কঠিন হয়েছে। যে কোন আঘাত আমি সহজভাবে সইতে পারব। তোমার সাথে থেকে এটুকু আমি শিখেছি।

বসন্ত জানা হাসলেন কিন্তু কোন কথা বললেন না। রেণু বোবার মত চেয়ে থাকল তার মাড়িয়ে যাওয়া পথের দিকে।

বিকেলে ঘর সংসারের কাজে ডুবে গেলে রেণুর সময়টা কী ভাবে যেন হারিয়ে যায়। রোজ বিকেলে সে পুকুরের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ায়। কাঁচা-হলুদ রোদে পুকুরের জল অদ্ভুত একটা রঙ পায়, যা অবর্ণনীয়। মুগ্ধ চোখে সে এসব দেখে, দেখতে দেখতে কেমন উদাস হয়ে পড়ে, মনটা ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে যায় মাঠপুকুরের ঘরে। মা বসে আছে দাওয়ায়। গাঁ ঘুরে এসেছে সবে, পায়ে ধুলো, মুখে তবু তাজা হাসি। কলসী থেকে সে জল এনে দিল মাকে। জলটুকু খেয়ে তার মা বলল, এবার আমি গা ধুতে যাব। আমার গেরু শাড়িটা দে তো। রেণু শাড়িটা দিত না, বুকে চেপে দাঁড়িয়ে থাকত পুকুর পাড়ে। কোমর জলে দাঁড়িয়ে তার মা ভুস করে ডুব দিয়ে রেণুর দিকে তাকাত। এমন সোনা মাখা রোদের মত হাসত, রেণু মুগ্ধ চোখে দেখত তার মায়ের রূপ। মেয়ে হয়েও চোখ ফেরাতে পারত না। ভগবান মেয়েমানুষকে কেন যে এত রূপ দেয়? ছোট থেকেই একটা প্রশ্ন ভাবত রেণু। আজও সে নিজের দিকে তাকিয়ে একই কথা ভাবে। মায়ের রূপ সে পায়নি, কিন্তু তীক্ষ্ণ, কলমীপাতার চেয়েও টানটান

চোখ দুটো তার মায়ের মতই। রেশমঘন চুলগুলো তার কোমরে এসে ফণাধারী সাপের মত নিপাট শুয়ে পড়েছে। চিকন কোমরে রেশমের এই অযাচিত সোহাগ হাওয়ার ভালবাসায় রেণুকে ভেতরে-ভেতরে জাগিয়ে রাখে, সদা সতর্ক করে, তুমি বড় হয়ে গেছ রেণু, এবার তোমার বুকের মাঝে ভালবাসার পদ্ম ফুটবে। ভ্রমর আসবে তার আকর্ষণে। বিষাক্ত পোকাও আসবে। সাবধান। নিজের কুসুম শরীরকে তুমি ভাল করে গুছিয়ে রাখো। কখনও অমনোযোগী হয়ো না। তাহলে পথ হারাবে, ঠকবে, কাঁদবে, দুঃখ পাবে।

পুকুরের জল ছুঁয়ে হাওয়া এল এক ঝলক। কলমীলতায় হেসে উঠল চোঙ্গা মাইক ফুল। জলঘুঘরো পোকা দৌড়ে বেড়ালো জলের উপর। একটা পানকৌড়ি পাখি এই দেখে ডুব দিল জলের তলায়। ডুবেই থাকল।

রেণু চেয়ে থাকল পলকহীন। ভাবনার গভীরে তলিয়ে যেতে যেতে সে শুনতে পেল সোহাগ জ্বরে পুড়ে যাওয়া ডাহুকের নরম কণ্ঠস্বর। বড় চেনা ডাক, তবু বুকের গভীরে কাঁপন তোলে কেন? কেন এলোমেলো করে দেয় সাজান মন? কেন চোখ দুটোয় এঁকে দেয় ভালবাসার কোমল পরশ? এগুলো আপাতত সরিয়ে রাখতে চায় রেণু। সে ভয় পায় মৃত্যুকে। জয়ন্তর মৃত্যুকে সে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। জয়ন্ত আগুন পোকার মত মৃত্যুতৃষ্ণা নিয়ে ছুটে এসেছিল তার দিকে। পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। বসন্ত জানার একমাত্র সম্বল রূপের আগুনে এভাবে পুড়ে যাবে রেণু ভাবতে পারেনি। জয়ন্তর মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে সে-ই তো দায়ী। নিজেকে সবসময় অপরাধী মনে হয় তার। যে কথা সে কাউকে বলেনি, যে কথা তার বুকের বাগানে কালবৈশাখীর ঝড় বইয়ে দেয়, সে-কথা সে কি ভাবে লুকিয়ে রাখবে রক্তে। ডুব দেওয়া পানকৌড়ি পাখিটার মত কথা ভেসে ওঠে বুকের জলাশয়ে; সাঁতার কাটে, তোলপাড় করে তোলে রেণুর সমস্ত সত্তা।

বেলা সরে এলে পুকুরপাড় ধরে রেণু হেঁটে আসে চালতাগাছের কাছাকাছি। গাছের ছায়া শরীর ঢেকেছে মাটির। রেণু গাছটার কাছে এসে চুপচাপ দাঁড়াল। ভয় করছিল তার। নতুন জীবনের জন্য তার যে অযাচিত আগ্রহ ছিল, সেই আগ্রহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছেন বসন্ত জানা। আসল কারণ না জানলেও রেণু জেনে গিয়েছে, তার বিয়ে ভেঙে গিয়েছে। পানিপারুলের সেই ছেলেটির সঙ্গে তার যে আর বিয়ে হবে না এ বিষয়ে সে মোটামুটি নিশ্চিত। দাদু জেদী মানুষ; কথায় কথায় বলে ফেলেছিলেন, ঐ তারিখেই তোর বিয়ে হবে। তবে ছেলে কে তা এখন আমি বলব না।

রেণুর আশ্চর্যভরা চোখে উপছে পড়ছিল আগ্রহ। বসন্ত জানা সংযমী হতে শেখেননি, রেণুকে ধাঁধার মধ্যে রেখে তিনি চলে গিয়েছেন দোকানে। রেণুর ভীষণ ভয় করে কেননা অপাত্রে পড়লে যে কোন মেয়ের জীবন বিষিয়ে যেতে পারে। তবে দাদুর উপর তার অগাধ আস্থা আছে। যোগ্য পাত্র ছাড়া রেণুর হাত অন্য কেউ ধরতে পাববে না। তা যদি না হোত তাহলে ভাঙত না বিয়ে। রেণুকে চলে যেতে হোত ঐ দোজবরের হাত ধরে। মুক্তিশ্বাস ছেড়ে রেণু আবার পুকুরের দিকে তাকাল। আলো মরে যাওয়া বিকেলে কালো ওড়নার ছায়া পড়েছে। আর একটু পরেই অন্ধকার মিশে যাবে পুকুরের জলে। জোনাকিরা ফুটে উঠবে চারদিকে। তখন সন্ধ্যাপ্রদীপ তুলসী তলায় জ্বেলে দেবে রেণু। যতক্ষণ তেল থাকবে প্রদীপটা জ্বলবে অন্ধকার ঠেলে দিয়ে। ঘরের দরজা লাগিয়ে সে বসে থাকবে চুপচাপ। ভাবনা মশার মত উড়বে চতুর্দিকে। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে এক সময়।

তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে রেণু ফিরে যাচ্ছিল ঘরে। পরনে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি, খালি পায়ে আলতার সীমারেখা। পিঠ ঢাকা ছিল চুলের বন্যায়। ঘাড় ছুঁয়ে রূপোর হারটা বুকের মাঝখানে। একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ রেণু টের পায় সেই রূপালী ধাতুতে। অনুভূতিটা চেতনায় আঘাত হানে। রোমাঞ্চিত, পুলকিত হয়ে ওঠে সে। ম্রিয়মাণ আলোর ক্ষীণতম ছটা তার মুখের উপর এসে পড়েছে। উদ্বেলিত, উদ্ভাসিত

হয়ে উঠছে সে। ঘরে ফিরে গেলে বাইরের এই নয়নাভিরাম দৃশ্য অন্তরালে চলে যাবে। রেণু পার্থিব সুখের এই দৃশ্যানুভূতিকে হৃদয়ের মাঝখানে অমলিন করে রাখতে চাইল। সে স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে থেকে দূরের দিকে চেয়ে রইল। কোন ফাঁকে পবন আগড় সরিয়ে ভেতরে ঢুকে এসেছে সে খেয়াল তার নেই। পবন মৃদু পায়ে হেঁটে এল রেণুর কাছে। একদম মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধোল, একা একা দাঁড়িয়ে কী করছো এখানে? রেণু আধো চোখ প্রস্ফুটিত করে তাকাল, ঘরে ভাল লাগছিল না তাই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। ভালই হল, তুমি এসেছ! নাহলে একা একা সময় আর কিছুতেই কাটতে চায় না।

—আর তো ক'দিন, তারপর তো সময় পাবে না একা থাকাব। পবনের চোখের কোণে হাসির দ্যুতি খেলে গেল। রেণু কোন কিছু না বলে প্রশ্নহীন চোখে পবনের দিকে তাকাল। পবন বলল, আমি তোমার কাছে এসেছিলাম একটা দরকারে।

—কী দরকার? তির্যক চোখে তাকাল রেণু।

পবন বলল, তুমি নিশ্চয়ই সব শুনে থাকবে?

—দাদু আমাকে কিছু বলেনি। রেণু অবাক হল না, শুধু হালকা গলায বলল, আমি আর কিছু শুনতে চাই না। কোন কিছু শুনতে আমার আর ভাল লাগে না। নিজেকে নিয়ে আমি খুব ঝামেলায আছি। মাঝেমাঝে আমার মনে হয়, আমি বুঝি দাদুর গলগ্রহ।

—এটা তোমার ভুল ধারণা। জোরের সঙ্গে পবন বলল, মানুষের ভালবাসাকে ছোট করে দেখো না। এতে ক্ষতি হয়—

সহসা কথা হারিয়ে রেণু আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। দাদু তাকে কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তা বলেননি। হয়ত বলার তাগিদ অনুভব করেননি। অথচ মারাত্মক কিছু সংবাদ তিনি পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন। রেণুও শোনবার জন্য প্রস্তুত ছিল। পবনকে প্রশ্ন কবলে সে নিশ্চয়ই আসল সত্য উন্মোচন করে দেবে। ধীর, শান্ত গলায় রেণু প্রশ্ন কবে, দাদু কিছু বলতে চেয়েছিল আমাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বলেনি। তুমি কি জান, দাদু কি বলতে চেয়েছিল?

—দাদুর মনের কথা আমি জানব কী করে? তবে—

—থামলে কেন, বল? রেণু আগ্রহ সহকারে ঝুঁকে পড়ল পবনের দিকে। পবন জড়তা কাটিয়ে বলল, পানিপারুলের ছেলের সাথে তোমার বিয়ে হবে না। একটা অসুবিধা আছে যা আমি তোমাকে বলতে পারব না।

—ওঃ, এই কথা। রেণু স্বাভাবিকভাবে হেসে উঠতে চাইল কিন্তু পারল না। বুকেব ভেতব থেকে ঠেলে উঠল দুঃখের চোরা ধারা। বিয়ে ভেঙে যাওয়ার জন্য নিজেকে দোষী ভাবতে শুরু করল সে। নিমেষে মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে বিষণ্ণতার ছায়া পড়ল, আমি জানতাম এমন কিছু একটা হবে। আমাব কোন কাজ সহজে হয় না।

—না, ঠিক তা নয়। পবন বোঝাতে চাইল, সব জেনে-শুনে তোমাকে তো অন্ধকাবে ঠেলে দেওয়া যায় না। সেটা উচিত হোত না।

—উচিত অনুচিতের প্রশ্ন নয়। আসলে আমার ভাগ্যটাই খারাপ। আমি পথের মেয়ে। আমাকে কে ঘরে তুলবে বল? অভিমানে ছলছলিয়ে উঠল রেণুর চোখ। অদ্ভুত বিষণ্ণতায় তার মুখমণ্ডল কালিমা-লিপ্ত হল। পবন পুরো ঘটনাকে সহজভাবে নিয়েছে। সে রেণুকে ভারমুক্ত করার জন্য বলল, যে কোন কাজে বাধা আসে। বাধাকে বড় করে দেখা কারোরই উচিত নয়।

রেণু কোন উত্তর করল না। পবন বলল, আমি তোমার কাছে একটা দরকারে এসেছি। কিন্তু কথাটা কী ভাবে বলব তা ভাবতে পারছি না। তবে সব শোনার পরে তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। পবন ইতস্ততা কাটিয়ে কিছু বলতে চাইলে রেণু তাকে থামিয়ে দিল, তুমি কী বলবে আমি তা জানি।

—জান? চমকে উঠল পবন। বুকের ভেতরটা দুলে উঠল ঝাঁকা দেওয়া পলকা গাছের মত। নিজেকে সামলাবার জন্য বেশ কিছুক্ষণ সময় নিল পবন; তারপর ধীর গলায় বলল, সব যখন জান তখন তোমার মত কি জানতে পারি? তোমার মত না পেলে আমার পক্ষে এক পা-ও এগোন সম্ভব নয়।

—কেন নয়, আমি এতই পাতে দেবার অযোগ্য?

—এ প্রশ্নটা পাল্টা আমি তোমাকে করতে চাই। নিজেকে নিয়ে আমার কোন বড়াই নেই কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমার ভীষণ গর্ব আছে।

—সে আমি জানি। রেণু আলতো ভাবে হাত ধরল পবনের। ধরেই থাকল। অন্ধকারে ওরা একে অপরকে দেখতে চাইল নিগূঢ় ভাবে। চোখে মিশে গেল চোখ, তাপ ছড়িয়ে পড়ল অবলীলায় এক শরীর থেকে আরেক শরীরে।

ছত্রিশ

সুভদ্রা ফিরে এল পুজো দিয়ে।

হাতে রেকাবি, রেকাবিতে ফুল-প্রসাদ। সাদা কাপড় ঢাকা দেওয়া ফলের উপর। সে পরেছে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। পিঠের উপর ভেজা চুল হাওয়ায় লুটায়। খালি পায়ে সুভদ্রা আসছিল ধীরে ধীরে। মনে চিন্তা। বিবাট বোঝা যেন তার পিঠের উপর চাপান। ক'দিন থেকে হাসি নেই ঠোঁটে। চেহারায় মৌন গম্ভীর নিস্তব্ধতা।

পবন হা-করে দেখছিল মাকে। প্রতি দিনের চেনা মা, তবু অচেনা।

সে বসেছিল, উঠোনেব একপাশে ফেলে রাখা কাঠের গুঁড়িতে। ওখানে সে প্রায়ই বসে। আজও বসেছে। তবে আজকের বসাটা অন্য কারণে। ঘর ভর্তি লোক, সে যাবে কোথায়! মানুষের ভিড় ক'দিন থেকে তার অসহ্য লাগছে। মনে মনে হাঁপিয়ে উঠেছে সে।

সুভদ্রা যাওয়ার সময় বলল, ঘরে থাকিস; আমি যাব, আর আসব।

সে যখন পুজো দিতে গেল তখন রোদ উঠেছে চনমনে। পুকুরের জলে হাঁসের দল সাঁতার কাটছিল ঢেউ তুলে। পাখ-পাখালি উড়ে গিয়েছে বাসা ছেড়ে। শুধু বুড়ো কাকটা তরলা বাঁশের ডগায় বসে 'কা-কা' করে ডাকছিল। পাড়ার কুঁচোকাঁচারা খেলছিল ধুলোপথে। পথের পারে বাঁধা গোরুর দড়ি শুয়েছিল সাপের মত। যুগলবুড়া গলা বাড়িয়ে বলেছিল, আজ পবনার বিয়ে, পেট পুরে খাবো গো!

কথাটা কানে গিয়েছিল সুভদ্রার। দাঁড়িয়ে যে দুটো কথা বলবে তার উপায় নেই। গত রাতে ঘুম হয়নি ভাল। হুড়মুড়িয়ে স্বপ্ন এল আধো ঘুমে। সহদেব এসেছে। ঘরে ঢুকছে না। গায়ে ধুম জ্বর। চোখের কোণে হেরো মানুষের চিহ্ন।

সেই থেকে মনটা কেমন হয়ে আছে সুভদ্রার।

নকুল তার মন খারাপ দেখে বলল, যাও, পুজো দিয়ে আসো শীতলা থান থেকে। শুভ দিনে পুজো-পাঠ ভাল। এতে বিপদ-আপদ দূর হয়।

কার জন্য পুজো দিতে যাওয়া। সহদেব না পবন— কার জন্য? —ভাবল সুভদ্রা। আর একটু হলে হোঁচট খেত, সামলে নিল নিজেকে। এমন একটা ব্যস্ত দিনে তার এত অন্যমনস্কতা মানায় না। সহদেব না থাকলেও, সে আছে। তাকে সব দিক দেখে শুনে কাজ করতে হবে। ছেলের মনে দুঃখ দেওয়া ঠিক হবে না।

বসন্ত জানা যখন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এল, তখনও নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেনি সে। এ-ও কি সম্ভব? চাঁদ কি তাহলে সত্যি হাসবে খড়ের ঘরে? গর্বে বুক ভরে উঠেছিল তার। রেণু মেয়ে

হিসেবে মন্দ নয়। ওর রূপ-গুণ-সব আছে। সংসারের কাজে তার কোন ক্লান্তি নেই। বসন্ত জানা হাতজোড় করে বললেন, অমত হয়ো না। তোমার পবনকে আমার রেণুর জন্য ভিক্ষা দাও। ওদের দু-জনকে মানাবে ভাল। আর ওরাও একে অপরকে চায়।

পুজোর ফুল পবনের মাথায় ছুঁইয়ে দিল সুভদ্রা। প্রসাদ দিল বেছে-বেছে। মনের মধ্যে কত কথা। কোন কথাই বাইরে আসে না। পবন অস্ফূটে ডাকে, মা।

চমকে উঠল সুভদ্রা। নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরিয়ে এনে বলল, কিছু বলছিস?

—তোমার কি মন খারাপ?

—কৈ, না তো। মিথ্যে হাসল সুভদ্রা, লুকোতে চাইল কিছু। সজল হল চোখ। সাদা শাড়ির আঁচলে চোখ রগড়ে আবার পবনের দিকে তাকাল। ব্যস্ত হয়ে বলল, আমি যাই। কত কাজ পড়ে আছে। —সে চলে যাচ্ছিল। আবার ফিরল। বলল, আজ ঘরের বাইরে যাবি নে।

—গেলে কী হয়?

সুভদ্রা উত্তর দিতে পারল না। তার চোখের তারায় কাঁসার বাটি পড়ে যাওয়ার কাঁপন। মুখ মাটির দিকে ঝুঁকিয়ে সে চলে গেল ঘরের দিকে ।

পবনের বিয়ে বলেই নকুল এসেছে সদর থেকে। তার গায়ে ঢোলা পাঞ্জাবী, পরনে ধুতি। পায়ে চামড়ার নতুন চপ্পল। সরু করে কাটা গোঁফ। মুখে পান, ঠোঁটের ফাঁকে চারমিনার। হরদম সে ফুঁকছে। ধোঁয়া ছাড়ছে। চাকুরিয়া বলে কথা! গ্রামে এলে সে হপ্তা খানিক বিড়ি খায় না। নিজের আভিজাত্য বজায় রাখে পকেটে পয়সা থাকা পর্যন্ত।

সে পবনকে জ্ঞান দিয়ে বলল, রোদে রোদে ঘুরিস নে। যা, ঘরে গিয়ে বোস। আর হ্যাঁ, কাজলপাতি রেখেছিস তো? আজকের দিনে কাজলপাতি হাত ছাড়া করবি নে?

লোহার কাজললতা পবনের কোমরে গোঁজা। সুভদ্রা দিয়েছে। পবন নিয়েছে। কেন নিয়েছে, কোন কারণ জানে না। নিতে হয় বলেই নিয়েছে সে।

বিয়ের কথা শুনে রেণু হেসেছিল দমতক। হাসি তার থামতেই চায় না। শরীর হিল্লোলিত হচ্ছিল হাসির গমকে। দু-গালে দুটো মস্ত টোল। চোখে উপছে পড়া ভাললাগা রঙ। ঐ রঙটাই নাকি সম্মতির। পবন বুঝেছিল কী করে। কেউ তাকে শিখিয়ে দেয়নি, সে ঠিক বুঝে নিয়েছে। সেই থেকে রেণুকে নিয়ে তার স্বপ্ন দেখা শুরু। স্বপ্ন দেখলেও সে রেণুর মুখের দিকে তাকায় না সাহস করে। যদি ধরা পড়ে যায়, যদি প্রকাশ পায় দুর্বলতা। রেণুর সাহস অনেক। সে ফাঁকা ঘরে হাত ধরেছিল পবনের। ধরেই ছিল অনেকক্ষণ। ঘেমো হাতের স্পর্শে উষ্ণতার আদর। ঠোঁট কাঁপছিল রেণুর। অস্পষ্ট, ভাঙা ভাঙা স্বরে বলেছিল, এই ভাল হল। তুমিও খুশি, আমিও খুশি। তবে হ্যাঁ, ঝগড়াঝাটি করো না কিন্তু। আমার তো কেউ নেই যে দুঃখ হলে পালিয়ে যাবো।

তার ভেজা কথায় চমকে উঠেছিল পবন। হিম স্পর্শে উদ্বেলিত হৃদয়। রেণু তাকে ছাড়ল না, মাথায় হাত দিয়ে শপথ করিয়ে ছাড়ল। পবনও বাধ্য অনগত। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, তুমি যা চাও, সারাজীবন তাই হবে।

—কথা দিচ্ছো?

ঘাড় নাড়ল পবন। তারপর মুক্তি।

মুক্তির স্বাদ জীবনে বুঝি এই প্রথম। এই প্রথম বুঝি একটা আনন্দময় দিনের আগমন। তবু বুকের মাঝখানে ফণীমনসার কাঁটার মত বিঁধছে অসহনীয় যন্ত্রণা। সবাই আছে, অথচ একজন নেই।

সহদেব কি আসবে না? তার অজ্ঞাতবাস কি ফুরোবে না?

রেণু কাঁপছিল। জোড়া চোখে টসটসে জল।

—মা'র কথা খুব মনে পড়ে, জান? মা হয়ত চাইত—এমন হোক। সে তো তোমাকে নিজের ছেলের মত দেখত।

আবার সাপের পিঠে পা দিয়ে চমকে ওঠার পালা। আবার বুকের উদ্যানে ঝড়-তুফান। এই নিয়ে কি মানুষের জীবন? এই নিয়ে কি মানুষের সুখ-স্বপ্ন বিরহ-মিলন-সংসার? বড় জটিল অঙ্ক। এর সমাধান তো পবনের জানা নেই।

নকুল পানের পিক ফেলে বরকর্তার মত বলল, যদিও পাশাপাশি গাঁয়ে বিয়ে, তবু তোর বিয়ে পরীযানে যাবে। এ আমার অনেক দিনের আশা।

রঙ বাজির আলোয় রাতের পৃথিবী রঙিন।

পুরো হাড়িসাইয়ে উৎসবের আয়োজন। নকুল তাদের মদতদাতা।

হরিয়া বলল, পবনের বিয়েতে গাছবাজি ধরান হবে মাঠপাড়ায়। দোদমা ফুটবে। তাসা বাজবে। পবনের বিয়ে হবে রাজার মত।

সব আয়োজন শেষ।

বসন্ত জানা কৃপণতা করেননি। দুলুবাবুও কম যান না। সবার মাঝখানে বললেন, রেণু আমার মেয়ের মত। ওর মা নেই। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেব। ও যেন না বুঝতে পারে, ও অনাথ।

সেই মত সব হল।

প্যাণ্ডেল এল এগরা থেকে। পানিপারুল থেকে ডায়নোমো। চেয়ার-টেবিলে গ্রামের মানুষগুলো খাবে। বসন্ত জানা সব দেখবেন দু-চোখ ভরে। জয়ন্ত নেই। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবেন তিনি।

রেণু পরেছে জবা রঙের বেনারসী। স্ত্রীর গয়নাগুলো বসন্ত জানা রেণুকে স্বেচ্ছায় দিয়েছেন সব। হাত ভর্তি চুড়ি, বালা। গলায় ফুল তোলা চওড়া হার। কানে ঝুমকো দুল। খোঁপায় রূপোর কাঁটা। কাচজল বসান রঙিন ওড়না পরীদের মত ওড়ে হাওয়ায়।

সানাই বেজে চলে রাতের বাতাসকে ঘুম পাড়িয়ে। জোনাকিরা শহুরে আলোকে ভয় পেয়ে ঝোপের আড়ালে মুখ লুকায়। অত আনন্দ কোথায় ছিল এতদিন, রেণু ভাবছিল চোখের তারায় কাঁপন তুলে। ওর বান্ধবীরা ভিড় করে আছে ওকে ঘিরে। হাসি নয়ত যেন ছড়িয়ে পড়ছে ফুল। আতরের শিশি ভেঙে গেছে এমন সুগন্ধ! রাতকে মনে হয় আলো ঝলমলে বসন্তবেলা। এত সুখ কি রেণুর জন্য তোলা ছিল? রেণুর ঠোঁট নড়ে ওঠে, মাগো, তুমি কি দেখতে পাচ্ছো এসব?

বিবাহবাসর কলি থেকে ফোঁটা পদ্মের রূপ নিল।

আলপনা আঁকা পিঁড়ির উপর বসে আছে রেণু। বুকে দুরুদুরু ভয়। রূপদর্শী পবনের দিকে তাকাতে পারছে না সে। লজ্জার রেণু ছড়িয়ে পড়েছে চোখে-মুখে। চাপা আবেগে অস্থির করে কাঁপছে বুকের চারপাশ।

পুরোহিতের মন্ত্র ভাসে বাতাসে।

নকুল সিগারেট ছাড়ে না মুখ থেকে, বরকর্তার গলায় বলে, আর দেরী করে কী লাভ? সত্বর বিয়ে শেষ করে খাওয়া-দাওয়ার পাটটা চুকিয়ে ফেলাই ভাল। সবাই সম্মতি দেয় তার কথায়। শুরু হয় বিয়ে।

মন্ত্রে-মন্ত্রে মুগ্ধ বাতাস।

পবন কাঁপা গলায় আওড়ায় সংস্কৃত শ্লোক।

রেণু অনুসরণ করে তাকে। এই অভিজ্ঞতা বিরল। রোমাঞ্চিত হয় উভয়ে। কোথাও বুঝি মেঘ করে ছিল এক চিলতে। ঢাকা পড়ে ছিল তারা। হঠাৎ হাওয়া এল, উড়ল খড়কুটো।

মাতাল সহদেব অন্ধকার ফুঁড়ে আলোয় এসে দম নিল। মুখে মদের গন্ধ। ছেঁড়া পাঞ্জাবির কোণায় ঝরে পড়েছে লালা। চোখ লাল। দাড়ি-গোঁফ ভর্তি মুখটা কাঁটার ঝোঁপ যেন। সে এসে ভাল করে

দেখল চারপাশ। আলো অসহ্য লাগাতে দু-চোখে ঢাকা দিল হাত। তারপর চিৎকার করে বলল, এ অধর্ম। এ বিয়ে হবে না, হতে পারে না।

গমগমিয়ে উঠল তার মদ-মেদো গলা। বাতাস চঞ্চল হল মুহূর্তে। চমকে উঠল আনন্দ জোয়ারে ভেসে যাওয়া মানুষ। রেণুর বুকে বাজ পড়ল যেন। ঘামে ভেসে যেতে থাকল প্রসাধনের চিহ্ন। পবনের শরীরে যেন প্রাণ নেই, সে শুকনো গাছের মত দাঁড়িয়ে থাকল।

পুণ্য, পবিত্র মন্ত্র থেমে গেছে। চারিদিকে অসহনীয় থমথমে পরিবেশ। সবার কৌতূহলী চোখ সহদেবের দিকে নিক্ষেপিত।

দুলুবাবু এগিয়ে গেলেন, এগিয়ে গেল নকুল। সহদেবের হাত ধরে টেনে আনল দূরে। হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল সহদেব। পারল না। ভেঙে পড়ল আর্তনাদে, দাদা, এ বিয়ে হবে না, হতে পারে না।

—তুই কি পাগল হলি? নকুলের গলার শিরা ফুলে উঠল। আবার একটা সিগারেট ধরাল সে। সহদেবের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে সে বলল, এসেছিস, ভালো করেছিস। চুপচাপ বস। বেশী কথা বাড়াস নে, বিয়েটা হয়ে যেতে দে।

—কীসের বিয়ে, কার বিয়ে? এ অধর্ম? এ পাপ! ডানে-বাঁয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে চুল চেপে মাটিতে বসে পড়ল সহদেব।

নকুল তার পিঠের উপর হাত রাখল; নরম হয়ে বলল, ভাইরে, শুভ কাজে বাধা দিস নে। বিয়েটা হয়ে যেতে দে।

—না-আ-আ-আ। এ বিয়ে হবে না। এবার রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়ল সহদেব, পিচুটি ভরা দু-চোখে আগুন ঝরিয়ে বলল, এ অধর্ম, এ পাপ! আমি বেঁচে থাকতে এ বিয়ে কখনও হবে না।

কপাল চাপড়ে ডুকরে উঠল সহদেব।

ধৈর্য্য হারিয়ে নকুল শুধোল, কীসের অধর্ম? জাতের মিল না থাকলে কি বিয়ে হয় না? যুগ বদলেছে, এখন আর মানুষ জাত-পাত নিয়ে মাথা ঘামায় না। তুই চুপ কর সহদেব, শুভ কাজে আর বাধা দিস নে।

সহদেব মচকাল, তবু ভাঙল না।

খোলস ছেড়ে দেওয়া সাপের চেয়েও নিস্তেজ শরীর নাড়িয়ে সে বলল, হিন্দু ধর্মে ভাই-বোনের কোনদিন বিয়ে হয় না। রেণু পবনের বোন। অতসী বোষ্টমী ওকে পেটে ধরলেও রেণু আমার ঔরসজাত মেয়ে। এ কথা এত দিন আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। একমাত্র অতসী বোষ্টমী ছাড়া কেউ জানে না। সে বেঁচে থাকলে এমন অঘটন কিছুতেই ঘটত না।

ছানা কাটা দুধের মত ম্লান হয়ে গেল বিবাহবাসর। নকুল বাষ্পরুদ্ধ চোখে বসন্ত জানার মুখের দিকে তাকাল। দুলুবাবু তড়িৎ গতিতে ছুটে গেলেন বিয়ের আসরে। রেণুর হাত ধরে কাতর হয়ে বললেন, ঘরে চল মা। তোর ভাগ্যের জন্য আমার চোখে জল এসে যাচ্ছে।

নকুলের চলার ক্ষমতা ছিল না, তবু সে ধীরে ধীরে হেঁটে এল পবনের কাছে। পবন ঝড়ো হাওয়ার চেয়েও অস্থির। রেণু ঘরে ফেরা মেঘ। মেঘজীবনের তৃষ্ণা তার বুকে।